কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত : জীবন ও সাহিত্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে বাংলা বিভাগের অধীনে
এম.ফিল. ডিগ্রি লাভ করার জন্য উপস্থাপিত
অভিসন্দর্ভ ২০০৮

উপস্থাপনকারী
মিলন কান্তি দে
নিবন্ধন নং-১৭, শিক্ষাবর্ষ ২০০১-২০০২
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত : জীবন ও কাব্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা বিভাগের অধীনে
এম.ফিল. ডিগ্রি লাভ করার জন্য উপস্থাপিত
অভিসন্দর্ভ ২০০৮

উপস্থাপনকারী
মিলন কান্তি রায়
নিবন্ধন নং - ১৭, শিক্ষাবর্ষ - ২০০১-২০০২
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ড. সৌমিত্র শেখর
সহযোগী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ফোন : ৮৬২৪৬৬৬ (বা), ০১৫৫২-৪১৪১৪৩ (মো)

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মিলন কান্তি রায় আমার তত্ত্বাবধানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে এম.ফিল. ডিগ্রি লাভ করার জন্য 'কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত : জীবন ও কাব্য' শীর্ষক বর্তমান অভিসন্দর্ভ রচনা করেছে। আমার জানা মতে, এই অভিসন্দর্ভের কোনো পরিচ্ছেদ বা অধ্যায় অথবা অংশ-বিশেষ অন্য কোথাও ইতঃপূর্বে প্রকাশিত হয় নি বা প্রকাশ করার জন্য জমা দেয়া হয় নি।

436741

সৌমিত্র শেখর 22/১/২০০৮
(ড. সৌমিত্র শেখর)

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

বাংলা কাব্যসাহিত্যের ধারায় সম্পূর্ণ অনালোচিত অথচ গুরুত্বপূর্ণ কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত (১৯১৮-১৯৯৮)। তিনি ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে জন্মগ্রহণ করেন এবং উত্তরকালে এ অঞ্চলের শিক্ষা-সাহিত্য-রাজনীতিতে অবদান রাখেন। তাঁর সমকালে বুদ্ধদেব বসু, সোমেন চন্দ, রণেশ দাশগুপ্ত, অজিত দত্ত, অচ্যুত গোস্বামী প্রমুখ কৃতী ব্যক্তিত্ব একই সঙ্গে সক্রিয় ছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁদের সম্পর্কে নানা ধরনের আলোচনা হলেও বাংলাদেশে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত সম্পর্কে কোনো আলোচনা বা গবেষণা হয় নি। অথচ ঢাকার প্রগতি আন্দোলনে তিনি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। মধ্য-জীবনে চাকরিসূত্রে তিনি কলকাতায় যান এবং সেখানে স্থায়ী হন। কলকাতাতেও তাঁর উপর বিস্তৃত গষেণাকর্ম হয়েছে বলে জানা যায় না। এই পরিপ্রেক্ষিতে কবির মৃত্যুর তিন বছর পর আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল ডিগ্রির জন্যে 'কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত : জীবন ও কাব্য' শীর্ষক গবেষণায় নিয়োজিত হই। বর্তমান অভিসন্দর্ভটি সেই গবেষণার ফসল।

এই গবেষণাকর্মের বিষয়-নির্বাচন ও পাণ্ডুলিপি প্রণয়নকালে যিনি অক্লান্ত পরিশ্রম, সময় এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা, নিরন্তর অনুপ্রেরণা ও তাগিদ দিয়ে আমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন, তিনি আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক, আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডক্টর সৌমিত্র শেখর; তাঁর অপরিমেয় স্নেহে আমি ধন্য, তাঁর কাছে আমার ঋণ পরিশোধযোগ্য নয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী আমার এম.ফিলের প্রথম বর্ষের দুটি কোর্স গ্রহণ করেছিলেন বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর সিদ্দিকা মাহমুদা ও অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া। এ সময় তাঁদের সঙ্গে গবেষণার বিষয়ে আলোচনা করে তাঁদের প্রাজ্ঞ পরামর্শ ও অনুপ্রেরণা পেয়ে আমি উপকৃত হয়েছি; তাঁদের কথা আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

436741

ঢাকায় বসে কবির কর্মচঞ্চল জীবন ও কবিকৃতি সংক্রান্ত সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ আমার জন্যে সহজসাধ্য ছিল না। গবেষণার প্রয়োজনে কবির জীবনী ও প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহের জন্যে আমি পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় কবির বাড়ি, কবির বন্ধু ও স্বজন এবং অন্যান্যের নিকট গিয়েছি। আর এ ব্যাপারে আমাকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন শহিদ সোমেন চন্দের কনিষ্ঠভ্রাতা শ্রী কল্যাণ চন্দ। তাঁর সাহায্যের হস্ত প্রসারিত না হলে কবির যাবতীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে আমাকে আরো বেশি বেগ পেতে হত। এছাড়া কবিভ্রাতা শ্রীসঞ্জয়শঙ্কর সেনগুপ্ত, কবিভগ্নী শ্রীমতী ইভা দাশগুপ্ত, কবিপুত্র শ্রীসুমিত্রশঙ্কর সেনগুপ্ত, কবিবন্ধু শ্রীপ্রফুল্লকুমার দত্ত, কবি রাণা চট্টোপাধ্যায়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুমিতা চক্রবর্তী কবি সম্পর্কে আমাকে নানা তথ্য ও গ্রন্থ দিয়ে উপকৃত করেছেন। এ সময় কবি গোলাম কুদ্দুসের সঙ্গেও আমার আলাপ হয়েছে। তবে তিনি কোনো লিখিত বা রেকর্ডধারণকৃত আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার দিতে রাজি হন নি। কবি গোলাম কুদ্দুস বলেছিলেন, তিনি আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার দান বন্ধ করে দিয়েছেন। তবে তাঁর সঙ্গে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ও চল্লিশের দশকের উত্তপ্ত দিনগুলো সম্পর্কে আলোচনা করে উপকৃত হয়েছি। কলকাতায় আমাকে সার্বক্ষণিক সঙ্গ ও উৎসাহ দিয়ে সবিশেষ

Dhaka University Institutional Repository

উপকৃত করেছে অনুজপ্রতিম শ্রীমান অলোকেশ বিশ্বাস। এঁদের সকলের প্রতি আমি হার্দিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

গবেষণাকালে নানা পর্যায়ে মূল্যবান পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়েছেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ও নাট্যকার মমতাজউদদীন আহমদ, অধ্যাপক ও কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ; চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর শাহজাহান মনির, ডক্টর মাহবুবুল হক; রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ আবদুল জলিল, ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ফারুক উজ জামান; সাভার বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মনজুর আলম খান (তপন খান)। কিছু তথ্য দিয়ে উপকৃত করেছেন ডক্টর আমিনুর রহমান সুলতান ও কলকাতার লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক শ্রীসন্দীপ দত্ত। সবাইকে আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণ করি আমার পরম শ্রদ্ধেয় গুরুজন অধ্যাপক রতন সিদ্দিকীর কথা। যাঁর প্রবল উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় আমি এম.ফিল গবেষণা শুরু করেছিলাম। তাঁর কাছে আমি অপরিমেয় ঋণে আবদ্ধ।

কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি 'মনন প্রকাশে'র স্বত্বাধিকারী জনাব শাহ আল মামুন, জনাব আবু হানিফ, 'বিশ্বসাহিত্য ভবনে'র স্বত্বাধিকারী জনাব তোফাজ্জল হোসেন, 'আফসার ব্রাদার্সে'র স্বত্বাধিকারী জনাব আফসারুল হুদা, 'গতিধারা' প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী জনাব সিকদার আবুল বাশার, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের লাইব্রেরির পরিচালক স্নেহাস্পদ আবিদ হোসেন, এ্যাডভোকেট এস. এম. এ ওয়াহাব, সাংবাদিক জনাব আমিরুল ইসলাম কাগজী, জনাব মোহন হাসান প্রমুখের আন্তরিক অনুপ্রেরণার কথা।

আল-কোরআনের কয়েকটি সুরার বাংলা তর্জমা বুঝতে আমাকে আন্তরিকভাবে সাহায্য করেছেন নারায়ণগঞ্জের হাজী আঃ সামাদ ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসার অধ্যক্ষ মওলানা আবু তাহের ভূঁইয়া, মওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম ও হাফেজ মোঃ ইলিয়াছ। তাঁদের সহযোগিতার কথা আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি।

গবেষণাকালে আমি প্রধানত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমী লাইব্রেরি, কলকাতার লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র, সিপিআই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের লাইব্রেরি থেকে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ও উপাদান সংগ্রহ করেছি। এসব গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

অভিসন্দর্ভটি অক্ষরবিন্যাসে সহযোগিতা করেছে আমার সুহৃদ সামসুদ্দীন মোল্লা টিটু, তাকেও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

গবেষণাকর্মে আত্মনিয়োগ করে সংসারের দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলা করায় যাঁদের কাছে আমি সবচেয়ে বেশি 'অপরাধী' — আমার পরম আরাধ্য পিতৃদেব শ্রীমন্মথরঞ্জন রায় ও মাতা শ্রীমতী আশালতা রায়; সবশেষে তাঁদের চরণকমলে সেই 'অপরাধে'র জন্যে মার্জনা ভিক্ষা এবং আশীর্বাদ প্রার্থনা করছি।

মিলন কান্তি রায়

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

মুখবন্ধ

ভূমিকা ৬-৭

প্রথম অধ্যায়
প্রথম পরিচ্ছেদ : প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বৈশ্বিক ও দৈশিক প্রেক্ষাপট ৮-৩২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : চল্লিশের দশক ও বাংলায় সাহিত্য-আন্দোলন ৩৩-৮৬

দ্বিতীয় অধ্যায়
কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত : জীবন ও মানস ৮৭-১১৮

তৃতীয় অধ্যায়
কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের কবিতা : বিষয়বৈচিত্র্য ও শিল্পরূপ ১১৯-৩৬৯
স্বপ্ন-কামনা ১২৫, নতুন আঁচড় ১৪৯, স্বর ও অন্যান্য কবিতা ১৬৭, দিনযাপন ১৮৭,
এই এক সময় ২২১, বৃষ্টি এলে ২৫৬, রুক্ষদিনের কবিতা ২৬৭, মানুষ জানে ২৭২,
ছায়া হেঁটে যায় ৩০১, ভিতরে বাইরে ৩২৬, দৃশ্য বদলের দিন ৩৩৭,
আশি-নব্বুই-এর কবিতা ৩৫৪

উপসংহার ৩৭০-৩৭১

পরিশিষ্ট ৩৭২-৩৭৯

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

তিরিশোত্তর বাংলা কবিতা নানা দিক থেকে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) প্রবর্তিত সাহিত্য-বলয়কে পাশ কাটিয়ে আধুনিক কাব্যচর্চার যে ধারাটি তিরিশের দশকে জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬১), বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২) প্রমুখ কবি স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করেছিলেন, সেটিও ছিল এক অর্থে রোমান্টিক কবিতারই অনুগামী। বিশেষ করে পাশ্চাত্য প্রভাব ও প্রতিক্রিয়াকে অবলম্বন করেই বিকশিত হয়েছিল এ সময়ের কবিতা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫) চলাকালে ভারতীয় জাতীয় রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক ক্রান্তিকালে কলকাতায় প্রগতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিকগণ তাঁদের সৃষ্টিতে বিষয় ও শিল্পগতভাবে ব্যাপক পরিবর্তন, যাকে নতুনত্বই বলা ভাল– আনতে সক্ষম হন।

চল্লিশের দশকে ঢাকায় প্রগতি লেখক সঙ্ঘকে ঘিরে একটি নতুন সাহিত্যগোষ্ঠী গড়ে ওঠে। নবীন এসব কবিদের কবিতায় আধুনিকতা একটা নতুন মাত্রা পায়। প্রগতিশীল এসব তরুণ কবিরা ছিলেন সাম্যবাদী ভাবধারায় বিশ্বাসী। ফলে তাঁদের কবিতায় প্রধানত প্রতিফলিত হয় সমাজচিন্ত

তিরিশের দশকের কবিদের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে চল্লিশের দশকের তরুণ কবিদের দৃষ্টিভঙ্গির বেশ কিছুটা পার্থক্য দৃষ্ট হয়। বস্তুত শেষ তিরিশ থেকে এই নতুন আধুনিকতা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং চল্লিশের দশকে সামগ্রিক রূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চল্লিশের দশকে দায়বদ্ধতা কবিতার একটি প্রধান শর্ত হওয়ায় কবিতার আধুনিকতা একটা বিশেষ মাত্রা পায়।

চল্লশের দশকে যে সব তরুণ কবি কবিতায় আধুনিকতার এই নতুন পথের সূচনা করেন, কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত (১৯১৮-১৯৯৮) তাঁদের মধ্যে অন্যতম

ঢাকায় প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের একজন সংগঠক হিসেবে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত কাব্যশৈলীতে নিয়ে আসেন আধুনিকতার নতুন মাত্রা। তাঁর কবিতায় বক্তব্য ও উপস্থাপনকলার যে সুসমন্বয় দেখা যায় তা চল্লিশের সব কবির মধ্যে নেই। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত সমকাল ও কবিতা নিয়ে একাধিক গ্রন্থও লেখেন। সেইসব গ্রন্থে কবিতা নিয়ে তাঁর একান্ত ভাবনাও প্রকাশিত। তাঁর এই নতুন শৈলী বাংলার আধুনিক কবিরা খুব একটা গ্রহণ করেছিলেন তা বলা যাবে না। তবুও তিনি যে স্বাতন্ত্র্য রেখে গেছেন তা একটি যুগের বিশেষ পরিচয়ের সঙ্গেই জড়িত। সে জন্যেই কিরণশঙ্কর আমাদের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল অধ্যায়।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান গবেষণায় তাঁর জীবন ও গ্রন্থিত-অগ্রন্থিত কবিতা বিশ্লেষণ করে ইতিহাসের সেই অনধিত অধ্যায়কে যেমন উন্মোচনের চেষ্টা করা হবে ঠিক তেমনি কবির কাব্যকলাগত কৌশলও অনুধাবন ও বিশ্লেষণ করা হবে।

আমার জানা মতে চল্লিশের দশকের আধুনিক কবিদের অন্যতম প্রধান কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তকে নিয়ে বা তাঁর রচিত সাহিত্যকীর্তি নিয়ে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা হয় নি। সে কারণেই বর্তমান গবেষণায় তাঁর রচিত প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতাবলি বিশেষভাবে পর্যালোচনা করে কবিতায় কবির দায়বদ্ধতা, সময় ও সমাজচিন্তার স্বরূপ উদ্ঘাটনের মাধ্যমে বাঙালি পাঠকের সামনে একজন শক্তিশালী, অথচ অনালোচিত– যিনি ঢাকা কেন্দ্রিক প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনেরও ছিলেন অন্যতম সংগঠক; তাঁর পরিচয় তুলে ধরা আমাদের লক্ষ। শুধু তাই নয়, চল্লিশের দশকের সমৃদ্ধ কাব্যধারা থেকে বর্তমান কালের কবিতায় কবি কিরণশঙ্করের চিন্তার প্রাসঙ্গিকতা নির্ণয়ও এই গবেষণার উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশের নিজস্ব পরিমণ্ডলে গড়ে ওঠা প্রগতিশীল সাহিত্যের একজন ধারক ও বাহক ছিলেন কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। তাঁর কবিতার শিকড় এই বাংলাদেশের মাটিতে প্রোথিত। তৎকালীন কলকাতা কেন্দ্রিক আধুনিক সাহিত্যিক ধারার বাইরে ঢাকায় স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যাঁরা কবিতা-চর্চার মাধ্যমে ঢাকাকে সাহিত্যাঙ্গনে বিশিষ্ট স্থান করে দিয়েছেন কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত তাঁদের অন্যতম। তাই বাংলা সাহিত্যে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের রচনার গুরুত্ব অপরিসীম। এই গবেষণার যথাযথ সমাপ্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত :

ক) চল্লিশের দশকের বাংলাদেশের কবিতায় প্রগতিশীল ধারার রূপরেখার যথাযথ উদ্ঘাটন।

খ) আধুনিক বাংলা কবিতায় ঢাকা কেন্দ্রিক কবিদের অবদান সম্পর্কে বিশদ আলোচনা। এতে সাহিত্য-বিবেচনায় ঢাকা শহরের গুরুত্বও নতুনভাবে চিহ্নিত করা যাবে।

গ) প্রগতিশীল কবি-সাহিত্যিকগোষ্ঠীর মধ্যে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের কাব্যচিন্তার স্বাতন্ত্র্য আবিষ্কার।

ঘ) বর্তমান সময়ের কবিদের মধ্যে এই সাহিত্যধারার প্রবহমানতা সম্পর্কে অনুসন্ধান।

ঙ) সবকিছু মিলিয়ে, এ ধারার সাহিত্য সুন্দর আগামী নির্মাণে কি ভূমিকা রাখতে পারে– এমন একটি জটিল অথচ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথ সহজ হতে পারে।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের জীবন অনুসন্ধান, প্রকাশিত কবিতা গ্রন্থাবলি ও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত অগ্রন্থিত কবিতাসমূহ নিবিড়-পাঠ আমাদের গবেষণার সূত্র ও আকর বলে বিবেচিত।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিশ্বযুদ্ধোত্তর বৈশ্বিক ও দৈশিক প্রেক্ষাপট

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিশ্বব্যাপী যে প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে ব্রিটিশ-শাসিত ভারতের বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষেরা এর বাইরে ছিল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে বিশ্বব্যাপী একদিকে পুঁজির বিকাশের পথ যেমন উন্মুক্ত হয়েছে, অন্যদিকে সমবাদী অর্থনৈতিক চেতনা ভিত্তিক মতবাদেরও উন্মেষ ঘটেছে। ভারতের সমাজ ও রাজনীতিতে এর প্রভাব দেখা যায়, বঙ্গীয় সমাজেও এই প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিভাত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবী পুঁজিবাদী ও সমাজতন্ত্রী এ দুই শিবিরে স্পষ্টত বিভক্ত হয়ে পড়ে। ভারতীয় সমাজে বিশেষত অবিভক্ত বাংলায় এই বিভক্তি ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে দেখা যায়। এই অবস্থায় পৌছতে ঘটনা পরম্পরায় কিছু স্তর ও পর্যায় অতিক্রান্ত হয়। নিচে এ প্রসঙ্গে সবিস্তার উল্লেখ করা হল।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট

উনিশ শতকের শেষার্ধে এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধে ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে যে পুঁজি নিয়ন্ত্রণ, নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণ, উৎকট জাতীয়তাবাদ ও যুদ্ধকামী মানসিকতা দেখা দিয়েছিল, তার চরম পরিণতি হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ১৯১৪ সালের ২৮শে জুলাই সার্বিয়ার বিরুদ্ধে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি যুদ্ধ ঘোষণা করলে এ যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। আর ২৯শে জুলাই অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডের উপর কামানের গোলা নিক্ষেপ করার সঙ্গে সঙ্গে এ মহাযুদ্ধ পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। সার্বিয়া আক্রান্ত হতেই সৈন্য সমাবেশের আদেশ দেয় রাশিয়া। সৈন্য সমাবেশকে যুদ্ধ ঘোষণার সামিল মনে করে জার্মানি রাশিয়াকে এক চরমপত্রে সৈন্য সমাবেশ বন্ধ করতে অনুরোধ জানায়। রাশিয়া সে চরমপত্রের জবাব না দেয়াতে জার্মানি ১লা আগস্ট (১৯১৪) রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। রুশ-জার্মান যুদ্ধ বাধলে ফ্রান্স রাশিয়ার পক্ষ নেবে এই আশঙ্কায় জার্মানি ৩রা আগস্ট (১৯১৪) ফ্রান্সের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করে। জার্মানি ফ্রান্স আক্রমণের জন্যে বেলজিয়ামের মধ্য দিয়ে সেনাবাহিনী প্রেরণ করায় বেলজিয়াম ইংল্যান্ডের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠায়। ফলে ইংল্যান্ড ৪ঠা আগস্ট (১৯১৪) জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ক্রমশ এ যুদ্ধে ইটালি (১৯১৫), জাপান (১৯১৫), চীন

Dhaka University Institutional Repository

(১৯১৭), গ্রীস (১৯১৭), আমেরিকা (১৯১৭) প্রভৃতি মিত্রপক্ষে এবং তুরস্ক (১৯১৫), রুমানিয়া (১৯১৬) প্রভৃতি জার্মানির পক্ষে যোগদান করে। এভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিধি দ্রুত বাড়তে থাকে এবং এক সময় পৃথিবীর প্রায় সব প্রধান দেশ এ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। যুদ্ধ চলে দীর্ঘ চার বছর তিন মাসেরও বেশি সময় ধরে। অবশেষে এক কোটি ত্রিশ লাখ প্রাণের বিনিময়ে[১] ১৯১৮ সালের ১১ই নভেম্বর মিত্রশক্তি ও জার্মানি মিলে যুদ্ধবিরতি অনুমোদন করলে এ মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

প্রত্যেক যুদ্ধেরই কোনো না কোনো কারণ থাকে এবং কোনো যুদ্ধই আকস্মিক কোনো কারণে ঘটে না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মতো মানবসভ্যতা ধ্বংসকারী যুদ্ধের পেছনেও দীর্ঘকালের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কারণ বিদ্যমান ছিল। উনিশ শতকের শেষ দিকে (১৮৭০ সালের পর থেকে) ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে ইউরোপের বাইরে বিশেষ করে পূর্ব এশিয়া ও আফ্রিকায় সাম্রাজ্য বিস্তারের এক নতুন প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এই সাম্রাজ্য বিস্তৃতির মূলে ছিল প্রধানত অর্থনীতি, রাজনীতি, উৎকট জাতীয়তাবাদ ও সামরিক আধিপত্য প্রদর্শন।

১৮৭০ সালের পর শিল্প-বিপ্লবের ফলে ইউরোপের শিল্পজাত দেশগুলো যেমন ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি প্রভৃতি দেশের প্রয়োজনের তুলনায় উৎপন্ন সামগ্রীর পরিমাণ অভাবনীয়ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এসব উদ্বৃত্ত সামগ্রী বিক্রির জন্যে নতুন নতুন বাজারের প্রয়োজন দেখা দেয়। যানবাহনের উন্নতির ফলে মাল রফতানির কোনো অসুবিধা ছিল না। তাই শিল্প-মালিকগণ বাণিজ্য-বিস্তারের জন্যে তাদের নিজ দেশের সরকারকে উপনিবেশ দখলে বাধ্য করে। উপনিবেশের কাঁচামাল ও বাজারকে একচেটিয়া দখল করে তারা ফুলে-ফেঁপে ওঠে। যার জন্যে ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্যবিস্তার ও উপনিবেশ স্থাপনের এক উৎকট প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। ঐতিহাসিক শ্রী প্রভাতাংশু মাইতি লিখেছেন :

> বিখ্যাত রুশ কমিউনিস্ট নেতা লেনিন, তাঁর "সাম্রাজ্যবাদ হল ধনতন্ত্রের সর্বোচ্চ স্তর" (Imperialism, the Highest stage of Capitalism) নামক গ্রন্থে সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাকে আরও বিশদভাবে তুলে ধরেছেন। লেনিনের মতে, ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদের ভেতরেই সাম্রাজ্যবাদের বীজ নিহিত আছে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির বৈদেশিক নীতি পুঁজিবাদীশ্রেণীর স্বার্থেই পরিচালিত হয়। অধিক মুনাফার আশায় শিল্প-মালিকরা দেশের লোকের প্রয়োজনের অপেক্ষা বাড়তি মাল উৎপাদন করে। এই বাড়তি মাল বিক্রয় এবং সস্তায় কাঁচামাল পাওয়ার জন্য পুঁজিবাদী রাষ্ট্র উপনিবেশ দখল করে।[২]

লেনিন (১৮৭০-১৯২৪) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ হিসেবে পুঁজিবাদী শক্তির উপনিবেশ দখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে দায়ী করলেও ইউরোপের প্রধান দেশগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক প্রাধান্যের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও কম দায়ী নয়।

১৮৭০ সালে ফ্রান্স-জার্মানি যুদ্ধের পর ইউরোপের শক্তিশালী দেশগুলোর মধ্যে এক অঘোষিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। ইংল্যান্ড, জার্মানি, ফ্রান্স, ইটালি প্রভৃতি শক্তিধর দেশই মনে করত সাম্রাজ্যের বিশালতার উপরই দেশের শক্তি ও মর্যাদা নির্ভরশীল।

১৮৮৩ সালে জন সিলি (John Seely) নামক একজন চিন্তাবিদ একটি মত প্রচার করেন —

Dhaka University Institutional Repository

> মার্কিন দেশ ও রাশিয়ার যে রূপ দ্রুত ক্ষমতা বাড়ছে তার ফলে শীঘ্রই তারা, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানীকে ছাড়িয়ে যাবে। ভবিষ্যতে এমন দিন আসতে পারে যেদিন ডেনমার্ক বা গ্রীসের ন্যায় ইংলন্ড বা ফ্রান্স একটি সাধারণ দেশে পরিণত হবে। সুতরাং উপনিবেশ দখল করে লোকবল, সম্পদ, সামরিক ঘাঁটি না বাড়ালে ব্রিটেন বা ফ্রান্স বা জার্মানী তাদের বর্তমান মর্যাদা ও আধিপত্য বজায় রাখতে পারবে না।[৩]

জন সিলি'র এই মতবাদ সে সময়ে শাসক গোষ্ঠীকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করে। ফলে ইউরোপীয় বৃহৎ শক্তিধর দেশগুলো যেমন ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইটালি, রাশিয়া, জার্মানি প্রভৃতি দেশগুলোর মধ্যে ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ায় উপনিবেশ বিস্তারের প্রবল প্রতিযোগিতা শুরু হয়, এবং পরস্পরের প্রতি ঔপনিবেশিক বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে ১৮৮৮ সালে জার্মানি, ইটালি ও অস্ট্রিয়া আত্মরক্ষার ব্যাপারে পরস্পর সাহায্যদানে প্রতিশ্রুত হয়ে 'ট্রিপল এলায়েন্স (Triple Alliance) চুক্তি সম্পাদন করে। ১৮৯০ সালে ফ্রান্স ও রাশিয়া মৈত্রী স্থাপন করে। ১৯০২ সালে ইংল্যান্ড ও জাপান এবং ১৯০৪ সালে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড তাদের মধ্যে ঔপনিবেশিক বিবাদ মিটিয়ে ফেলে। তবে ১৯০৭ সালে ইংল্যান্ড, রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে 'ট্রিপল আঁতাত (Triple Entente) মৈত্রী স্থাপিত হলে সমগ্র ইউরোপ দুটি পরস্পর বিরোধী দলে (ট্রিপল এলায়েন্স ও ট্রিপল আঁতাত) বিভক্ত হয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আরো একটি বড় কারণ হচ্ছে ইউরোপীয় শক্তিশালী দেশগুলোর উৎকট জাতীয়তাবোধ। জার্মানিদের মনে বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, জার্মান জাতি অন্যান্য জাতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ (কারণ তারা টিউটনিক সভ্যতার ধারক ও বাহক[৪]) এবং জার্মানি হচ্ছে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ। শুধু জার্মানিরাই নয়, এই উৎকট, সংকীর্ণ ও স্বার্থপর জাতীয়তাবোধ তীব্রভাবে প্রচলিত ছিল ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, রাশিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশেও। ফলে বিভিন্ন দেশের ও জাতির মধ্যে পরস্পরের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে বিদ্বেষ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মানসিক ভিত্তিভূমি তৈরি করে ছিল।

সামরিক আধিপত্য বিস্তারও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ বলে স্বীকৃত। বিশ শতকের শুরুতে ইউরোপে স্থল শক্তি হিসেবে জার্মানি এবং নৌ-শক্তি হিসেবে ইংল্যান্ড ছিল শক্তিধর। নিজ নিজ ক্ষেত্রে জার্মানি ও ইংল্যান্ড ছিল শ্রেষ্ঠ শক্তি। ফলে ইউরোপে প্রকৃত শক্তি-সাম্য ছিল না। এ সময় জার্মানি নৌ-নির্মাণ নীতি গ্রহণ করলে ইংল্যান্ডে আতঙ্ক দেখা দেয়। ১৯০৩ সালে ইংল্যান্ড নতুন নৌ-বহর নির্মাণ শুরু করে। নৌ-প্রতিদ্বন্দ্বিতার সঙ্গে যোগ হয় স্থল-বাহিনী সংগঠন ও অস্ত্র নির্মাণের প্রতিযোগিতা। ফ্রান্স ও রাশিয়া তাদের নাগরিকদের মধ্যে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা চালু করে। প্রত্যেক জোট যতবেশি সম্ভব মারণাস্ত্র তৈরি করে। ফলে ১৯১২-১৪ সালের মধ্যে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠী দুই প্রতিদ্বন্দ্বী সামরিক শিবিরে পরিণত হয়। এই বিদ্বেষময় পরিবেশে যে কোনো আন্তর্জাতিক সংঘাতকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ বেঁধে যাবার আশঙ্কা দেখা দেয়। আর ঠিক এ সময় (২৮শে জুন ১৯১৪) অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফার্দিনান্দ ও যুবরানি সোফিয়া সারাজেভোয় এক উগ্রপন্থী সার্ব-সন্ত্রাসবাদীর হাতে নিহত হলে অস্ট্রো-সার্ব যুদ্ধ শুরু হয়। ক্রমে ক্রমে তা জার্মানি,

Dhaka University Institutional Repository

রাশিয়া, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, ইটালি, জাপান, তুরস্ক, আমেরিকা প্রভৃতি বড় বড় রাষ্ট্র ও তাদের মিত্রশক্তিগুলোর যোগদানে বিশ্বের প্রথম মহাযুদ্ধে পরিণত হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে থেকেই ইউরোপীয় মানুষের মন এক নতুন ধরনের অনিশ্চয়তা ও যুগপরিবর্তনের চেতনায় আক্রান্ত হচ্ছিল।[৫] তাদের উনিশ শতকীয় উদ্বেগহীন জীবন, আত্মতৃপ্তি, ন্যায়-নীতির প্রতি অবিচল আস্থা, সৃষ্টিকর্তার প্রতি গভীর বিশ্বাস, আর প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রতি একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এসে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেল।[৬] কারণ পৃথিবীর ইতিহাসে এটাই ছিল প্রথম সর্বাত্মক যুদ্ধ। এর আগে বিশ্বে যতগুলো যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে সেগুলোর কোনোটিতেই এতগুলো দেশ অংশগ্রহণ করে নি। এ যুদ্ধে যে পরিমাণ বৈজ্ঞানিক মারণাস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছিল তা এর আগে আর কখনো হয় নি। বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারে প্রতি মুহূর্তে এই যুদ্ধ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। ডুবোজাহাজ, ট্যাংক, বড় কামান, হাউইটজার প্রভৃতির ব্যবহার, মাস্টার্ড গ্যাস, তরল আগুন, বিষাক্ত গ্যাস, রোগের জীবাণুর সাহায্যে শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করার অভিনব চেষ্টা এই যুদ্ধেই প্রথম। জল, স্থল ও আকাশ পথে সংঘটিত এ যুদ্ধ বিশ্ববাসীর কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা। বিশ্বযুদ্ধে মোট সাড়ে ছয় কোটি সৈন্য অংশগ্রহণ করেছিল। এই সৈন্যদের প্রতি পাঁচজনের মধ্যে একজন যুদ্ধে নিহত হয় এবং প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন গুরুতর আহত হয়।[৭] এছাড়াও মৃত এবং হতাহত সৈন্যদের স্থান পূরণের জন্যে জবরদস্তিমূলক সামরিক বৃত্তি গ্রহণের যে নীতি চালু করা হয়েছিল তাতে উদীয়মান বহু বিজ্ঞানী, কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষক যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। ইংরেজ কবি উলফ্রেড আওয়েন ও রবার্ট ব্রুক-এর নাম এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য। তাছাড়া যুদ্ধের সময় সামরিক আক্রমণ, খাদ্যাভাব, নানাপ্রকার রোগ ও মহামারীতে সেনাবাহিনীর চেয়েও আরো বেশি বেসামরিক লোক মৃত্যুবরণ করে। এই বিশাল সংখ্যক নর-নারীর মৃত্যুতে একাধিক দেশে পরবর্তী সময়ে জনসখ্যা বৃদ্ধির হার, কৃষি ও শিল্পোজাত দ্রব্যের উৎপাদন একেবারেই হ্রাস পায়। যুদ্ধোত্তর যুগের অনিবার্য প্রতিক্রিয়াস্বরূপ দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ ও মহামারী। যুদ্ধের প্রয়োজনে যে বিশাল সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছিল তারাও হয়ে পড়ে বেকার। ফলে যা কিছু পুরনো — ন্যায়নীতি, বিশ্বাস, রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ব্যবস্থা, মানবিক ও পারিবারিক সম্পর্ক — সবকিছু ভেঙে পড়ে। দেখা দেয় দারুণ নৈতিক অবক্ষয়। সামাজিক দিক থেকেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত করে। যুদ্ধের সময় পুরুষেরা যুদ্ধে গেলে গৃহবধূরা অফিসে, স্কুলে, ক্ষেতে, খামারে, কল-কারখানায় কাজ করতে বাধ্য হয়। যুদ্ধ শেষ হলেও তারা আর ঘরের বদ্ধ জীবনে ফিরে যায় নি। ইউরোপে তারা পুরুষের পাশাপাশি মাথা উঁচু করে চলতে শুরু করে। যুদ্ধের সময় শ্রমিক শ্রেণি তাদের শক্তির কথা বুঝতে পারে। তাই রুশ বিপ্লবের পর সে দেশে শ্রমিক শ্রেণি লাভবান হলে অন্যান্য দেশেও শ্রমিকের জন্যে রাষ্ট্রীয় আইন রচিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণেই নারী, শ্রম ও শ্রমিকের মর্যাদা বাড়ে।

বিশ্বযুদ্ধের চাপে বিজ্ঞান, চিকিৎসা ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতি হয়। আলবার্ট আইনস্টাইন, ম্যাক্স প্লাঙ্ক, স্যার আর্নেস্ট রাদারফোর্ড, নীলস বোর প্রমুখ বিজ্ঞানী; টমাস

Dhaka University Institutional Repository

মর্গান, ফ্রেজার প্রমুখ নৃতত্ত্ববিদ; সিগমুন্ড ফ্রয়েড, ইয়ুং প্রমুখ মনোবিজ্ঞানী; এবং কার্ল মার্কস, ফ্রেডারিক এঙ্গেলস প্রমুখ সমাজতাত্ত্বিকের আবিষ্কার মানুষের পরিচিত জগতকে অতিদ্রুত বদলে দেয়। এ প্রসঙ্গে দীপ্তি ত্রিপাঠীর উক্তি স্মরণযোগ্য :

> উনবিংশ শতাব্দীতে জড়বাদী ও যুক্তিবাদী বিজ্ঞান ধর্মের স্থান অধিকার করেছিল এবং মানুষের সমাজ ও তার মূল্যবোধকে একটি একসূত্রে ধরে রেখেছিল। কিন্তু এই শতকের প্রথম দশকে কতকগুলি যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মানুষের মানসজগতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাল।[৮]

রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক দিক থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বিশ্বব্যাপী এক সুদূর প্রসারী পরিবর্তনের সূচনা করে। জাতীয় জীবনের প্রতিটি স্তরেই এ যুদ্ধ প্রভাব ফেলে অনিবার্যভাবে। এ যুদ্ধের ফলে বিশ্বের চারটি বড় সাম্রাজ্য — জার্মান, রাশিয়া, তুরস্ক ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি লুপ্ত হয়। আবার পোল্যান্ড, বোহেমিয়া, লিথুনিয়ার পুনর্গঠন, চেকোস্লাভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়ার গঠন ইউরোপীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে এক নতুন ধারার সৃষ্টি করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ফ্রান্স, জার্মানি, ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশের উৎকট জাতীয়তাবোধের পরিবর্তে জেগে ওঠে দেশাত্মবোধ। মিত্রশক্তিবর্গের অধীন ঔপনিবেশিক জনসাধারণের মধ্যে এই দেশাত্মবোধ জাগ্রত হলে ভারতবর্ষ, মিশর, আফ্রিকা, কোরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে স্বাধীনতা লাভের জন্যে এক দুর্দমনীয় আবেগ ও আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে গণতন্ত্রের প্রসার ঘটে। কিন্তু যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক নানাবিধ সমস্যার সমাধানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অকৃতকার্যতার ফলে কোনো কোনো দেশে গণতন্ত্রের জায়গায় 'ডিক্টেটরশিপ' বা 'একক-অধিনায়কত্বের' উদ্ভব হয়। এই নতুন রাজনৈতিক মনোভাবের প্রকাশ ঘটে রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবে, ইটালির ফ্যাসিজম ও জার্মানির ন্যাৎসিজম-এর উত্থানে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার জার সেনাদলের পরাজয় ঘটলে জারের বিরুদ্ধে দারুণ বিক্ষোভ দেখা দেয়। ফলে জার দ্বিতীয় নিকোলাস পদত্যাগ করেন। রাশিয়ায় জারতন্ত্রের অবসান ঘটে। জারতন্ত্রের পতনের পর লুভভ ও কেরেনস্কির নেতৃত্বে রাশিয়ায় প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয়। কিন্তু এ প্রজাতন্ত্রে শ্রমিক ও কৃষকদের সমর্থন না থাকায় প্রজাতান্ত্রিক সরকারকে উচ্ছেদ করে ভ. ই. লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক দল রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে (১৯১৭)। প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক সরকার।

লেনিন রাশিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ করেই জার্মানির সঙ্গে আর্থিক ক্ষতিপূরণ স্বীকার করে সন্ধির (১৯১৮) দ্বারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে সরে আসেন। কারণ লেনিন মনে করতেন, এ যুদ্ধ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ। তাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে সরে এসে তিনি রাশিয়ার সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে মনোযোগী হন। কিন্তু যুদ্ধকালীন বিরাট ক্ষয়ক্ষতি সামাল দিতে গিয়ে এবং মার্কসবাদী আদর্শ অনুসারে নতুন সমাজ ব্যবস্থা চালু করতে গিয়ে তাঁকে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কৃষকদের অসহযোগিতার ফলে ১৯২১ সালে এক দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক খাদ্যাভাবে মারা যায়। শিল্পক্ষেত্রে দুরবস্থা দেখা দেয়। শ্রমিক সংগঠনের ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতার অভাবে শিল্পোৎপাদনের পরিমাণ

Dhaka University Institutional Repository

দিন দিন কমে যেতে থাকে। কিন্তু লেনিনের কঠোর মনোবল, দূরদর্শিতা এবং সমাজতন্ত্র ধনতন্ত্রের সংমিশ্রণে গঠিত নতুন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা দ্বারা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত সংকট কাটিয়ে ওঠেন।

১৯২৪ সালে লেনিনের মৃত্যুর পর ট্রটস্কি, ক্যামেনেভ, জিনোভিয়েভ প্রমুখ কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের বিরোধিতা দমন করে স্টালিন রাশিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং লেনিন-প্রবর্তিত অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করে ১৯৩৩ সালের মধ্যে রাশিয়ার অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধন করেন। ১৯৪২ সালের মধ্যে রাশিয়া শিল্পক্ষেত্রে ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ক্ষমতাধর দেশে পরিণত হয়। সামরিক অস্ত্র তৈরিতেও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয় ও বেকার-সমস্যার অবসান ঘটে। কৃষিপ্রধান দেশ রাশিয়া পৃথিবীর শিল্পোৎপাদক দেশের অন্যতম দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

স্টালিন ছিলেন শান্তিবাদী নেতা। তাই ১৯২৫ সালে 'লোকার্ন চুক্তি' স্বাক্ষরিত হলে স্টালিন ধারণা করেন যে সেটা রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-প্রস্তুতির পূর্বাভাস। ফলে তিনি ১৯২৫ সালে তুরস্ক এবং ১৯২৬ সালে জার্মানির সঙ্গে 'অনাক্রমণ চুক্তি' স্বাক্ষর করেন। ক্রমে ক্রমে ইটালি, চীন, জার্মানি ও তুরস্কের সঙ্গে মৈত্রীভাব বৃদ্ধি পেতে থাকলে ফ্রান্স রাশিয়ার প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। এ কারণে ফ্রান্স আমেরিকা ও ইংল্যান্ডকে নিয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে একটি ইউরোপীয় শক্তি সংঘ গঠন করে এবং রাশিয়ার শত্রুদেশ পোল্যান্ড ও রুমানিয়ার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে। এতে রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে তীব্র বিদ্বেষ ও বিরোধিতা সৃষ্টি হয়। তবে জার্মানিতে হিটলারের নেতৃত্বে নাৎসিবাদ ও ইটালিতে মুসোলিনির নেতৃত্বে ফ্যাসিজম-এর অভ্যুত্থান ঘটলে এবং জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া আক্রান্ত হলে রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে ১৯৩৪ সালে এক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৩৬ সালে জার্মানি ও জাপানের মধ্যে অক্ষ চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে উভয় দেশ কর্তৃক রাশিয়া আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দেয়। তখন রাশিয়া ফ্রান্সের সাহায্য চাইলে ইংল্যান্ডের প্ররোচনায় ফ্রান্স পূর্ববর্তী চুক্তি ভঙ্গ করে করে। এ সময় জার্মান চেকোস্লাভাকিয়া দখল করলে রুশ সীমান্ত অংশে জার্মানের আক্রমণের সম্ভাবনা ভীষণভাবে বাড়ে। তখন পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে রাশিয়ার সহযোগিতা নীতির ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয়। এ সুযোগে হিটলার রাশিয়ার সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তির প্রস্তাব দেয় (১৯৩৯)। কারণ হিটলার চাইছিল রাশিয়াকে পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ থেকে আলাদা রাখতে। স্টালিনও তখন জার্মানির সঙ্গে প্রকাশ্য শত্রুতা করার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। তাই উভয় দেশ ১০ বছরের জন্যে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করে। এতে হিটলারের উদ্দেশ্য পূরণ হয় এবং এ বছরই সেপ্টেম্বর মাসে পোল্যান্ড আক্রমণ করেন। ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইটালিতে গণতন্ত্রের পতন ও স্বৈরতন্ত্রবাদী ফ্যাসিস্ট শক্তির উদ্ভব যুদ্ধোত্তর ইউরোপের ইতিহাসের অন্যতম প্রধান ঘটনা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইটালির যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছিল, প্যারিসের শান্তি সম্মেলন থেকে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ সে তুলনায়

Dhaka University Institutional Repository

ছিল অত্যন্ত কম। আবার যুদ্ধের পরপরই ইটালিতে দারুণ অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়। নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র ও খাদ্যদ্রব্যের দামও অসম্ভব বৃদ্ধি পায়। খাদ্য ও শিল্প দ্রব্যের অভাব জনজীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। ফলে শ্রমিকরা মালিকদের বিরুদ্ধে এবং কৃষকরা জমিদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে। এ অবস্থার সুযোগে সমাজতন্ত্রী সাম্যবাদীরা দেশে বিপ্লবের বীজ ছড়িয়ে দেয়। কোনো কোনো জায়গায় কমিউনিস্টদের প্ররোচনায় শ্রমিকরা কল-কারখানা এবং কৃষকরা জমিদারদের উৎখাত করে তাদের সম্পত্তি দখল করে নেয়। ঠিক এ সময় যুদ্ধ ফেরত বেকার সেনা ও বেকার যুবকদের নিয়ে বেনিটো মুসোলিনি ফ্যাসিস্ট সংগ্রামী বাহিনী (১৯১৯) নামে এক আধা-সামরিক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলেন।

আইন ও শৃংখলা রক্ষা করা ছিল ফ্যাসিস্টদের মূলনীতি। এ কারণে মুসোলিনি ধর্মঘট আর কর্মবিরতির ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাই দেশের যেখানেই গণ্ডগোল বা অরাজকতা দেখা দিল, সেখানেই ফ্যাসিস্ট দল বল প্রয়োগে তা দমন করতে লাগল। এতে ফ্যাসিস্টরা বুর্জোয়াদের সমর্থন লাভ করল। ফলে ১৯২১ সালের নির্বাচনে মুসোলিনি জোর করে ক্ষমতা দখল করেন এবং ১৯২৫ সালে 'ইলদুচে' বা 'নেতা' উপাধি নিয়ে ডিক্টেটরে পরিণত হন। মুসোলিনি হন ইটালির সর্বময় ক্ষমতার অধীশ্বর। মুসোলিনি ক্ষমতা দখল করেই সরকার বিরোধী দলগুলোকে কঠোরভাবে দমন করে রাজনৈতিক ও সামাজিক শৃংখলা ফিরিয়ে আনলেন। তিনি শিল্পের উন্নতির জন্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে ইটালিতে ব্যাপক অর্থনৈতিক পুনরুত্থান ও শিক্ষার প্রসার ঘটালেন। আর বেকার সমস্যা সমাধানের জন্যে তিনি বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেন এবং সেনাবাহিনীকে পুনর্গঠন করেন।

মুসোলিনি সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইটালির মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করা। তাই ভার্সাই সন্ধিতে ইটালির প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছিল, তার প্রতিকারের জন্যে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। ১৯২৩ সালে ডোডেকানিজ (Dodeconese) ও ১৯২৫ সালে ফিউম (Fiume) অধিকার করে মুসোলিনি পূর্ব-ইউরোপে শক্তি বৃদ্ধি করেন। এরপর তিনি আফ্রিকায় আধিপত্য বিস্তারে মনোযোগী হন। ১৯৩৬ সালে মুসোলিনি 'লীগ অব নেশানস'-কে উপেক্ষা করে আবিসিনিয়া দখল করেন। এতে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের সঙ্গে ইটালির মনোমালিন্য বেড়ে যাওয়ায় মুসোলিনি জার্মানির সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন। জার্মান ও জাপানের মধ্যে আগে থেকেই কমিউনিস্ট বিরোধী মিত্রতা চুক্তি (১৯৩৬) ছিল, ১৯৩৭ সালে ইটালির সঙ্গে জার্মানির চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে জার্মান-জাপান-ইটালি মৈত্রীসংঘ স্থাপিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এ তিন দেশ একপক্ষে থেকে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া প্রভৃতি মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির শোচনীয় পরাজয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার মর্যাদা ও প্রতিপত্তি লোপ পায় এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও এক বিরাট রাজনৈতিক বিপ্লবের সূত্রপাত করে। এ সময় দেশের শাসন ক্ষমতায় যাঁরা ছিলেন, তাঁরাও যোগ্যতার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হন।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বযুদ্ধোত্তর জার্মানির আর্থিক দুর্দশা ছিল অন্যান্য দেশের চেয়ে অনেকগুণ বেশি। তাই অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের এই বিশাল ধাক্কা সে সামলে উঠতে পারে নি। একদিকে অর্থনীতির বিরাট ধ্বস, অন্যদিকে ভার্সাই চুক্তি অনুযায়ী মিত্রবাহিনীর ক্ষতিপূরণের দাবি: সেই সঙ্গে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দামের উর্ধ্বগতির কারণে জনগণের দুঃখ-দুর্দশার সীমা ছিল না। দেশের এই দুঃসময়ে এডলফ হিটলার 'ন্যাশনাল সোশিয়েলিস্ট' বা 'নাৎসি' (National Socialist বা Nazi) নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। হিটলার ছিলেন অসাধারণ বাগ্মী। জার্মান জনগণের কাছে তাঁর আবেদন ছিল খুবই সহজ-সরল ও স্পষ্ট। তিনি জার্মান জনগণকে বোঝাতে সক্ষম হন যে, জার্মানির যা কিছু অভাব অভিযোগ, সব কিছুর জন্যে ভার্সাই-এর শান্তি চুক্তি, মার্কসবাদী ও ইহুদিদের জাতীয় স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপ এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক শোষণকারী মূলধনীদের কাজ-কর্মই দায়ী। তিনি জার্মান জাতির মনে দৃঢ়ভাবে এই বিশ্বাস জাগিয়ে তোলেন যে, জার্মানির রাজনৈতিক পুনরুজ্জীবন জার্মান সমাজ, অর্থনীতি এবং জার্মানদের জাতিগত বিশুদ্ধতা বজায় রাখার উপর নির্ভরশীল। ফলে নাৎসি দলের সদস্য সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল। ১৯৩২ সালের মধ্যে নাৎসি দলের সমর্থক এত বৃদ্ধি পেল যে, জার্মান প্রজাতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে হিটলারের নেতৃত্বে নাৎসি একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল। হিটলার ছিলেন ইহুদি ও কমিউনিস্ট বিরোধী। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, আর্যরাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ জাতি, আর জার্মানরা আর্যজাতির বংশোদ্ভূত। সুতরাং ক্ষমতা দখল করেই তিনি ইহুদি ও কমিউনিস্টদের উপর তীব্র অত্যাচারের মাধ্যমে তাদেরকে দেশ ছাড়া করলেন। নাৎসি-বিরোধী সমস্ত দলকে বেআইনি ঘোষণা করলেন। তাঁর চেষ্টায় দেশের আর্থিক সংকট অনেকটা দূরীভূত হয়।

হিটলার দেশে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা প্রবর্তন করেন। পদাতিক, নৌ ও বিমান সেনাবাহিনীর সৈন্য সংখ্যা বাড়িয়ে একদিকে যেমন সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করেন, অন্যদিকে তেমনি দেশের বেকার সমস্যা অনেকাংশে দূর করেন। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি সঞ্চয় করে হিটলার ভার্সাই সন্ধিতে জার্মানির প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছিল তার প্রতিশোধ নিতে শুরু করেন। ১৯৩৩ সালে সামরিক শক্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর হিটলার ১৯২৫ সালের 'লোকার্ন চুক্তি' অনুযায়ী 'লীগ অব নেশনস'-এর সদস্যপদ ত্যাগ করেন। ১৯৩৬ সালে ভার্সাই সন্ধির শর্ত অমান্য করে রাইন অঞ্চল দখল করে নেন। এ বছরই স্পেনে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সঙ্গে প্রজাতন্ত্রী সরকারের গৃহযুদ্ধ শুরু হলে মুসোলিনি ও হিটলার ফ্রাঙ্কোকে সরাসরি সাহায্য করেন। ফ্রাঙ্কো স্পেনীয় সরকারের বিরুদ্ধে জয়ী হওয়ায় হিটলার ও মুসোলিনি সমর্থিত আরেকটি স্বৈরতন্ত্রী শক্তির সৃষ্টি হয়। একই বছরের আরো একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে জার্মান-জাপান কমিউনিস্ট বিরোধী চুক্তি। ১৯৩৭ সালে ফ্যাসিস্ট ইটালিও এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করলে এ তিন দেশের মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হয়। ১৯৩৮ সালে হিটলার অস্ট্রিয়া দখল করে চেকোস্লাভাকিয়ার প্রতি দৃষ্টি দেন। তখন ফ্রান্স ও রাশিয়া চোকোস্লাভাকিয়াকে সাহায্য করতে চাইলে বিরাট যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দেয়। এ যুদ্ধ এড়াতে ইংল্যান্ডের মধ্যস্থতায়

Dhaka University Institutional Repository

ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি ও ইটালির মধ্যে 'মিউনিক চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু মাত্র ছয় মাস পর হিটলার মিউনিক চুক্তি ভঙ্গ করে চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগ এবং বোহেমিয়া ও মোরেভিয়া প্রদেশ দখল করেন। ১৯৩৯ সালে তিনি পোল্যান্ডের কাছে ডানজিগ বন্দর দাবি করেন। কিন্তু পোল্যান্ড সে দাবি অগ্রাহ্য করলে ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হিটলার পোল্যান্ড আক্রমণ করেন। এতে হিটলারের মিউনিক চুক্তি ভঙ্গ ও ভয়ানক রাজ্যলিপ্সাকে দমন করতে ৩রা সেপ্টেম্বর (১৯৩৯) ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯৪০ সালে রাশিয়া, জাপান ও আমেরিকা এ যুদ্ধে যোগদান করলে পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধের তাণ্ডব শুরু হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তি পরাজিত তুরস্কের উপর সেভরের চুক্তি (১৯২০) দ্বারা তুর্কি সাম্রাজ্যের বিশালত্বের বিলোপ সাধন করে। এ চুক্তির শর্তানুসারে তুরস্ককে সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, সুদান, মরোক্কো, মেসোপটেমিয়া ও মিশরের উপর সব অধিকার ত্যাগ করতে হয়। আর্মেনিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং দার্দানেলিজ ও বোসফোরাস প্রণালী দুটো আন্তর্জাতিকভাবে নিরপেক্ষ জলপথ বলে ঘোষিত হয়। পরাজিত তুরস্ক যখন মিত্রশক্তির হাতে এভাবে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাচ্ছিল, তখন তুরস্কের বীরসেনানী মোস্তফা কামাল পাশা জাতির ত্রাণকর্তা রূপে আবির্ভূত হন। তাঁর নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী দল (Nationalists) সেভার্সের সন্ধি অস্বীকার করে ১৯২০ সালে গ্রিসের অধীন থেস ও স্মার্না দখল করে নেয়। ১৯২৩ সালে তুরস্কের খেলাফতের অবসান ঘটিয়ে কামাল পাশা প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেন এবং তিনি হন এর প্রথম সভাপতি। তুরস্কের চরম দুর্যোগপূর্ণ সময়ে কামাল পাশা দেশকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক ও প্রকৃতবাদী, সুষ্ঠু-সুন্দর আদর্শবাদী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলেন। কামাল পাশা যখন দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন, তখন তুরস্কের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। তিনি 'কপিচুলেশন' প্রথার বিলোপ সাধন করে দেশের অর্থনীতিতে বিদেশী হস্তক্ষেপ বন্ধ করেন। অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যে তিনি কৃষকদের উৎসাহিত করেন। কামাল পাশার নেতৃত্বে তুরস্ক ১৯৩২ সালে জাতিসংঘে যোগদান করে। ক্রমে ক্রমে তিনি তুরস্কের নিরাপত্তার জন্যে গ্রিস, রুমানিয়া, যুগোস্লাভিয়া, ইরান, ইরাক, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৩৮ সালে কামাল আতাতুর্কের মৃত্যু হলে ইসমত ইননু তুরস্কের নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। তিনি অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে তুরস্ককে যথেষ্ট শক্তিশালী করে গড়ে তোলেন। ফলে ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার আগেই ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স তুরস্কের সঙ্গে সামরিক সহযোগিতার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় স্পেন নিরপেক্ষ থেকে শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করছিল। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে স্পেনে অর্থনৈতিক দুর্বলতা ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশৃংখলা প্রকট হয়ে ওঠে। ১৯১৯ থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে প্রজাতন্ত্রের দাবিতে স্পেনের অনেক শহরে বিভিন্ন দলের সঙ্গে ক্ষমতাসীনদের বেশ কতগুলো খণ্ডযুদ্ধ সংঘটিত হয়। আর এ পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ক্যাপ্টেন জেনারেল প্রিমো-ডি-রিভেরা ১৯২৩ সালে শাসন ক্ষমতা হস্তগত করেন। তাঁর চেষ্টায় স্পেন অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে শক্তিশালী হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

ওঠে। কিন্তু তিনি দেশবাসীর মন জয় করতে পারলেন না। জনগণের চাপের মুখে তিনি পদত্যাগ করলে ১৯৩১ সালের সাধারণ নির্বাচনে স্পেনে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। নিমেটো জামোরা হলেন প্রজাতন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি এবং ম্যানুয়েল আজানা হলেন প্রধানমন্ত্রী। প্রজাতান্ত্রিক শাসকগণও দেশের অভ্যন্তরীণ অশান্তি ও বিশৃংখলা দমন করতে ব্যর্থ হলেন। ফলে স্পেনের নির্বাচিত প্রজাতন্ত্রী সরকারের বিরুদ্ধে জেনারেল ফ্রান্সিকো ফ্রাঙ্কো ১৯৩৬ সালে রাজতন্ত্রী, ফ্যাসিবাদী, অভিজাত ও পেশাদার সেনাদের সংগঠিত করে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী সরকার ঘোষণা করেন। শুরু হয় স্পেনের গৃহযুদ্ধ। শুরু থেকেই ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স স্পেনের এই গৃহযুদ্ধে কোনো বৈদেশিক শক্তির পক্ষ থেকে সাহায্য না পাঠাবার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু এই প্রস্তাব অমান্য করে জার্মানি ও ইটালি জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সরকারকে স্বীকৃতি দিয়ে অস্ত্র ও অন্যান্য সাহায্য দ্বারা প্রকাশ্যে সমর্থন দিতে থাকে। ফলে স্পেনের নির্বাচিত প্রজাতন্ত্রী সরকারের পক্ষে বিশ্বজনমত সোচ্চার হয়ে ওঠে। মানবতাবাদী কবি রবীন্দ্রনাথও বিশ্ব বিবেকের কাছে আবেদন জানান :

> "স্পেনে আজ বিশ্ব সভ্যতা পদদলিত। স্পেনের জনগণের গণতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে ফ্রাঙ্কো বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়েছে। অর্থ ও জনবল দিয়ে বিদ্রোহীদের সাহায্য করছে আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদ। স্পেনের সুন্দর সমতলভূমি মরু ও বিদেশী সেনাবাহিনী দখল করে নিচ্ছে, সঙ্গে থাকছে মৃত্যু ক্ষুধা ও দুর্দশা।
>
> শিল্প সংস্কৃতির গৌরবকেন্দ্র মাদ্রিদ জ্বলছে। বিদ্রোহীদের বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত হচ্ছে তার শিল্পের অমূল্য সম্পদ। হাসপাতাল ও ক্রেশও রেহাই পায়নি। নারী ও শিশুদের খুন করা হচ্ছে, গৃহহারা ও নিঃস্ব করা হচ্ছে।
>
> আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদের এই প্রলয়ঙ্কর বন্যাকে রোধ করতেই হবে। স্পেনে যে তামসিকতা, যে জাতিগত কুসংস্কার, যে লুণ্ঠন ও যুদ্ধের গৌরব প্রতিষ্ঠার অমানুষিক পুনঃপ্রচেষ্টা চলেছে তাকে চূড়ান্ত প্রত্যাঘাতে স্তব্ধ করতেই হবে। বর্বরতার প্লাবনে নিমজ্জিত হওয়ার আগেই সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে।
>
> স্পেনের জনগণের চূড়ান্ত পরীক্ষা ও দুঃখভোগের মুহূর্তে মানবতার বিবেকের কাছে আমি আবেদন করছি।
>
> স্পেনের গণ-ফ্রন্টের পাশে দাঁড়ান, জনগণের সরকারকে সাহায্য করুন, লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনি তুলুন — 'প্রতিক্রিয়া দূর হও!' লাখে লাখে এগিয়ে আসুন গণতন্ত্রের সাহায্যে, সভ্যতা ও সংস্কৃতি রক্ষায়।"

ইউনাইটেড প্রেস

(স্টেটস্‌ম্যান — কলিকাতা, ৩রা মার্চ ১৯৩৭। ইংরেজি থেকে অনূদিত)[৯]

'দেশ-বিদেশের কমিউনিস্ট, সমাজতন্ত্রী, লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবী ও গণতান্ত্রিক মানুষ বৈধ সরকারের সমর্থনে এগিয়ে আসেন এবং 'ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেট' বা আন্তর্জাতিক সৈন্য বাহিনী গঠন করা হয়। পৃথিবীর বহু দেশ থেকে অগণিত ব্যক্তি স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে এতে যোগ দিয়ে একটি জাতির বৈধ ও নৈতিক সংগ্রামের পক্ষে যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ বিসর্জন দেন। এঁদের মধ্যে আছেন প্রখ্যাত ইংরেজ সাহিত্য সমালোচক র‍্যাল্‌ফ্ ফক্স ও 'ইলিউসন এন্ড রিয়্যালিটি' গ্রন্থখ্যাত ক্রিস্টোফার কডওয়েলের ন্যায় প্রতিভাবান মনীষী। বিশ্ববিখ্যাত হিস্পানী কবি ফেদেরিকো গার্থিয়া লোর্কাকে হত্যা করা হয়। পাবলো

Dhaka University Institutional Repository

পিকাসো পালিয়ে আসেন ফ্রান্সে, রচিত হয় তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্র 'গোয়ের্নিকা'।[১০] বিখ্যাত মার্কিন লেখক আর্নেস্ট হেমিংওয়ে এই যুদ্ধে প্রজাতন্ত্রী সরকারের পক্ষে যুদ্ধ করেন। স্পেনের গৃহযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত হয় তাঁর বিশ্ব বিখ্যাত ধ্রুপদী উপন্যাস 'ফর হুম দি বেল টোলস'।[১১]

স্পেনের গৃহযুদ্ধ এভাবে একটি ক্ষুদ্র বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয়। ফলে 'লীগ-অব-নেশানসে'র আদর্শ অকার্যকরী বলে প্রতিপন্ন হয়। অবশেষে ১৯৩৯ সালে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদীদের হাতে বার্সেলোনা, মাদ্রিদ ও ভালেন্সিয়া পতনের মাধ্যমে স্পেনে ফ্রাঙ্কোর একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিশ্বের ইতিহাসের সবচেয়ে বিভীষিকাময় ঘটনা হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হিটলারের নাৎসি বাহিনী পোল্যান্ড আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে। ক্রমে ক্রমে তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়লে সমস্ত পৃথিবীটাই একটা ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত হয়। কোটি কোটি মানুষ এই নির্মম ধ্বংসযজ্ঞের অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয় অক্ষশক্তি ও মিত্রপক্ষের মধ্যে। অক্ষশক্তির পক্ষে ছিল নাৎসি জার্মানি, ফ্যাসিস্ট ইটালি ও সাম্রাজ্যবাদী জাপান।

মিত্রপক্ষে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড যুদ্ধ শুরু করলেও ১৯৪১ সালে আমেরিকা এ পক্ষে যোগ দেয়। একই বছরে জার্মানি রাশিয়ার নিরপেক্ষতা অগ্রাহ্য করে রাশিয়া আক্রমণ করলে সোভিয়েত রাশিয়াও মিত্রশক্তির অন্তর্ভুক্ত হয়। ধীরে ধীরে উভয়শক্তির পক্ষে ও বিপক্ষে পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রও এ সর্বনাশা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। দীর্ঘ ছয় বছর ধরে এ হিংস্র যুদ্ধের দাবাগ্নিতে সমস্ত পৃথিবী ক্ষতবিক্ষত হবার পর ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে আমেরিকা কর্তৃক জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে এ্যাটম বোমা নিক্ষেপ করার ফলে অক্ষশক্তির আত্মসমর্পণের মাধ্যমে এ মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তি হয়।

কোনো যুদ্ধই একটি মাত্র কারণে ঘটে না। তার একাধিক কারণ থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হবার পেছনেও অনেকগুলো কারণ বিদ্যমান ছিল। ১৯১৯ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ বিশ বছরের প্রতিটি ঘটনাই ভার্সাই সন্ধির দ্বারা প্রভাবান্বিত। ভার্সাই চুক্তিতে জার্মানির প্রতি যে প্রতিহিংসামূলক আচরণ করা হয়েছিল তার প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা থেকেই মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত। হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানির ন্যাশনাল সোসিয়েলিস্ট দলের অন্যতম উদ্দেশ্যই ছিল ভার্সাই শান্তি চুক্তির অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করা এবং জার্মান ভাষাভাষি জনগণ অধ্যুষিত অঞ্চল জার্মানির সঙ্গে সংযুক্ত করে ইউরোপের উপর একক আধিপত্য বিস্তার করা। সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একক প্রাধান্য বিস্তার করে সমগ্র বিশ্বকে জার্মানির উপনিবেশে পরিণত করার পরিকল্পনাও ছিল হিটলারের আগ্রাসী মনের অভিপ্রায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল একক অধিনায়কত্ব ও গণতন্ত্রের আদর্শগত বিরোধ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর প্রধান প্রধান দেশ পরস্পর বিরোধী আদর্শের ভিত্তিতে দুটো আলাদা শিবিরে পরিণত হয়েছিল। অক্ষশক্তিবর্গ অর্থাৎ জার্মান-

Dhaka University Institutional Repository

ইটালি-জাপান ছিল একক অধিনায়কত্ব, স্বৈরাচার ও সাম্রাজ্যবাদের ধারক। অপরদিকে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকা ছিল গণতন্ত্রের সমর্থক। আবার রাশিয়ার সাম্যবাদ ছিল গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের শত্রু। সুতরাং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে রাশিয়া জার্মানির সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি (১৯৩৯) স্বাক্ষর করে যুদ্ধকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু শেষে হিটলারের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে গণতান্ত্রিক দেশসমূহের সঙ্গে যোগদান করে (১৯৪১)। জাপান-ইটালি-জার্মানির সাম্রাজ্যবাদী নীতি এবং লীগ-অব-নেশনসের অকার্যকারিতাও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি হিসেবে বিবেচ্য। জাপান ১৯৩১ সালে মাঞ্চুরিয়া দখল করে লীগ অব নেশানসের সদস্যপদ ত্যাগ করে। ফলে লীগের দুর্বলতা সবার সামনে প্রকট হয়ে ওঠে। তেমনি ইটালি কর্তৃক ইথিওপিয়া (১৯৩৫) ও আলবেনিয়া (১৯৩৬) দখল হবার পর তাকে প্রতিহত করতে লীগের অকর্মণ্যতায় সে সময়ের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অন্যান্য শক্তিবর্গের দুর্বলতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভার্সাই-সন্ধির নির্দেশ অমান্য করে যখন হিটলার রাইনল্যান্ডে সেনা সমাবেশ করে (১৯৩৬), তখন ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের নির্লিপ্ততা তাঁর রাজ্যগ্রাসী ক্ষুধাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। এই সব কারণে জার্মানি-ইটালি ও জাপানের নিজ শক্তি সম্পর্কে অতিউচ্চ ধারণা তাদের যুদ্ধামোদী করে এবং বিশ্বযুদ্ধকে অনিবার্য করে তোলে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অক্ষশক্তির পতনের পর বিজয়ী মিত্রশক্তিগুলোর অবস্থা হয় খুবই শোচনীয়। এ যুদ্ধে জনবল, জাতীয় সম্পদ, শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষয়ক্ষতির কারণে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে ধস দেখা দেয়। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল আমেরিকা। কারণ যুদ্ধের প্রত্যক্ষ আক্রমণের ক্ষয়ক্ষতি আমেরিকাকে স্পর্শ করে নি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইংল্যান্ড তার বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য হারাতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে হীনবল হয়ে পড়ে। জার্মানির বোমার আঘাতে লন্ডনসহ বড় বড় শিল্প-শহর, বন্দর ও ডকগুলো প্রায় ধ্বংস হয়েছিল। ঘর-বাড়িগুলো সব ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। ইংল্যান্ডের অর্থনীতি ভেঙে পড়ে বিশ্বের বাজারে ব্রিটিশ পণ্য রফতানি বন্ধ হয়ে যায়। কৃষি জমিগুলো অনাবাদী পড়ে থাকে। যন্ত্রপাতি, সার ও বীজের যোগান দেয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে ব্রিটেনে খাদ্য সংকট দেখা দেয়। যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থাও ভেঙে পড়ে। কাঁচামাল ও কয়লার অভাবে কল-কারখানা বন্ধ হবার উপক্রম হয়। ইংল্যান্ডের আগের উপনিবেশগুলোও একে একে দখলমুক্ত হতে থাকে। ভারতবর্ষ থেকে ১৯৪৭ সালে ইংল্যান্ড তার আধিপত্য ত্যাগ করে। অর্থনৈতিক সংকটের কারণে যুদ্ধ ফেরত সৈন্যদের ভাতা ও পুনর্বাসনের সমস্যা দেখা দেয়। বাধ্য হয়ে ইংল্যান্ড তার নৌবহর ও স্থলবাহিনীকে হ্রাস করতে হয়। ফলে ব্রিটেনের সামরিক শক্তি খর্বিত হয়।

গণতন্ত্রের আরেক স্তম্ভ হচ্ছে ফ্রান্স। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ফ্রান্সের অবস্থা হয় ইংল্যান্ডের চেয়েও খারাপ। ১৯৪০ সালে ফ্রান্সের একাংশ জার্মানির প্রত্যক্ষ শাসনে চলে যায়। যে অংশ বাকি থাকে সেখানেও নাৎসি তাঁবেদার ভিসি সরকার গঠিত হয়। ১৯৪৪ সালে মিত্রশক্তি ফ্রান্সে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার পর আফ্রিকায় গঠিত স্বাধীন ফরাসি সরকারের প্রতিষ্ঠাতা দ্য গল ফ্রান্সে ফিরে এলে জার্মান অধিকার মুক্ত ফরাসিবাসী তাঁকে সাদরে

Dhaka University Institutional Repository

বরণ করে নেয়। দ্য গল জার্মান মুক্ত ফ্রান্সে স্বাধীন ৪র্থ প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেন। কিন্তু নানা রাজনৈতিক টানাপোড়েনে ফ্রান্সের স্থায়ী সরকার গঠনে তিনি ব্যর্থ হন। ফলে ফ্রান্সের শিল্প ও অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিশৃংখলা ও ধর্মঘটে ফ্রান্স ধ্বংসের পথে চলতে থাকে। ১৯৫৮ সালে ৫ম প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করার পর ফ্রান্সের দ্রুত উন্নতি হতে থাকে এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ইউরোপের প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার বিজয় সমগ্র পৃথিবীকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করে। হিটলারের ঝটিকা আক্রমণে একটার পর একটা দেশ যেভাবে পরাজিত হচ্ছিল, তাতে সোভিয়েত রাশিয়া আক্রান্ত হলে বিজয়ের সম্ভাবনা ছিল কম। কিন্তু বিশ্ববাসী অবাক হয়ে দেখল যে, হিটলারের দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনীর সমস্ত যুদ্ধকৌশল রাশিয়ার ধুলাবালুতে চাপা পড়ে গেল। অবশ্য এতে রাশিয়াকে অনেক মূল্য দিতে হয়। দশ মিলিয়ন রুশ সেনা ও পনের মিলিয়ন সাধারণ মানুষ এ যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করে। রাশিয়ার গৃহপালিত পশুর অধিকাংশ জার্মানরা খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে।[১২] পশ্চিম রাশিয়ার শহর ও গ্রামগুলোর একটিও অক্ষত ছিল না। এই মরণপণ যুদ্ধে রাশিয়ার অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল সবচেয়ে বেশি। এ জন্যে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ স্টালিন জার্মানির কাছ থেকে ২০ মিলিয়ন ডলার আদায় করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধসে পড়া রাশিয়াকে স্টালিন তাঁর কঠোর অনুশাসন, দৃঢ় মনোবল ও সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে ১৯৫০ সালের মধ্যেই নিজের পায়ের উপর দাঁড় করাতে সক্ষম হন। তাঁর ওই সফলতার কথা বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলো বিশ্বের সর্বত্র প্রচার করে। ফলে যুদ্ধোত্তর বিশ্বের অনেক দেশেই কমিউনিস্টদের জনপ্রিয়তা বাড়ে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই ইউরোপের দুই প্রধান গণতান্ত্রিক দেশের অবস্থা বেশ নড়বড়ে হয়ে পড়ে। জার্মান অধিকারমুক্ত হয়ে বেলজিয়াম, হল্যান্ড, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশ গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন করে ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক অগ্রগতি লাভ করে। কিন্তু ফ্রান্স, ইটালিসহ ইউরোপের অধিকাংশ দেশেই যুদ্ধোত্তর নির্বাচনে বামপন্থী বা কমিউনিস্টরা যথেষ্ট সংখ্যক সদস্যপদ লাভ করে এবং কোয়ালিশন সরকার গঠনে বাধ্য করে। এতে গণতান্ত্রিক দেশগুলো আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। কারণ তাদের ধারণা হয় কমিউনিস্টরা প্রলেতারিয়েত শ্রেণিবিপ্লব দ্বারা ক্ষমতা দখল করে নিতে পারে। তাই এইসব দেশে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে একটি জাতীয়তাবাদী দল গড়ে ওঠে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে গঠিত রুশ-মার্কিন-ব্রিটিশ মিত্রজোট (১৯৪১) পারস্পরিক সহায়তার দ্বারা অক্ষশক্তির পতন ঘটায়। কিন্তু জার্মানির পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের পুরোনো অবিশ্বাস মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের মৃত্যু এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের পদত্যাগে আমেরিকা ও ইংল্যান্ডে নতুন নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটে। এতে মিত্রশক্তির যুদ্ধকালীন পারস্পরিক বোঝাপড়া বিনষ্ট হয়। ১৯৪৭ সাল থেকে পশ্চিমী শক্তিগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের প্রচণ্ড অবনতি হতে থাকে। এ সময় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান মার্শাল পরিকল্পনা (১৯৪৭) ঘোষণা করেন। মার্শাল পরিকল্পনা এই ঠাণ্ডা লড়াইয়ের আগুনে ঘি ঢেলে দেয়। ইংল্যান্ড, ফ্রান্সসহ

Dhaka University Institutional Repository

ইউরোপের মোট ১৬টি দেশ এই পরিকল্পনায় যোগ দেয়। রাশিয়ার চাপে পোল্যান্ড, বুলগেরিয়াসহ ৮টি দেশ এই পরিকল্পনা থেকে বিরত থাকে। ফলে পৃথিবী আবারো দুটো শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মার্শাল পরিকল্পনা গ্রহণ করার ফলে পশ্চিমের দেশগুলোর অর্থনৈতিক অগ্রগতি হয় এবং কমিউনিজমের অগ্রগতি মন্দীভূত হয়। কারণ অর্থনৈতিক ধস রোধ হলে জনগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও জাতীয়তাবাদ জেগে ওঠে। ব্যক্তি স্বাধীনতা, মৌলিক অধিকার, জীবিকার স্বাধীনতা, মত প্রকাশের অধিকার প্রখর হয়ে ওঠে। এক সময় নাৎসি জার্মানির প্রতি গণতান্ত্রিক দেশগুলোর যেমন তীব্র ঘৃণা দেখা দিয়েছিল, এখন রুশী কমিউনিজমের বিরুদ্ধেও তেমনি বিদ্বেষ দেখা দেয়। ফলে পশ্চিমী গণতন্ত্র ও রাশিয়ার সমাজতন্ত্রের এই ঠাণ্ডা লড়াই যে কোনো সময় গরম যুদ্ধে পরিণত হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ১৯৪৮ সাল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বড় যুদ্ধের আশঙ্কায় নিজস্ব অস্ত্রসজ্জা ও আণবিক অস্ত্রভাণ্ডার মজুত করছিল। এজন্যে ১৯৪৯ সালে N.A.T.O বা ন্যাটো চুক্তির দ্বারা আমেরিকা ১১টি দেশের সঙ্গে ২০ বছরের আত্মরক্ষামূলক সামরিক চুক্তি স্বাক্ষর করে। আসলে রাশিয়ার দূরপাল্লার বোমারু বিমান আবিষ্কার, আণবিক বোমা ও হাইড্রোজেন বোমার অস্তিত্ব এবং মহাকাশে স্পুটনিকের জয়যাত্রা আমেরিকাকে শঙ্কিত করে তোলে। ন্যাটো জোট গঠিত হলে রাশিয়া তীব্র ভাষায় এর প্রতিবাদ করে। তখন ন্যাটো জোট ঘোষণা করে যে, এর সদস্যরা আঞ্চলিক নিরাপত্তার কারণে জোট গঠন করলেও ন্যাটো U.N.O বা জাতিসংঘের নীতি ও আদর্শের অনুগামী থাকবে। ১৯৫৩ সালে রাশিয়া পরমাণু বোমা আবিষ্কার করে এবং মহাকাশে ইউরি গ্যাগারিনের মহাকাশ যান দ্বারা সফল পরিক্রমণের মাধ্যমে রাশিয়া তার শক্তির বিস্তৃতি ঘটায়। ১৯৫৫ সালে রাশিয়া তাঁর অনুগত দেশগুলোর সমন্বয়ে Warsaw Pact নামে একটি জোট গঠন করে N.A.T.O জোটের প্রত্যুত্তর দেয়।

এইভাবে বিশ্ব ঠাণ্ডা লড়াইয়ের ফলে দুই শত্রু শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

দৈশিক প্রেক্ষাপট

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-'১৮)-এ ভারতবর্ষ তেমন কোনো বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয় নি, যাতে ইউরোপীয় মনোভাবের মতো একই মনোভাব ভারতীয়দের মনে সৃষ্টি হতে পারে। কারণ এ যুদ্ধে ভারত প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে নি। তবে একথাও ঠিক যে, যুদ্ধের পরোক্ষ নানান প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার ছাপ পড়েছিল এ দেশের সমগ্র শরীরে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ ছিল ইংল্যান্ডের একটি উপনিবেশ। বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ সরকার বিশেষ 'ভারতরক্ষা' আইন করে দেশের প্রধান বিপ্লবী নেতাদের গ্রেফতার করে জেলে পুরে দেন। তা সত্ত্বেও দেশের প্রধান রাজনীতিকেরা মনে করেন যুদ্ধে ইংল্যান্ডকে সাহায্য করলে যুদ্ধ শেষে 'স্বরাজ' পাওয়া যাবে। কারণ যুদ্ধের সময় মিত্রশক্তিগুলো এই মত প্রচার করেছিল যে, যুদ্ধশেষে 'তারা গণতন্ত্র ও সর্বজাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় রত হবে'[১৩]। তাই দরিদ্র ভারতবাসী ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধকালীন অতিরিক্ত কর চাপিয়ে দেওয়াকেও স্বীকার করে নেয়।

Dhaka University Institutional Repository

'কিন্তু ১৯১৮ সালে যুদ্ধ শেষ হবার পর স্বরাজ এল না দেশে, এল মন্টেগু-চেমস্ফোর্ড সংস্কার পরিকল্পনা (১৯১৯)'।[১৪] এ পরিকল্পনায় বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে ভারতের প্রদেশগুলোকে স্বায়ত্বশাসন দেয়া হয়। দুরাশায় পরিণত হয় স্বরাজ পাবার আশা। ফলে যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর পর্যায়ে তীব্র অর্থনৈতিক-সংকট এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে ভারতীয় মধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবী মানুষের মনে জেগে ওঠে চরম অসন্তোষ। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক একের পর এক বঞ্চনার স্বীকার হয়ে সমগ্র ভারত প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ার জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে। হতাশার দুঃসহ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্যে এ সময় থেকেই ভারতে চরমপন্থী জাতীয়তাবাদের পুনরুত্থান ঘটে।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই ভারতে প্রথম জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী সংগ্রামী ধারা প্রবল হয়ে ওঠে। একই বছরে এশিয়ার একটি ক্ষুদ্র দেশ জাপানের হাতে পরাক্রমশালী রাশিয়ার সামরিক বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়ে ইউরোপীয় সামরিক বাহিনীর দুর্ধর্ষতা সম্পর্কে ভারতীয়দের মোহভঙ্গ হয়। তাদের মনে বিশ্বাস জেগে ওঠে যে, জাপানের মতো তারাও ইংরেজকে ভারত থেকে তাড়িয়ে দিতে পারবে।[১৫] এর জন্যে দরকার গভীর দেশপ্রেম ও আত্মোৎসর্গের প্রেরণা। এ সময়ই বাংলায় গড়ে ওঠে 'অনুশীলন সমিতি', 'যুগান্তর দল', 'মুক্তি সংঘ', 'শ্রী সংঘ' নামক অনেক বিপ্লববাদী সংগঠন। যারা ব্রিটিশের ঔদ্ধত্য ও দমন নীতিতে বিক্ষুব্ধ হয়ে বিস্ফোরক বোমা তৈরি করে শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করার নীতি গ্রহণ করেছিল। 'আইরিশ সন্ত্রাসবাদী ও রুশ নৈরাজ্যবাদী নিহিলিস্টদের অনুকরণে অত্যাচারী রাজকর্মচারীদের হত্যা করাই এদের লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল'।[১৬] যার পরিণতিতে ১৯০৭ সালে বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নরের প্রাণনাশের চেষ্টা করা হয়। ১৯০৮ সালে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী মজফরপুরের জেলা জজ কিংস্ফোর্ডের গাড়িতে বোমা ছুঁড়ে ধরা পড়লে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়, প্রফুল্ল আত্মহত্যা করে। বাংলা, মুজফরপুর ছাড়াও 'আহমদাবাদে, দিল্লীতে এমন কি খাস লন্ডনে পর্যন্ত ভারতীয় সন্ত্রাসবাদীদের আবির্ভাবে বড় লাট থেকে দারোগা পর্যন্ত সবাই রীতিমত শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল'[১৭]। ১৯০৬ থেকে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত শুধু বাংলাতেই রাজনৈতিক মামলা হয়েছিল ৫৫০টি।[১৮] অবশেষে ১৯১১ সালে ব্রিটিশ সরকার বাধ্য হয়ে বঙ্গভঙ্গের আদেশ তুলে নেন। ফলে বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তিমূলকে সুদৃঢ় অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করে।

১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সালের মধ্যে ভারতের জাতীয়তাবাদের শক্তি অভাবনীয় ভাবে বৃদ্ধি পায়। যদিও জাতীয়তাবাদীদের মনে আশা জেগেছিল যে, বিশ্বযুদ্ধ শেষে ভারতবাসী রাজনৈতিক দিক থেকে লাভবান হবে। কিন্তু সে আশা যখন পূর্ণ হল না তখন আবার রাজনৈতিক সংগ্রাম শুরু করার সংকল্প গ্রহণ করে। আর এই সংগ্রামকে তীব্রতর করে তোলার প্রেরণা তারা সঞ্চয় করেছিল রুশ-বিপ্লবের (১৯১৭) কাছ থেকে। রুশ-বিপ্লব ঔপনিবেশিক শাসন-পীড়িত জনসাধারণের কাছে এই সত্যটি পরিষ্কার করে দিয়েছিল যে, যে কোনো দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যেই লুকানো আছে অফুরন্ত শক্তি ও উদ্যম। শুধু সেই শক্তি ও উদ্যমকে জাগিয়ে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত হয়ে, দৃঢ় সংকল্প নিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

সমগ্র ভারতবাসী যখন জাতীয়তাবাদ ও সরকার বিদ্বেষী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রচণ্ডভাবে ফেটে পড়তে চাইছিল, তখন ব্রিটিশ সরকার 'রাউলাট আইন' (Rowlatt Act, ১৯১৯) নামক সভ্যসমাজ বিবর্জিত আইন করে দেশবাসীর উপর বর্বরের মতো চড়াও হয়। দেশের দিকে দিকে আগুন জ্বলে ওঠে। কংগ্রেস এই আইনের তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা করে। মহাত্মা গান্ধীর (মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধী) নেতৃত্বে ভারতীয় জনগণ বিপুলভাবে সাড়া দিয়ে রাউলাট আইন অমান্য করে গ্রেফতার ও কারাবরণের জন্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। গান্ধীজি সারা দেশব্যাপী হরতালের ডাক দিলে ১৩ই এপ্রিল (১৯১৯) পাঞ্জাব প্রদেশের 'জালিয়ানওয়ালাবাগ' উদ্যানে হরতাল পালনকারী লক্ষ লক্ষ জনতার উপর জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে রাইফেল ও মেশিনগানের গুলি চালিয়ে সৈন্যরা এক পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডে মেতে ওঠে। জালিয়ানওয়ালাবাগের নির্মম ঘটনাবলির বিবরণ দেশের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়লে জনসাধারণের কাছে সভ্যতা ও সাম্রাজ্যবাদের মুখোসধারী ব্রিটিশ শাসনের কুৎসিত ও ভয়াবহ স্বরূপ উন্মোচিত হয়। মানবতাবাদী মহান কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'নাইট হুড' উপাধি পরিত্যাগ করে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করেন। সারা দেশব্যাপী আন্দোলনের বেগ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে। এ সময় গান্ধীজির নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয় আন্দোলন এক সর্বভারতীয় চরিত্র ধারণ করে। জাতি-ধর্ম-ভাষা-বর্ণ ও শ্রেণিগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও মহাত্মাগান্ধীর নেতৃত্বে জাতীয় আন্দোলনের সামাজিক ভিত্তি বেশ মজবুত হয়ে ওঠে। হিন্দু-মুসলমানের অপূর্ব সম্প্রীতি দেখা দেয়। গান্ধীজি মুসলিম লীগ ও খিলাফৎ আন্দোলনেরও অন্যতম নেতা হিসেবে স্বীকৃত হন।

১৯২০ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের এক সভায় গান্ধীজি পাঞ্জাবের অন্যায়ের প্রতিকার, খিলাফৎ প্রশ্নের সুষ্ঠু মীমাংসা এবং পূর্ণ স্বরাজ অর্জনের জন্যে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। এতে কৃষক, শ্রমিক ও ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা দেখা দেয়। সারা দেশের জাতি-ধর্ম, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার যোগদানের ফলে অসহযোগ গণআন্দোলন প্রতিরোধের আন্দোলনে পরিণত হয়।

১৯২১ সালে তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারে এক কোটি পনের লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়।[১৯] বিদেশী কাপড় পুড়িয়ে জনতা স্বাধীনতা সংগ্রামে অবিচলিত থাকার প্রতিজ্ঞা নেয়।

কেরালার মালাবার অঞ্চলে মোপলা সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ ও ইংরেজ সরকারের ব্যাপক হত্যালীলা দেশবাসীকে বিস্মিত ও বিক্ষুব্ধ করে তেলে (১৯২১)। অসহযোগ আন্দোলনের ব্যাপকতা দেখে ব্রিটিশ সরকার সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে এবং বড় লাট লর্ড রিডিং দমনমূলক নীতি গ্রহণে প্রস্তুত হন। ১৯২২ সালের প্রথম দিকে গান্ধীজি বড়লাটকে এক পত্রে সরকারি অত্যাচার ও উৎপীড়নের সুদীর্ঘ তালিকা দিয়ে সমস্ত দমনমূলকনীতি অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানান। লর্ড রিডিং গান্ধীজির প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে দেশে আইন-শৃংখলার অবনতির জন্যে কংগ্রেসকে দায়ী করেন। এ সময় গান্ধীজি সমষ্টিগত আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার জন্যে গুজরাটের বারদৌলি যান। কিন্তু

Dhaka University Institutional Repository

বারদৌলিতে সংগ্রাম শুরু করার আগেই উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার চৌরীচৌরা গ্রামে তিন সহস্রাধিক কৃষকের একটি শোভাযাত্রার উপর পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালালে ক্রুদ্ধ জনতা পুলিশকে আক্রমণ করে। এই সংঘর্ষে বাইশজন পুলিশের মৃত্যু হয়। (৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯২২)। শান্তির পূজারী গান্ধীজি এই সহিংস ঘটনায় গভীর মর্মাহত হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, জাতীয় কর্মীগণ তখনো পর্যন্ত অহিংসার মর্ম বুঝতে পারে নি এবং অহিংসায় তারা অভ্যস্তও হয়ে ওঠে নি। তাই বারদৌলিতে কংগ্রেসের কার্যকরী সভার এক অধিবেশনে তিনি অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন (১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯২২)। গান্ধীজির এ ঘোষণায় দেশবাসী স্তম্ভিত হয়ে গেল। জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ হলেন। দেশব্যাপী নৈরাশ্যের কালো ছায়া দেখা দিল। আর এ সুযোগে লর্ড রিডিং গান্ধীজিকে গ্রেফতার করে ৬ বছরের কারাদণ্ড দিলেন (১০ই মার্চ ১৯২২)। ফলে অসহযোগ আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে। অসহযোগ আন্দোলনের পরিণতিতে খিলাফৎ আন্দোলনও স্তিমিত হয়ে পড়ল। এ প্রসঙ্গে পূর্বেই বলা হয়েছে, তুরস্কে কামাল পাশার নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও নবজাগরণ দেখা দেয়। ১৯২৩ সালে তিনি তুরস্কে জাতীয়তাবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৪ সালে তিনি তুরস্ক থেকে সুদীর্ঘকালের মুসলিম ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ঐক্যের প্রতীক 'খেলাফৎ'-এর বিলুপ্তি ঘোষণা করেন। ভারতীয় মুসলমানরা এতে হতভম্ব ও মর্মাহত হয় এবং 'খিলাফৎ' আন্দোলনেরও যবনিকাপাত ঘটে।

অসহযোগ আন্দোলনের অবসানের পর ভারতীয় রাজনীতিতে এক সংকটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এ পরিস্থিতিতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও মতিলাল নেহরু 'স্বরাজ্য দল' গঠন করেন (১৯২২)। সুভাষচন্দ্র বসু, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীসহ অনেক যুবনেতা এই রাজনৈতিক দলে যোগ দেন। অল্পদিনের মধ্যেই এই দল জনপ্রিয়তা অর্জন করে শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

১৯২৩ সালের নির্বাচনে 'স্বরাজ্য দল' সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলে বাংলার লর্ড লিটন দেশবন্ধুকে মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান জানান। দেশবন্ধু এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলোতে সক্রিয় বিরোধিতার নীতি গ্রহণ করেন। এই সময় বাংলার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল 'বেঙ্গল প্যাক্ট'। স্বরাজ্য দলের নেতা চিত্তরঞ্জন দাশ ও মুসলিম নেতা আবদুল করিম ছিলেন এই প্যাক্টের উদ্যোক্তা। দেশবন্ধু মনে করতেন মুসলমানদের সহযোগিতা ছাড়া দেশের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়।

১৯২৫ সালে চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু হলে স্বরাজ্য দলের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। ইতোমধ্যে মহাত্মা গান্ধী কারামুক্ত হয়ে বাইরে আসেন (১৯২৪)। কারামুক্তির পর তিনি স্বরাজ্য দল ও কংগ্রেসের মধ্যে ঐক্য আনতে সচেষ্ট হন।

১৯২৩ সালের পর থেকে দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার প্রকোপ বাড়ছিল। গান্ধীজি সাম্প্রদায়িকতার আবির্ভাবে বিচলিত হন এবং দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়ে তিনি দিল্লীতে মৌলানা মহম্মদ আলির বাড়িতে থেকে ২১ দিন

Dhaka University Institutional Repository

অনশন করেন (১৯২৪)। কিন্তু দুঃখের বিষয় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনে তাঁর এ প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

বস্তুত এ সময়ে দেশের অবস্থা বেশ হতাশাব্যঞ্জক হয়ে উঠেছিল। মহাত্মা গান্ধী রাজনীতি থেকে অবসর নিলেন (১৯২৬)। এ সময় থেকেই ভারতের জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলো ধীরে ধীরে আবার জেগে ওঠে এবং ১৯২৭ সালে 'সাইমন কমিশন' ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সে শক্তি ভারতকে একটা অন্ধকার জগত থেকে মুক্ত করে নতুন রাজনৈতিক সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করে।

১৯১৭ সালের রুশ-বিপ্লবের ঘটনা ভারতীয় যুবমানসে যে প্রবল আলোড়ন তুলেছিল তারই ফলে ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতে সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। এর আগে ১৯২০ সালে রাশিয়ার তাসখন্দে ভারতীয় বিপ্লবী মানবেন্দ্র রায়ের (এম. এন. রায়) উদ্যোগে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। ১৯২১ সালে ভারতের অভ্যন্তরে কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়াস শুরু হয়। এম. এন. রায়ের নির্দেশে প্রবাস থেকে নলিনী গুপ্ত ও শওকত ওসমানী ভারতে আসেন এবং ১৯২১ সালের শেষ দিকে ভারতের বোম্বাইতে (বর্তমান মুম্বাই) এস. এ. ডাঙ্গে, লাহোরে গোলাম হোসেন, কলকাতায় মুজাফফর আহম্মদ ও মাদ্রাজে সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার নেতৃত্বে চারটি পৃথক কমিউনিস্ট গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। এ সময় থেকেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যেও সমাজতান্ত্রিক ও বামপন্থী ভাবধারার অনুপ্রবেশ ঘটে। দেশের যুবশক্তির প্রধান প্রতিভূ জওহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বসু এই ভাবধারার প্রথম থেকেই ছিলেন অনুরাগী। ১৯২২ সালে কমিউনিস্ট কার্যকলাপের উপর ব্রিটিশ সরকার দমনমূলক নীতি চাপিয়ে দেয়। ১৯২৩ সালে পেশোয়ারে ও ১৯২৪ সালে কানপুরে বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হয়। কানপুর ষড়যন্ত্র মামলায় এস. এ. ডাঙ্গে, মুজাফফর আহম্মদ, নলিনী গুপ্ত ও শওকত ওসমানীকে অভিযুক্ত করা হয়। ব্রিটিশের এই দমনমূলক নীতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনকে সুসংহত করার জন্যে প্রচেষ্টা শুরু হয় এবং এভাবেই কমিউনিস্ট আন্দোলন গোষ্ঠী চরিত্র ত্যাগ করে সর্বভারতীয় সাংগঠনিক চরিত্র গ্রহণ করে (১৯২৫)।

এ সময় ভারতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ ভয়াবহ আকার ধারণ করে। ভারতের কৃষি ও শিল্প উভয়ক্ষেত্রেই উৎপাদন হ্রাস পেতে থাকে। আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁচামালের দাম কমে যাওয়ায় ভারতের রফতানি আয় কমে যায়। আবার দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাওয়ায় সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের দুর্দশা চরমে পৌঁছায়। শ্রমিক অসন্তোষ বাড়তে থাকে। ১৯২৯-৩০ সালের দিকে আমেরিকার শেয়ার বাজারে ধস নামলে ইংল্যান্ডের অর্থনীতি ভীষণভাবে বিপন্ন হয়। ফলে তার সরাসরি ধাক্কা এসে লাগে ভারতের অর্থনীতির উপর। দেশব্যাপী প্রচণ্ড অর্থনৈতিক মন্দার কারণে জনজীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলাদেশ একেবারে কোণঠাসা হয়ে পড়ে। শিক্ষিত বাঙালি যুবকদের আশা ও আদর্শ ধূলিসাৎ হয়ে যায়। বাঙালি যুবচিত্ত গভীর হতাশায়-ক্ষোভে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই অর্থনৈতিক দুর্দশার ফলে একদিকে জঙ্গী শ্রমিক আন্দোলন আত্মপ্রকাশ

Dhaka University Institutional Repository

করল, অন্যদিকে ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্যবাদী আন্দোলন সুস্পষ্ট আকার ধারণ করল।

ফলে ১৯২৭ সালে 'সাইমন কমিশন' বয়কট ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দাবিতে পরিণত হলে অন্যান্য দলগুলোর সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টিও তাতে যোগদান করে।

১৯২৮ সালে সাইমন কমিশনের সদস্যরা ভারতে এসে পৌঁছালে সমগ্র ভারত 'সাইমন ফিরে যাও' ধ্বনিতে প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। দেশের অর্থনৈতিক দুর্দশা ও রাজনৈতিক অসন্তোষের কারণে সাইমন কমিশন বর্জন আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রাণবন্ত আকার ধারণ করে। এতে ব্রিটিশ সরকার ক্ষিপ্ত হয়ে নিরস্ত্র জনগণের উপর লাঠিচার্জ করে। ৩০শে অক্টোবর (১৯২৮) লাহোরে লালা লাজপত রায়ের নেতৃত্বে এক প্রতিবাদী মিছিলে পুলিশ নির্মমভাবে লাঠিচার্জ করলে লালাজী গুরুতরভাবে আহত হন এবং ১৭ই নভেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। ৩০শে নভেম্বর (১৯২৮) লক্ষ্ণৌতে এ ঘটনার প্রতিবাদে জওহরলাল নেহেরু ও গোবিন্দবল্লভ পন্থের নেতৃত্বে মিছিল বের হলে পুলিশ সেখানেও ব্যাপক অত্যাচার ও নির্মম দমননীতি গ্রহণ করে। এই সময় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বৈপ্লবিক তৎপরতা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। লাহোরে লালা লাজপত রায়ের মৃত্যু হলে হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন লাহোরের পুলিশ ইনেসপেক্টর মি. স্যান্ডার্সকে হত্যা করে (১৭ই ডিসেম্বর ১৯২৮)। ১৯২৯ সালের ৮ই এপ্রিল দিল্লীতে অধিবেশন চলাকালীন কেন্দ্রীয় আইন সভায় বোমা নিক্ষেপ করলে তরুণ বিপ্লবী ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তের ফাঁসি হয়। কলকাতায় লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় ধৃত রাজনৈতিক বন্দীদের উন্নত ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে বিপ্লবী যুবক যতীন্দ্রনাথ দাস দীর্ঘ ৬৩দিন অনশনের পর বীরের মতো মৃত্যুবরণ করেন (১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯২৯)। এই সময় বৈপ্লবিক তৎপরতা সমগ্র ভারতের ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। উল্লেখ্য যে, জওহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বসুর প্রভাবে ভারতীয় যুবসমাজে এই চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁরা উভয়ই ছিলেন বামপন্থী মনোভাবাপন্ন। এই যুব-জাগরণ ও বামপন্থী আদর্শের প্রসারের পাশাপাশি জঙ্গী শ্রমিক আন্দোলনের ব্যাপকতায় ভারত সরকার সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন। ফলে ১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লর্ড আরউইন 'জননিরাপত্তা বিল' পাশ করেন। কমিউনিস্ট আন্দোলনকে সমূলে বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে মার্চ মাসে কমিউনিস্ট ও শ্রমিক আন্দোলনের ৩১ জন নেতাকে গ্রেফতার করে প্রসিদ্ধ মিরাট ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁদের অভিযুক্ত করেন। এই দমন নীতির ফলে ভারতের শ্রমিক ও সাম্যবাদী আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে। এ বছরই ইংল্যান্ডে শ্রমিকদল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ায় ভারতের জনগণ আশা করল যে, মিরাট মামলায় অভিযুক্ত শ্রমিক নেতাদের প্রতি সুবিচার করা হবে। কিন্তু ব্রিটিশ শ্রমিক দল এ ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করায় ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে ক্ষোভ দেখা দেয়। অতঃপর ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর মধ্যরাতে মহাত্মা গান্ধী ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাব উত্থাপন করেন। গান্ধীজির পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাব ও আন্দোলনের আহ্বান দেশবাসীর মনে ব্যাপক উৎসাহ ও চাঞ্চল্য দেখা দেয়। ১৯৩০ সালে গান্ধীজির নেতৃত্বে আইন অমান্য আইন পুনরায়

Dhaka University Institutional Repository

শুরু হলে দেশব্যাপী ব্রিটিশ-বিরোধী বিক্ষোভের অনুকূল পরিবেশে বিভিন্ন বিপ্লবী সংগঠন আবার বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এ সময় বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল।

চট্টগ্রামে মাস্টার দা সূর্যসেনের নেতৃত্বে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটে। তিনি ১৮ই এপ্রিল (১৯৩০) চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুট করেন। ফলে চট্টগ্রামের জনগণের উপর ব্রিটিশের নির্মম দমন-পীড়ন শুরু হয়। অত্যাচারী পুলিশ ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট আসানুল্লাহ তরুণ বিপ্লবী হরিপদ ভট্টাচার্যের গুলিতে নিহত হন (১৯৩১)। ১৯৩২ সালে মহীয়সী বিপ্লবী নেত্রী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের নেতৃত্বে বিদ্রোহী দল চট্টগ্রামের ইউরোপীয়ান ক্লাবে হানা দিতে গিয়ে প্রীতিলতা পুলিশের হাতে ধরা পড়েন এবং আত্মহত্যা করেন। ১৯৩৩ সালে মাস্টার দা পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন এবং ১৯৩৪ সালে ফাঁসি কাষ্ঠে প্রাণ দিলেন।

চট্টগ্রামের এই সশস্ত্র অভ্যুত্থান সমগ্র বাংলায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল। বিপ্লবী আন্দোলনের পীঠস্থান ঢাকায় ছাত্র-সমাজের মধ্যে বিপ্লববাদ এ সময় বিশেষ প্রসার লাভ করল। বিখ্যাত বিপ্লবী পুলিন দাসের অনুশীলন সমিতি, ও বিপ্লবী নেতা হেমচন্দ্র ঘোষের বেঙ্গল ভলান্টিয়ার (বি. ভি.) চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর ব্রিটিশ কর্মচারীদের গুপ্ত হত্যা কার্যক্রম গ্রহণ করে। বিনয় বসুর হাতে বাংলার পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান মি. লোম্যান নিহত হন (২৯শে আগস্ট ১৯৩০)। ১৯৩০ সালের ৮ই নভেম্বর কলকাতার মহাকরণে দুঃসাহসিক অভিযান চালিয়ে বিনয়-বাদল-দীনেশ কারাবিভাগের প্রধান মি. এন. জি. সিম্পসনকে হত্যা করার পর বাদল আত্মহত্যা করেন। বিনয় কয়েকদিন পর মারা যান এবং দীনেশ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। দীনেশের মৃত্যুদণ্ডদাতা বিচারক মি. আর. আর. গার্লিক ১৯৩২ সালের ২৭শে জুলাই আলিপুর সেসন জজকোর্টে কানাইলাল ভট্টাচার্যের গুলিতে নিহত হন। স্কুল ছাত্রী শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরীর গুলিতে কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট মি. সি. জি. বিস্টিভেশন নিহত হন। এভাবে ১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ সালের মধ্যে সারা বাংলায় ব্যাপক বৈপ্লবিক তৎপরতা সংঘটিত হয়। এতে মহিলা বিপ্লবীদের অংশগ্রহণ ছিল এক অভাবনীয় ও বিরল ঘটনা।

ইতোমধ্যে অনুশীলন সমিতি বাংলার বাইরে পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি জায়গায় শাখা স্থাপন করে এই বৈপ্লবিক আন্দোলনকে ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে দিয়েছিল। তবে ১৯৩৪ সালের পর থেকে ভারতে বৈপ্লবিক তৎপরতার অবসান হতে থাকে। কারণ এ সময় আন্দামানে বন্দী বিপ্লবীদের মাঝে সাম্যবাদী আদর্শের প্রসার ঘটে। ১৯৩৯ সালে জেলমুক্ত বিপ্লবীরা ক্রমশ সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কমিউনিস্ট ও বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। বাংলার অনুশীলন সমিতি ও উত্তরপ্রদেশের হিন্দুস্থান সমাজতান্ত্রিক রিপাবলিকান সমিতির সদস্যগণ দলে দলে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়। এইসব বিপ্লবীদের সহযোগিতায় সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৩৯ সালে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' নামক রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠা করেন।

Dhaka University Institutional Repository
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে প্রাক্তন বিপ্লবীরা যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনে অংশ নেন এবং ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সূচনার হলে বিপ্লবীরা কংগ্রেস পরিচালিত আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলেন। ফলে ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনে অহিংস ও সশস্ত্র সংগ্রামের অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছিল।

এদিকে ১৯৩০ সালের ৬ই এপ্রিল গান্ধীজি বাছাই করা ৭৮ জন শিষ্য নিয়ে লবণ আইন অমান্য করার জন্যে বিখ্যাত ডান্ডি অভিযান শুরু করলেন। এতে সারা দেশব্যাপী প্রচণ্ড উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। সর্বত্র বিদেশী দ্রব্য বর্জন, স্কুল-কলেজে ধর্মঘট, সরকারি দপ্তরে পিকেটিং চলতে থাকে বিপুল উৎসাহে। মেয়েরা দলে দলে আন্দোলনে অংশ নেয়।

বাঙলার মেদিনিপুরে ও উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষকদের অভ্যুত্থান দেখা দেয়। বোম্বাইতে (বর্তমান মুম্বাই) কিছুদিন শ্রমিকরাই যেন শহর দখল করে রাখল। উত্তর পশ্চিম সীমান্তে আবদুল গফর খান 'লালকুর্তা' পরা অনুচরদের নিয়ে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সীমান্তের পেশোয়ারে গাড়োয়ালি রাইফেলসের হিন্দু সিপাইরা নিরস্ত্র মুসলমান জনতার উপর গুলি চালাবার হুকুম অমান্য করে দেশবাসী কর্তৃক অভিনন্দিত হন। কিন্তু সাম্প্রদায়িক ও অন্যান্য স্বার্থ নিয়ে ভারতের নেতাদের অন্তর্বিরোধ এবং তীব্র দমননীতির প্রকোপে আইন অমান্য আন্দোলনের গতি স্তিমিত হয়ে এল। ১৯৩৪ সালে এই আন্দোলন সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করে নিয়ে গান্ধীজি আরেকবার সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর নিলেন। আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেবার পর কংগ্রেস রাজনীতিতে নেমে আসে গভীর শূন্যতা ও অবসাদ। এই সময় কংগ্রেসে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী উভয় ধরনের প্রবণতাই প্রবল হয়ে ওঠে। আন্দোলন প্রত্যাহৃত হবার পর কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করে কংগ্রেসের বামপন্থী নেতারা কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল প্রতিষ্ঠা করেন (অক্টোবর ১৯৩৪)। এর কিছুদিন পর শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট ও কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল একসঙ্গে কাজ করে।

১৯৩৬ ও '৩৭ সালে জওহরলাল নেহরু এবং ১৯৩৮ ও '৩৯ সালে সালে সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত হলে কংগ্রেসের বামপন্থী মহলে উৎসাহের সঞ্চার হয়। কিন্তু দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দের মনে ভীতি সঞ্চারিত হয় এবং অল্পদিনের মধ্যেই এঁদের সঙ্গে অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয়বার সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতি পদে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের এই অভ্যন্তরীণ অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ্য আকার ধারণ করে। ইতোমধ্যে সুভাষ বসু তরুণ ও বামপন্থী মহলে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। কারণ প্রথম থেকেই তিনি ছিলেন মহাত্মা গান্ধীর আপোষমূলক নীতির কঠোর সমালোচক। তাই ১৯৩৯ সালে সুভাষ বসু কংগ্রেসের সভাপতি পদে ইস্তফা দিয়ে তাঁর অনুগামীদের নিয়ে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' নামে একটি নতুন দল গঠন করেন।

১৯১৪ সালে মহম্মদ আলি জিন্নাহ নিখিল ভারত মুসলিম লীগ-এর সভাপতি নির্বাচিত হলে ভারতীয় মুসলমান রাজনীতির ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সূচিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

জিন্নাহ রাজনৈতিক জীবনের প্রথম দিকে একজন জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকে তিনি কংগ্রেস বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। ১৯২৯ থেকে ১৯৩৫ সালের মধ্যেই তিনি সাম্প্রদায়িক নেতা হিসেবে ভারতীয় রাজনীতিতে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। ১৯৩৫-৩৬ সালে জিন্নাহ মুসলিম লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতার আসনে বসেন এবং নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করে সাংগঠনিক সংহতি বজায় রেখে মুসলিম লীগকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে মুসলমান সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠন রূপে দাঁড় করান।

অতঃপর জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলানদের জন্যে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি জানাতে শুরু করেন (১৯৩৮)। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ভারতীয় রাজনীতিতে যে জটিলতার সৃষ্টি হয়, তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে মহম্মদ আলি জিন্নাহ ও মুসলিম লীগ দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবিকে সুস্পষ্ট রূপ দেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বড়লাট লিনলিথগো ও ভারত সচিব জেটল্যান্ড সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর মতামত উপেক্ষা করে ভারতে কোনো সাংবিধানিক সংস্কার গৃহীত হবে না।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ভারত সরকার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে কোনো আলোচনা না করেই বিশ্বযুদ্ধে ভারতকে সংশ্লিষ্ট করলেন (৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯)। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রী রাষ্ট্রসমূহের সংগ্রামে সহযোগিতার জন্যে কংগ্রেস পূর্ণমাত্রায় প্রস্তুত ছিল। কিন্তু নিজেরা পরাধীন হয়ে অন্য দেশের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে যোগদান অসম্ভব বলে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ভারতবর্ষকে স্বাধীন দেশ হিসেবে ঘোষণা দেবার দাবি জানান। ব্রিটিশ সরকার এ দাবির প্রতি কোনো সাড়া না দিলে ১৯৪০ সালে গান্ধীজি অল্প কয়েকজন মনোনীত ব্যক্তিকে নিয়ে শুরু করেন সত্যাগ্রহ আন্দোলন। ফলে ১৯৪০ থেকে ১৯৪১ সাল ব্যাপী ভারতীয় রাজনীতিতে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। এ সময় প্রায় ২০,০০০ কংগ্রেস সত্যাগ্রহী[২০] কারাগারে বন্দী হন।

১৯৪১ সালের শেষ দিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গতিধরা ভয়াবহ মোড় নেয়। জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ফিলিপাইন, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া, মালয় ও বার্মা জাপানের করায়ত্ত হয়। ১৯৪২ সালে রেঙ্গুন জাপানের অধিকৃত হওয়ায় ভারত সরকার যুদ্ধে ভারতবাসীর সর্বাত্মক সহযোগিতা অর্জনের জন্যে উদগ্রীব হয়ে ওঠে। একে একে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও কর্মীগণ জেল থেকে ছাড়া পেলেন।

১৯৪২ সালের ২২শে মার্চ স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে এক প্রস্তাব নিয়ে দিল্লীতে এসে কংগ্রেস ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন। কিন্তু কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ক্রিপসের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে এবং ১৯৪২ সালের ৮ই আগস্ট বোম্বাইয়ের (মুম্বাই) নিখিল ভারত কংগ্রেসের এক অধিবেশনে গান্ধীজি ঐতিহাসিক 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ডাক দেন। গান্ধীজি দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, "এই মুহূর্ত থেকে ভারতের প্রত্যেক নরনারী নিজেকে স্বাধীন বলে মনে করবে

Dhaka University Institutional Repository

এবং সেই মত আচরণ করবে। ... পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া আর কিছুতেই আমি সন্তুষ্ট হবো না। হয় লক্ষ্য অর্জন নয় মৃত্যু। আমরা ভারত স্বাধীন করবো, নতুবা মৃত্যুবরণ করবো”[২১]। ব্রিটিশ সরকার এ আন্দোলনকে কঠোর হস্তে দমন করার লক্ষে ৯ই আগস্ট (১৯৪২) ভোরে গান্ধীজি ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করেন এবং কংগ্রেসকে বেআইনী বলে ঘোষণা করা হয়। দেশ জুড়ে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল। জনগণের রুদ্ধ রোষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে একটা প্রবল বিক্ষোভমূলক আন্দোলনের রূপ নিল। নেতৃহীন ও সংগঠনহীন জনতা দেশের সর্বত্র হরতাল, কল-কারখানায় ও স্কুল-কলেজে ধর্মঘট করতে শুরু করল। পুলিশ এসব বিক্ষোভ দমনের জন্যে বেপরোয়াভাবে লাঠিচার্জ অথবা গুলি করল। এতে জনতা আরো ক্ষুব্ধ হয়ে হিংসাত্মক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়। তাঁরা ব্রিটিশ শাসনের প্রতীক স্বরূপ থানা, পোস্ট-অফিস ও রেলস্টেশনগুলোতে আক্রমণ চালায়। রেললাইন তুলে নেয়, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তার কেটে ফেলে। সরকারি বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়।

এই বিক্ষোভ আন্দোলন বাংলা, বিহার, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় গণঅভ্যুত্থানের রূপ নেয়। কোনো কোনো জায়গায় বিদ্রোহীরা ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জাতীয় সরকার স্থাপন করে। বাংলাদেশের মেদিনিপুর, বীরভূম, ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, দিনাজপুর, হুগলি, হাওড়া প্রভৃতি জেলায় আন্দোলনের ব্যাপকতা ছিল ভয়াবহ। ঢাকায় এ আন্দোলন সবচেয়ে মারাত্মক আকার ধারণ করে। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মধ্যে উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চল, বিহারের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ও মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলায় আগস্ট আন্দোলনের ব্যাপকতা ছিল সবচেয়ে বেশি। আগস্ট আন্দোলন ছিল এক সর্বভারতীয় গণবিক্ষোভ। এ গণআন্দোলনে সামিল হয়েছিল ছাত্র, কৃষক ও শ্রমিক। সমাজের উচ্চশ্রেণির মানুষ এ বিদ্রোহ থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছিল নিজ শ্রেণিস্বার্থে। আগস্ট আন্দোলনের গণমুখী চরিত্রের মূলে ছিল তীব্র জাতীয়তাবাদ ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়। ১৯৩৯ সালের পর ভারতব্যাপী মুদ্রাস্ফীতি ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। যুদ্ধের সময় নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিক বেড়ে যায়। তাই আগস্ট আন্দোলনের এক বছরের মধ্যেই সারা বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং প্রায় ৩০ লক্ষ লোক খাদ্যাভাবে মারা যায়।[২২] এসব সত্ত্বেও ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত আগস্ট আন্দোলনের ব্যাপকতা পরিলক্ষিত হয়। ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারির পর থেকে এ ব্যাপকতা হ্রাস পেতে থাকে। কারণ সরকারি কর্তৃপক্ষ এ আন্দোলন স্তব্ধ করার জন্যে নিষ্ঠুরতম দমননীতি অবলম্বন করে। সংবাদপত্রগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী জনতার উপর মেশিনগানের সাহায্যে গুলি করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে হেলিকপ্টার থেকে বোমা ফেলে জনতাকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়। সরকার পুলিশ ও গোয়েন্দা পুলিশের হাতে দেশকে ছেড়ে দেন। ফলে তারা যা খুশি তাই করতে লাগল। এ আন্দোলনে ১০ হাজারেরও বেশি মানুষ পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর হাতে মারা গিয়েছিল।[২৩] যেসব গ্রামে গণবিপ্লব দেখা দিয়েছিল সেসব গ্রামবাসীর উপর পিটুনি কর ধার্য করা হয়েছিল। ১৯৪৪ সালের ৮ই আগস্ট মহাত্মা গান্ধী মুক্তি লাভ করেন এবং প্রচণ্ড দমননীতির প্রয়োগে সরকারি কর্তৃপক্ষ অবশেষে এই আন্দোলন দমনে

Dhaka University Institutional Repository

সাফল্য লাভ করেন। তবে এ আন্দোলনের ব্যাপকতা ও তীব্রতা লক্ষ করে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান আসন্নপ্রায়।

ইতোমধ্যে ১৯৪৩ সালে সুভাষচন্দ্র বসু মালয় ও বার্মায় বসবাসকারী ভারতীয় এবং জাপানিদের হাতে বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে তাঁর বিখ্যাত 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ' গঠন করেন এবং সিঙ্গাপুরে এর কার্যালয় স্থাপন করেন। জীবনের এ অধ্যায়ে সুভাষচন্দ্র 'নেতাজী' বলে অভিহিত হন। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে গঠিত তাঁর আজাদ-হিন্দ্ ফৌজ ও সরকার জিন্নাহর 'দ্বিজাতি' নীতিকে খণ্ডিত করে ভারতীয় জাতীয়তার ঐকান্তিক অখণ্ডতার মাহাত্ম্য প্রচার করল।

আজাদ হিন্দ্ সরকারকে জাপান, জার্মানি, ইটালিসহ ৯টি দেশ স্বীকৃতি দেয় এবং ১৯৪৩ সালের ২৩শে অক্টোবর নেতাজী ইংল্যান্ড ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। জাপান নতুন সরকারকে শুভেচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ আন্দামন ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ প্রত্যার্পণ করে (ডিসেম্বর ১৯৪৩)। ১৯৪৪ সালে নেতাজী আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ও সরকারের প্রধান কেন্দ্র রেঙ্গুনে স্থানান্তরিত করেন এবং মে মাসের শেষ নাগাদ আসামের কোহিমা দখল করে নেন। ১৯৪৫ সালে জাপান বিপন্ন হয়ে পড়লে ব্রিটিশ বাহিনীর কাছে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের পরাজয় অনিবার্য হয়ে ওঠে। তখন নেতাজী আজাদ হিন্দ্ ফৌজের যুদ্ধ স্থগিত ঘোষণা করে টোকিও যাত্রার পথে বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু মুখে পতিত হন।[২৪]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আর একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। ১৯৪২-এর গণবিপ্লব এবং আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বীরত্বপূর্ণ স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে ভারতবাসীর বীরত্ব ও স্বাধীনতা অর্জনের দৃঢ় সংকল্পবদ্ধতার পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এ সময় জাতীয় নেতৃবৃন্দ কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বাইরে আসেন এবং জনগণ চূড়ান্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্যে উন্মুখ হয়ে ওঠে। ঠিক তখন আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বন্দী সৈনিক ও সেনানায়কদের বিচারকে কেন্দ্র করে একটি বিরাট গণআন্দোলন জেগে উঠল। কারণ ব্রিটিশের চোখে এঁরা বিশ্বাসঘাতক ও রাজদ্রোহী হলেও দেশবাসীর কাছে এঁরা হয়ে উঠেছিলেন জাতীয় বীর। তাই সারা দেশ এঁদের মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। পরিস্থিতি এমন আকার ধারণ করল যে, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ আগের মতো ভারতীয় জনতাকে উপেক্ষা করার সাহস পেলেন না। ফলে সামরিক আদালতে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বন্দীরা দোষী সাব্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও সরকারি কর্তৃপক্ষ এঁদের সবাইকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন। ভারত সম্পর্কে ব্রিটিশের মনোভাব পরিবর্তন হল। কারণ ব্রিটিশের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, ভারতবাসী পরাধীনতার গ্লানি আর সহ্য করতে প্রস্তুত নয়। ১৯৩৬-এর বোম্বাইয়ের (মুম্বাই) নৌ বিদ্রোহ, সারা দেশ জুড়ে শ্রমিক অশান্তি, রেল কর্মীদের ধর্মঘট, কৃষক আন্দোলন প্রভৃতি ব্রিটিশের জ্ঞান চক্ষু খুলে দিয়েছিল। এ সময় ভারতে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ব্যাপকভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার প্রাদুর্ভাব ঘটে। নৃশংস হানাহানিতে এরা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হল। গান্ধীজি পায়ে হেঁটে সমগ্র পূর্ব বাংলা ও

Dhaka University Institutional Repository

বিহারে এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধের চেষ্টা করেন। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এই দাঙ্গা দমনের ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় থাকে। ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন ভারতের বড়লাট হয়ে আসেন এবং এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ব্যাপক লোকক্ষয় ও রক্তপাতের সম্ভাবনা পরিহারের জন্যে তিনি মুসলিম লীগের দাবি অনুযায়ী হিন্দু ও মুসলমানের জন্যে ভারত ও পাকিস্তান নামে আলাদা দুটো স্বাধীন দেশের ঘোষণা দেন। ঠিক এ সময় এপ্রিল, ১৯৪৭ বাংলার মুসলিম লীগের হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, খাজা নাজিমুদ্দিন, মহম্মদ আলি, ডা. এ. এম. মালেক, ফজলুর রহমান ও আবুল হাশিম এবং কংগ্রেসের শরৎচন্দ্র বসু, কিরণশঙ্কর রায়, নলিনীরঞ্জন সরকার ও সত্যরঞ্জন বসু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ হিন্দুস্থান-পাকিস্তানের বাইরে অবিভক্ত বাংলা গঠনের পরিকল্পনা করেন।[২৫] কারণ এ নেতৃবৃন্দ সুদূর পাকিস্তানিদের তাঁবেদারি মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। আরো বড় কথা হচ্ছে হিন্দু হোক, মুসলমান হোক — এ অঞ্চলের সবাই বাঙালি। সবার ভাষা এক, সংস্কৃতি এক। তাই তাঁরা হাজার মাইল দূরের পাকিস্তানিদের শাসন মেনে নিতে কিছুতেই সম্মত ছিলেন না। এ উপলক্ষে শরৎচন্দ্র বসু, আবুল হাশিম ও সোহরাওয়ার্দী মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দীর্ঘ আলোচনা করেন এবং গান্ধীজি তাঁদের এই পরিকল্পনায় সহমত পোষণ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নানা প্রতিবন্ধকতায় এবং নিতান্ত অসময়ে স্বাধীন বাংলা গড়ার স্বপ্ন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়।

আর তাই লর্ড মাউন্টব্যাটেনের ঘোষণা অনুসারে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ মহানন্দে তার প্রথম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করে। পাকিস্তানে মহম্মদ আলি জিন্নাহ গর্ভনর জেনারেল হলেন।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পরপরই নতুন স্বাধীন সরকার হাজার সমস্যার সম্মুখীন হলেন। 'পশ্চিম পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে এল ৫৫ থকে ৭০ লক্ষ; পূর্ব-পাকিস্তানে তখনও অবস্থার একান্ত অবনতি হয় নি বলে এল সাড়ে সতেরো লক্ষ; পরে বহু বৎসর ধরে যারা পূর্ববঙ্গ ছেড়ে এসেছে, সেই উদ্বাস্তুদের মোট সংখ্যা ৫০ লক্ষের কম নয়। তুলনায় কম হলেও পাকিস্তানকেও অনুরূপ উদ্বাস্তু সমস্যার চাপে পড়তে হয়েছে।'[২৬]

সাম্প্রদায়িক বিষে সমাজ জীবন তখনো জর্জর। পাঞ্জাবের মাটি বারবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় কলঙ্কিত হচ্ছে। কাশ্মীরকে উপলক্ষ করে ভারত ও পাকিস্তান মুখোমুখি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে (অক্টোবর ১৯৪৭)। শেষ হয় ১৯৪৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর ভারতের বিজয়ে। ইতোমধ্যে আততায়ীর গুলিতে মহাত্মা গান্ধী নিহত হন। গান্ধীজির মৃত্যুতে দেশের বুকে নেমে আসে বেদনার ঘন অন্ধকার। তাঁর অনুপস্থিতিতে দেশ গঠন ও শাসন সম্পর্কিত সমস্যাগুলো আরো প্রকট হয়ে দেখা দিল। তবুও কংগ্রেসের সুদক্ষ নেতৃত্ব সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে, অথচ পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের পথে অগ্রসর হয়ে দেশের জীবন ও অর্থনীতিকে সুসংগঠিত করে তুলতে সক্ষম হল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ভারত ১৯৫৫ সালের মধ্যে এশিয়া ও আফ্রিকার নবজাগ্রত চেতনার প্রধান প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চল্লিশের দশক ও বাংলায় সাহিত্য-আন্দোলন

বিশ শতকের চল্লিশের দশক এক উত্তাল আন্দোলনের দশক — সমগ্র পৃথিবী জুড়ে। দশক শুরু হওয়ার আগেই (১লা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯) শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ক্ষমতাসীন ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষের স্বার্থ ও জনমতকে উপেক্ষা করে ভারতকে এ যুদ্ধের অংশীদার বলে ঘোষণা করলে সমগ্র ভারতব্যাপী তীব্র অসন্তোষ দানা বেঁধে ওঠে। ক্রমশ তা স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। এ আন্দোলন ভারতের চূড়ান্ত স্বাধীনতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত (১৪ই আগস্ট ১৯৪৭) অর্থাৎ চল্লিশের প্রায় সম্পূর্ণ দশক জুড়েই অব্যাহত থাকে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ছাড়াও দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নানান বিরোধ এ সময় তীব্র আকার ধারণ করে। আর তার প্রভাব সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয় বাংলাদেশে। এ সময় বাংলায় একের পর এক ঘটতে থাকে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংঘাত। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : কমিউনিস্ট ফরোয়ার্ড ব্লক সংঘর্ষ (১৯৪০), ঢাকা ও রায়পুরায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (১৯৪১), ফ্যাসিস্ট বিরোধী সম্মেলনে সোমেন-হত্যা (১৯৪২), ভারত ছাড়ো আন্দোলন (১৯৪২), দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর (১৯৪৩), রামেশ্বর হত্যা, নৌবিদ্রোহ, রশিদ আলি দিবসের প্রচণ্ড গণবিক্ষোভ (১৯৪৫), পোস্টাল কর্মচারীদের সারা ভারত ধর্মঘট (১৯৪৬), ভারত-পাকিস্তান দেশবিভাগ (১৯৪৭), ভাষা আন্দোলন (১৯৪৮), টংক বিদ্রোহ (১৯৪৯) এবং ঢাকায় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা (১৯৫০)। এই উত্তাল তরঙ্গের অভিঘাতে সারা বাংলার মানুষ ভীষণভাবে আন্দোলিত হয়েছে। তাদের জীবনে নেমে এসেছে দুরপনেয় হতাশা, চারিত্রিক অধঃপতন, দারিদ্র্য আর হাহাকার। বাঙালির এই বিপর্যয়কে ড. বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায় বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন :

> পরপর নানা বিপর্যয়ে বাঙালী সমাজ দিশেহারা হয়ে পড়ল। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু, মন্বন্তর, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা, ভারত বিভাগের ফলে বাংলার দ্বিখণ্ডীকরণ, উদ্বাস্তু সমস্যা, গান্ধী হত্যা, মহৎ আদর্শের 'মহতী বিনষ্টি', অর্থনৈতিক বিপর্যয় বাঙালীর মেরুদণ্ড ভেঙে দিল।[২৭]

বাঙালির সামগ্রিক জীবনে দেখা দিল সাংস্কৃতিক-সংকট। সামাজিক ভাঙনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাঙালি উপলব্ধি করল,

> দেশ-বিভাগের ওপারে কাঁদছে মহুয়া-মলুয়া-কাজলরেখার দল, এপারে চোখের জল ফেলছে ফুল্লরা-খুল্লনা-বেহুলার দল; ওপারে ভাটিয়ায়ালী, এপারে বাউল। এই হ'ল গ্রাম-

Dhaka University Institutional Repository

> সংস্কৃতির রূপ। এদিকে নগর-সংস্কৃতির রূপ ভিন্ন — এপারে কলকাতা, ওপারে ঢাকা। দুই-এর উপর পড়েছে মার্কিনী প্রভাবের বিষক্রিয়া, আধুনিক যান্ত্রিক জীবনের বিষবাষ্প। নগর জীবনে দেখা গেল উগ্র আধুনিকতা-পুষ্ট ইয়াংকী সভ্যতার অনুকরণ: আধুনিক তরুণ-তরুণীর দল যারা বাড়ীর চৌহদ্দির মধ্যে থাকতে আর চায় না, তারা রকে বসে, চায়ের দোকানে, মোড়ে মোড়ে জটলা করে আড্ডা দিয়ে নিজেদের প্রাণশক্তির পরিচয় জাহির করতে চাইছে, জীবনের মূল্যবোধকে নূতন মানে নির্দ্ধারণ করতে চাইছে।[২৮]

তাই সে-সময়ের বুদ্ধিজীবী শিক্ষিত সম্প্রদায় জীবনের এই হতাশ্বাসকে সাহিত্যের মধ্যদিয়ে বিদ্রোহের অগ্নিশিখা রূপে জ্বালিয়ে তুলতে চাইলেন। গড়ে তুললেন নতুন সাহিত্যিক গোষ্ঠী। সাহিত্যের পালা-বদল হল। গদ্যে ও পদ্যে দেখা দিল নতুন সুরের অনুরণন। অরুণকুমার সরকারের ভাষায় :

> আমরা চল্লিশের কবিরা, ইতিহাসের এক ঘোরতর সংকটকালে আমাদের যৌবনের দিনগুলি অতিবাহিত করেছি। পৃথিবীজোড়া যুদ্ধ, শহরভরতি বুভুক্ষু মানুষের মৃতদেহ, ঘৃণ্যতম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, আত্মঘাতী রক্তপাত, ছিন্নমূল উদ্‌ভ্রান্ত মানুষ, উচ্ছৃঙ্খল সমাজবন্ধন — এক কথায় মানবিক মূল্যবোধ এবং মানব-সম্পর্কের এক শোচনীয় অমাবস্যায় বোবা দুঃস্বপ্নের জগৎ ছিল আমাদের। নামহীন যন্ত্রণায় প্রতিমুহূর্তের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এবং পুঞ্জীভূত অসন্তোষকে বহন করেও আমরা বুকের মধ্যে আলো জ্বালিয়ে রেখেছিলুম, ভালোবেসেছিলুম মানবিক মূল্যের সারাৎসার কবিতাকে।[২৯]

বাংলা-সাহিত্যের পালা-বদল শুরু হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ শতকের বিশের দশকে — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) প্রভাব-বলয় থেকে সরে আসার চেষ্টায়।

রবীন্দ্রনাথ সে-সময় 'সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অপ্রতিরথ অধীশ্বর'[৩০]। তাঁর সমসাময়িক সাহিত্যিকদের প্রায় সবাই তাঁর বিশাল প্রতিভার ঐশ্বর্যর দীপ্তিতে মোহমুগ্ধ। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রবল ঘূর্ণাবর্তে সে-যুগের তরুণ মনে 'যা-কিছু পুরনো — ন্যায়, নীতি, বিশ্বাস, রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ব্যবস্থা, মানবিক ও পারিবারিক সম্পর্ক সব কিছুর ওপর প্রথমত সন্দেহ জন্মাল। সন্দেহ থেকে অবিশ্বাস, তারপর অবিশ্বাস-ই বিদ্বেষে পরিণত হোলো'[৩১]। তাঁরা 'জয়দেব-চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি'র মতো রবীন্দ্রনাথকেও 'ক্লাসিক্যাল' আখ্যা দিয়ে শ্রদ্ধাভরে দূরে সরিয়ে রাখলেন। কারণ রবীন্দ্রনাথের জীবনদৃষ্টি ও শিল্পচেতনা তরুণ লেখকগোষ্ঠীর কাছে যুগোপযোগী বলে মনে হল না। তাছাড়া মার্কস-এঙ্গেলস-এর সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ, ফ্রয়েড-ইয়ুং-এর যৌনবাদ, আইনস্টাইন-নীলস্ বোর প্রমুখের নতুন নতুন আবিষ্কার এ-যুগের তরুণ শিল্পীমনকে দারুণভাবে অভিভূত করল। তাঁদের পরিচিত জগতকে দিল বদলে। এ সময় তাঁদের হাতে এসে পৌঁছল টি. এস. এলিয়ট, এমি লাওয়েল, এজরা পাউন্ড প্রমুখ ইউরোপীয় কবির কবিতাবলি। এ সব কবিতা পঠন-পাঠনে তরুণ সাহিত্যসেবীরা নতুন যুগের সন্ধান পেলেন। ফলে তাঁরা এই নতুন যুগের আবেগ, অনুভূতি, মনন ও মূল্যবোধকে সাহিত্যে রূপ দিতে গিয়ে নতুন নতুন বিষয়-ভাষা ও আঙ্গিকের অন্বেষণ করলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তিকাল পর্যন্ত (১৯৪৫) বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অপ্রতিরোধ্য। তবুও এ সময় তাঁরই ভাব-শিষ্যদের কেউ কেউ, যেমন শরৎচন্দ্র

Dhaka University Institutional Repository

চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮), সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২) প্রমুখ ধীরে ধীরে তাঁদের রচনার বিষয় ও আঙ্গিকের নতুনত্ব আনবার তাগিদ অনুভব করেন। তবে রবীন্দ্রবলয় থেকে 'প্রমথ চৌধুরী প্রথম এই সরে আসা মানুষ। বিষয়ের দিক থেকে না হোক, মনোভঙ্গি ও প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে'[৩২]। শ্রী সুকুমার সেন তাঁর বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (চতুর্থ খণ্ড) গ্রন্থে এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন :

> এক অভিনব ও চমকপ্রদ শক্তির অভ্রান্ত পরিচয় বহন করিয়া প্রমথনাথ চৌধুরীর (১৮৬৮-১৯৪৬) গদ্য-পদ্য রচনা বাহির হইল রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সমসময়ে অর্থাৎ ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে। বৎসরখানেকের মধ্যেই প্রমথবাবুর সম্পাদিত সবুজপত্র প্রকাশিত হইয়া শিক্ষিত বাঙ্গালীর সাহিত্য ও সমাজচিন্তার মর্মান্তিক ও গতানুগতিকতার উপর প্রাণান্তিক আঘাত হানিল।[৩৩]

তাঁর 'সনেট-পঞ্চাশৎ' (১৯১৩) এবং 'পদ-চারণ' (১৯১৯) কাব্য দুটোতে শব্দের নিপুণ প্রয়োগ, ভাষা ও ভঙ্গির তীব্র দীপ্তি আর রচনাবন্ধের গাঢ়তা বাংলা কাব্যজগতে এক নতুন আস্বাদনের আমেজ নিয়ে এল। তিনি 'সবুজপত্র'-এ বাঙালির জীবনে যে নতুনত্বের আবির্ভাব ঘটেছে তাকে স্বাচ্ছন্দ্যে বরণ করে নিলেন। বাংলা-সাহিত্যে প্রথম চলিতরীতির সার্থক প্রবর্তন হল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পালাবদলের এই পালায় হাত মেলালেন। লিখলেন 'স্ত্রীর পত্র', 'ঘরে-বাইরে'র মতো গল্প-উপন্যাস।

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র তাঁর কথাসাহিত্যে সমাজের অবহেলিত, অচ্ছুৎ নিম্নবর্ণের মানুষদের স্থান করে দিয়ে এবং সমাজ-বিগর্হিত প্রেমকে শাশ্বত মহিমায় প্রতিষ্ঠা করে নতুন যুগের প্রাণস্পন্দনটিকে জাগিয়ে দিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে শোনালেন সাম্যের বাণী। তিনি তাঁর কাব্যে ধনী-নির্ধন, উঁচু-নীচু ভেদাভেদ তুলে দিয়ে অনায়াসে মুচি, মেথর, বারাঙ্গনাকে স্থান করে দিলেন।

কিন্তু এঁদের জীবনদর্শন, ভাব, ভাষা তখনো পর্যন্ত রাবীন্দ্রিক। এক সত্যেন্দ্রনাথ ছন্দোবৈচিত্র্যে ও আঙ্গিকের নতুনত্বে সে-সময়ের তরুণদের মন কিছুটা ভুলিয়েছিলেন বটে কিন্তু শেষপর্যন্ত তাঁদের মনোযোগ ধরে রাখতে পারেন নি।

ঠিক এ সময় বাংলা কাব্যে নতুন দর্শন ও নতুন কাব্যভাবনা নিয়ে আবির্ভূত হলেন মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২), যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪) এবং নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। মোহিতলালের বলিষ্ঠ দেহবাদী উচ্চারণ, যতীন্দ্রনাথের সংশয় ও দুঃখবাদ এবং নজরুলের বেপরোয়া প্রাণশক্তির উচ্ছলতা ও বিদ্রোহ প্রকাশে রবীন্দ্রনাথ থেকে স্বতন্ত্র সুরে সাহিত্য সৃষ্টির একটি ধারা সৃষ্টি হল। ফলে এঁদের হাতেই বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতার প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হল। তাই কোনো কোনো সমালোচক এঁদের বললেন, 'আধুনিক কবিতার প্রস্তুতি-পর্বের কবি'[৩৪]।

মোহিতলালের বাংলা কবিতা ক্ষেত্রে আবির্ভাব ১৯১৯ সালে। ১৯২২ সালে তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'স্বপন-পসারী' প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থেই প্রথম শোনা গেল রবীন্দ্র-কাব্যের সংস্কার বিরোধী নতুন একটা সুর। "তাঁর অকুতোভয় কবি-প্রাণ 'স্বপন-পসারী'র মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সোনার খাঁচা স্বীকার করেও তাকে ত্যাগ করতে চেয়েছে, বেরিয়েছে

Dhaka University Institutional Repository
নতুন অরুণাচলের সন্ধানে। তাই মোহিতলালের এই রবীন্দ্র-প্রতিস্পর্ধী কবিসত্তার কাছে কল্লোলের তরুণতম কবিরা গত্যন্তর খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি আধুনিকদের চোখে হয়ে উঠেছিলেন রবিদ্রোহিতার অগ্রবর্তী প্রাণপুরুষ"।[৩৫] নাগরিক মধ্যবিত্ত তরুণ কবিদের তিনি সমকালীন বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে অবরোধের অর্গল ভাঙার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অতিন্দ্রীয় প্রেম ও সৌন্দর্যানুভূতির পাশে মোহিতলালের বাস্তবানুগ বলিষ্ঠ দেহবাদী কবিতা তরুণ কবিদের দারুণভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সে কথা স্মরণ করেই লিখেছেন :

> মোহিতলালকে আমরা আধুনিকতার পুরোধা মনে করতাম। এক কথায় তিনিই ছিলেন আধুনিকোত্তম। ... যজন-যাজনের পাঠ আমরা তাঁর কছ থেকেই প্রথম নিয়েছিলাম। আধুনিকতা যে অর্থে বলিষ্ঠতা, সত্যভাষিতা বা সংস্কারসাহিত্য তা আমরা খুঁজে পেয়েছিলাম তাঁর কবিতায়।[৩৬]

মোহিতলালের মতো যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তও রবীন্দ্র-বলয় ভেঙে ভেঙে নতুন সুর সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর প্রথম কাব্য 'মরীচিকা'তেই (১৯২৩) শোনা গেল রবীন্দ্রদর্শনের বিরুদ্ধ সুর। উপনিষদের আনন্দলোকের যে অমৃত বাণীতে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সুস্থির, যতীন্দ্রনাথ তাকে অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন, এ পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর জন্ম হচ্ছে সর্বব্যাপী দুঃখ থেকে, আর সেই সর্বব্যাপী দুঃখের দ্বারাই তারা জীবিত আছে; এই সর্বব্যাপী দুঃখের মধ্যেই এদের যাতায়াত। 'রবীন্দ্রনাথের আনন্দমণ্ডপে যখন জীবনের উৎসব গান মুখরিত তখন এই বেসুরো গান ধরেছিলেন তিনি। কবিগুরুর সৌন্দর্যভাবাতুর কাব্যকলা ও ধ্বনিমসৃণ কারুকলার পাশে উপস্থিত হয়েছিলো তাঁর কাব্যের তির্যক মনোভঙ্গি ও অনতিভব্য শিল্পকর্ম। এবং তাতে রবীন্দ্রকাব্য মণ্ডলে ধ্বস নামিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও ছিলো'।[৩৭] সমকালীন তরুণ কবি ও পাঠক যে তাঁর দুঃখবিলাসে কতটা মশগুল ছিল তার সাক্ষ্য পাওয়া যায় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের স্বীকারোক্তিতে :

> মোহিতলালের মত যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তও আমাদের আরাধনীয় ছিলেন — ভাবের আধুনিকতার দিক থেকে যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব অভিজ্ঞতা। আমাদের তদানীন্তন মনোভাবের সঙ্গে চমৎকার মিলে গিয়েছিল। দুঃখের মধ্যে কাব্যের যে বিলাস আছে সেই বিলাসে আমরা মশগুল ছিলাম।[৩৮]

রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে আসা 'দ্বিতীয় মানুষ নজরুল' — বলেছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।[৩৯] কারণ কালবোশেখীর ঝড়ের মতো প্রচণ্ড উন্মাদনা নিয়ে বাংলা কাব্যাঙ্গনে তাঁর আবির্ভাব। তাঁর 'এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণতূর্য'। তিনি বললেন, 'আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ।' তাই বাংলা কাব্যে 'অ-রাবীন্দ্রিক' দৃষ্টিকোণ ও সুরের ভিন্নতা প্রকাশে নজরুল ইসলামের একটা বিশেষ দান আছে।

তখন সারা ভারতে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের (১৯২০) প্রচণ্ড আলোড়ন। এই উন্মাদনার সুর নিয়ে প্রকাশিত হল নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা। সে-সময়ের স্মৃতিচরণ করতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন :

Dhaka University Institutional Repository

> 'বিদ্রোহী' পড়লুম ছাপার অক্ষরে মাসিক পত্রে — মনে হ'লো এমন কখনো পড়িনি। অসহযোগের অগ্নিদীক্ষার পরে সমস্ত মন-প্রাণ যা-কামনা করছিলো, এ যেন তা-ই: দেশব্যাপী উদ্দীপনার এ-ই যেন বাণী।[৪০]

নজরুলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা' প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালে। এ কাব্যগ্রন্থেই তিনি 'তোরা সব জয়ধ্বনি কর / ওই নূতনের কেতন ওড়ে কালবোশেখীর ঝড়' এবং 'আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দেই পদচিহ্ন' বলে তখনকার বাংলা কবিতার ভাবালুতা ও মৃদু সুরের গুঞ্জনধ্বনিকে স্তব্ধ করে দিয়ে পৌরুষ ও তারুণ্যের বিজয়বার্তা ঘোষণা করলেন। বাংলা কাব্যে এমন উচ্চকণ্ঠের উচ্চারণ এর আগে আর শোনা যায় নি। তাই তিনি পেলেন 'বিদ্রোহী-কবি'র সম্মান। শ্রী সুকুমার সেন লিখেছেন :

> সুতরাং অনিবার্যভাবেই অতঃপর নজরুলের কবিতা প্রেমের আবেগের ও প্যাশনের উচ্ছ্বাসের পথ ধরিল। নজরুল তরুণ "অতি-আধুনিক" কবিদের পদপ্রদর্শক হইলেন।[৪১]

রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে আসার প্রয়াসে কবিতার ক্ষেত্রে যেমন নতুন নতুন সৃষ্টির আয়োজন চলছিল, তেমনি সে-সময়ের গল্প, উপন্যাসেও পরিলক্ষিত হয় নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষার ছাপ।

প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের হাত ধরে বাংলার সাহিত্যাঙ্গনে স্বাধীন যৌন-জীবনের গল্প আগেই এসেছিল। এ পর্যায়ে নরেশ সেনগুপ্ত (১৮৮২-১৯৬৪), চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৩৮) প্রমুখের হাতে তা নতুন মাত্রা পেল। এঁরা স্খলন, পতন ও অধঃপতনকে বৈজ্ঞানিক নিস্পৃহতার সঙ্গে উদ্‌ঘাটন করে দেখালেন যে, জীবনের সত্য আর সাহিত্যের সত্যের মধ্যে কোনো ভেদ নেই। তাই নরেশচন্দ্রের 'ঠানদিদি' (১৯১৮), 'শুভ্রা' (১৯২০); চারুচন্দ্রের 'পঞ্চতিলক' (১৯১৯), দোটানা (১৯২০) প্রভৃতি রচনায় নর-নারীর জীবন ও নৈতিক আদর্শের সাহসিক মনোভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। এঁরা বিবাহিত নারীর স্বামী ছেড়ে প্রেমিকে আসক্তি, যৌন-উচ্ছৃঙ্খলতা ও পাপাচারের চিত্র রচনায় প্রভূত স্বাধীনতা অবলম্বন করে এক ধরনের আধুনিকাতার প্রবর্তন করলেন।[৪২]

১৯২৩ সালে 'উদ্ধতযৌবনের ফেনিল উদ্দামতা, সমস্ত বাধা-বন্ধনের বিরুদ্ধে নির্বারিত বিদ্রোহ, স্থবির সমাজের পচা ভিত্তিকে উৎখাত করার আলোড়ন'[৪৩] তুলে প্রকাশিত হল 'কল্লোল'। বাংলা সাহিত্যে এল একটি যুগ-চেতনা। যাকে বলা হল 'কল্লোল-যুগ'। কোনো কোনো সমালোচক মনে করেন, কল্লোল যুগের শুরু থেকেই আধুনিক বাংলা কবিতারও যাত্রা শুরু।[৪৪] কারণ 'বাঙালি মধ্যবিত্ত শিক্ষিত তরুণ কবিগোষ্ঠী কবিতা সম্পর্কে তখন থেকেই নতুন ও স্বতন্ত্র ধ্যান ধারণায় উদ্বুদ্ধ হতে চেয়েছিলেন'[৪৫]।

একই বছরে অর্থাৎ ১৯২৩ সালেই প্রকাশিত হয় বাংলাদেশের শ্রমজীবীদের প্রথম মুখপত্র[৪৬] 'সংহতি'।

আবির্ভূত হলেন একদল গোষ্ঠীভূত তরুণ কবি ও কথাশিল্পী। তাঁরা মনে করলেন, 'এ যুগ অনেক লেখকের — একজনের নয় — কয়েকজন কবির'[৪৭]। তাঁরা একক রবীন্দ্রনাথের প্রভুত্ব অস্বীকার করলেন। কারণ 'রবীন্দ্রনাথের কবিতার চর্চা আধুনিক বাঙালী কবির তেমন মন যোগাত না'[৪৮]। ফলে 'যারা আধুনিক বিশিষ্ট বাঙালী কবি

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাথকে তারা বিস্পষ্ট সম্ভ্রমে প্রণাম জানিয়ে মালার্মে ও পল ভারলেন, রসাঁর ও ইয়েটস ও এলিয়ট-এর সদর্থক বা নঙর্থক মননবিচিত্রতার কাছে গিয়ে দাঁড়াল'[৪৯]।

'কল্লোল' ছাড়াও এ সময় সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে 'লাঙ্গল' (১৯২৫ — পরিবর্তিত হয়ে 'গণবাণী' ১৯২৬), 'কালি-কলম' (১৯২৬), 'প্রগতি' (১৯২৭), 'ধূপছায়া' (১৯২৭) প্রভৃতি। এসব সাহিত্য পত্রিকাকে ঘিরে অর্থাৎ 'কল্লোল-সংহতি-কালিকলম-প্রগতি-ধূপছায়া' ইত্যাদি অনেকগুলো পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে লেখক-সমবেশ ঘটে তাঁরা একত্রে 'কল্লোলগোষ্ঠী' নামে খ্যাত হয়েছিলেন। এবং এঁরাই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিরিশের দশকের লেখক হিসেবে পরিচিত। 'কল্লোলগোষ্ঠী'র লেখকদের মধ্যে যাঁরা সাহিত্যকীর্তিতে উজ্জ্বল হয়ে আছেন, তাঁদের মধ্যে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০), জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪), অজিত কুমার দত্ত (১৯০৭-১৯৭৯), অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৬), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮), বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২), যুবনাশ্ব [মণীষ ঘটকের ছদ্মনাম] (১৯০১-১৯৮০), তরাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। একটু লক্ষ করলেই দেখা যায় এ সকল 'বিশিষ্ট লেখক কিংবা যাঁরা তাঁদের সমকালীন' তাঁদের প্রায় সবার জন্মকাল 'মোটামুটিভাবে ১৯০০ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে'। অর্থাৎ 'কল্লোল' যখন আত্মপ্রকাশ করে তখন এঁদের অনেকেরই বয়স পনের থেকে পঁচিশ বছর।[৫০] এসব লেখকের শৈশব থেকে যৌবন-অব্দি বেড়ে ওঠার সেই সময়টা ছিল নানান ভাঙা-গড়ার সংগ্রামে আন্দোলিত। বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫-১৯১১) আন্দোলন থেকে শুরু করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৯), অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০) পর্যন্ত (বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এ অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায় : প্রথম পরিচ্ছেদের 'বিশ্বযুদ্ধোত্তর বৈশ্বিক ও দৈশিক প্রেক্ষাপট' অংশে) একের পর এক ঘটনার আবর্তে তাঁদের মানসিক পটভূমি হয়ে পড়েছিল বিপর্যস্ত। আশা-হতাশার দোলাচালে দেশের যুবচিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছে বারবার। 'সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম, নৈতিক চেতনা — এক কথায় সমগ্র জীবন সম্পর্কে এক সংশয়পীড়িত' অবস্থা থেকে উত্তরণের আশায় তারুণ্যের দুরন্ত আবেগে তাঁরা চেয়েছে পুরোনো মূল্যবোধ ভেঙে নতুন জীবনবোধের মন্ত্রে উজ্জীবিত হতে। যুবসমাজের এ মানসিক অবস্থাকে গোপিকানাথ রায়চৌধুরী বর্ণনা করেছেন এভাবে :

> একদিকে হতাশা-অবিশ্বাস অনিশ্চয়তা বাঙালী যুবচিত্তকে ক্রমশ ঘিরে ধরেছে। অন্যদিকে সবকিছুকে অস্বীকার করে এক নতুন মূল্যবোধে জীবন গড়ে তোলার তীব্র পিপাসা তাকে উচ্চকিত করেছে।[৫১]

তাই বন্ধন মুক্তির আশায় বাঙালি তরুণ লেখকসমাজ অনুপ্রাণিত হয়েছে যুদ্ধোত্তর ইউরোপীয় লেখকদের রচনাবলি পাঠে। কারণ 'যে রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের আবর্তে পড়ে এ-যুগের ক্রমউদ্ভিদ্যমান কৈশোর ও নবযৌবন-চেতনার অঙ্কুরগুলি নিষ্পিষ্ট হয়েছে, যে অস্থিরতা বিষণ্ণতা ও নাস্তিক্যবোধ তাদের চেতনাকে অপ্রকৃতিতস্থ করে তুলেছে, আবার আরেকদিকে যে চেতনা বিপ্লবী সমাজবাদী ভাবাদর্শ

ও অবচেতনাশ্রয়ী যৌনভাবনা'[৫২] তাদের উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলেছে, তা থেকে উত্তরণের কোনো ইঙ্গিত বা সান্ত্বনা প্রধানত রবীন্দ্রনাথ গৌণত তাঁদের অগ্রজ আধুনিক কবিদের কাব্যের মধ্যে তাঁরা পান নি। রবীন্দ্রনাথ তখনো উনিশ শতকীয় আদর্শনিষ্ঠা, মানুষ, প্রকৃতি ও ধর্মবিশ্বাসের প্রতি গভীর আস্থা নিয়ে কাব্য রচনায় মগ্ন, আর অগ্রজ কবিরা মত্ত রবীন্দ্র-বিরোধিতায়। তাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে রবীন্দ্রবলয় ভাঙার যে ধীর প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল, 'কল্লোলে'র আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে সে প্রচেষ্টা তীব্রতা পেল। কাব্যের বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গির ক্ষেত্রে এ যুগের কবিরা প্রচলিত ঐতিহ্যের বিরোধিতা করলেন। গদ্য ও পদ্যের মধ্যে ভাষাগত যে দূরত্ব ছিল তাকে দূর করে দিতে চাইলেন এবং কবিতায় আবেগের প্রাধান্য ঘুচিয়ে বুদ্ধির প্রাধান্য আনতে সচেষ্ট হলেন।

'কল্লোল-সংহতি-কালিকলম-প্রগতি-ধূপছায়া' ইত্যাদি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে 'কল্লোল-যুগের' প্রতিষ্ঠা, তার আয়ুষ্কাল মাত্র আট বছর (১৩৩০-১৩৩৭)।[৫৩] এই স্বল্পায়ু নিয়েও বাংলা সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি পরিবর্তনে নতুন নতুন প্রবণতার প্রবর্তন করেছিলেন কল্লোল-যুগের আত্মপ্রত্যয়ী তরুণ লেখকগোষ্ঠী। কিন্তু সাহিত্যের যে আধুনিকতার সন্ধানে তাঁরা সাধনা শুরু করেছিলেন এ সময় পরিসরে তা সম্পূর্ণ করায়ত্ত হয় নি। সেই সিদ্ধি করায়ত্ত হল সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'পরিচয়' (১৯৩১), সঞ্জয় ভট্টাচার্য, অজয় ভট্টাচার্যের 'পূর্বাশা' (১৯৩২), বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সমর সেনের 'কবিতা' (১৯৩৫) পত্রিকা আত্মপ্রকাশের পর। তাই এই লেখকগোষ্ঠী বিশের দশকে সাহিত্যচর্চা শুরু করলেও বা কারো কারো গ্রন্থ প্রকাশিত হলেও তিরিশের দশকেই তাঁরা প্রতিষ্ঠা পেলেন। এবং এঁদের কাব্যসাধনা কেবল তিরিশের দশকেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকল না — কবিতার ক্রমবিবর্তন ও অগ্রগতির ধারায় উত্তরকালে চল্লিশ-পঞ্চাশ-ষাট-সত্তর এমনকি আশির দশক পর্যন্ত বিস্তৃত হল। তাঁদের রচনায় 'ব্যাপকভাবে স্থান পেল যুগের অস্থিরতা, নীতিহীনতা, অবক্ষয়, প্রেম-সম্পর্কিত পরিবর্তিত ধারণা, সামাজিক ও রাজনৈতিক তিক্ত-অভিজ্ঞতা'[৫৪]। ফলে তাঁরা সমাজের কঠোর সমালোচনার পাশাপাশি আত্মনিয়োগ করলেন মানবকল্যাণের পথ অনুসন্ধানের।

কল্লোলগোষ্ঠীর কবিদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং রবীন্দ্রোত্তর কাব্য-আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা হচ্ছেন বুদ্ধদেব বসু। রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেই তাঁর কাব্য-সধনার সূচনা। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মর্মবাণী'-ই (১৯২৫) তার সাক্ষ্য। কিন্তু অচিরেই রবীন্দ্র-প্রভাবকে আত্মসাৎ করে স্বকীয় প্রতিভার বলে কবিতায় তিনি স্বাতন্ত্র্য হয়ে উঠলেন। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ "বন্দীর বন্দনা'য় (১৯৩০) তাঁর বলিষ্ঠ আত্মপ্রতিষ্ঠা, ভাবনা ও প্রকরণের অভিনব রূপান্তর, শব্দ-চয়নের উদ্ভাবনী প্রতিভা'[৫৫] তাঁকে আধুনিক কবি হিসেবে তরুণ পাঠক সমাজে প্রতিষ্ঠার স্বীকৃতি এনে দিল।

বুদ্ধদেব বসু প্রেমের কবি। তাঁর অধিকাংশ কাব্য যেমন : 'আমি চঞ্চল হে' (১৯৩৭), 'কঙ্কাবতী' (১৯৩৭), 'পরিক্রমা' (১৯৩৮), 'নতুন পাতা' (১৯৪০), 'দময়ন্তী' (১৯৪৩), 'দ্রৌপদীর শাড়ি' (১৯৪৮), 'শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর' (১৯৫৫), 'মরচে পড়া

Dhaka University Institutional Repository

পেরেকের গান' (১৯৬৬), 'স্বাগত বিদায় ও অন্যান্য কবিতা' (১৯৭১) প্রভৃতি গ্রন্থে প্রেমের কবিতারই প্রাধান্য। তবে প্রেমকে তিনি রাবীন্দ্রিক বিমূর্ত অতিন্দ্রীয়তা দ্বারা আচ্ছন্ন করেন নি, যুগধর্ম অনুসারে তিনি প্রেমকে দেখেছেন প্রত্যক্ষ, শরীরী রূপে। প্রেমের শরীরী অনুভূতিতে যে যৌন আকাঙ্ক্ষা জাগে— তাকে তিনি অস্বীকার করেন নি। তাইতো 'বন্দীর বন্দনা'য় যে গ্লানিবোধ ছিল, 'কঙ্কাবতী', 'নতুন পাতা' প্রভৃতি কাব্যে সে গ্লানি ঘুচিয়ে যৌনতাকে অবলম্বন করে ইন্দ্রিয়ঘন চিত্রকল্প সৃষ্টি করেছেন। 'দময়ন্তী', 'দ্রৌপদীর শাড়ি' প্রভৃতি কাব্যে অবশ্য প্রেমের ভোগতৃষ্ণা পরিত্যাগ করে কবি প্রেমের দর্শন রচনায় মন দিয়েছেন। তাঁর কবিতার অন্যতম লক্ষণ নগরচেতনা। তাঁর ভালবাসার প্রিয়তম নগরী কলকাতার ট্রাম-পেট্রোল-আলকাতরা, এরোড্রোম, এরোপ্লেন ইত্যাদি শব্দ কবিতায় উঠে এসেছে যন্ত্রসভ্যতার প্রতীক হিসেবে। আধুনিক কাব্যের বৈশিষ্ট্যানুযায়ী শব্দ বা চিত্রের পৌনঃপুনিক প্রয়োগে সম্মোহনজাল বিস্তার বা কথ্যরীতি ও কাব্যরীতির মিশ্রণের প্রয়োগও সর্থক হয়েছে তাঁর কবিতায়।

কবিতায় যেমন কথা সাহিত্যেও তেমনি প্রেমের বিচিত্র বর্ণরাগ রঙে রেখায় চিত্রিত করেছেন বুদ্ধদেব। আধুনিক শিক্ষিত নরনারীর জীবনে প্রেমের শরীরী তৃষ্ণা তাঁর কবি-কল্পনায় বিভিন্ন কবিতা-গল্প ও উপন্যাসে যেন বাণীরূপ পেয়েছে। মূলত তিনি এই আধুনিক যুগের নগরজীবনের অবক্ষয়পীড়িত যৌবনের বিচিত্র প্রবণতা ও যৌন আকাঙ্ক্ষার তীব্র যন্ত্রণাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন। আর তাই তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প 'রজনী হল উতলা'তে (কল্লোল, ১৩৩৩ জৈষ্ঠ্য সংখ্যা) জীবনের আদিম অন্ধ পিপাসার যে ছবি ফুটে উঠেছে— সে ছবি 'সাড়া' (১৯৩০), 'যেদিন ফুটলো কমল' (১৯৪০), 'একদা তুমি প্রিয়ে' (১৩৪১) প্রভৃতি গ্রন্থেও পরিস্ফুট। গোপিকানাথ রায়চৌধুরীর ভাষায় :

> প্রায় সমস্ত গল্পে-উপন্যাসে তিনি নিজেকেই উন্মোচিত প্রসারিত করেছেন। তিনি নিজেই তাঁর রচনার বিষয়। তাঁর এই আত্মপরিচয় মুখ্যত কবি হিসেবে, সূক্ষ্মরুচি বিদগ্ধ অথচ আবেগপ্রবণ সৌন্দর্যসন্ধানী এক শিল্পী হিসেবে। শিল্পীর এই সমস্ত চেতনাই তাঁর রচনায় সঞ্চারিত। সূক্ষ্ম-কবিস্বভাবের অন্তর্লীন সুবাস তাঁর সব গল্প-উপন্যাসে-পরিব্যাপ্ত। [...] এখানেই বুদ্ধদেবের আধুনিকতা।[৫৬]

বাংলা কাব্যসাহিত্যে বুদ্ধদেব বসুর পরিপূরক হিসেবেই যেন প্রেমেন্দ্র মিত্রের আবির্ভাব। কারণ বুদ্ধদেব ব্যক্তি জীবনের কবি— তাঁর সমস্ত কবিতা-গল্প-উপন্যাসে তিনি একান্ত ভাবেই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের কথা বলেছেন। অপরদিকে প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রথম থেকেই সামগ্রিক জীবনের কবি। 'আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের, /— মুটে মজুরের, /— আমি কবি যত ইতরের'।— এ ঘোষণার মধ্যদিয়েই জানান দিলেন তিনি সাধারণ মানুষের কবি। তাদের নিয়েই রচনা করবেন তিনি জীবনের জয়গান। আধুনিক কবিতার একটি বিশেষ লক্ষণ যে সাধারণ মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও সহানুভূতি— তা তাঁর সমগ্র কাব্য জীবনে যথাযথ আন্তরিকতার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। তিনি যথার্থ আধুনিক।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম প্রকাশিক কাব্যগ্রন্থ 'প্রথমা' (১৯৩২) থেকেই প্রেমেন্দ্র মিত্র স্বকীয়তা ও কাব্যকুশলতায় সুস্পষ্ট। এ কাব্যগ্রন্থের একদিকে 'বেনামী বন্দরে'র নির্বাসিতদের প্রতি যেমন গভীর সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি অন্যদিকে কামার-কুমোর-কুলি-মজুরের সঙ্গেও কবির একাত্মতা আছে। তাঁর 'ফেরারী ফৌজ' (১৯৪৮), 'সাগর থেকে ফেরা' (১৯৫৬), 'হরিণ চিতা চিল' (১৯৬০) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে বৃহত্তর পৃথিবীর মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার ছবির সঙ্গে সঙ্গে আছে যান্ত্রিক বিকলাঙ্গ সভ্যতার অস্তিত্বের দ্বন্দ্ব, সংক্ষুব্ধ অবস্থা থেকে উত্তরণের কথা। প্রেমেন্দ্র মিত্রের যুগচেতনাই তাঁকে সমাজসচেতন করেছে। তাইতো 'অথবা কিন্নর' (১৯৬৫), 'কখনো মেঘ' (১৯৬০) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে দেখি কবিচেতনায় সমাজের অসুস্থতা এবং যন্ত্রসভ্যতার যে রূপ বর্তমান ছিল; কবি তার অবসান কামনা করেছেন। 'নদীর নিকট' (১৯৭১)-এ আছে কবির যুগচেতনার ছবি। ১৯৬৮-'৭০ সালে বাংলায় যে যুববিক্ষোভ হয়েছিল, যে বিশৃঙ্খলাপূর্ণ আতঙ্ক মানুষের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল — সেসব চিত্রকে সুস্পষ্টভাবে এগ্রন্থে তিনি প্রকাশ করেছেন।

কথাসাহিত্যেও প্রেমেন্দ্র মিত্রের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর 'পাঁক' (১৯২৬), 'বেনামী বন্দর' (১৯৩০), 'পুতুল ও প্রতিমা' (১৯৩১), 'অফুরন্ত' (১৯৩২), 'বাঁকালেখা' (১৯৩৪), 'পঞ্চশর' (১৯৩৪), 'সপ্তপদী' (১৯৫৩) প্রভৃতি গল্প-উপন্যাসে বিধৃত আছে এক আত্মস্থ অস্ফুট কবি-জীবন-বোধের সাংকেতিক ব্যঞ্জনা। শ্রীভূদেব চৌধুরী মনে করেন, 'প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পের morbidity আসলে এক ভারসাম্যহীন অসুস্থ যুগজীবন-যন্ত্রণাকে নিজের মধ্যে ধারণ এবং বহন করার শৈল্পিক ফল-পরিণাম'। ... এবং সেজন্যেই 'তিনি যথার্থ কবি'[৫৭]। শ্রী সুকুমার সেন তাঁকে "আধুনিক" সাহিত্যিকদের উচ্চশ্রেণিতে স্থান দিয়ে বলেছেন,

> জীবনের সঙ্গে যুদ্ধে যাহারা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও জিতিতে পরিতেছে না তাহাদের ব্যর্থতাক প্রেমেন্দ্রবাবু গল্পে দীপ্তিমান্ করিয়াছেন, অথচ কোন আড়ম্বর অথবা ভাবুকতা নাই।[৫৮]

বস্তুত আধুনিকতার সমস্ত লক্ষণ যেমন : নগরকেন্দ্রিক যান্ত্রিকসভ্যতার অভিঘাত, জীবনের নৈরাশ্য ও ক্লান্তিবোধ, ঐতিহ্যসচেতনা, বিজ্ঞানচেতনা, সাম্যবাদী চিন্তাধারা, ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের প্রভাব, প্রথাগত নীতিধর্মে অবিশ্বাস, রবীন্দ্র বিরোধিতা — প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা-গল্প-উপন্যাসে বিপুল পরিমাণে উপস্থিত। তাই কোনো কোনো সমালোচক তাঁকে 'রবীন্দ্র যুগ ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণের'[৫৯] কবি বলে মনে করলেও অধিকাংশ সমালোচকের কাছে তিনি আধুনিক কবি[৬০] বলেই স্বীকৃত।

রবীন্দ্রময় বাংলা কবিতার জগৎকে অস্বীকার করে বাংলা কবিতায় সম্পূর্ণ নতুন জগৎ সৃষ্টি করলেন জীবনানন্দ দাশ। 'সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামের ক্ষণিক প্রভাবের কথা বাদ দিলে — তিনি যে মহাভারত থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রবাহিত তাঁর পূর্বজ স্বদেশীয় সাহিত্যের কোনো অংশের দ্বারা কখনো সংক্রমিত হয়েছিলেন বা কোনো পূর্বসূরীর সঙ্গে তাঁর একাত্মতাবোধ জন্মেছিল, এমন কোনো প্রত্যক্ষ পরিচয় তাঁর কাব্যে নেই বললেই চলে'।[৬১]

Dhaka University Institutional Repository

জীবনানন্দের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরা পালক' (১৯২৭)-এ সত্যেন্দ্রনাথ-নজরুলের দ্বারা প্রভাবিত হলেও তাঁর স্বাতন্ত্র্যের চিহ্ন লক্ষণীয়। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' (১৯৩৬)কে জীবনানন্দের 'প্রথম পরিণত গ্রন্থ' আখ্যা দিয়ে বুদ্ধদেব বসু বলেন, 'জীবনানন্দ দাশকে আমি আধুনিক যুগের একজন প্রধান কবি বলে মনে করি'[৬২]।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অসংগতি এবং পারিপার্শ্বিক অস্থিরতা এ সময় তাঁকে সমাজসচেতন ও ইতিহাসসচেতন হয়ে উঠতে সাহায্য করে। ক্ষুদ্র থেকে বৃহত্তর সমাজ, বৃহত্তর বিশ্বের প্রেক্ষাপটে তাঁর কাব্য ভাবনার রূপান্তর ঘটে। তাই 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র আনন্দচেতনা 'বনলতা সেন' (১৯৪২)-এ জীবন, সময়চেতনা কিংবা ইতিহাসবোধের দ্বারা আচ্ছন্ন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রক্তঝরা পরিবেশে কবির হৃদয়ে জেগেছিল গভীরতর জিজ্ঞাসা। এই জিজ্ঞাসা তাঁর কবিতার ভাষাকেও রূপান্তরিত করেছিল। কবিতায় প্রকৃতিচেতনার সঙ্গে ইতিহাসচেতনা, ইন্দ্রিয়চেতনা ও মৃত্যুচেতনা একাকার হয়ে ওঠে তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'মহাপৃথিবী' (১৯৪৪), 'সাতটি তারার তিমির' (১৯৪৮), 'রূপসী বাংলা' (১৯৫৭), 'বেলা-অবেলা-কালবেলা' (১৯৬১)-র কবিতাসমূহে। তাই 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র জগৎ থেকে 'সাতটি তারার তিমির' কিংবা 'বেলা-অবেলা-কালবেলা'র কবিতায় দেখি এক জীবন থেকে আরেক জীবনের দিকে গমন, বিশেষ করে 'অন্ধকার ও খারাপের দিক এবং অকল্যাণের সম্ভাবনা ও অমঙ্গলবোধ তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে— কদাচিত তিনি সেই আচ্ছন্নতা কাটাতে পেরেছেন'[৬৩]। সুতরাং আলোর জগত থেকে অন্ধকারের পথে তাঁর নিরুদ্দেশ যাত্রা। প্রেম থেকে কবি এসে পৌঁছেছেন অপ্রেমের জগতে— যেখানে মানবহৃদয়ের কাছে পুরোনো মূল্যবোধের কোনো দাম নেই।

জীবনানন্দ দাশের 'কাব্য বর্ণনাবহুল তাঁর বর্ণনা চিত্রবহুল, এবং তাঁর চিত্র বর্ণবহুল'। আর এই 'বর্ণনাকে পাঠকের মনে পৌঁছিয়ে দেবার বাহন তাঁর উপমা'[৬৪]। আবার বাক্-রীতিতে অনেকটা হপকিন্‌সের মতো গভীরভাবে ব্যঞ্জনাধর্মী[৬৫] হলেও কবিতার শরীর গঠনে জীবনানন্দ একেবারেই আধুনিক। চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে তাঁর যে স্বাতন্ত্র্য— পরিবেশনের ক্ষেত্রেও সেই স্বতন্ত্রতা তিনি প্রমাণ করেছেন। সে কারণেই 'কবিতার স্তবক বন্ধনে, ছন্দোবন্ধনে, শব্দ ব্যবহারে, অলঙ্কার প্রয়োগে, Logic-এর প্রয়োগ এবং মুদ্রাদোষের বৈশিষ্ট্যে, চিত্রকৌশলে জীবনানন্দ অনন্য'[৬৬]।

জীবনানন্দ দাশের মতো বাংলা কাব্য জগতে সুধীন্দ্রনাথ দত্তও নিজের স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। জীবনানন্দের কবি-প্রাণের উৎস যেমন রূপসী বাংলা, তেমনি সুধীন্দ্রনাথের কবি-স্বাতন্ত্র্যের মূলে ইংরেজি ও ফরাসি কবিতার অনুপ্রেরণা। একদিকে সমকালীন নানান ঘটনা, অন্যদিকে পাশ্চাত্য-সাহিত্যের প্রত্যক্ষ-প্রভাবে তাঁর মানসিকতার উৎসমুখ যেমন উন্মুক্ত করে দিয়েছে, তেমনি বাংলা কাব্যধারায় সৃষ্টি হয়েছে এক নতুন রীতির। 'অতি সাবধানে কথার পর কথা সাজিয়ে কবিতাকে গঠন করেন তিনি; তাঁর মন তার্কিকের-তাত্ত্বিকের, গদ্যের ন্যায়সম্মত ধরনটা তিনি কবিতায় প্রয়োগ করেছেন'।[৬৭] বস্তুত সময় সচেতনতা ও অনেক জানার বেদনা তাঁকে অনবরত

Dhaka University Institutional Repository

যন্ত্রণাদগ্ধ করেছে। ফলে তাঁর 'তন্বী' (১৯৩০), 'অর্কেস্ট্রা' (১৯৩৫), 'ক্রন্দসী' (১৯৩৭), 'উত্তর ফাল্গুনী' (১৯৪০), 'সংবর্ত' (১৯৫৬), 'দশমী' (১৯৫৬) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের কবিতায় চেতনার অন্তরালে অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দের কাঠিন্য থাকলেও প্রেমচেতনা ও প্রকৃতিচিন্তায় এক ধরনের যন্ত্রণার অভিপ্রকাশ ঘটেছে।

সুধীন্দ্রনাথের অনেক কবিতায় নাগরিক জীবনের বিলাস-বৈভব-উন্নাসিকতা, সূক্ষ্মরুচি ও বিচিত্র কামনা-বাসনার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে তিনি ছিলেন নৈরাশ্যবাদী। তাঁর নঞর্থক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ঈশ্বর, প্রেম ও রাজনীতির চেয়ে এই বাস্তব পৃথিবীকে জেনেছেন তিনি একমাত্র সত্য বলে — যদিও কবি সেখানেও দেখেছেন অস্বাস্থ্য ও নরকের প্রতিচ্ছবি। তবে 'সব মিলিয়ে কবি সুধীন্দ্রনাথ একালের কাব্য-রচনার ক্ষেত্রে একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব; মেধা ও মনীষা এবং সচেতন কারুকৃতি যে-ব্যক্তিত্বের অন্যতম, কিংবা প্রধানতম অবলম্বন। এবং সে-কারণেই জীবনানন্দের মতো সুধীন্দ্রনাথের অনুসরণ সহজ হবে কি-না সন্দেহ'[৬৮]।

টি. এস. এলিয়ট ও এজরা পাউন্ডের অনুসরণে কবিতার চর্চা করতে গিয়ে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মতো বিষ্ণু দে'ও তাঁর কবিতাকে দুর্বোধ্য করে তুলেছেন। প্রখ্যাত সমালোচক ড. অশোককুমার মিশ্রের ভাষায়, 'আধুনিক কবিদের মধ্যে দুর্বোধ্য অভিযোগে যে কবি সর্বাপক্ষা বেশি অভিযুক্ত তিনি এযুগের বিতর্কিত কবি বিষ্ণু দে'[৬৯]। তবে 'তিরিশের যুগে বাংলা কবিতার মৌলিক রচনা গুণে যাঁরা খ্যাতি লাভ করেছিলেন বিষ্ণু দে তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট'[৭০]।

বিষ্ণু দে বুদ্ধদেব-জীবনানন্দ দাশের সমকালে কাব্যচর্চা শুরু করলেও তাঁর কাব্যসাধনার ব্যাপ্তি আশির দশক পর্যন্ত। জীবনের প্রায় শেষদিন পর্যন্ত তিনি কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর সৃষ্টির প্রাচুর্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাব্যগুলো হচ্ছে — 'উর্বশী ও আর্টেমিস' (১৯৩৩), 'চোরাবালি' (১৯৩৭), 'পূর্বলেখ' (১৯৪১), 'অন্বিষ্ট' (১৯৫০), 'সাতভাই চম্পা' (১৯৪৪), 'সন্দীপের চর' (১৯৪৭), 'নাম রেখেছি কোমল-গান্ধার' (১৯৫৩), 'আলেখ্য' (১৯৫৮), 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ' (১৯৬০), 'সংবাদ মূলত কাব্য' (১৯৬১), 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ (১৯৬৩), 'সেই অন্ধকার চাই' (১৯৬৮), 'ইতিহাসে ট্রাজিক উল্লাসে' (১৯৭০), 'ঈশবাস্য দিবা নিশা' (১৯৭৪), 'চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর' (১৯৭৫), 'উত্তরে থাকো মৌন' (১৯৭৭), 'আমার হৃদয়ে বাঁচো' (১৯৮০)।

কাব্যসাধনার শুরু থেকেই বিষ্ণু দে বুঝেছিলেন শুধু রবীন্দ্র-বিরোধিতায়ই বাংলা কাব্যের মুক্তি সম্ভব নয়। বাংলাকাব্যের মুক্তি ঐতিহ্য-সচেতনায়। তাই তিনি অত্যন্ত সচেতনভাবেই পাশ্চাত্য ও দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর কবিতায় গ্রিক পুরাণের পাশে ভারতীয় পুরাণ, পিকাশো-বিঠোফেনের সাথে কালিদাস-রবীন্দ্রনাথ-যামিনী রায় সমান মর্যাদায় স্বীকৃত। কাব্যজীবনের প্রথম পর্বে প্রেমের যে ক্ষণিক ও নশ্বররূপ বিষ্ণু দে'র কবিতায় চিত্রিত হয়েছিল, সাম্যবাদের আদর্শ গ্রহণ করার পর সেই প্রেমের বলিষ্ঠ রূপায়ণে তিনি সচেষ্ট হয়েছেন। এ পর্যায়ে তাঁর কবিতায় প্রেম-প্রকৃতি ও বিপ্লব

Dhaka University Institutional Repository

মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। সাম্যবাদের আদর্শ কবিতাকে এতটাই অনুপ্রাণিত করেছে যে তাঁর কবিতায় ক্লান্তি ও নৈরাশ্যের পরিবর্তে প্রচণ্ড আশাবাদ ব্যক্ত হয়েছে।

বিষ্ণু দে নাগরিক কবি। আধুনিক নগর জীবনের বিভিন্ন সমস্যা, হতাশাক্লিষ্ট জীবন, পরাধীনতার গ্লানি ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, নীতিহীনতা, অবক্ষয়ী মূল্যবোধ, বেকারত্ব, অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা, রাজনৈতিক সংকট প্রভৃতি তাঁর কবিতায় ব্যাপকভাবে স্থান লাভ করেছে। তাঁর বেশির ভাগ কবিতাই জটিল ও অপ্রচলিত শব্দের অত্যধিক প্রয়োগে সাধারণের কাছে দুর্বোধ্য। তাঁর কবিতায় উদ্ধৃতি ও উল্লেখ এত বেশি যে অনেক সময় শিক্ষিতজনের কাছেও তা গোলকধাঁধার মতো লাগে। ফলে তাঁর কবিতার পাঠকসংখ্যা যেমন অল্প, তার ব্যবহারিক মূল্যও কম। তবে এ কথাও ঠিক যে, আধুনিকতায় তিনি অগ্রগণ্য, গীতিধর্মী প্রতীকী কবিতা রচনায় তাঁর দান অসামান্য। আর এখানেই তাঁর প্রতিভার যথার্থ পরিচয়।

রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থেকেও আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল কবি অমিয় চক্রবর্তী। কবিতার আঙ্গিক, শব্দচয়ন, প্রচলিত নানা শব্দের ব্যবহার, উচ্চারণের ভঙ্গি ও ধ্বনিতে তিনি তাঁর সমসাময়িক কবিদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সুধীন্দ্রনাথের মতো সংস্কৃতঘেঁষা শব্দ তাঁর কবিতায় যেমন কম, তেমনি জীবনানন্দ দাশের দেশজ ভাষা বা বিষ্ণু দে'র বিদেশী শব্দ-সমাবেশের দৃষ্টান্তও দুর্লভ। তাঁর অধিকাংশ কবিতার শব্দ যুক্তাক্ষর বর্জিত — সাধারণ পাঠকের পরিচিত। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তুও সমসাময়িক — সমকালীন যুগ, সমাজ, সাম্প্রদায়িকতা, যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের দুঃসহ চিত্র অত্যন্ত দরদের সঙ্গে তিনি অঙ্কন করেছেন।

প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'খসড়া' (১৯৩৮) প্রকাশের আগেই অমিয় চক্রবর্তী অনেকগুলো দেশভ্রমণ করে এসেছেন। তাই প্রথম গ্রন্থেই পাওয়া যায় বিশ্বপ্রেমের পরিচয়। এই বিশ্বপ্রীতির পরিচয় বিধৃত আছে তাঁর 'পারাপার' (১৯৫৩), 'পালাবদল' (১৯৫৫), 'ঘরে ফেরার দিন' (১৯৬১), 'হারানো অর্কিড' (১৯৬৬) প্রভৃতি কাব্যের কবিতায়। তিনি দেশের মানুষকে যেমন ভালবেসেছেন, তাদের বেদনাকে অনুভব করেছেন হৃদয়ে, তেমনি বিদেশীদের জন্যেও তিনি ভেবেছেন, ভালবেসেছেন। তাইতো, 'আফ্রিকার সাম্প্রতিক ঘটনা তাঁকে চিন্তিত করে, আমেরিকা প্রবাসী হয়েও ভিয়েতনামে মার্কিন বর্বরতাকে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিরোধ করা তিনি কর্তব্য মনে করেন'[৭১]।

অমিয় চক্রবর্তী তাঁর কবিতায় বিজ্ঞান চিন্তাকে গভীর দার্শনিক চিন্তার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ও বৈজ্ঞানিক চেতনা মিলিত হয়ে যে দর্শন পূর্ণ হয় তা তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অন্যান্য আধুনিক কবিদের মতো অমিয় চক্রবর্তীও মৃত্যু-সচেতন। তবে তিনি জৈবিক মৃত্যুর কথাই ভেবেছেন। তাঁর স্থির বিশ্বাস এই পৃথিবীতে এসে জগৎ সংসারে যে সাক্ষ্য তিনি রেখে গেলেন তার মৃত্যু নেই।

এ সময় আরো যাঁরা সাহিত্যচর্চার মধ্যমে বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে প্রতিষ্ঠা পান তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অজিতকুমার দত্ত মূলত প্রেমের কবি। তাঁর 'কুসুমের মাস' (১৯৩০),

Dhaka University Institutional Repository

'পাতাল কন্যা' (১৯৩৮), 'নষ্ট চাঁদ' (১৯৪৫), 'পুনর্ণবা' (১৯৪৬), 'জানালা' (১৯৫৯) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের কবিতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তিনি সমকালীন ঘটনা সংঘাতের চেয়ে অনুভূতির চিরকালীন প্রকাশকেই বড় করে দেখেছেন। তাঁর কবিতায় রবীন্দ্র-প্রভাবকে অতিক্রম করার প্রয়াস থাকলেও শেষ পর্যন্ত তিনি রবীন্দ্র-প্রভাবকেই স্বীকার করে নিয়েছেন।

'রবীন্দ্রদ্রোহিতাকে মূলধন করে উচ্চ চীৎকারে দশদিগন্ত কাঁপিয়ে তিরিশের দশককে মাতিয়ে দিয়েছিলেন'[৭২] অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। প্রেম ও প্রকৃতি হচ্ছে তাঁর কাব্যের মূল উপজীব্য। তবে সে প্রেম রাবীন্দ্রিক অতিন্দ্রীয় প্রেম নয়, সে প্রেম শারীরিক। তাঁর 'অমাবস্যা' (১৯৩০), 'আমরা' (১৯৩২), 'প্রিয়া ও পৃথিবী' (১৯৩৬), 'নীল আকাশ' (১৯৪৯), 'পূর্ব-পশ্চিম' (১৯৬৯) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের কবিতায় প্রিয়তমার দেহের প্রতি নিজের আকর্ষণের তীব্রতাকে অত্যন্ত সার্থকভাবে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন।

কবিতার মতো গল্প-উপন্যাসেও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর ব্যক্তি-সত্তাকে সঞ্চারিত করেছেন। বিন্যস্ত করেছেন নানা পরিবেশে, নানা চরিত্রে। সিগমন্ড ফ্রয়েড, হ্যাভলক এলিস প্রমুখের যৌনতত্ত্বের প্রভাবে তিনি কথাসাহিত্যে বিধৃত জীবনে বৈচিত্র্যের স্বাদ আনার জন্যে বেপরোয়াভাবে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর 'টুটাফুটা' (১৯২৮), 'আকস্মিক' (১৯৩০), 'বিবাহের চেয়ে বড়' (১৯৩১), 'ইতি' (১৯৩২), 'প্রাচীর ও প্রান্তর' (১৯৩৪), 'বেদে' (১৩৩৫), 'অকাল বসন্ত' (১৩৩৯), 'পলায়ন' (১৩৪৭), 'হাড়ি-মুড়ি-ডোম' (১৩৫০), 'মগের মুলুক' (১৩৫৮), 'একরাত্রি' (১৩৬৮) প্রভৃতি গল্প-উপন্যাসে তৎকালীন সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধ ও আদর্শবোধের বিরুদ্ধে অবাধ যৌন-চেতনার উল্লাসে জীবনের কুৎসিত, বীভৎস, দারিদ্র্যপিষ্ট, পাপ-পঙ্কিল চিত্রকে বর্ণময় করে তুলেছেন। গোপিকানাথ রায়চৌধুরী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কথাসাহিত্য সম্পর্ক মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন :

> রবীন্দ্রনাথ 'আধুনিক' তরুণ লেখকগোষ্ঠীর যে দুটি মুখ্য প্রবণতার আতিশয্যকে নিন্দা করে আখ্যা দিয়েছিলেন 'লালসার অসংযম' ও 'দারিদ্র্যের আস্ফালন'— সেই দুটি প্রবণতাই অচিন্ত্যকুমারের গল্প-উপন্যাসে বর্তমান। এই অর্থে তিনি খাঁটি 'আধুনিক' কালের শিল্পী।[৭৩]

বাংলা সাহিত্যে নতুন বস্তু, নতুন ভাষা, নতুন ভঙ্গি নিয়ে আবির্ভূত হন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০০-১৯৭৫)।[৭৪] কয়লাকুঠির সাঁওতাল-বাউড়ী-কুলি-কামিনদের ধাওড়ার অজ্ঞাত জীবনকথাকে তিনি আশ্চর্য কুশলতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর কথাসাহিত্যে। "কিন্তু কল্লোল-গোষ্ঠীর তরুণ লেখকদের গল্পে-উপন্যাসে যে যৌন-আচরণের চিত্র সেদিন অনেকের কাছেই 'অশ্লীল' বলে মনে হয়েছিল কয়লাকুঠির গল্পগুলিতে আদিম নরনারীর অনাবৃত জীবনের ছবিগুলিতে তা আদৌ মনে হয়নি।"[৭৫] তাঁর 'ঝড়ো হাওয়া' (১৩৩০), 'বাংলার মেয়ে' (১৩৩২), 'অতসী' (১৩৩২), 'নারীমেধ' (১৩৩৫), 'বধূবরণ' (১৩৩৬), 'দিনমজুর' (১৩৩৯), 'আকাশ-কুসুম' (১৩৪১), 'বন্ধু প্রিয়া' (১৩৪৫), 'ভালবাসার নেশা' (১৩৬৫), 'মনের মত গল্প' (১৩৬৭), 'মিতে

Dhaka University Institutional Repository

মিতিন' (১৩৬৭) ইত্যাদি গল্প-উপন্যাসে আদিম মানব-মানবীর জীবনাচরণের স্থূল অসংস্কৃত বলিষ্ঠ রূপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংগতি রেখেই তিনি তাদের উদ্দাম যৌন-চেতনার চিত্র এঁকেছেন। জীবনদৃষ্টির এই সুকঠিন সামগ্রিকতাই বাংলাসাহিত্যে শৈলজানন্দের অভিনব দান।[৭৬]

'উত্তর-শরৎচন্দ্র যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক' তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর আবির্ভাব চতুর্থ বর্ষ 'কল্লোল'-এ 'রসকলি' গল্পের মাধ্যমে। শৈলজানন্দের পথ অনুসরণ করেই তিনি তাঁর দেশ দক্ষিণ-পূর্ব বীরভূমের সাধারণ লোকের জীবন — পুরোনো জমিদারদের কাহিনী রচনায় অবতীর্ণ হন। 'রাঢ় অঞ্চলের প্রকৃতি, মানুষ, সমাজ ও সংস্কৃতি তাদের সমস্ত রূপ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে তারাশঙ্করের কাহিনীর মধ্যে আবির্ভূত এবং সমগ্র কাহিনীর রসাবেদনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত'।[৭৭] তাঁর 'ছলনাময়ী' (১৯৩৬), 'জলসাঘর' (১৯৩৭), 'চৈতালী ঘূর্ণি' (১৯৩১), 'রাইকমল' (১৯৩৫), 'রসকলি' (১৯৩৮), 'ধাত্রীদেবতা' (১৯৩৯), 'গণদেবতা' (১৯৪২), 'পঞ্চগ্রাম' (১৯৪৩), 'হারানো সুর' (১৯৪৫), 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' (১৯৪৭) প্রভৃতি গল্প-উপন্যাসই পল্লী-জীবনাশ্রয়ী আঞ্চলিক চেতনাপুষ্ট বাস্তব অথচ বিচিত্র স্বাদী রসসাহিত্য হিসেবে খ্যাত। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে মন্তব্য করে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন :

> বোধহয় রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে তাঁর মতো এত দক্ষতার সঙ্গে ছোটগল্পের সীমাবদ্ধ আঙ্গিকের মধ্যে আর কেউ বিশাল বিচিত্র জীবনকে ফুটিয়ে তুলতে পারেনি। [...] সমগ্রভাবে বিচার করলে তাকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অর্থাৎ উত্তর-শরৎচন্দ্র যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বলতে হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।[৭৮]

'পটলডাঙার পাঁচালি'কার মণীশ ঘটক (যুবনাশ্ব যাঁর ছদ্মনাম)-ই 'কল্লোলে'র 'প্রথম মশালচী' যিনি 'সাহিত্যের নিত্যক্ষেত্রে এমন সব অভাজনকে ডেকে আনলেন যা একেবারে অভূতপূর্ব'[৭৯]। তাঁর একমাত্র গল্প-সংকলন 'পটলডাঙার পাঁচালী' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালে। কিন্তু এর গল্পগুলো 'কল্লোলে'র পৃষ্ঠায় প্রথম ছাপা হয়। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে লিখেছেন :

> "কল্লোলে" আত্মপ্রকাশ করে সে যুবনাশ্বের ছদ্মনাম নিয়ে। সেদিন যুবনাশ্বের অর্থ যদি কেউ করত 'জোয়ান ঘোড়া' তাহলে খুব ভুল করত না, তার লেখায় ছিল সেই উদ্দীপ্ত সরলতা। কিন্তু এমন বিষয় নিয়ে সে লিখতে লাগল যা মান্ধাতার বাপের আমল থেকে চলে এলেও বাংলাদেশের 'সুনীতি সংঘের' মেম্বাররা দেখেও চোখ বুজে থাকছেন। এ একেবারে নতুন সংসার, অধন্য ও অকৃতার্থের এলাকা। কানা খোড়া ভিক্ষুক গুণ্ডা চোর আর পকেটমারের রাজপাট। যত বিকৃত জীবনের কারখানা।[৮০]

বস্তুত সমস্ত 'পটলডাঙার পাঁচালী' ভরে ক্ষুধার্ত, দরিদ্র, পঙ্গু, বিকৃত-দেহ মানুষের মিছিল চলেছে। দেখে মনে হয় এরা যেন মানুষের বীভৎস শরীরের আবরণে জীবন্ত হিংস্র পশু এক-একটা। তাঁর 'গোষ্পদ', 'কালনেমি', 'রাতবিরেত', 'মৃত্যুঞ্জয়', 'মন্থশেষ', 'ভূখা ভগবান', 'দুর্যোগ' প্রভৃতি গল্পে তিনি মানুষের ইতিহাসে অন্ধকারের বিষাক্ত চোরা গলিতে যে নিষিদ্ধ জগত স্বাভাবিক নিয়মে আবৃত — তার আব্রুর দেয়াল ভেঙে তছনছ করেছেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাই লিখছেন,

Dhaka University Institutional Repository

> যুবনাশ্বের ঐসব গল্পে হয়তো আধুনিক অর্থে কোনো সক্রিয় সমাজ সচেতনতা ছিল না, কিন্তু জীবন সম্বন্ধে ছিল একটা সহজ বিশালতাবোধ। ... অন্তত এই অগ্রদৌত্যের দিক থেকে এই গল্পগুলি সাহিত্যের ইতিহাসে গণনীয় হয়ে থাকবে। এরাই বাংলা সাহিত্যে নতুন আবাদের বীজ ছড়ালে।[৮১]

'কল্লোলের কুলবর্ধন' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬) প্রথম আবির্ভাব ঘটে 'বিচিত্রা'র পাতায় 'অতসী মামী' গল্পের মাধ্যমে।[৮২] 'কল্লোলে'র 'উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা' যখন পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া থেকে বিলুপ্ত, তখন বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জীবন আর সাহিত্যের সাধনায় ব্রতী হলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্র। বৈজ্ঞানিকের মতোই ছিল তাঁর মন ও দৃষ্টিভঙ্গি। আর লেখক হওয়ার জন্যে অতি প্রয়োজনীয় উপাদান মানুষ সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে ছিলেন ছোটবেলা থেকেই। কিন্তু তাঁর সে অভিজ্ঞতায় প্রচুর ফাঁক ছিল। কারণ মানিক জানতেন না মানুষের ব্যক্তিজীবন ও সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে নরনারীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, শারীরিক ও মানসিক সম্পর্ক, বিশেষত যৌন সম্পর্ক। একটা ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে যা বাদ দিয়ে বা এড়িয়ে বস্তুনিষ্ঠ সাহিত্য রচনা সম্ভব নয়। তাই তিনি এ বিষয়ে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও তাঁর জ্ঞাত তথ্যের স্বল্পতা পূরণার্থে দ্বারস্থ হলেন ফ্রয়েডের কাছে। তাঁর প্রথম দিকে লেখা 'অতসী মামী' (১৯৩৫), 'দিবারাত্রির কাব্য' (১৯৩৫), 'জননী' (১৯৩৫), 'পুতুল নাচের ইতিকথা' (১৯৩৬), 'প্রাগৈতিহাসিক' (১৯৩৭), 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬), 'সরীসৃপ' (১৯৩৮) প্রভৃতি গল্পগ্রন্থ ও উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তিনি বাস্তবের সঙ্গে ভাবপ্রবণতার সংঘাত উত্তরণের পথে এগিয়ে চলেছেন। এ সময়ে রচিত তাঁর সাহিত্যে আধুনিক নরনারীর মনোলোকের দুর্গম-জটিল রহস্য অনেকখানি উন্মোচিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যায় 'সহরতলী' (১৯৪০), 'চতুষ্কোণ' (১৯৪২), 'প্রতিবিম্ব' (১৯৪৩), 'বৌ' (১৯৪৩) প্রভৃতি উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থের গল্পগুলোতে। তবে অচিরেই মানিক আবিষ্কার করলেন যে ফ্রয়েডের তত্ত্ব দিয়ে বাঙালি সমাজের সব ঘটনার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। এ সময়ই তিনি মার্কসবাদের সংস্পর্শে এসে নবচেতনায় ব্যক্তিগত পর্যায় ছেড়ে শ্রেণিগত পর্যায়ে স্থানান্তরিত হলেন। সরোজমোহন মিত্রের ভাষায় :

> মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচয়ের পর মানিকের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। তার লেখায় যে ভ্রান্তি, মিথ্যা আর অসম্পূর্ণতার ফাঁকি ছিল তাকে স্পষ্ট এবং আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করলেন। ... তিনি নিজেকে ছড়িয়ে দিলেন প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের মধ্যে, ছাত্রদের মিছিলে, কৃষকের তেভাগা আন্দোলনে, রাজনৈতিক কর্মীদের উপর সরকারী নির্যাতনের প্রতিবাদ সভায়, আইন অমান্য আন্দোলনে, গ্রামে শহরে, দূর-দূরান্তে বিভিন্ন সাহিত্য-সংস্কৃতির সভায়।[৮৩]

বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন তিনি। তাই 'সহরতলী' উপন্যাসে যশোদা একক চেষ্টায় যা পারে নি 'দর্পণে'র, রম্ভা, বীরেশ্বর, মহীউদ্দীন, শম্ভু তাকেই সার্থক করে তুলল। অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে তিনি এ উপন্যাসে সংগ্রামের নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। এরই ধারাবাহিকতা দেখি 'চিহ্ন', 'স্বাধীনতার স্বাদ' (১৯৫১), 'আরোগ্য' (১৯৫৩) প্রভৃতি

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাসে। ১৯৪৬ থেকে ১৯৫০-এর মধ্যে পূর্ববাংলা থেকে যেসব উদ্বাস্তু তাদের সহায়-সম্বল হারিয়ে পশ্চিম বাংলায় চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল, তাদের জীবনযাত্রার বাস্তবচিত্র এঁকেছেন মানিক 'সোনার চেয়ে দামী' (১৯৫১), 'সার্বজনীন', 'আজ কাল পরশুর গল্প' (১৯৪৬), 'পরিস্থিতি' (১৯৪৬) প্রভৃতি উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থের গল্পসমূহে। সরোজমোহন মিত্র তাই বলেন :

> যুদ্ধ, দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, দেশভাগ, স্বাধীনতা, আশাভঙ্গে জনতার ক্রমবিক্ষোভ সবগুলোকেই মানিক বৈজ্ঞানিক সমাজ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। নানা ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জরিত মানুষের মর্মবেদনার কাহিনী যেমন তিনি একদিকে অপূর্ব দরদ এবং দক্ষতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন অন্যদিকে তিনি শোষণ মুক্তির দৃঢ় প্রত্যয়ে পথনির্দেশ করেছেন। তাঁর রাঘব মালাকার, যাকে ঘুষ দিতে হয়, নমুনা, শিল্পী, কংক্রিট, প্রাণের গুদাম প্রভৃতি অসংখ্য গল্পে বিষয় বিন্যাসে মানিক যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তাতে তিনি বিশ্ব সাহিত্যের যে কোন ছোটগল্প লেখকের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারেন।[৮৪]

একথা তাঁর সমগ্র কথাসাহিত্য সম্পর্কেও যথোপোযুক্ত বলেই মনে হয়।

এছাড়াও তিরিশের দশকের প্রতিনিধিত্বকারী সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্নদাশঙ্কর রায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় [বনফুল যাঁর ছদ্মনাম] (১৮৯৯-১৯৭৯), হেমচন্দ্র বাগচী, দীনেশরঞ্জন দাশ, হুমায়ুন কবির (১৯০৬-৬৯) প্রমুখের নাম স্মরণযোগ্য। এঁরা সকলেই বাংলা সাহিত্যকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সমাজপ্রেক্ষাপটগত পরিবর্তনের ধারায় রাবীন্দ্রিক কাব্যবলয়ের অমোঘ আকর্ষণের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় আধুনিকতার পথে যাত্রা শুরু করে সার্থকতার পর্যায়ে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই পরবর্তী দশকের সাহিত্যিকদের রচনায় শোনা গেল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সুরের অনুরণন।

চল্লিশের দশক হচ্ছে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা আর যুদ্ধান্তের বিধ্বস্ততার দশক। সমস্ত দেশজুড়ে এ সময় চলেছে তীব্র আকাল ও অস্থিরতা। সুমিতা চক্রবর্তী তাই যথার্থই বলেছেন :

> বাংলা কবিতার ধারায় চল্লিশের দশক যতটা বাস্তব অর্থে ইতিহাসের আলোড়নকে ধারণ করেছে তেমন বোধহয় অন্য কোনো সময়ে দেখা যায় না।[৮৫]

'বাংলা কবিতায় চল্লিশের দশক ১৯৩৭ থেকে ১৯৫০ এই তেরো-চৌদ্দ বছর ধরেই বিস্তৃত'।[৮৬] সেজন্যে এই দশকের আলোচনা একটু বিস্তৃত হওয়া দরকার।

তিরিশের দশকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে যে সংকট ঘনিয়ে উঠেছিল, চল্লিশের দশকে সেই সংকট আরো তীব্র হয়ে উঠল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সমগ্র বিশ্বজুড়ে যে ত্রাসের আবহাওয়া কাঁপিয়ে দিচ্ছিল সচেতন মানুষের মন, তা স্পষ্ট দৃশ্যমান হল তিরিশের মাঝামাঝিতে ইউরোপে ভয়ংকর ফ্যাসিস্ট শক্তির উত্থানের মাধ্যমে। ১৯৩৫ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত হল ফ্যাসিস্ট বিরোধী বিশ্ব সম্মেলন। ১৯৩৬-এ স্পেনে ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে এবং গণতন্ত্রী সরকারের পক্ষে বিভিন্ন দেশের লেখক-কবি-বুদ্ধিজীবীর সমন্বয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক বাহিনী প্রত্যক্ষ যুদ্ধে লিপ্ত হলে লোরকা, কডওয়েল, র‍্যালফ ফক্স প্রমুখ সাহিত্যিক মৃত্যুবরণ করেন। এ পরিস্থিতিতে ১৯৩৬ সালেই ভারতে 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৭ সালে

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'প্রগতি লেখক সংঘ'। ঐ একই বছরে ফ্যাসিস্ট বিরোধী ও মার্কসপন্থী পত্রিকা হিসেবে 'পূর্বাশা'র দ্বিতীয় পর্যায় প্রকাশিত হয়। ১৯৩৮-এ ঢাকাতে গড়ে ওঠে 'কমিউনিস্ট পাঠচক্র' ও 'প্রগতি পাঠাগার'। ১৯৪০-এ উদ্বোধন হয় ঢাকার 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘে'র এবং এই সংঘের পক্ষ থেকে সে বছরই প্রকাশিত হয় প্রথম সাহিত্য সংকলন 'ক্রান্তি'। ১৯৪২ সালে ঢাকায় তরুণ কমিউনিস্ট কর্মী ও লেখক সোমেন চন্দ জাতীয়তাবাদী একদল হিংস্র ব্যক্তির হাতে নির্মমভাবে নিহত হলে 'প্রগতি লেখক সংঘে'র নাম বদলে রাখা হয় 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'। ১৯৪৩ সাল থেকে এই সংগঠনের মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হতে থাকে 'প্রতিরোধ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা।

১৯৩৯ সালে ঘটে অনেকগুলো ঘটনা। জানুয়ারি মাসে বামপন্থী মাসিক পত্রিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে 'অগ্রণী'।[৮৭] সেপ্টেম্বরে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। সেই যুদ্ধের মারাত্মক কুফল ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র পৃথিবীময়। ভারতবর্ষেও তার প্রতিক্রিয়া হয়।

তিরিশের দশকে ভারতের অর্থনৈতিক বিপর্যয়, বেকারত্ব বৃদ্ধি, অন্ন-বস্ত্রের তীব্র সংকটের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের যে চেতনা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ছিল — দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়াতে তা নতুন গতি পেল। এ বছরের নভেম্বরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মুম্বাইয়ের সূতাকল শ্রমিকদের নিয়ে পালন করে যুদ্ধ বিরোধী সাধারণ ধর্মঘট। মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করে কংগ্রেস। সুভাষ বসু কংগ্রেস ত্যাগ করে গঠন করেন 'ফরোয়ার্ড ব্লক'। এবং বছরের শেষ দিকে উত্তর বঙ্গের জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ফসলের অর্ধেক পাওয়ার দাবিতে শুরু হয় কৃষকদের 'আধিয়ার আন্দোলন'।[৮৮] ১৯৪১ সালও নানা কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। 'অনাক্রমণ চুক্তি' ভঙ্গ করে হিটলার এ বছরে রাশিয়া আক্রমণ করলে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এ যুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' হিসেবে আখ্যায়িত করে এবং '৪১-এ কলকাতায় ও '৪২-এ ঢাকায় 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি' নামক একটি সংগঠন গড়ে তোলে।[৮৯] '৪১-এর এপ্রিল মাসে ঢাকা ও রায়পুরা থানায় ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংগঠিত হলে সমগ্র ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।[৯০]

১৯৪২ সালে ক্রিপস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ও 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের প্রচণ্ড ঝড়ে সারা ভারতে যে তাণ্ডবের সৃষ্টি হয় তাতে ব্রিটিশ সরকারের সেনাবাহিনীর হাতে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয় নয়শতাধিক স্বাধীনতাকামীর।[৯১] ঢাকাতে পুলিশের গুলিতে শুধু এক দিনেই মারা যায় ১৭ জন।[৯২] ১৯৪২ সালের যুদ্ধাতঙ্কগ্রস্থ কলকাতার নানান চিত্র তুলে ধরা আছে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কয়েকটি চিঠিতে।[৯৩]

১৯৪৩ সাল হচ্ছে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের কাল। 'সে মন্বন্তর খুব বেশি প্রকট হয়েছিল পূর্ব-সীমান্তের কাছাকাছি পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও কুমিল্লায় এবং ঢাকা ও বরিশালে এবং পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগণায়'।[৯৪] লক্ষ লক্ষ লোক বাঁচার তাগিদে শহরে এসে ভিড় করে এবং একটুখানি খাবার পাবার আশায় দুয়ারে দুয়ারে ধর্ণা দিয়ে পড়ে থাকে। জ্ঞান চক্রবর্তী লিখেছেন :

Dhaka University Institutional Repository

> "ফ্যান দাও ফ্যান" শব্দের করুণ ধ্বনিতে তখন শহরের সমস্ত রাস্তাঘাট অলিগলিতে বাতাস যেন কাঁদিতে থাকে। অনেক জায়গায়ই এ দৃশ্য দেখা যায় যে, অনাহারে অর্ধমৃত অবস্থায় কেহ পড়িয়া আছে; কুকুরে তাহাকে খাইতে আরম্ভ করিয়াছে, বাধা দেওয়ার কোন ক্ষমতা নাই। মৃত মাতার বুকের উপরে জীবন্ত শিশু পড়িয়া আছে।[৯৫]

সরকারি হিসাব মতে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জে প্রায় পাঁচলক্ষের মতো মানুষ অনাহারে মারা যায়।[৯৬] ১৯৪৩ সালেই সিংগাপুরে 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ' গঠন করেন সুভাষচন্দ্র বসু। এ বছরই প্রতিষ্ঠিত হয় 'গণনাট্য সংঘ'। তার ফলে বাংলার সংগীত, নাটক ও কবিতা হয়ে ওঠে গণমুখী।

১৯৪৫ সালে আমেরিকা জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে প্রথম পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। এ বছরের মে মাসে জার্মানির পরাজয়ের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। '৪৫-এর শেষ দিকে সমস্ত ভারতে এক গণসংগ্রামের জোয়ার ওঠে। কলকাতায় পুলিশের গুলিতে রামেশ্বর হত্যা, আজাদ হিন্দ্ ফৌজ দিবস, রশিদ আলি দিবসের প্রচণ্ড গণবিক্ষোভ, শ্রমিক ধর্মঘট, পুলিশ ধর্মঘট, নৌ-বিদ্রোহ প্রভৃতির মধ্যে যে ঝড়ের বীজ লুকানো ছিল তা কালবোশেখী আকারে সারা দেশের ওপর ফেটে পড়ল ১৯৪৬ সালে।

১৯৪৬ সাল ভারতবর্ষের ইতিহাসে সত্যিকার অর্থেই এক উত্তাল তরঙ্গের ইতিহাস। ১৯৪৫-এর নভেম্বর থেকে ১৯৪৬-এর জুলাই পর্যন্ত বিস্তৃত আন্দোলন-সংগ্রামের দিনগুলো জাতির জীবনে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। 'লড়াইয়ের আঁচে ঝলসানো' সেই দিনগুলোর যে দিনলিপি তৈরি করেছেন অমলেন্দু সেনগুপ্ত তার একটা ছক এখানে তুলে ধরা হল :

জানুয়ারি ১৯৪৬

১০ গ্রামে মিলিটারির অত্যাচারের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামে একলক্ষ লোকের শোভাযাত্রা।

১২ গোয়ালিয়রে শ্রমিকদের উপর গুলি চালনার ফলে ১৭ জন শ্রমিক নিহত ও ১৩০ জন আহত।

১৬ কলকাতায় ব্রেথওয়েট স্টীলের শ্রমিকদের উপর গুলি চালনার ফলে দুজন শ্রমিক নিহত ও কয়েকজন শ্রমিক আহত।

২৭ কোলার সোনার খনিতে কুড়ি হাজার শ্রমিকের ধর্মঘট শুরু।

ফেব্রুয়ারি

৭ বোম্বাইয়ে বিমান বাহিনীর ভারতীয় সদস্যদের অনশন ধর্মঘট।

১৩ কলকাতায় রশিদ আলি দিবসের শোভাযাত্রার উপর গুলিবর্ষণ। জনতা বনাম ব্রিটিশ পল্টনের খণ্ডযুদ্ধ। বার্মা থেকে বিমানযোগে আরও ব্রিটিশ সেনা কলকাতায় আনা হয়েছে।

১৬ মীরাটে রশিদ আলি দিবসে শোভাযাত্রীদের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণ।

১৭ বোম্বাইয়ে নৌ-সেনাদের ধর্মঘট শুরু।

২১ নৌ-সেনাদের ধর্মঘট করাচী, কলকাতা ও মাদ্রাজে বিস্তার।

২৩ ধর্মঘটী নৌ-সেনাদের সমর্থনে বোম্বাইয়ে সর্বাত্মক শ্রমিক ধর্মঘট — তিন লক্ষ শ্রমিকের অংশগ্রহণ — ব্রিটিশ সেনাদের বেপরোয়া গুলিবর্ষণে দু'শজন নিহত ও বহু আহত।

Dhaka University Institutional Repository

২৩ নৌ-সেনাদের ধর্মঘটের সমর্থনে মাদ্রাজে বিমান বাহিনীর সদস্যদের ধর্মঘট।

২৬ নৌ-সেনা ধর্মঘটের সমর্থনে ত্রিচীতে এক লক্ষ শ্রমিকের ধর্মঘট ও মাদ্রাজে পঞ্চাশ হাজার শ্রমিকের মিছিল।

২৮ মাদুরায় নৌ-সেনা ধর্মঘটের সমর্থনে হরতাল।

মার্চ

১ জব্বলপুরে স্থল-সেনাদের ধর্মঘট।

৫ বোম্বাইয়ে প্রাথমিক শিক্ষকদের ধর্মঘট।

৮ দিল্লীতে 'যুদ্ধজয় উৎসব'-বিরোধী মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণ— এগারোজন নিহত।

১৪ মুলুন্দ শিবিরে বন্দী নৌ-সেনাদের অনশন ধর্মঘট।

১৮ দেরাদুনে গোর্খা সৈন্যদের বিদ্রোহ।

১৯ এলাহাবাদে পুলিশদের অনশন ধর্মঘট।

২২ দিল্লীতে পুলিশদের অনশন ধর্মঘট।

২৩ রেশন কাটার প্রতিবাদে বেঙ্গল-আসাম রেলওয়ের শ্রমিকদের ধর্মঘট।

২৭ নারায়ণগঞ্জে ধর্মঘটী সূতাকল শ্রমিকদের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণ— চারজন শ্রমিক নিহত ও ষোলোজন আহত।

এপ্রিল

৩ বিহারে দশ হাজার পুলিশের ধর্মঘট।

৫ নিখিল ভারত রেলওয়ে মেনস্ ফেডারেশনের স্ট্রাইক ব্যালট গ্রহণ।

৬ বোম্বাইয়ে ধাঙ্গর ধর্মঘট।

২৯ ফরিদকোটে সত্যাগ্রহ শুরু।

মে

২ উত্তর-পশ্চিম রেলওয়ে শ্রমিকদের চারঘণ্টা প্রতীক ধর্মঘট।

৫ রেলওয়ে মেনস্ ফেডারেশন-এর ২৭ জুন থেকে ভারতব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৬ রামপুরে কৃষকদের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণের ফলে একজন নিহত ও কয়েকজন আহত।

২২ দক্ষিণ ভারতীয় রেলওয়ে শ্রমিকদের একদিনের প্রতিবাদ ধর্মঘট।

জুন

২১ কাশ্মীরে পণ্ডিত নেহরু গ্রেফতার।

২২ পণ্ডিত নেহরুর গ্রেফতারের প্রতিবাদে দেশজোড়া বিক্ষোভ।

২৪ অন্তর্বর্তী রিলিফের আশ্বাস পেয়ে রেলওয়ে মেনস্ ফেডারেশন ধর্মঘট প্রত্যাহার করলেন।

২৭ দেশীয় রাজ্য-পাতৌদিতে গুলি চালনা— পঁচিশ জন আহত।

জুলাই

৭ ইন্দোরের ছাব্বিশ হাজার শ্রমিক দাবি আদায় করলেন।

১১ সারা ভারত ডাক ধর্মঘট শুরু।

Dhaka University Institutional Repository

১৬ রতলামের (পাঞ্জাব) একলক্ষ কৃষক শোভাযাত্রীদের উপর গুলি বর্ষণের ফলে দশ জন নিহত ও তিরিশ জন আহত।
২৩ ডাক ধর্মঘটের সমর্থনে চার লক্ষ শিল্প-শ্রমিকের প্রতীক ধর্মঘট।
২৬ রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে কলকাতায় পনের হাজার ছাত্রের শোভাযাত্রা।
২৯ কলকাতা ও শহরতলীর চল্লিশ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষ ডাক-তার শ্রমিক ধর্মঘটের সমর্থনে সর্বাত্মক হরতাল ও ধর্মঘট পালন করেন।

১৯৪৬ সালের জুলাই পর্যন্ত অসংখ্য জঙ্গী লড়াইয়ের সমাবেশ — সমকালীন ইতিহাসের এক উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য। এবং তাতে সামিল শ্রমিক, ছাত্র, সেনাবাহিনী, পুলিশবাহিনী ও সমাজের অন্যান্য অংশের মানুষ। বোম্বাই ও করাচীর নৌ-বিদ্রোহীদের স্বল্প-মেয়াদী অথচ বীরত্বপূর্ণ লড়াই সূচনা করল এক নতুন অধ্যায়। বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের অধ্যায়। নৌ-বিদ্রোহীদের সাহস ও ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের দৃষ্টান্ত সেনাবাহিনীর অন্যান্য শাখাকে অনুপ্রাণিত করে। সেনাবাহিনী ও অসামরিক মানুষের মিলিত সংগ্রামের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনের শেষ প্রহর ঘনিয়ে আসে।[৯৭]

১৯৪৬ সালের আগস্টে কলকাতায় যে দাঙ্গা শুরু হয় তা ক্রমে ক্রমে সর্বভারতীয় রূপ পরিগ্রহ করে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিষে গোটা দেশ জর্জর হয়ে পড়ে। এ বছরের শেষ দিকে 'বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ কৃষক সংগ্রাম — যাহা তে-ভাগা আন্দোলন নামে খ্যাত — উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের কৃষকদের মধ্যে এক ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। তে-ভাগার দাবী ছাড়াও টংক প্রথা বিলোপের দাবী নিয়া ময়মনসিংহ-এ এবং নানকার প্রথা বাতিলের দাবী নিয়া সিলেটে এই সময়ে শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন গড়িয়া ওঠে।'[৯৮] এই সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতই চল্লিশের সাম্যবাদী কবিদের ভীষণভাবে উদ্দীপিত করে তুলল। তাঁদের কবিতায় দেখা দিল এর সমুজ্জ্বল প্রকাশ।

১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশও ভেঙে দু টুকরো হয়ে গেল। অর্থনীতিগত ও সংস্কৃতিগত অখণ্ড বাংলার রাজনৈতিক ব্যবচ্ছেদের ফলে মুষ্টিমেয় কিছু রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ছাড়া দু বাংলার শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীসহ সাধারণ মানুষের হৃদয়ও ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল।

১৯৪৭-৪৮-এ অর্থাৎ ভারত-পাকিস্তানের স্বাধীনতা লাভের পরপরই দুদেশের চরম সমস্যা হয়ে দেখা দিল উদ্বাস্তু সমস্যা। ১৯৪৮-এ স্বাধীন ভারতের পশ্চিম বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হলেও কমিউনিস্ট কর্মীরা থেমে থাকে নি। নানা অত্যাচার-নিপীড়নের মধ্যেও তাঁদের সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছেন। একই বছরে পূর্ব বাংলায় বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে শুরু হয় ভাষা আন্দোলন। ১৯৪৯ সালে নিরস্ত্র কমিউনিস্ট বন্দীদের গুলি করে হত্যা করার প্রতিবাদে ও অন্যান্য বন্দীদের মুক্তির দাবিতে শোভাযাত্রা করতে গিয়ে কলকাতায় পুলিশের গুলিতে নিহত হয় 'লতিকা-প্রতিভা-গীতা-অমিয়া' নামে চার মহিলা কর্মী। আত্মাহুতি দেয় গ্রামের গরিব ঘরের মেয়ে 'অহল্যা-সরোজিনী-বাতাসী ও উত্তমী'। এ ঘটনা সাম্যবাদী লেখক ও কবিদের প্রচণ্ডভাবে তোলপাড় করেছিল। ১৯৪৯ সালে পুনরায় ময়মনসিংহ ও সিলেটে দেখা দেয় টংক বিদ্রোহ। ১৯৫০ সালে ঢাকাতে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় প্রায় ১২শয়ের মতো

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু মারা যায়।[৯৯] এ ছাড়াও চল্লিশের দশকে মৃত্যুবরণ করেন রবীন্দ্রনাথ (১৯৪১), জিন্নাহ (১৯৪৮), গান্ধী (১৯৪৮), হিটলার (১৯৪৫), মুসোলিনি (১৯৪৫) প্রমুখ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখক-কবি ও রাজনীতিক।

'বাংলার প্রবীণ ও নবীন কবিসমাজ ছিলেন এই সমস্ত ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী, তাই তাঁদের মননে ও মানসে ঘটনাগুলির ছাপ'[১০০] পড়েছিল বেশ গভীর ভাবেই। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের ভাষায় :

> তিরিশের দশকের কবিতায় যে সময়ে আধুনিকতার সূত্রপাত ঘটেছিল, সে-সময়ে আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী সামাজিক মানুষকে স্পর্শ করলেও তাদের প্রাণসত্তাকে প্রত্যক্ষভাবে তেমন বিপদাপন্ন করেনি। কিন্তু পরবর্তী দশকে স্বদেশে বিদেশে জাতীয় আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর আবর্তে সাধারণ মানুষ তো বটেই কবি ও লেখকরাও কিছুটা দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন।[১০১]

বস্তুত তিরিশের শেষার্ধে ও চল্লিশের দশকে যাঁরা সাহিত্য ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন তাঁরা প্রধানত সমকাল-সম্পৃক্ত রাজনীতি নির্ভর ও সমাজ-সচেতনমূলক সাহিত্য রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। চল্লিশের দশককে আধুনিক বাংলা কবিতার 'দ্বিতীয় পর্যায়' বলে উল্লেখ করে সুমিতা চক্রবর্তী লিখেছেন :

> দ্বিতীয় পর্যায়ের কবিরা হয়ে উঠলেন গভীরভাবে সমাজ-মনস্ক ও রাজনীতি-সচেতন। যে রাজনীতি বিশ্বের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি থেকেও যেমন মনোলক্ষণ অর্জন করেছে তেমনি স্বদেশের রাজনৈতিক আলোড়ন ও সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কেও থেকেছে সমান আগ্রহী।[১০২]

দ্বিতীয় পর্যায়ের এই আধুনিক কবিরা কবিতা চর্চা শুরু করেছেন তিরিশের মধ্যভাগ থেকে এবং তাঁরা লিখলেন সমগ্র চল্লিশের দশক জুড়ে।

চল্লিশের দশকে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৯৪৭ সালে বাংলার দু টুকরো হওয়া। 'কেবল চল্লিশের দশক কেন বাংলাদেশের সমগ্র ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করলে এরকম তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা আর কখনো ঘটে নি'[১০৩] বলেই বিশ্বাস করেন প্রখ্যাত গবেষক মাসুদুজ্জামান। এই বিচ্ছিন্নতার কারণে দুটি অঞ্চলে দেখা দিল অর্থনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতার, তৈরি হল সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতাবোধের। অখণ্ড বাংলায় কলকাতাকে কেন্দ্র করে যাঁরা সাহিত্যচর্চা করতেন, তাঁদের একাংশ দ্বিখণ্ডিত বাংলার পূর্ববঙ্গে ঢাকাকে কেন্দ্র করে সাহিত্যচর্চা অব্যাহত রাখলেন। যদিও ঢাকায় সাহিত্যচর্চার স্বতন্ত্র একটা ধারা বিশের দশক থেকেই সচল ছিল। ১৯২৬ সালে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের প্রভাবে ও মানবতাবাদী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে তৎকালীন একদল তরুণ সাহিত্যকর্মী ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করেন 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'। তিরিশের দশকে মার্কসবাদী জীবনদর্শনে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে দেশের তরুণ-সমাজ। প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন যখন ভারতবর্ষে বিশেষ করে কলকাতায় বিস্তার লাভ করছে তখন ঢাকার তরুণ সাহিত্যকর্মীরাও পিছিয়ে ছিলেন না। ধনঞ্জয় দাশের উক্তিই তার সাক্ষ্য :

Dhaka University Institutional Repository

> প্রগতি লেখক সংঘের আন্দোলন ঢাকার তরুণ মনে সাড়া তুলেছিল। তৎকালীন সংস্কৃতকর্মী রণেশ দাশগুপ্ত, নৃপেন্দ্র গোস্বামী, সত্যেন সেন, অচ্যুৎ গোস্বামী, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত এবং প্রায় কিশোর সোমেন চন্দ'র প্রচেষ্টায় ঢাকাতেও স্থাপিত হয়েছিল প্রগতি লেখক সংঘের শাখা। কলকাতার পরেই ঢাকার এই শাখা কেন্দ্রটি ছিল সবচেয়ে সক্রিয়।[১০৪]

কলকাতায় 'প্রগতি লেখক সংঘের আন্দোলনে ১৯৩৯-৪০ সালের মধ্যে ভাঁটার টান লক্ষিত হলেও ঢাকা, কুমিল্লা, শ্রীহট্ট, যশোহর, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলায় এই আন্দোলন কিছু তরুণ বুদ্ধিজীবীকে প্রগতিশীল শিল্প-সাহিত্য তথা সংস্কৃতিচর্চায় উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল। এঁরা 'প্রতিরোধ', 'নবযুগ', 'বলাকা', 'প্রগতি' প্রভৃতি সাময়িকী প্রকাশের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং মার্কসীয় চিন্তাচর্চায় বেশ কিছুকাল তৎপর ছিলেন'[১০৫]।

১৯৪১ সালে 'অরণি' পত্রিকার প্রকাশ প্রগতি সাহিত্যের দিক থেকে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। 'অরণি'তে রাজনীতি ও সাহিত্য নিয়ে মতামতের ক্ষেত্রে অনেকখানি উদারতা ছিল; আর সে কারণেই ১৯৪১ সালে ব্রিটিশ সরকার কমিউনিস্ট পার্টির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। 'অরণি' চলে ১৯৪৮ পর্যন্ত। ১৯৪৪ সালে 'পরিচয়' পত্রিকা কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র হয়ে ওঠাতে এবং ১৯৪৬-৪৮-এর মধ্যে 'ডাক', 'ইস্পাত', 'নতুন সাহিত্য' ইত্যাদি পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ায় এ সময়কে বলা হয়ে থাকে প্রগতি সাহিত্যের স্বর্ণযুগ।

১৯৪০ সালে 'লাহোর প্রস্তাব' গৃহীত হলে ঐ বছরে কলকাতায় 'পূর্বপাকিস্তান সাহিত্য সোসাইটি' এবং ঢাকায় 'পূর্বপাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' (১৯৪২) প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ববাংলার বাঙালি মুসলমানের ধর্মীয় সংস্কৃতিকে ভিত্তি করে এ সংগঠন দুটি সক্রিয় হয়ে ওঠে। 'ফলত, এই পর্বে, পূর্ব বাংলার কবিতায় স্বভাবতই সক্রিয় ছিল প্রধানত তিনটি ধারা : এক. প্রগতিশীল চেতনাপ্রবাহ, দুই. রক্ষণশীল পাকিস্তানি বা ধর্মীয় মনোভঙ্গি এবং তিন. মানবতাবাদী মতাদর্শ'।[১০৬]

সামগ্রিকভাবে চল্লিশের দশকে আবির্ভূত কবিদের বিশেষ বিশেষ মানসিকতার স্বাতন্ত্র্যে দুটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করেছেন ড. অশোককুমার মিশ্র :

১. সামাজ্যবাদ বিরোধী কবি।
২. রোমান্টিক স্বপ্নবিলাসিতার বিরোধিতায় কিংবা রোমান্টিক অনুধ্যানেরত কবি।[১০৭]

তিনি এ পর্বের কবিদের রচনায় কতকগুলো সাধারণ লক্ষণও নির্দেশ করেছেন। সেগুলো হচ্ছে :

ক. বাস্তব সচেতনতা   খ. সময়চেতনা   গ. কালচেতনা
ঘ. মানবপ্রীতি   ঙ. কাব্যের আঙ্গিকে সারল্য প্রভৃতি।[১০৮]

এখানে একটা কথা স্মর্তব্য যে, চল্লিশের কবিরা যখন কাব্যরচনায় আত্মনিয়োগ করলেন, তখন তাঁদের কাছে রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে আত্মরক্ষার প্রশ্ন গৌণ হয়ে গিয়েছে। কেননা তাঁরা মূলত তিরিশের শক্তিমান কবিদের কাব্যরীতিকে আশ্রয় করে অগ্রসর হলেও রবীন্দ্র-কাব্য পাঠের মধ্য দিয়ে তাঁরা বাংলা কবিতার দীপ্তি ও ঐশ্বর্যের সন্ধান

Dhaka University Institutional Repository

পেয়েছিলেন। 'ফলে কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথকে আবার আঁকড়ে ধরলেন নতুনভাবে, কেউ আবার বিষ্ণু দে'র মত রবীন্দ্রচরণের ব্যঙ্গে বিশেষ মন দিলেন'।[১০৯]

চল্লিশের দশকের কবিদের মধ্যে যাঁরা প্রতিনিধিস্থানীয় তাঁদের বেশিরভাগই ছিলেন শিক্ষিত নাগরিক কবি। তাঁরা যে কেবল স্বদেশ ও স্বকালের ঘটনায় চিন্তিত ছিলেন তা নয়, বিশ্বের নানান দেশের ঘটনাবলির চিন্তায়ও তাঁরা আলোড়িত হয়েছিলেন। বিশ্ব মানবিকতা যেমন তাঁদের আকর্ষণ করেছিল তেমনি সমকালীন ইংরেজ ও ইউরোপীয় আধুনিক কবিদের সঙ্গে তাঁরা প্রাণের যোগ সৃষ্টি করেছিলেন। তাই অডেন, স্পেন্সর, কডওয়েল, এলিয়ট প্রমুখ কবির কবিতার প্রভাব চল্লিশের কবিদের কবিতায় বেশ স্পষ্ট করেই লক্ষ করা যায়।

চল্লিশের দশকের কবিতার আলোচনায় সাধারণত সমাজমনস্ক সমকাল, উদ্দীপ্ত প্রতিবাদী কবিতার ধারাটির প্রাধান্য পায়। এ ধারার উল্লেখযোগ্য কবি হলেন অরুণ মিত্র (১৯০৯-২০০০), দিনেশ দাশ (১৯১৩-১৯৮৫), মণীন্দ্র রায় (১৯১৯-২০০০), মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় (১৯২০-২০০২), কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত (১৯১৮-১৯৯৮), সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯-২০০৩), সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-১৯৪৭) বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯২০-১৯৮৫), সিদ্ধেশ্বর সেন, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, গোলাম কুদ্দুস ((১৯২০-২০০৫), ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪), আহসান হাবীব (১৯১৭-১৯৮৫), আবুল হোসেন (১৯১৮-১৯৭৫), সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০৩) প্রমুখ।

রাজনীতি চেতনাবর্জিত আরেকটি ধারাও চল্লিশের দশকের বাংলা কবিতায় সক্রিয় ছিল — যেখানে প্রেম, নিসর্গ ও আত্মমগ্নতার চিরায়ত উপলব্ধি কবিতাকে আশ্রয় করে প্রকাশ পেয়েছে। এ ধারার কবিদের মধ্যে অশোকবিজয় রাহা (১৯১০-১৯৯০), অরুণকুমার সরকার (১৯২১-১৯৮০), অরুণ ভট্টাচার্য (১৯২৫-১৯৮৫), বাণী রায় (১৯১৮-১৯৯২) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। তবে সমাজ ও রাজনীতি মনস্কতার পথ ধরে স্বদেশ-বিদেশ ও স্বকাল-সচেতন কবিরাই এ দশকের প্রধান কবি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। সুমিতা চক্রবর্তী লিখেছেন :

> রবীন্দ্র-উত্তরকালীন কবিতার প্রকৃত ধারক হয়ে উঠেছিলেন এই কবিরা। তাঁদের শাণিত বাগ্ভঙ্গিতে, সম্পূর্ণ নতুন ধরনের উপমা আর চিত্রকল্পে, নতুন দৃষ্টিকোণে — একই সঙ্গে স্বাদেশিক ও আন্তর্জাতিকতা-বোধে, আবার একান্ত বাস্তব জীবন-চিত্রণের অনুপুঙ্খতায়, উৎপীড়তের প্রতি গভীর সহমর্মীতা ও তাদের জন্য আশার সঞ্চয়ে সত্যিই এই সময়ে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল বাংলা কবিতা।[১১০]

বাংলা কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে তিরিশ ও চল্লিশ দশকের কবির ইমেজ নিয়েই বিশিষ্ট ও উজ্জ্বল হয়ে আছেন সমর সেন (১৯১৬-১৯৮৭)। কেননা 'সমর সেন যে সময়ে আবির্ভূত হলেন তখন থেকেই সাধারণত আধুনিক বাংলা কবিতায় চল্লিশের যুগ চিহ্নিত'[১১১]। আর সে সময়টা ১৯৩৫ সাল অর্থাৎ তিরিশ দশকের মাঝামাঝি কাল। বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত 'কবিতা' (১৯৩৫) পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় একই সঙ্গে সমর সেনের চারটি কবিতা ছাপা হয় : 'Amor stands upon you',

Dhaka University Institutional Repository

'মুক্তি', 'স্মৃতি' ও 'প্রেম'। এ সময় থেকে শুরু করে চল্লিশ দশকের মাঝামাঝি (১৯৪৬) পর্যন্ত অব্যাহত ছিল তাঁর কবিতা চর্চা। এই অল্প সময়ের মধ্যে স্বল্প সংখ্যক কবিতা লিখেই তিনি বদলে দিয়েছিলেন বাংলা কবিতার রূপ, চরিত্র, চিত্রকল্প, শব্দাবলি, স্বাদ ও মেজাজ। তাঁর পূর্বজ তিরিশের কবিরা যখন রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে অক্লান্ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তখন তিনি অবলীলায় রবীন্দ্রনাথকে অত্মসাৎ করে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কবিতা নিয়ে আবির্ভূত হলেন। তিরিশের প্রতিনিধিত্বকারী অন্যতম কবি বুদ্ধদেব বসু তাই বিস্মিত হয়ে বলতে বাধ্য হন :

> আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার কথা বলি; অর্থাৎ এটা আমরা ধ'রেই নিই যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আধুনিক বাঙালি কবির প্রচেষ্টায় অনিবার্য। কিন্তু এই যুবক-কবি যেন রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে কখনো পড়েননি, সেটা আমার আশ্চর্য লাগে।[১১২]

সমর সেন চল্লিশের দশকের প্রথম প্রতিনিধিস্থানীয় নাগরিক কবি।[১১৩] তাঁর আগে তিরিশের কবিদের মধ্যে কেউ কেউ নাগরিক কবিতা লিখলেও তা ছিল 'রাখাল-বালকের চোখে পল্লী প্রকৃতির ছবি'। বুদ্ধদেব বসুর ভাষ্যেই তার প্রমাণ :

> নাগরিক জীবনের খণ্ড খণ্ড ছবি বা উল্লেখ কোনো কোনো আধুনিক কবিতে থাকলেও, সমগ্রভাবে আধুনিক নগরজীবন সমর সেনের কবিতাতেই ধরা পড়লো। সমর সেন শহরের কবি, কলকাতার কবি, আমাদের আজকালকার জীবনের সমস্ত বিকার, বিক্ষোভ ও ক্লান্তির কবি।[১১৪]

তবে তিনি 'মুখ্যত নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের অবক্ষয়ের কবি'[১১৫]। তাঁর কবিতায় ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত জীবনের নাগরিক অভিজ্ঞতা যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে। তাই 'বলা যেতে পারে, নাগরিক জীবনের ক্লেদ ও গ্লানির ধূসরতায় তাঁর কবিতা আগাগোড়া মোড়া'[১১৬]। সামগ্রিকভাবে মার্কসবাদী[১১৭] কবি সমর সেনের কবিতায় একদিকে যেমন নাগরিক জীবন-জটিলতা, মধ্যবিত্ত মানসের চারিত্র্য, নৈতিক অধঃপতন ও মূল্যবোধের অবক্ষয়জনিত সামাজিক ও মানবিক সমস্যা, অর্থনৈতিক সংকট, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, মারী-মড়ক এবং শোষিত-বঞ্চিত মানুষের জীবন আলেখ্য বিধৃত হয়েছে, অপরদিকে তেমনি প্রেম ও প্রকৃতি এবং শুভ ও কল্যাণের প্রতি আকর্ষণ ও আশাবাদ ব্যক্ত হয়েছে।

সমর সেনের কাব্যচর্চার ব্যাপ্তি বার বছর। এ সময় পরিসরে প্রকাশিত কাব্যগুলো হচ্ছে : 'কয়েকটি কবিতা' (১৯৩৭), 'গ্রহণ' (১৯৪০), 'নানা কথা' (১৯৪২), 'খোলা চিঠি' (১৯৪৩), 'তিন পুরুষ' (১৯৪৪) এবং ১৯৪৪-৪৬ পর্যন্ত লেখা ৪টি কবিতা ও স্বনির্বাচিত কবিতা নিয়ে 'সমর সেনের কবিতা' (১৯৫৪)।

আঠার থেকে ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত[১১৮] তিনি কবিতা লিখেছেন। ১৯৩৪ থেকে '৩৭ সালে মধ্যে লেখা কবিতাগুলো নিয়ে 'কয়েকটি কবিতা' যখন আত্মপ্রকাশ করে তখন তাঁর বয়স একুশ। ফলে এ সময়ের কবিতায় লক্ষ করা যায় 'নব যৌবনোদ্‌গমে নিষ্ঠুর বাস্তবের সঙ্গে কৈশোর স্বপ্নের বিষম মিলন হয়েছে দৈহিক প্রেমের দেহলিতে। নগর জীবন হয়েছে শূন্য মরুভূমি'[১১৯]। তাঁর এ পর্যায়ের কবিতায় প্রেম-অপ্রেমের দ্বন্দ্ব এবং সমকালীন বিক্ষুব্ধ পটভূমিই প্রধান।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৭ থেকে '৪০ সালের মধ্যে লেখা কবিতাগুলো নিয়ে প্রকাশিত হয় সমর সেনের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'গ্রহণ'। এ সময় তাঁর বয়স চব্বিশ। এই সময়ই তিনি মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির খুব কাছাকাছি আসেন। ফলে তাঁর কবিতার দৃষ্টি বদল হল। কবিতায় চিত্রিত হল মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের ভয়াবহ ও বিকৃত রূপ এবং কঠোর পঙ্গুতার ছবি। তাঁর কবিতায় শোনা গেল রাজনৈতিক শ্লোগানের সুর।

সমর সেনের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'নানা কথা'য় রক্ষিত আছে ১৯৪০-'৪২ সালের মধ্যে লেখা কবিতাগুলো। এ সময়ে কবির বয়স ছাব্বিশ। ইতিহাসের এক উত্তাল সময়ের মধ্যে দিয়ে পার হচ্ছিলেন তিনি। তাই এ পর্যায়ের কবিতায় সমকাল ও পারিপার্শ্বিকতার ছায়াপাত অনেক বেশি স্পষ্ট।

কবির চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ 'খোলা চিঠি'তে গ্রন্থিত হয়েছে ১৯৪২-'৪৩ সালে রচিত সাতটি কবিতা। এগুলোতেও সমকালীন বিশ্ব, স্বদেশ, সমাজ ও রাজনীতি প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলেছে।

সমর সেনের পঞ্চম গ্রন্থ 'তিন পুরুষ' ১৯৪৩-'৪৪ সালে লেখা তেরটি কবিতার সংকলন। প্রধানত ১৯৪৩ সালের ভয়ঙ্কর মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটই বিধৃত হয়েছে এ সময়ে লেখা কবিতায়। যদিও বাংলাদেশের এই বিভীষিকাময় অবস্থা স্বচক্ষে দেখার সুযোগ তাঁর হয় নি। কারণ কর্মসূত্রে তখন তিনি দিল্লিতে। তবুও দূরের অনুভব হিসেবে মন্বন্তরের চিত্র অত্যন্ত দরদ দিয়েই তিনি আঁকার চেষ্টা করেছেন এ পর্যায়ের কবিতায়।

সমর সেনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য তিনি গদ্য কবি। 'তার কবিতা গদ্যে রচিত, এবং কেবলই গদ্যে। ... তার গদ্য-ছন্দ বাংলা ভাষায় অভিনব, রবীন্দ্রনাথ বা অন্য কোনো কবির ছাঁচে ঢালাই করা নয়'।[১২০] তবু তিনি তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থ 'তিন পুরুষ'-এ পদ্যছন্দের প্রকাশ ঘটালেন। সচেতনভাবেই কবি পদ্য বা পয়ার-পাঁচালির ছন্দ অবলম্বন করে মন্বন্তরের জন্যে দায়ী সাম্রাজ্যবাদ ও তার দোসর এদেশীয় বেনিয়া-মাহাজনদের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করেছেন এ পর্যায়ের কবিতায়।

১৯৪৬ সালের পর সমর সেন আর কোনো কবিতা লেখেন নি। ১৯৪৪-'৪৬-এর মধ্যে লেখা চারটি কবিতায় চিত্রিত হয়েছে দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধের চিত্র।

বস্তুত সমর সেনের আবির্ভাব থেকে স্বেচ্ছা-নির্বাসন পর্যন্ত লক্ষ করলে আমরা দেখতে পাই তিনি কবিতা রচনার ক্ষেত্রে কখনো কারো শিক্ষানবিশি করেন নি এবং এক জায়গায় তিনি থেমেও থাকেন নি। একটা পর্যায় থেকে আরেকটি পর্যায়ে পৌঁছতে তিনি বারবার বদলেছেন। তাই তাঁর কবিতায় মানুষ যেমন আছে, তেমনি আছে সমাজ, প্রেম, রাজনীতি; আছে স্বদেশপ্রেম ও সময়সচেতনতা। আর এসব কিছু মিলিয়ে তাঁর কবিতাকে তিনি নানান বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ করেছেন। সর্বোপরি 'রসকষহীন গদ্যকে তিনি কবিতায় রূপান্তরিত করেছেন'[১২১]। এ কারণেই সমর সেন আধুনিক কবি এবং তাঁর সমকালীন অন্যান্য কবিদের থেকে স্বতন্ত্রচিহ্নিত।

চল্লিশের কবিদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ অরুণ মিত্রও সমর সেনের মতো কবিতা লেখা শুরু করেন ১৯৩৪ সাল থেকে। এবং ১৯৩৫-'৩৬ সালে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে

Dhaka University Institutional Repository

জড়িয়ে অর্জন করে নেন নিজস্ব মনোভঙ্গি।[১২২] তবে মার্কসবাদে বিশ্বাস স্থাপন করেও প্রথম থেকেই তাঁর কবিতায় তিনি প্রত্যক্ষ সংগ্রামী মনোভাব বর্জন করেছিলেন। তিনি ভেতর থেকে অনুভব করেছিলেন কবিতাকে শিল্প হিসেবে দাঁড় করানোর তাগিদ। ফলে সমসাময়িক সময়কে ধারণ করে যেমন তিনি বিশ্ব রাজনীতি-অর্থনীতির জটিলতা ও সমাজের বিচিত্র শ্রেণিবিভাজনকে আশ্চর্য কুশলতায় তাঁর কবিতায় চিত্রিত করেছেন, তেমনি শ্রমজীবী মানুষের জীবনবোধ ও তাদের প্রতি সহমর্মিতা তাঁর কাব্যে পরম নিষ্ঠায় অঙ্কিত হয়েছে।

দীর্ঘজীবী কবি অরুণ মিত্রের কাব্য প্রাচুর্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাব্যগুলো হচ্ছে : 'প্রান্তরেখা' (১৯৪৩), 'উৎসের দিকে' (১৯৫৫), 'ঘনিষ্ঠ তাপ' (১৯৬৩), 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে' (১৯৭০), 'শুধু রাতের শব্দ নয়' (১৯৭৮), 'প্রথম পলি শেষ পাথর' (১৯৮১), 'খুঁজতে খুঁজতে এত দূর' (১৯৮৬), 'এই অমৃত এই গরল' (১৯৯১), 'অন্ধকার যতক্ষণ জেগে থাকে' (১৯৯৬), 'উচ্ছন্ন পৃথিবীর সুখ-দুঃখ' (১৯৯৯) প্রভৃতি।

চল্লিশের দশকে প্রকাশিত তাঁর একমাত্র কাব্যগ্রন্থ 'প্রান্তরেখা'র "লাল ইস্তাহার" কবিতাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'অনেকেই মনে করেন যে-ধরনের প্রতিবাদী কবিতার অজস্রতায় বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল চল্লিশের দশক তার প্রথম পথিকৃৎ এই 'লাল ইস্তাহার' কবিতাটি'।[১২৩] এ কবিতায় কবি সাম্যবাদী ইস্তাহারকে মুক্তি ও প্রতিরোধের প্রতীক হিসেবে নির্দিষ্ট করেছেন। 'প্রান্তরেখা'র 'কসাকের ডাক', 'সাময়িক', 'মাটির কবর', 'বসন্ত-বাণী' প্রভৃতি কবিতাতেও তাঁর সাম্যবাদী চেতনার উজ্জ্বল স্বাক্ষর চিহ্নিত হয়ে আছে।

অরুণ মিত্র মানব মুক্তির কবি। 'মানুষ এবং প্রকৃতি দুই-ই তাঁর কবিতায় ভালোবাসার রসে সিঞ্চিত — কেউ বঞ্চিত নয়'।[১২৪] তাই কবি পঞ্চাশের দশকে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতি থেকে সরিয়ে নিলেন নিজেকে। তবে রাজনীতি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করলেও মানুষের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতার কথা তিনি তখনো বিস্মৃত হন নি। এ সময়ে প্রকাশিত 'উৎসের দিকে' কাব্যগ্রন্থই তার সাক্ষ্য। কিন্তু পঞ্চাশ পরবর্তী পর্যায়ে 'দায়বদ্ধতার যে-অর্থ ছিল জীবনের সরল উপস্থাপন; কোনো প্রশ্ন নয়, কোনো দ্বন্দ্ব নয়, শুধু প্রতিপক্ষকে সরাসরি আঘাত করা কিংবা দ্রোহাত্মক ভঙ্গিতে বিশ্বাসের কথা বলা — চল্লিশের সেই প্রবণতা থেকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে সরে এলেন অরুণ মিত্র'[১২৫]। আর চল্লিশ-পঞ্চাশ পরবর্তী কবিতায় তুলে আনলেন সমাজের সমস্ত বৈরিতা বা প্রতিকূলতাকে আত্মস্থ করে ভালবাসার সুগভীর বোধে, মগ্নস্বরে জীবনের অন্তঃসারকে। বিবৃত করলেন মানুষ, দেশ ও পরিপার্শ্বকে দেশকালোত্তর এক বৃহত্তর পটভূমিকায়। এবং সবার সঙ্গে পা মিলিয়ে বেরিয়ে পড়লেন জীবনের উৎস সন্ধানে।

অরুণ মিত্র নগরের কবি হলেও পুরোপুরি নাগরিক কবি তিনি নন। কেননা কবিতায় বার বার তিনি ফিরে ফিরে এসেছেন বাংলাদেশে, তাঁর জন্মস্থানের পল্লী গ্রামে। দেশ-বিভাগের ফলে উদ্বাস্তু কবির বেদনা আশ্রয় খুঁজেছে এদেশের মাটির বুকে বিছানো নরোম

Dhaka University Institutional Repository

দুর্বা ঘাসে, মাঠে মাঠে সবুজ ধানের উপর বাতাসের হিল্লোলে, আপন খেয়ালে মত্ত ফিঙে-দোয়েলের কণ্ঠে।

ফরাসি ভাষায় অরুণ মিত্রের বিশেষ দক্ষতার কারণে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কবিতায় তার প্রকাশ ঘটেছে। কবিতার গঠন নিয়েও তিনি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। লিখেছেন গদ্য কবিতা, মিলনান্তক কবিতা এবং দীর্ঘ পঙ্ক্তি সমন্বিত টানা গদ্য কবিতা। তাঁর পদ্য কবিতা যেমন খুবই সাদামাটা — আটপৌরে; তেমনি তাঁর 'গদ্য কবিতা রবীন্দ্রনাথের মতো কাব্যগন্ধী নয়, আবার সমর সেনের মতো গদ্যগম্ভীরও নয়'[১২৬]। সুমিতা চক্রবর্তীর ভাষায় :

> টানা গদ্যে লেখার নিদর্শন বাংলা কবিতায় আরো আছে। কিন্তু চল্লিশের দশক থেকে নিয়মিত এই আপাত অ-ছন্দিত কবিতায় বার্তালাপের সুরে জনজীবনের এই যে রূপ উন্মোচন করেছেন অরুণ মিত্র তা চল্লিশের দশকের কবিতা থেকেই আমাদের সম্পদ হয়ে আছে।[১২৭]

অরুণ মিত্রের কবিতার ভাষা তাঁর মগ্নচেতনার অনুবর্তী এবং তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির আলোকে নির্মিত বলেই তা যথার্থই আধুনিক কবিতা হয়ে উঠেছে।

রাজনৈতিক নানান মতবিশ্বাসে আন্দোলিত দিনেশ দাসও কবিতা চর্চা শুরু করেন তিরিশের মধ্যপর্যায়ে।[১২৮] এবং তাঁর 'মৌমাছি' কবিতাটি ১৯৩৭ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত 'বাংলা কাব্য পরিচয়' গ্রন্থে সংকলিত হয়। কাব্যজীবনের শুরুতে কংগ্রেসের রাজনীতি ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের চেতনায় একাত্মতা ঘোষণা করে গান্ধীজির লবণ অমান্য আইন আন্দোলনে শরিক হয়েছিলেন। তারও আগে থেকে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল গুপ্ত রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে।

১৯৩৬-এ কলকাতায় 'কমিউনিজম'-চর্চা শুরু হলে তিনি সাম্যবাদে দীক্ষিত হন। ১৯৩৮-এর শারদীয় 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় ছাপা হয় তাঁর বিখ্যাত 'কাস্তে' কবিতা। যার ফলে তাঁকে রাজরোষে পতিত হয়ে কারাবরণও করতে হয়।[১২৯]

১৯৪২-'৪৩ সালে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুকে কেন্দ্র করে সাম্যবাদীদের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ হওয়াতে সক্রিয় 'কমিউনিজম' থেকে গুটিয়ে নিলেন নিজেকে; হলেন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সমর্থক। 'আসলে কবির এই দোলাচাল-চিত্তবৃত্তি তাঁর সংবেদনশীল স্বদেশপ্রেমী কবিমানসেরই লক্ষণ'।[১৩০] তবে তাঁর 'প্রগতিবাদী কবিচরিত্র জীবনের শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিল'[১৩১]।

তিরিশের দশকে কাব্যচর্চা শুরু হলেও দিনেশ দাসের প্রথম কবিতার বই 'কবিতা (১৩৪৩-৪৮)' প্রকাশিত হয় ১৯৪২ সালে। চল্লিশের দশকে আর একটি মাত্র কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় তাঁর — 'ভুখ-মিছিল' (১৯৪৪)। এরপর একে একে প্রকাশিত হয় 'অহল্যা' (১৯৬৪), 'কাঁচের মানুষ' (১৯৭১), 'অসংগতি' (১৯৭১) ও 'রাম গেছে বনে' (১৯৮২)। তাঁর কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ছয়টি। এছাড়াও 'দিনেশ দাশের কবিতা' (১৯৫৪), 'দিনেশ দাসের শ্রেষ্ঠ কবিতা' (১৯৭২), 'কাস্তে' (১৯৭৫) প্রভৃতি কয়েকখানা কাব্য-সংকলনও প্রকাশিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দিনেশ দাসের প্রথম দিকের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট অনুসরণ লক্ষ করা গেলেও তা স্থায়ী নয়। সাম্যবাদে দীক্ষা নেওয়ার পরেই তাঁর কাব্যের হাওয়া বদল হল। তিনি লিখলেন:

'চাঁদের শতক আজ নহে তো,
এ-যুগের চাঁদ হল কাস্তে!'[১৩২]

আর এর মধ্য দিয়েই চল্লিশের কাব্যধারার প্রধান সুরটিকে তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ধারণ করলেন।

দিনেশ দাসের কবিতায় সমকাল ও সমাজ-সচেতনতার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর বর্তমান। 'কবিতা (১৩৪৩-৪৮)', 'ভুখ-মিছিল' তার অন্যতম সাক্ষ্য। তিনি পরাধীনতার বেদনাকে যেমন অনুভব করেছেন অন্তর দিয়ে, তেমনি দেশবাসীর দারিদ্র্য ও দুর্দশার সঙ্গেও একাত্মতা প্রকাশ করেছেন। তাই তাঁর কবিতার মূল সুর হয়ে উঠেছে মানবতাবোধ। মানুষের সর্বাত্মক মহিমা ও মাহাত্ম্য বিকাশের সোপান হিসেবে তিনি গ্রহণ করেছিলেন সাম্যবাদকে। তাঁর বিশ্বাস ছিল 'খণ্ডিত পৃথিবীর রূঢ়তা আর মানুষের অমানবিকতা সবই সাম্যবাদ তিরোহিত করতে পারে'[১৩৩]।

'অহল্যা' এবং 'কাঁচের মানুষ' কাব্যে দিনেশ দাসের কবিচেতনা মূলত অন্তর্মুখী। এ সময় তাঁর কবিতায় গ্রাম-বাংলার শ্যামল প্রকৃতি ও সহজ-সরল মানুষের জীবনের প্রতিচ্ছবি প্রতীকাশ্রয়ে নতুন আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। তাঁর 'অসংগতি' ও 'রাম গেছে বনে' কাব্যগ্রন্থে একদিকে আছে কবির মৃত্যুচেতনার কথা, তেমনি অন্যদিকে আছে কবির আত্মজিজ্ঞাসা। তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন মানুষের নিজেকে জানাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সমস্যা। তবে সবকিছুর মধ্যেও তিনি ভীষণভাবে যুগ-সচেতন। তাই কাব্যচর্চার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত 'রোমান্টিকতার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ দিনেশ দাসের কাব্যে থাকলেও সাধারণ মানুষ এবং সমকাল এ কমিউনিস্ট ভাবাদর্শী কবির কবিতায় সদগুণের মত উপস্থিত ছিল'[১৩৪]।

চল্লিশের দশকে প্রতিষ্ঠিত কবি মণীন্দ্র রায়ও সাম্যবাদী দর্শনকে ধারণ করে তিরিশের মাঝামাঝি পর্যায় থেকে কবিতা চর্চা শুরু করেন, এবং ১৯৩৮ সালেই প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কবিতার বই 'ত্রিশঙ্কু'। চল্লিশের দশকে প্রকাশ পায় তাঁর 'একচক্ষু' (১৯৪২), 'ছায়া সহচর' (১৯৪৪) এবং 'সেতু বন্ধন' (১৯৪৮) কাব্য। মণীন্দ্র রায়ের গ্রন্থ সংখ্যা অনেক। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগুলো হচ্ছে : 'অন্যপথ' (১৯৫১), 'অমিল থেকে মিলে' (১৯৫৮), 'স্বাধীন কিশোর' (১৯৫৯), 'মোহিনী আড়াল' (১৯৬৬), 'ভিয়েৎনাম' (১৯৬৯), 'জামায় রক্তের দাগ' (১৯৭০), 'আমাকে বাঁচতে দাও, আমাকে জানতে দাও' (১৯৭১), 'মাথায় জড়ানো জলপাই পল্লব' (১৯৮৪), 'ভালো থেকো' (১৯৯৯) প্রভৃতি।

'মণীন্দ্র রায় আধুনিক কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা লিখে, আর পাঁচজন সমকালীন কবির মত প্রতিষ্ঠার সহজপথ না খুঁজে লেখার আন্তরিক তাগিদকেই বরণ করে নিয়েছিলেন'।[১৩৫] আর তাই নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ের চেয়ে নিজের সমগ্র সত্তাকে সামনে রেখে আত্মার রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে চেয়েছেন গভীর আগ্রহে। তাঁর প্রথম দিকের কবিতায় প্রেম চেতনা প্রবল। তবে 'চল্লিশ দশকের

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবাদী চেতনাও মণীন্দ্র রায়ের ওই সময়ের কবিতায় পূর্ণমাত্রায় ধ্বনিত হয়েছিল'[১৩৬]। চল্লিশের দশকে প্রকাশিত মণীন্দ্র রায়ের চারটি কাব্যগ্রন্থের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে অনীক মাহমুদ লিখেছেন :

> কবির সাম্যবাদী চেতনার বিস্তার না ঘটলেও এই কাব্যগুলোর কিছু কবিতায় তাঁর প্রগতিশীল চিন্তাধারার পরিচয় আছে। ধনতান্ত্রিক যুগের ক্লিষ্টতা, বিষণ্ণতা ও বিচ্ছিন্নতা মণীন্দ্র রায়ের কবিতায় প্রাথমিক পরিসরে রূপায়িত হয়েছে।[১৩৭]

তাঁর কবিকৃতি স্পষ্টরূপ লাভ করে পঞ্চাশের দশকে।

চল্লিশের দশকের দৈশিক ও বৈশ্বিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির চরম আলোড়িত সময়ে বাংলা কাব্যজগতে আবির্ভূত হন কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়। এবং তিনি 'চল্লিশের দশকের মানবতামুখী সমাজমুখী কবিতায় নিজেকে উৎসারিত'[১৩৮] করেন। কবি প্রত্যক্ষ করেন ১৯৪৩-এর ভয়াবহ মন্বন্তর ও সামাজিক ভাঙন, ১৯৪৪-'৪৫-এর আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি ও মজুতদারের চোরাবাজারের বিরুদ্ধে মধ্যবিত্তের সংগ্রাম, ১৯৪৬-এর দাঙ্গা ও কৃষক বিদ্রোহ, '৪৭-এর দেশবিভাগ জনিত উদ্বাস্তু সমস্যা ও বিক্ষোভ। সাম্যবাদে আস্থাশীল কবি বিশ্বাস করতেন, 'প্রবল ধ্বংসশক্তির বিরুদ্ধে এই সক্রিয় সচেতন প্রতিরোধবৃত্তি সংখ্যাশক্তিতে হয়তো অকিঞ্চিৎকর, তবু এই সক্রিয় সংঘর্ষই সমসাময়িক বাংলাদেশের একমাত্র ইতিহাস এবং এই ইতিহাসই আমাদের শ্রেণীচেতনাকে তীব্রতর করতে সমর্থ'[১৩৯]। আর তাই 'এইসব সমস্যা থেকে উদ্ভূত অন্তর্জ্বালা ও যন্ত্রণা মঙ্গলাচরণের কবিতাকে দিয়েছে চল্লিশেরই দায়বদ্ধ কবিতার ভিন্নতর এক প্রতিষ্ঠা'[১৪০]।

চল্লিশের দশকে মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের চারটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ পায় : 'স্নায়ু' (১৯৪১), 'মনপবন' (১৯৪২), 'ঘুম তাড়ানি ছড়া' (বিষ্ণু দে, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ও সুকান্ত ভট্টাচার্য সহযোগে — ১৯৪৭) এবং 'তেলেঙ্গানা ও অন্যান্য কবিতা' (১৯৪৮)। এছাড়াও তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগুলো হচ্ছে : 'মেঘবৃষ্টিঝড়' (১৯৫১), 'ক'টি কবিতা ও একালব্য' (১৯৫৯), 'বৈরী মন' (১৯৭১), 'কোথাও যাওয়ার কথা ছিল' (১৯৮৭) প্রভৃতি।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'স্নায়ু'তেই 'তাঁর স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত হয়ে গেছে'। এবং তাঁর 'কবিসত্তার পূর্ণবিকাশ ঘটেছে 'তেলেঙ্গানা ও অন্যান্য কবিতা'য়'[১৪১]। কবি যেমন বিশ্বাস করতেন যে, 'বিবর্তনশীল কালের পটভূমিতে কতকগুলি টাইপ চরিত্রকে বিশেষ বিশেষ কালের প্রতিভূ হিসেবে দেখাতে হলে শুধু তাদের মধ্যে সময়ের বিশেষ লক্ষণগুলি ফুটিয়ে তুললেই কবির কাজ শেষ হয় না — সেই লক্ষণগুলির বিরুদ্ধে তাদের সচেতন কিংবা অবচেতন প্রতিরোধস্পৃহাও স্পষ্টভাবে দেখানো দরকার, তা না হলে জীবন্ত চরিত্রগুলোকে আসলে সময়ের নির্জীব প্রতিফলন বলে মনে হয়'[১৪২]। তেমনি তাঁর প্রতিটি কবিতায় শুধু প্রতিচ্ছবি অঙ্কন কিংবা শুধু প্রতিশ্রুতি নয় — নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়াবার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায়। তাঁর কবিতায় যেমন সমকালীন যুগযন্ত্রণার প্রকাশ ঘটেছে, তেমনি 'মর্মস্পর্শী ভাষায়

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু সবল আশাবাদে বিকীর্ণ হয়ে, বাংলাদেশের বিগত দিনগুলোর সংগ্রামময় ঐতিহ্যের পটভূমিকায় তাঁর কবিতা পরিতৃপ্তির শান্ত নির্ঝরের দিকে এগিয়ে গিয়েছে'[১৪৩]। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রায় সমস্ত কাব্যের মধ্যেই মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁর স্বদেশ ও স্বদেশের খেটে খাওয়া সাধারণ দুঃখী মানুষের জীবন। এদের থেকে কখনোই বিচ্ছিন্ন হয় নি তাঁর কবিতা।

চল্লিশের দশকের শুরুতে সংগ্রামী কমরেডকে নবযুগ আনবার আহ্বান জানিয়ে[১৪৪] বাংলা কাব্যজগতে আবির্ভূত হন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। প্রথম থেকেই তিনি ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির একনিষ্ঠ সমর্থক ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মী। সে কারণেই তাঁর কবিতায় স্থাপিত হয়েছে নিপুণ শিল্পকর্মের সঙ্গে রাজনীতির অবিচ্ছেদ্য মেলবন্ধন। তিনি অত্যন্ত সফলভাবে সৃষ্টির গৌরব ও মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন রাজনীতির জটিল কঠিন বক্তব্যকে। তাঁর কবিতা হয়ে উঠেছে লড়াইয়ের শাণিত অস্ত্র — সংগ্রামের ধারালো হাতিয়ার। তাইতো ১৯৪০-এর ফেব্রুয়ারিতে তেইশটি কবিতা নিয়ে যখন তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পদাতিক' প্রকাশ পায় — তখন তিরিশের অন্যতম প্রধান কবি বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন :

> এখন আমরা ইতিহাসের এমন একটি পর্যায়ে এসে পৌঁচেছি যখন বাঙালি কবির হাতেও কবিতা আর শুধুই বীণা হ'য়ে বাজছে না, অস্ত্র হ'য়েও ঝলসাচ্ছে।[১৪৫]

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আগেও বাংলা কাব্যে সাম্যবাদী চেতনা পরিস্ফুট হয়েছে কাজী নজরুল ইসলাম, বিষ্ণু দে, সমর সেন প্রমুখের কবিতায়। তবে পূর্ববর্তী কবিদের সাম্যবাদী চেতনার মূলগত ভিত্তি ছিল মানবিক সহানুভূতি ও কাল্পনিক সাম্যবাদে। নজরুল ইসলাম মার্কসীয় মতবাদকে কখনো তেমন করে আঁকড়ে ধরেন নি। বিষ্ণু দে, সমর সেন আঁকড়ে ধরেছিলেন কিন্তু প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিজেদের জড়ান নি। সুভাষ মুখোপাধ্যায় যেহেতু রাজনৈতিক মতাদর্শ গ্রহণের ক্ষেত্রে ছিলেন দ্বিধাহীন, সেজন্যে তাঁর কবিতায় সাম্যবাদী চেতনার যথার্থ প্রতিফলন ঘটে। আর সে কারণেই অশ্রুকুমার সিকদার লিখেছেন :

> এই প্রথম একজন কবি রাজনৈতিক দলের মতবাদ পুরোপুরি মেনে নিয়ে, সেই মতবাদে দীক্ষিত হয়ে, দলভুক্ত রাজনীতির প্রতিনিধি হিসেবে বাংলায় কবিতা লিখলেন।[১৪৬]

পার্টির প্রতি এই আনুগত্য সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে করেছে নিষ্ঠাবান, সংগ্রামী ভাবনায় উদ্দীপিত ও সর্বহারার মানবতা প্রতিষ্ঠায় প্রণোদিত।

চল্লিশের দশকে লেখা কবিতাগুলো নিয়ে প্রকাশিত হয় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'অগ্নিকোণ' (১৯৪৮) ও 'চিরকুট' (১৯৫০) কাব্যগ্রন্থদ্বয়।

১৯৪৮ সালে পার্টি দৈনিককে টাকা তোলার জন্যে সুভাষ 'অগ্নিকোণ' রচনা করেন।[১৪৭] ব্রিটিশের ফাঁসি কাষ্ঠে প্রাণদানকারী তিনজন সিংগাপুরী বিপ্লবীদের নিয়ে লেখা তিনটি কবিতাসহ এর কবিতা সংখ্যা পাঁচটি। পরে এই পাঁচটি কবিতা 'চিরকুট'-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। 'চিরকুট'-এর কবিতা সংখ্যা দাঁড়ায় ঊনত্রিশে। এছাড়াও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য কাব্যগুলো হচ্ছে : 'ফুল ফুটুক' (১৯৫৭), 'যত দূরেই যাই' (১৯৬২), 'কাল মধুমাস' (১৯৬৬), 'ছেলে গেছে বনে' (১৯৭২), 'একটু পা চালিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

ভাই' (১৯৭৯), 'চইচই চইচই' (১৯৮৩) ইত্যাদি। তাঁর অনুবাদ কাব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ; 'নাজিম হিকমতের কবিতা' (১৯৫২), 'পাবলো নেরুদার কবিতাগুচ্ছ', 'হাফিজের কবিতা' ইত্যাদি।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পদাতিক'-এই কবির স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত। বাংলা কাব্যের ইতিহাসে তিনিই প্রথম কবি যিনি প্রচলিত ধারার বাইরে গিয়ে রাজনীতি নির্ভর, জীবনঘনিষ্ঠ কবিতা রচনা করে নতুন ধারার প্রবর্তন করলেন। 'পদাতিক' পাঠ করে বুদ্ধদেব বসু তাই সুভাষকে অভিনন্দিত করে লিখলেন :

> মাত্র কয়েকটি কবিতা লিখে তিনি প্রমাণ করেছেন যে তিনি শক্তিমান, যে কোনো আদর্শই না বিচার করি, মন দিয়ে পড়লে তাঁর কাব্যের সার্থকতা স্বীকার করতেই হয়।[১৪৮]

তিনি আরো লিখলেন :

> তিনি [সুভাষ] বোধ হয় প্রথম বাঙালি কবি যিনি প্রেমের কবিতা লিখে কাব্যজীবন আরম্ভ করলেন না। এমনকি, প্রকৃতি বিষয়ক কবিতাও লিখলেন না; কোনো অস্পষ্ট, মধুর সৌরভ তাঁর রচনায় নেই।[১৪৯]

নিজের মতাদর্শকে নিষ্কণ্টক করার জন্যে সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রেম ও প্রকৃতি ত্যাগ করে বেছে নিয়েছিলেন মানুষকে। মানুষই তাঁর কবিতার শ্রেষ্ঠ মূলধন। আর 'জনতা মন্থন করে জীবন তুলে আনার যৌথ দৈবশক্তি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যশক্তিতে পুঞ্জিভূত করা ছিল বলে একটি পক্ষাবলম্বী হয়েও তাঁর কবিতা সর্বজনীন সমাদর লাভ করে'[১৫০]।

১৯৪১ থেকে '৪৬ পর্যন্ত লেখা কবিতা এবং 'অগ্নিকোণ'-এর কবিতাগুলো নিয়ে প্রকাশিত 'চিরকুট' কাব্যেও লক্ষিত হয় সংঘবদ্ধ হবার আহ্বান, শোষণমুক্তির লক্ষে অগ্রবর্তী হবার ইশারা। 'চিরকুট'-এর প্রথম কবিতায় কবি স্বীকার করেছেন 'সেদিনের শাণিত ধার হারিয়েছি'। তবুও '৪২-এর আগস্ট আন্দোলন, '৪৩-এর মন্বন্তর, '৪৫-এর নাগাসাকি-হিরোশিমায় আণবিক বোমার প্রলয় ঘটিয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান, '৪৬-এর রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার পর '৪৭-এর দেশবিভাগ 'পদাতিক'-এর সংগ্রামী কবিকে উত্তেজিত করেছে। আর সেই উত্তেজনা প্রমত্ত আস্ফালন হয়ে 'চিরকুটে'র মধ্যে গর্জে উঠেছে।
'চিরকুট' কাব্যেই সুভাষ মুখোপাধ্যায় 'গণমানুষের জীবনে আমূলিত জাতীয় সংকট থেকে আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিষয়েও'[১৫১] সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। অশ্রুকুমার সিকদার 'চিরকুট' কাব্যপ্রসঙ্গে তাঁর 'আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয়' গ্রন্থে লিখেছেন :

> আর একটা কারণে 'চিরকুট' আমার কাছে মূল্যবান মনে হয়। পঞ্চাশের মন্বন্তর নিয়ে বেশ কিছু ভালো ছোটগল্প বাংলায় লেখা হয়েছিল, কিন্তু ঐ প্রসঙ্গ নিয়ে ভালো কবিতা বেশি পাই নাই। 'চিরকুটে' পাই। এক বিষাদগাঢ় সকরুণ মমতা এই কবিতাগুলোয় বর্তমান।[১৫২]

'পদাতিক'-এ প্রেমের উপস্থিতি না থাকলেও 'চিরকুট'-এ সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রেমকে অস্বীকার করেন নি। তবে সে প্রেম নরনারীর দেহ নির্ভর নয়, নিছক রোমান্টিক কল্পনা বিলাসও নয়। এ প্রেমে আছে ঝড়ের মাতন, আগুনের দাহ, নিষিদ্ধ ইস্তাহারের বার্তা।

Dhaka University Institutional Repository

তাই মিছিলের একটি মুখ কবিকে 'উজ্জীবিত করে', 'নিষ্কোষিত তরবারির মত' দীপ্তিতে অন্যায় পাপকে নির্মূল করে,

> আর সমস্ত পৃথিবীর শৃঙ্খলমুক্ত ভালবাসা
> দুটি হৃদয়ের সেতুপথে
> পারাপার করতে পারে।[১৫৩]

'ফুল ফুটুক' কাব্যের 'ফুল ফুটুক না ফুটুক' শীর্ষক অসাধারণ কবিতাটিতেও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রেম ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। এখানে প্রেম দেহনির্ভর। কিন্তু বাস্তব পৃথিবী সে প্রেমকে সফল হতে দেয় নি। দারিদ্র্যের কারণে সে প্রেম হতাশায় পর্যবসিত হয়েছে।

'ফুল ফুটুক' কাব্যে হতাশা বা 'শুধু ভাঙা নয়', গড়ার কথা বা আশাবাদের কথাও ব্যক্ত হয়েছে। মূলত পঞ্চাশের দশকের অস্থিরতা ও প্রত্যাশা প্রকাশ পেয়েছে এ কাব্যে। চল্লিশের জীবনদর্শনে স্থির থাকলেও এসময়ে তাঁর কবিতার আঙ্গিক ও ভাষায় পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। প্রকাশভঙ্গিতে দেখা দিয়েছে নতুনত্ব। নাজিম হিকমতের কবিতার সঙ্গে পরিচয়ের ফলেই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় এসেছে এই নতুন ধরন, নতুন গড়ন।[১৫৪] জগদীশ ভট্টাচার্যের ভাষায় :

> 'ফুল ফুটুক' কাব্যগ্রন্থেই সংগ্রামী সৈনিক দেখা দিলেন কবি-শিল্পীর অপূর্ব রূপলাবণ্যে। এই কাব্যগুচ্ছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পুনরুজ্জীবনই শুধু ঘটল না, কবি হিসেবে তাঁর নবজন্ম হল।[১৫৫]

'যত দূরেই যাই' গ্রন্থে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের তৃতীয় জন্ম হল। শিল্পী হিসেবে এটি তাঁর নবতর অভ্যুদয়-দিগন্তের ইশারা বহন করে এনেছে।[১৫৬] কবিতাগুলোর মধ্যে গল্পের স্বাদ এসেছে, কোনো কোনো কবিতায় গল্পের স্বাদের সঙ্গে এসে মিশেছে দার্শনিকতার ছোঁয়া।

ষাটের দশকে পৌঁছে কবির পূর্ববর্তী রাজনৈতিক বিশ্বাস ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হয়ে আসতে থাকে। সমষ্টির ভাবনা থেকে কবি ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভাবনা দ্বারা আক্রান্ত হন। এ পর্যায়ে প্রকাশিত 'কাল মধুমাস' কাব্যের অধিকাংশ কবিতাই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আত্মকথন। ড. বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায় সুভাষের এই বিপরীত চারিত্র্য লক্ষ করে লিখেছেন :

> তাঁর [সুভাষের] স্বভাবের এই বৈপরীত্য কাব্যের বৈচিত্র্য বাড়িয়েছে সন্দেহ নেই, তবু সব জ্বালা সব সন্দেহ মেটাবার জন্য কালো দিঘির শান্ত জলের মতো স্থির বিশ্বাসের গভীর প্রশান্তি যে কত আরামদায়ক এবং আরামদায়ক বলেই কাম্য ও আরাধ্য 'কাল মধুমাস'-এর একক ব্যতিক্রম।[১৫৭]

ঊনসত্তর থেকে একাত্তর সাল পর্যন্ত পশ্চিম বাংলা ও বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক অরাজকতা, উগ্র সন্ত্রাসবাদ ও সার্বভৌম সাংস্কৃতিক সংকট দেখা দিয়েছিল তারই কাব্য-ছবি 'এই ভাই' ও 'ছেলে গেছে বনে' গ্রন্থদ্বয়ে অঙ্কিত। এ পর্যায়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায় যেন ফিরে পান তাঁর প্রথম যৌবনের উত্তাপ। চরম আশাবাদে উদ্দীপিত হয়ে কবি আবার ব্যক্ত করেন ব্যক্তি নয়, সমষ্টিই তাঁর কাম্য; নিভৃতে নয় উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ্যে ঘোষণাই তাঁর আকাঙ্ক্ষা। মূলত ''পদাতিক'-এ তাঁর রাজনৈতিক চেতনার উপর ভর করে দাঁড়াতে

Dhaka University Institutional Repository

চেয়েছিল তাঁর জীবনবোধ। 'চিরকুট'-এও সে ত্রুটি বিদায় নেয় নি। কিন্তু ক্রমশই তিনি বুঝেছেন জীবন নামক বৃহৎ জটিল অসংজ্ঞেয় ব্যাপারটিকে। তিনি জেনে নিয়েছেন সেই জীবনই সব কিছুর ধারক, বাহক, ভাষ্য রচয়িতা। 'ছেলে গেছে বনে'তে সেই বোধ আরো তীব্রতা পেয়েছে'[১৫৮]।

সাম্যবাদী কবি হিসেবে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের একটি অন্যতম দায়িত্ব ছিল কৃষক-শ্রমিকের জীবনকে কাব্যে প্রতিফলিত করা। আমরা লক্ষ করি, 'কুলি, মজুর, শ্রমিক, চাষী সবার কথাই সুভাষের কবিতায় উচ্চারিত হয়েছে অনিবার্য পার্টি লাইন রক্ষার তাগিদে। কিন্তু শহুরে মানুষ সুভাষ চাষী এবং শ্রমিকের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেছেন নিজ হৃদয়ের তাগিদে'[১৫৯]। তাইতো ট্রাক্টরের পাশে নিজের কলম রেখে তিনি অসংকোচে কৃষকের কাছে আগুন চাইতে পারেন। শ্রমিকের সঙ্গে ময়দানে গিয়ে অনায়াসে ধর্মঘটে সামিল হতেও তাঁর বাধে না। তীব্র মানবতাবোধে আচ্ছন্ন কবি কখনোই সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে চান নি। বুদ্ধদেব বসু তাই বলেন :

> তাঁর মুক্তি কামনা একলার জন্য নয়, কোনো বিধাতানির্বাচিত মনীষীসম্প্রদায়ের জন্যও নয়, সমগ্র মনুষ্য-সমাজেরই জন্য।[১৬০]

সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রথম থেকেই প্রধানত সমকালীন জীবনের কবি। সমকালীন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই জন্ম নিয়েছে তাঁর কবিভাষা। সহজ-সরল একান্ত জীবনঘনিষ্ঠ সে ভাষা। জগদীশ ভট্টাচার্য তাই বিস্ময় প্রকাশ করে লেখেন :

> প্রতিদিনের পরিবর্তনশীল জীবনের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করে সুভাষ মুখোপাধ্যায় যেভাবে তাঁর কবিভাষাকে অনুক্ষণ জীবনানুগ ও লোকায়ত করে তোলেন তাও তাঁর সিসৃক্ষু কবি মনের এক অন্তহীন বিস্ময়।[১৬১]

ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন মনে করেন এই ভাষা-বৈশিষ্ট্যের জন্যেই 'তাঁর ছন্দের ধ্বনি নতুন বলে বোধ হয়; চলতি বাংলার অনভ্যস্ত ধ্বনি'[১৬২] সুভাষের কবিতায় নূতনত্বের আভাস এনে দিয়েছে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার ছন্দে যেমন চমৎকারিত্ব লক্ষণীয়, তেমনি অভিনবত্ব লক্ষ করা যায় কবিতার উপমা ও চিত্রকল্প নির্মাণে। চল্লিশের আর কোনো কবি এত উপমা ও চিত্রকল্প সৃষ্টি করতে পারেন নি। এখানেই সুভাষের অনন্যতা। এসব কারণেই সুভাষ মুখোপাধ্যায় আজো অতুলনীয়।

জন্মমাত্রই যে কবি দেখলেন 'ক্ষুব্ধ স্বদেশভূমি'— তিনি চল্লিশের শক্তিশালী ও স্বাতন্ত্র্য মর্যাদায় অধিষ্ঠিত কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য। কবি বেড়ে উঠলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর দৈশিক ও বৈশ্বিক যুদ্ধ, অশান্তি আর অস্থির রাজনৈতিক পরিবেশে। কৈশোর ও প্রাক যৌবনে পেলেন বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, দাঙ্গা আর গণ-আন্দোলনের বিপুল বিক্ষোভ। প্রত্যক্ষ করলেন ফ্যাসিবাদের উত্থান ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়ংকর তাণ্ডব; এবং যুদ্ধোত্তর স্বদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নির্মম নিপীড়ন, রাজনীতিবিদ আর কালোবাজারীদের দুর্নীতি, মহাজনের শোষণ, বুভুক্ষু মানুষের মিছিল, ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা, দেশব্যাপী স্বাধীনতাকামী মানুষের বিদ্রোহ। শরিক হয়েছিলেন ফ্যাসি-বিরোধী সংগঠনে, মন্বন্তর, দুর্ভিক্ষ ও

Dhaka University Institutional Repository

মহামারীতে আর্ত মানুষের সেবায়, জনযুদ্ধের আন্দোলনে, যুদ্ধশেষে স্বাধীনতার জন্যে উত্তাল বিক্ষোভে। ইচ্ছে পোষণ করেছিলেন পৃথিবী থেকে ফ্যাসিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ নির্মূল করে একটি সাম্যবাদী সমাজগঠন করার, স্বাধীন স্বদেশে সকল মানুষের সঙ্গে এক কাতারে সামিল হবার। তাঁর সে স্বপ্ন পূরণ হবার আগেই ১৯৪৭-এর ১৩ই মে তিনি অন্তর্হিত হন।

কবি হিসেবে সুকান্ত ভট্টাচার্যের কাব্যজগতে পদচারণা বাল্যবয়স থেকেই এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ মাটির পৃথিবীতে অজ্ঞাতজনের মর্মবেদনা উদ্ধার করার জন্যে যে কবির অপেক্ষায় কান পেতে ছিলেন সুকান্ত সেই কবি। তিনি যথার্থই মাটির কাছাকাছির মানুষ। মাটির রসে ঋদ্ধ ও পুষ্ট তাঁর দেহ ও মন। কাজে আর কথায় সত্যিকার অর্থেই তিনি ছিলেন 'একই মাটিতে তুষ্ট' কৃষাণ-মজুরের অত্যন্ত 'আপনার জন'। তাঁর অধিকাংশ কবিতায় অনুরণিত হয়েছে অতি সাধারণ বঞ্চিত মানুষের মর্মবেদনা ও তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষারই কথা।

তিরিশের দশক থেকেই সুকান্তর কবিতা চর্চা আরম্ভ। কিন্তু তাঁর পূর্বজ তিরিশ ও চল্লিশের আধুনিক কবিরা যেমন কবিতা চর্চা শুরু করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক সৌন্দর্য স্বপ্নের মোহাচ্ছন্ন জগৎ থেকে দূরে সরে যাবার প্রবল প্রতিজ্ঞা নিয়ে, সুকান্ত তেমনি কাব্যচর্চা শুরু করলেন রবীন্দ্রনাথকে আপন অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করে। কারণ রবীন্দ্রনাথকে তিনি মনে করতেন ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতিমূর্তি বলে। 'ফলে রবীন্দ্রনাথ সুকান্তের কবিতায় এক বিশেষ আদর্শায়িত চেতনার সঞ্চার করেছেন, কাব্যিক ভাষা দিয়েছেন তাঁকে'।[১৬৩] তাই সুকান্তর কবিতার সঙ্গে বাংলা কবিতার ঐতিহ্যক্রমাগত দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতার মূলেতেই পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তাঁর এই মৌলিক চেতনার পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় তাঁর 'ছাড়পত্র' (১৩৫৪), 'ঘুম নেই' (১৩৫৭), 'পূর্বভাস' (১৩৫৭), 'মিঠেকড়া' (১৩৫৮), 'সুকান্ত সমগ্র' (১৩৭৪) প্রভৃতি গ্রন্থের কবিতামর্মের ভেতর দিয়ে। 'সুকান্ত ভট্টাচার্যকে নিয়ে বাংলা কবিতার একটি নতুন অধ্যায়ের শুরু'।[১৬৪] কারণ তিনি শুধু সাম্যবাদের কবি নন — তিনি জনগণের কবি। 'জনগণের চেতনাই তাঁর চেতনা — জনগণের দৃষ্টিই তাঁর দৃষ্টি'।[১৬৫] সুকান্ত বিশ্বাস করতেন সমগ্র সমাজজীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়েই ব্যক্তি জীবনের সার্থকতা। মেজবৌদিকে তাই চিঠিতে জানিয়েছিলেন, 'আমি যে জনতার কবি হতে চাই, জনতা বাদ দিলে আমার চলবে কি করে? তা ছাড়া কবির চেয়ে বড় কথা আমি কমিউনিস্ট, কমিউনিস্টদের কাজ-কারবার সব জনতা নিয়েই'[১৬৬]। চল্লিশের আরেক নিবেদিতপ্রাণ কমিউনিস্ট কর্মী ও কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় :

> কবিতাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে আমাদের যেমন রাজনীতির আসরে ঢুকতে হয়েছিল, সুকান্তর বেলায় তা হয়নি। ... সুকান্তর আগের যুগের লোক বলে আমি পার্টিতে এসেছিলাম কবিতা ছেড়ে দিয়ে; আর সুকান্ত এসেছিল কবিতা নিয়ে। ফলে কবিতাকে সে সহজেই রাজনীতির সঙ্গে মেলাতে পেরেছিল।[১৬৭]

সুকান্তের আগে সাম্যবাদী কবি অভিধায় কবিতা লিখেছেন বিষ্ণু দে, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এঁদের মধ্যে একমাত্র সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন সক্রিয় কমিউনিস্ট

Dhaka University Institutional Repository

কর্মী। 'তবু তাঁরা 'জনতার কবি' হতে পারেন নি। তাঁদের জীবনে রাজনীতি এবং কবিতার মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব ছিল। সুকান্ত ভট্টাচার্যের মধ্যে তা নিয়ে কোনো দ্বন্দ্ব নেই'।[১৬৮] তাঁর রাজনীতিক আদর্শই তাঁর কাব্যের আদর্শ। সমকাল নির্ভর তাঁর কবিতায় তাই অঙ্কিত হয়েছে চল্লিশের যন্ত্রণাবিদ্ধ জনতার আবেগ, অনুভব, কল্পনা এবং তাদের জীবন-সংগ্রামের বলিষ্ঠ চিত্র। অসাধারণ সাফল্যে রূপায়িত হয়েছে শ্রেণি-সংগ্রামের বিচিত্র রূপ।

প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ছাড়পত্র'ই তার সাক্ষ্য। ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ — যুগসন্ধির এই পাঁচটি বছর 'ছাড়পত্রে'র রচনাকাল। এ সময়ে একদিকে যেমন মৃত্যুকীর্ণ যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, বন্যা আর মহামারী নিয়ে সুকান্তের রাজনৈতিক সামষ্টিক জীবন আবর্তিত, তেমনি অন্যদিকে ব্যক্তিগত জীবন প্রতিষ্ঠার মৃত্যুপণ সংগ্রামে তিনি নিরত যুধ্যমান। বহির্বিশ্বেও এ পাঁচ বছর নানান ঘটনায় উন্মাতাল। তাই 'ছাড়পত্রে'র ছত্রে ছত্রে বিধৃত হয়ে আছে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ, ধনিক-বণিকের শোষণ-পেষণে অত্যাচারিত শ্রমজীবী-মজুর-কৃষকের লাঞ্ছনা এবং অধিকার বঞ্চিত মানুষের মুক্তির বাণী। একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে তিনি যেমন সকল আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন, তেমনি শ্রমজীবী, পেশাজীবী মানুষদেরও অংশ নেবার জন্যে তিনি উদ্দীপিত করেছেন। যেসব মানুষের কথা এতকাল কাব্যে উপেক্ষিত ছিল — সেইসব পঙক্তিহীন ব্রাত্যদের কথা 'ছাড়পত্রে'র একাধিক কবিতায় উচ্চারিত হয়েছে। কবির বিশ্বাস বর্তমানে যে সংগ্রাম ও সম্ভাবনা অঙ্কুর মাত্র, ভবিষতে তা বিশাল মহীরূহে পরিণত হবে। গঠিত হবে নতুন সমাজব্যবস্থা। তাই তিনি নিজের রক্তের বিনিময়ে এ পৃথিবীকে জঞ্জালমুক্ত করে ভবিষ্য-প্রজন্মের বাসযোগ্য করার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। 'ছাড়পত্রে'র কবিতাগুলোর মধ্যে 'ছাড়পত্র', 'বোধন', 'রানার', 'লেনিন', 'চিল' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এসব কবিতায় কবি অন্যায়ের বিরুদ্ধে, রাগে-ক্ষোভে ও অসহিষ্ণুতায় এবং নির্বীর্য-উদারতা ও ক্ষমাপ্রবণতার বিরুদ্ধে শাণিত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে অন্যায়কারীকে ধ্বংস করার দুর্জয় সংকল্প ব্যক্ত করেছেন।

সুকান্তের কবিতায় বরাবরই একটা বিদ্রোহের ভাব লক্ষণীয়। তবে গোড়ার দিকে দেশের বস্তুগত অবস্থা বিদ্রোহীভাবের ততটা অনুকূল ছিল না বলে প্রথম পর্বের কবিতায় বিদ্রোহের সোচ্চার ভাব অনেকটা শিথিল। সে সময় তাঁর অনুভব আর্তপীড়িত-শোষিত স্তরের মানুষের প্রতিই নিবদ্ধ। কিন্তু দেশে সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণ, বিদ্রোহ-বিস্ফোরণ যতই বাড়তে লাগল ততই তাঁর কবিতা পরিবর্তমান ভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিবর্তিত হতে থাকল। 'ছাড়পত্র' ও 'ঘুম নেই' কাব্যের কবিতাগুলোর বক্তব্য ও বিষয়বস্তুর মর্ম অনুধাবন করলেই সেটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

'ছাড়পত্র'র সময়ে ছিল আঘাতের পর আঘাতের ঘায়ে মনের বিপর্যস্ত, বিমূঢ় অবস্থা; 'ঘুম নেই' পর্যায়ে শুরু হল 'দিন বদলের পালা'। এল প্রত্যাঘাতের চেতনা, মারের বদলে মার দেবার মনোভাব। চারদিকে একটা অবাধ্যতার অনুভূতি ছড়িয়ে পড়তে লাগল। বিক্ষোভে, বিদ্রোহে, প্রতিবাদে, প্রতিরোধে ফেটে পড়তে চাইল ভারতবর্ষের জনতা। সুকান্ত তাঁর 'ঘুম নেই' কাব্যের মধ্য দিয়ে দেশের মানুষকে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে,

Dhaka University Institutional Repository

পরের বশ্যতা অস্বীকার করে দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ার জন্যে আহ্বান জানালেন। 'বিদ্রোহের গান', 'জনতার মুখে ফোটে বিদ্যুৎবাণী', 'দিনবদলের পালা' প্রভৃতি কবিতায় কবি সর্বহারাদের প্রতি বুকভরা ভালবাসায়, বিদ্রোহের দৃপ্ত বাণীতে অন্যায় ও লোভ-লালসার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন।

'পূর্বাভাস'-এর কবিতাগুলো সুকান্তের বার-তের বছর বয়সের রচনা।[১৬৯] তবুও এ কাব্যের 'ছন্দোনৈপুণ্য, ভাষা মাধুর্য ও বিষয়বস্তুর গভীরতা' দেখে বিমলচন্দ্র ঘোষ সুকান্তকে 'জ্ঞানবৃদ্ধ' বলে আখ্যায়িত করে লিখেছিলেন :

> 'ছাড়পত্র', 'ঘুম নেই' ও 'মিঠে-কড়া'র কবিতাগুলির তুলনায় 'পূর্বাভাসে'র কবিতাগুলি আঙ্গিক ও বিষয়-বস্তুর দিক দিয়ে অপরিণত মনে হলেও ... সূর্যোদয়ের আগে পূর্বাকাশের রক্তিমাভার মত পরিণত পূর্বাভাস এই কবিতাগুলির মধ্যে সুস্পষ্ট।[১৭০]

'পূর্বাভাসে'র কবিতাগুলোর মধ্যেই সুকান্তর সমকালীন চেতনা ও জনতার কবি হয়ে ওঠার ইঙ্গিত আছে।

'মিঠে-কড়া' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত কবিতাগুলো ছড়া জাতীয় রচনা। এগুলো সুকান্ত যখন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদভুক্ত ও কিশোর বাহিনীর পরিচালক তখনকার লেখা। কবিতাগুলোতে ছড়ার মেজাজ ও ভঙ্গিমা পরিস্ফুট হলেও এর প্রতি লাইনে বিধৃত আছে সমকালীন সমাজজীবনের অনাচার-অবিচার-অত্যাচার আর শোষণের বিরুদ্ধে তীর্যক ব্যঙ্গ।

সাম্যবাদী কবি সুকান্তর ঈপ্সিত লক্ষ ছিল শোষক-বঞ্চকদের কবল থেকে সকল শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি। তাই তিনি শ্রমজীবী মানুষের কাতারে নিজেকে সামিল করে ক্ষুদ্র বীজ হিসেবে একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন। তাদের হয়ে সত্য ও ন্যায়ের সংগ্রামে আমৃত্যু লড়ে যাবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। আসলে 'সুকান্তের কাছে বাস্তব আর কল্পনায়, জীবন আর কাব্যে কোন পার্থক্য ছিল না। সুকান্তের জীবনই তার কাব্য, তার কাব্যই তার জীবন'[১৭১]। তাইতো 'কাব্য-সাহিত্যে নতুন যুগকে প্রাণ দিতে' নিজের জীবনকেই উৎসর্গ করলেন তিনি। 'সুকান্তের কবিতায় তাই বাংলা কাব্য-সাহিত্যের নবজন্মের সূচনা'[১৭২] হল। সে কারণেই এ যুগের মহাকবি তিনি।

চল্লিশের দশকের সমাজমনস্ক কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তবে তাঁর সমাজমনস্কতা কোনো সতর্ক রাজনীতির ঘেরা-টোপে আবদ্ধ নয়। সাম্যবাদী চেতনায় সুপরিকল্পিত সমাজ রূপায়ণও তাঁর অভিপ্রেত নয়। যদিও তিনি ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন; যুক্ত ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গেও। তবুও কবিতা রচনায় নির্দিষ্ট বক্তব্য বা রীতি অনুসরণ করার ধরাবাঁধা নিয়ম মানার ছিলেন বিরোধী। তিনি আঙ্গিক ও বিষয়ের ক্ষেত্রে সবসময় নিজের মতো থাকতেই পছন্দ করেছেন।[১৭৩] তিনি বিপন্ন স্বদেশের বিপন্ন মানুষ সম্পর্কে অনুভব করেছেন তীব্র আবেগ। এই হার্দিক-সংযোগ থেকেই সমাজ প্রত্যক্ষ হয়েছে তাঁর কবিতায়। তাঁর কবিমানসের ক্রমপরিণতির যাত্রাপথে কোনো ব্যক্তি নয়, বিশ্বের সমগ্র ক্ষুধার্ত, লাঞ্ছিত, শোষিত মানুষের সঙ্গে তাঁর মানস আত্মীয়তার কথা উচ্চারিত হয়। সমস্ত মানুষের জন্যেই তিনি কামনা করেন শান্তির নীড়।

Dhaka University Institutional Repository

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা চর্চা চল্লিশের দশকে শুরু হলেও লিখেছেন আশির দশক পর্যন্ত। তাই তাঁর কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা অনেক। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাব্যগুলো হচ্ছে : 'গ্রহচ্যুত' (১৯৪২), 'রাণুর জন্য' (১৯৫১), 'উলুখড়ের কবিতা' (১৯৫৪), 'মৃত্যুত্তীর্ণ' (১৯৫৫), 'লখিন্দর' (১৯৫৬) 'তিন পাহাড়ের স্বপ্ন' (১৯৬৩), 'মুখে যদি রক্ত ওঠে' (১৯৬৪), 'মানুষের মুখ' (১৯৬৯), 'মুণ্ডহীন ধড়গুলি অহ্লাদে চিৎকার করে' (১৯৭১), 'মানুষ খেকো বাঘেরা বড় লাফায়' (১৯৭৩), 'পৃথিবী ঘুরছে' (১৯৭৫), 'আমার কবিতা' (১৯৮৫) ইত্যাদি।

১৯৪১-এ প্রকাশিত 'গ্রহচ্যুত' এবং ১৯৫১-এ প্রকাশিত 'রাণুর জন্য' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলোকে মোটামুটিভাবে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চল্লিশের দশকে রচিত কবিতা বলা যেতে পারে। এছাড়া এ দশকে যৌথভাবে 'পেট্রল ও অন্যান্য কবিতা' (নির্মল সেনের সঙ্গে, ১৩৫১), 'নতুন মাস' (পীযুষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে, ১৩৫৩) ও ''২৬শে জানুয়ারি' (নরেন সেনগুপ্তের সঙ্গে, ১৩৫৩) কাব্যগুলো প্রকাশ পায়। এবং আশ্চর্যভাবে লক্ষণীয় চল্লিশের দশকে তিনি সাম্যবাদে সম্পৃক্ত হয়েও এই উত্তাল দশকের দুরন্ত বিদ্রোহ, ভয়ংকর মন্বন্তর, বীভৎসতম দাঙ্গা, সর্বহারার বিক্ষোভ, স্বাধীনতা, উদ্বাস্তু সমস্যা, কৃষক আন্দোলন ইত্যাদির কোনো কিছুতে তেমন বিচলিত হলেন না। তিনি বেছে নিলেন 'জীবনানন্দের আত্মগতবোধ ও অস্তিচেতনা, নজরুলের রোমান্টিক কারুণ্য ও প্রলয়মত্ততা এবং প্রতিকূলতার মুখেও রবীন্দ্রনাথের স্থির প্রত্যয়বোধ'[১৭৪]। এগুলোর মিশ্রণে গড়ে তুললেন তাঁর নিজস্ব চেতনালোক।

'গ্রহচ্যুত' কাব্যসংকলন সম্পর্কে সুমিতা চক্রবর্তী মন্তব্য করেন :

> [গ্রহচ্যুত] অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলি — একটি বাদে সবই প্রেম-উপলব্ধির লিরিক। 'ভালোবেসে দুজনাতে এ ধরায় স্বর্গ রচিয়াছি' — এই জাতীয় অত্যন্ত গতানুগতিক ভাব-ভাষায় লেখা কবিতা।[১৭৫]

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার প্রধান সুর মানবতাবোধ। তাই তাঁর 'গতানুগতিক ভাব-ভাষায় লেখা' প্রেমের কবিতার পাশাপাশি দেখা যায় ফ্যাসিবাদ, মন্বন্তর প্রভৃতির নির্মম আঘাতে জর্জরিত 'ব্রাত্য' জীবনের দুর্দশার চিত্র। '২৬শে জানুয়ারি'র অন্তর্গত বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় আছে তেতাল্লিশের মন্বন্তরে 'সবুজের চাষ' করা কৃষকের 'বস্ত্রহীন' হবার বর্ণনা। যে কৃষক-শ্রমিক রক্ত-ঘাম ঝরিয়ে ধনীর ঘরে ব্যসনের যোগান দেয় — তাদের সামান্য রুটির ক্ষুধায় ফুটপাতে নির্ঘুম রাত কাটানোর কাহিনী। শেষ পর্যন্ত তিনি প্রত্যয়সিদ্ধ হয়ে ঘোষণা করেন, যে চাষী মজুর সুদীর্ঘ বঞ্চনার অভিঘাতে জরা-মৃত্যু-মন্বন্তরে জর্জরিত হয়, তারাই অত্যাচারী ও ধনিকের মৃত্যু ডেকে আনবে। 'নতুন মাস'-এর অন্তর্গত তাঁর কবিতাগুচ্ছে তিনি গণমানুষের জীবনের অন্ধকারকে দূর করে আলো দেখানোর জন্যে প্রমিথিয়ুসকে আহ্বান জানান। চল্লিশের দশকে রচিত বিভিন্ন কবিতায় বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের মুক্তির পথ সন্ধান করেছেন।

তাঁর সমকালীন কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত বলেন :

Dhaka University Institutional Repository

> তাঁর [বীরেন্দ্র] বিশেষত্ব এইখানে যে, তিনি ভিন্নমুখী বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে প্রায় একই সময়ে বিভিন্ন মেজাজের কবিতা রচনায় উৎসাহী এবং ক্ষোভের কবিতার পাশাপাশি প্রেমের এবং প্রেমের কবিতার পাশাপাশি তীব্র ব্যঙ্গের কবিতা কিংবা যন্ত্রণার সমাবেশ ঘটিয়ে কবিতাকে প্রায় সর্বত্রগামী করার কৃতিত্ব তাঁর প্রাপ্য।[১৭৬]

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রাজনীতি সচেতন কবিতা প্রতিষ্ঠা পায় পঞ্চাশ-ষাটের দশকে। কিন্তু সেখানেও কবির অন্বিষ্ট স্বদেশ ও স্বদেশের সাধারণ জনতা। একদিকে তাঁর কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে ভ্রষ্টাচার শাসকের অত্যাচারের প্রতিবাদ, ভণ্ডনেতা-কবি-সাংবাদিককুলের মুখোশ উন্মোচনে তীক্ষ্ণকণ্ঠ শ্লেষাত্মক ও নির্মম বাণী; অন্যদিকে সাধারণ, উৎপীড়িত, সংগ্রামী-শ্রমজীবী মানুষের প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তাঁর গভীর মমতা ও স্নিগ্ধ ভালবাসা। মোট কথা 'মানুষকেই তিনি ভেবেছেন শক্তির উৎস হিসেবে, যে-মানুষ হয়তো একদিন পৌঁছে যাবে কোনো মুক্তির লক্ষ্যে'[১৭৭]। আর এখনেই বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্বাতন্ত্র্য।

চল্লিশের দশকে সাম্যবাদের উজ্জীবন মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে 'দায়বদ্ধ কবি' হিসেবে কবিতা চর্চা শুরু করলেও যাঁদের কবিকৃতি প্রকাশ পেয়েছে পঞ্চাশ কিংবা ষাটের দশকে এবং সে-সময়েই অর্জন করেছেন বিশিষ্টতা, তাঁদের মধ্যে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী অন্যতম। কাব্যচর্চার প্রথম দিকে সাম্যবাদে আস্থাশীল হলেও তিনি কোনো ধরাবাঁধা পথে কবিতাকে বেঁধে রাখেন নি। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'নীল নির্জন' (১৯৫৪)-এ রোমান্টিকতার অন্তর্লক্ষণ যুক্ত কবিতার প্রাধান্য লক্ষ করা গেলেও দ্বিতীয় কাব্য 'অন্ধকার বারান্দা'তেই (১৯৬০) লক্ষিত হয় কবির সমকাল সচেতনতার প্রখর উপস্থিতি। বস্তুত নীরেন্দ্রনাথের প্রায় সমগ্র কাব্যজগত জুড়েই রোমান্টিক ভাবাবেগের সঙ্গে মিশে আছে মানুষ, বিশেষত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের প্রসঙ্গ। তাঁদের সুখ-দুঃখ, স্বপ্ন-কল্পনা, উদ্যম-নিষ্ক্রিয়তার চিত্র। মূলত তিনি তাঁর কবিতায় ধারণ করেছেন 'বৃত্তাবদ্ধ, অবসাদগ্রস্ত আধুনিক মানুষের অস্তিত্বের স্বরূপ'[১৭৮]।

একনিষ্ঠ কমিউনিস্ট কর্মী ও কবি গোলাম কুদ্দুস-এর চল্লিশের কবিতাগুলো নিয়ে প্রথম গ্রন্থ 'বিদীর্ণ' আত্মপ্রকাশ করে ১৯৫১ সালে। তাঁর কাব্যে বর্ণিত আছে দেশবিভাগজনিত যন্ত্রণা ও পাকিস্তানি সেনাদের অকথিত অত্যাচারের কাহিনী। তেভাগা আন্দোলনের অবিসংবদিত নেত্রী ইলা মিত্রের উপর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অমানুষিক নির্যাতনের চিত্র বিধৃত আছে তাঁর 'ইলা মিত্র' (১৯৫৩) কাব্যের কবিতায়।

চল্লিশের দায়বদ্ধ কবি সিদ্ধেশ্বর সেনও তাঁর নিজস্বতা খুঁজে পেয়েছিলেন পঞ্চাশের দশকে। তেতাল্লিশের মন্বন্তর, ছেচল্লিশের দাঙ্গা, সাতচল্লিশে দেশবিভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা প্রভৃতির প্রত্যক্ষদর্শী কবির নানান কবিতায় উঠে এসেছে সমকালীন বিভিন্ন সমস্যা ও সংকটের প্রতীকী চিত্র। সেই সঙ্গে তাঁর আন্তরিক সহানুভূতির স্পর্শ পেয়েছে দারিদ্র্যক্লিষ্ট সাধারণ মানুষ। এই মানুষের মুক্তির জন্যে কবি অনুভব করেন স্বপ্নময় জাগরণ এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের ব্রত নিয়ে এগিয়ে চলেন আপন প্রাতিস্বিকতায়। সিদ্ধেশ্বর সেনের উল্লেখযোগ্য কাব্যগুলো হচ্ছে : 'আয়না-আঁটা সপ্ততলা' (১৯৮৩), 'তোমরা শুধু মানুষ' (১৯৮২), 'দীর্ঘায়ু অমর তৃষায়' (১৯৮৩) ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়াও চল্লিশের দশকের শেষভাগে সমাজমনস্ক দায়বদ্ধ কবিতার ধারায় আত্মনিয়োগ করে পরবর্তীকালেও লেখনী সচল রেখেছেন তাঁদের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্ব বসু, ধনঞ্জয় দাশ, রাম বসু, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণ ধর প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা প্রত্যেকেই স্ব-স্ব কাব্যপ্রতিভায় স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছিলেন।

কলকাতার বাইরে তৎকালীন পূর্ববাংলার ঢাকাও ত্রিশের দশক থেকেই আধুনিক কবিতা চর্চার কেন্দ্র হিসেবে সুপরিচিত হয়ে ওঠে। চল্লিশের দশকে 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ' স্থাপিত হলে ঢাকাতেও প্রগতি সাহিত্যের আন্দোলন বেগবান হয়। সে সময় এ সংঘের সক্রিয় সদস্য ছিলেন রণেশ দাশগুপ্ত, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, সোমেন চন্দ, অচ্যুত গোস্বামী, অজিত দত্ত প্রমুখ প্রতিশ্রুতিশীল কবি ও সাহিত্যিক।

রণেশ দাশগুপ্ত ছিলেন পূর্ববাংলার প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের পথিকৃৎ ও কমিউনিস্ট কর্মী (১৯১২-১৯৯৭)। তাঁর প্রথম লেখা 'গোর্কির পরিচয়' প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে নলিনীকিশোর গুহ সম্পাদিত 'সোনার বাংলা' পত্রিকায়। তখন থেকেই রাজনীতির মতো তাঁর সাহিত্যের বিষয়ও স্থির হয়ে যায়। তিনি লিখেছেন আমৃত্যু এবং মূলত প্রবন্ধই বেশি লিখেছেন। সাম্যবাদের কষ্টিপাথরে যাচাই করে সাহিত্যের শিল্পমূল্য নির্বাচনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন রণেশ দাশগুপ্ত। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে 'উপন্যাসের শিল্পরূপ' (১৯৫৯), 'শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে', 'আলো দিয়ে আলো জ্বাল', 'সাম্যবাদী উত্থান প্রত্যাশা : আত্মজিজ্ঞাসা' (১৯৯৫) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বর্তমান অভিসন্দর্ভের অবতারণা যাঁকে নিয়ে সেই কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত কবিতা চর্চা শুরু করেন ১৯৩৬ সাল থেকে। ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কবিতার বই 'স্বপ্ন-কামনা'—যার ভূমিকা লিখেছিলেন জীবনানন্দ দাশ। চল্লিশের দশকের শুরুতে ফ্যাসিবাদ বিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়ে সাম্যবাদের আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন তিনি এবং রোমান্টিক কবি থেকে নিজেকে 'সমাজমনস্ক, প্রগতিমুখী ও প্রতিবাদী'[১৭৯] কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কবিকৃতিগুলো হচ্ছে : 'নতুন আঁচড়' (১৯৪৩), 'স্বর ও অন্যান্য কবিতা' (১৯৫৩), 'দিনযাপন' (১৯৬২), 'মানুষ জানে' (১৯৮৫), 'ভিতরে-বাইরে' (১৯৯৪) ইত্যাদি।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের কবিতার অন্যতম মূল সুর সমাজ ও মানবচেতনা। সমাজ ও সময়ের কাছে দায়বদ্ধ কবি কখনোই মানুষের থেকে সরে আসেন নি।

'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘে'র অন্যতম পুরোধা নিবেদিতপ্রাণ কমিউনিস্ট কর্মী ও কথাসাহিত্যিক সোমেন চন্দ (১৯২০-১৯৪২) ১৯৩৭-এ 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'শিশু তপন' গল্পের মধ্য দিয়ে সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রথম আবির্ভূত হন। তাঁর প্রথম দিকের রচনায় রোমান্টিক প্রবণতা লক্ষ করা গেলেও কমিউনিস্ট মতবাদে বিশ্বাস স্থাপন করে তিনি অচিরেই সে প্রভাব কাটিয়ে উঠলেন। সোমেন চন্দ ছিলেন সক্রিয় কমিউনিস্ট কর্মী, শ্রমজীবী মানুষের নেতা। তাই তিনি বাস্তব-সচেতন সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা মিশিয়ে তাঁর গল্পগুলোকে একটা উন্নততর অবস্থানে পৌঁছে

Dhaka University Institutional Repository

দিলেন। সোমেন চন্দ অত্যন্ত সচেতনভাবেই নতুন বিষয়বস্তু ও নতুন বিষয়ের উপযোগী ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি আয়ত্ত করে লিখলেন 'সংকেত' (১৯৩৮, রবি-বাসরীয় আনন্দবাজার), 'বনস্পতি' (১৯৪০, ক্রান্তি সংকলন), 'ইঁদুর' (১৯৪২, মাসিক পরিচয়), 'দাঙ্গা' (১৯৪২, পাক্ষিক প্রতিরোধ) প্রভৃতি অসামান্য গল্প এবং 'বন্যা' উপন্যাস।

অপরিণত বয়সে রাজনীতির প্রতিহিংসার শিকার হয়ে সোমেন চন্দের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় তাঁর দুটি গল্পগ্রন্থ : 'সংকেত ও অন্যান্য গল্প' (১৯৪২) এবং 'বনস্পতি' (১৯৪৩)।

'বাংলা উপন্যাসের ধারা' (১৯৫৮) গ্রন্থের লেখক অচ্যুত গোস্বামীও ঢাকার প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হন ১৯৩৮-এ রণেশ দাশগুপ্তের আমন্ত্রণে। 'শিল্প-সাহিত্য বিষয়ে সেই সময় থেকে শুরু করে আমৃত্যু চল্লিশ বছরের বেশি সময় ধরে অচ্যুত গোস্বামী সমাজসচেতনমূলক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি পক্ষপাত কখনো বর্জন করেন নি'।[১৮০] কথাসাহিত্যিক ও প্রবন্ধকার অচ্যুত গোস্বামীর প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যা পাঁচটি। লিখেছেন কিছু গল্পও।

'চল্লিশের দশকে একদিকে মার্কসবাদী চিন্তা প্রলবলতার [প্রবলতর] অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্ব-সচেতনতার পরিবেশে আর একদল তরুণ কবির আবির্ভাব ঘটে'।[১৮১] এইসব তরুণ কবিরা নতুন বক্তব্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা, বাকরীতি ও ভঙ্গিতে নতুনত্ব আনতে সচেষ্ট হন এবং এঁদের মধ্যে আহসান হাবীব (১৯১৭-১৯৮৫), ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪), সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৭-১৯৭৫), সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০৩), আবুল হোসেন (১৯১৮-১৯৭৫) প্রমুখ স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেন। মূলত 'বিভাগপূর্ব বাংলাদেশে কলকাতা জীবনেই এঁদের কাব্য সাধনার শুরু। কিন্তু পাকিস্তান-আন্দোলনের সাংস্কৃতিক প্রভাবে ফররুখ-তালিমের কবিতা গোড়া থেকেই আহসান হাবীব-আবুল হোসেনের ধারা থেকে পৃথক হয়ে গেছে। সেই পার্থক্য প্রথমত প্রেরণাগত, দ্বিতীয়ত প্রকাশগত'[১৮২]।

চল্লিশের দশকের সমাজসচেতন ও জীবনধর্মী কবি আহসান হাবীব 'পূর্ববঙ্গের কাব্য আন্দোলনের এক অন্যতম কবি'[১৮৩]। তিনি দেশ-কাল ও সমাজভাবনাকেই মূলত তাঁর কাব্যে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর কবিতায় 'ব্যক্তি ও সমাজের টানাপোড়েন, দায়বদ্ধতার সূক্ষ্মবোধ, নৈর্ব্যক্তিকতা, অস্তিচেতনা, সহজ মর্মভেদী প্রতীকোৎসারী ভাষাভঙ্গি'[১৮৪] তাঁকে আধুনিক কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার দুবছরের মধ্যে প্রকাশিত হয় আহসান হাবীবের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'রাত্রিশেষ' (১৯৪৭)। এ কাব্যের অধিকাংশ কবিতাই কবির সমাজ-সম্পৃক্তবোধ থেকে উৎসারিত। 'রাত্রিশেষ' কাব্যে কবির শিল্পীমানসের ক্রমপরিণতিকে নির্দেশ করতে 'প্রহর', 'প্রান্তিক', 'প্রতিভাস' ও 'পদক্ষেপ' — এই চার পর্বে ভাগ করে দেখিয়েছেন। 'প্রহর' পর্যায়ে কবির যে হতাশা তার উত্তরণ ঘটেছে 'প্রান্তিক' পর্যায়ে কবির সমাজমনস্কতায়, রাজনৈতিক সচেতনতায় এবং ইতিহাসবোধের যুক্তিগ্রাহ্য

Dhaka University Institutional Repository

পরিণতিতে। নিস্তরঙ্গ জীবন আর নস্টালজিয়া-তাড়িত অতীতকে নিয়েই 'প্রতিভাস' পর্বের কবিতাগুলো উজ্জ্বল এবং 'পদক্ষেপ' পর্বে এসে আলোকিত বিশ্বের স্বপ্নে বিভোর হলেন কবি।

'রাত্রিশেষ' কাব্যে প্রবল হতাশার মধ্য থেকে আশাবাদের এই যে উদ্বোধন — এই ইতিবাচক জীবনবীক্ষাই আহসান হাবীবের কাব্যের মৌল বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তেতাল্লিশের মন্বন্তরের পটভূমিকায় রচিত কবিতাগুলো নিয়ে প্রকাশিত হয় আহসান হাবীবের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ছায়া হরিণ' (১৯৬২)। 'রাত্রিশেষ' কাব্যে আলোকে উদ্ভাসিত পৃথিবীর যে ইঙ্গিত প্রকাশ পেয়েছিল 'ছায়া হরিণ' কাব্যে তারই অনুরণন ধ্বনিত হয়েছে। তবে আশাবাদের পাশাপাশি প্রকৃতি, স্বদেশ প্রেম, ইতিহাস ও বিশ্ববোধের সম্পৃক্তি 'ছায়া হরিণ'কে দান করেছে এক অপূর্ব ব্যঞ্জনা।

'আহসান হাবীবের কবিতায় কেন্দ্রীয় প্রসঙ্গ হচ্ছে মানুষ। অবশ্য এমন মানুষ যার নিবিড় সংযোগ রয়েছে দেশকালের সঙ্গে, সমাজের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে যে প্রতিনিয়ত আপন অস্তিত্ব রক্ষায় উন্মুখ'।[১৮৫] তাঁর 'সারাদুপুর' (১৯৬৪), 'আশায় বসতি' (১৯৭৫), 'মেঘ বলে চৈত্রে যাবো' (১৯৭৬), 'বিদীর্ণ দর্পণে মুখ' (১৯৮৫) প্রভৃতি কাব্যের কবিতায় লক্ষ করা যায় এই অস্তিত্বের বোধে মানবিক অনুষঙ্গ আর দেশ-চেতনার সরল উপস্থিতি। আহসান হাবীব সমকালীন তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতিতে কখনো বিচলিত হন নি। এমন কি চল্লিশের সবচেয়ে আলোচিত সাম্যবাদও তাঁকে আলোড়িত করে নি। কবিবন্ধু সৈয়দ আলী আহসান তাই লিখেছেন :

> আহসান হাবীব আপন নির্জনতার সত্য থেকে কখনও বিচলিত হন নি। [...] [...] অস্তিত্বকে মেনে নিয়েই তাঁর কাব্যজীবনের সিদ্ধি। যেমন ব্যক্তিগত জীবনে তেমনি কবি জীবনে একটি নিরুপদ্রব শান্তির আশায় তাঁর বসতি। বৃক্ষছায়া যেমন সত্য, কল্লোলিত নদী যেমন একটি সুনিশ্চয় কলকণ্ঠ, আহসান হাবীব তেমন একজন যথার্থ কবি।[১৮৬]

ইসলামি রেনেসাঁর কবি 'ফররুখ আহমদ প্রথম পর্যায়ে (১৯৩৫-১৯৪১) আকৃষ্ট হয়েছিলেন সমকালীন বামপন্থী রাজনীতির প্রতি'[১৮৭]। সাম্যবাদী অনুভবজাত তাঁর কবিতাগুলো তৎকালীন 'কবিতা', 'পরিচয়', 'অরণি', 'নবযুগ', 'নবশক্তি' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ফররুখ আহমদের 'হে বন্য স্বপ্নেরা' (১৯৭৬) কাব্যগ্রন্থে এইসব সাম্যবাদী কবিতার কয়েকটি সংকলিত হয়েছে। তাঁর সাম্যবাদী কবিতাগুলোতে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রভাব লক্ষযোগ্য।

চল্লিশের গোড়ার দিকেই ফররুখ আহমদের কাব্য ভাবনায় পরিবর্তন লক্ষিত হয়। তখন সমগ্র ভারত জুড়ে মুসলিম স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার যে আন্দোলন চলছিল তারই ভিত্তিতে তাঁর কাব্য-চেতনা উজ্জীবিত হয়ে ওঠে এবং ধর্মীয় পুনর্জাগরণে বিশ্বাসী কবির কবিতায় নতুন প্রেরণায় ও নতুন ছন্দে প্রকাশিত হয় ইসলামের অতীত কীর্তি বিজড়িত বিভিন্ন কাহিনী-কিংবদন্তি। আর এই ধর্মীয় পুনর্জাগরণে ব্রতী, সৌন্দর্যদীপ্ত শিল্প সার্থক প্রকাশনাই ফররুখ আহমদকে বাংলা কাব্যে স্বতন্ত্র কবি-সত্তায় প্রতিষ্ঠিত করে।

Dhaka University Institutional Repository

ফররুখ আহমদের আগে কাজী নজরুল ইসলাম ও আরো কোনো কোনো কবির কাব্যে ইসলামের পুনর্জাগরণের বাণী ধ্বনিত হলেও পূর্ববর্তীদের চেয়ে ফররুখ আহমদের এ বোধ অনেক বেশি প্রখর। কবির সমসাময়িক কালের আরেকজন কবি তাই বলেন :

> ফররুখ আহমদ তাঁর পূর্ববর্তী কবিদের কাব্যধারা থেকে স্বতন্ত্র একটি ধারা নির্মাণ করেছিলেন এবং এর ফলে তিনি বিশিষ্ট এবং এককরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাঁর সমসাময়িক যাঁরা তাঁদের থেকেও তিনি বিশিষ্ট এবং অনন্য ছিলেন।[১৮৮]

চল্লিশের দশকের প্রধান চরিত্রলক্ষণ 'সমাজচেতনা, স্বতন্ত্র সংস্কৃতিচেতনা এবং রোম্যান্টিকতা'[১৮৯] মিলেমিশেই ফররুখ আহমদের কবি প্রকৃতির গঠন। তবে অচিরেই তাঁর কাব্যের মূল সুর হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায় স্বতন্ত্র সংস্কৃতিচেতনা। কিন্তু সমাজচেতনা ও রোমান্টিকতা কোনো সময়ই তাঁর কবিতা থেকে একেবারেই অপসৃত হয়ে যায় নি।

ফররুখ আহমদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সাতসাগরের মাঝি' প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ সালে। রোমান্টিকতার চূড়া স্পর্শী এ কাব্যে কবি ঘুমন্ত মুসলমান জাতিকে মোহনিদ্রা ত্যাগ করে নতুন জীবনপথে যাত্রা শুরু করার আহ্বান জানিয়েছেন। এবং অপরাজেয় জীবনের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করেছেন আরব্য উপন্যাসের দুঃসাহসী অভিযাত্রী সিন্দবাদকে। এ কাব্যে ফররুখ আহমদ প্রতীকের আধারে ইসলামি ঐতিহ্য ও আদর্শের সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়ে কবি হিসেবে তাঁর বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করেন।

ফররুখ আহমদের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'আজাদ কর পাকিস্তান' (১৯৪৬) পাঁচটি গান ও পাঁচটি কবিতার সংকলন। ১৯৪১ থেকে ১৯৪৬ সালের মধ্যেই এগুলো রচনা করা হয়। তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'সিরাজাম মুনীরা'তেও (১৯৫২) চল্লিশের দশকে লেখা কবিতাগুচ্ছের সাক্ষাত পাওয়া যায়। 'সিরাজাম মুনীরা'য় কবি মুসলমানদের অতীতের গৌরবদীপ্ত যুগকে কেন্দ্র করে বর্তমান জীবনকে পুনর্গঠনের আহ্বান জানিয়েছেন।

চল্লিশ-পরবর্তী ফররুখ আহমদের উল্লেখযোগ্য কাব্যগুলো হচ্ছে : 'নৌফেল ও হাতেম' (১৯৬১), 'মুহূর্তের কবিতা' (১৯৬৩), 'হাতেমতায়ী' (১৯৬৬) প্রভৃতি।

ইসলামি ঐতিহ্য ফররুখ আহমদের কবিতার প্রধান উপকরণ হওয়াতে তাঁর রচনায় আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়। তবে ফররুখ আহমদের কবিতার আঙ্গিক ও কবিভাষার শিল্পসম্মত পরিণতিই তাঁর কাব্যের সাফল্যের চাবিকাঠি। আবদুল মান্নান সৈয়দের সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করে তাই বলা যায় :

> আরবি-ফারসি শব্দ প্রয়োগের বিচিত্র পরীক্ষা; কবিকে আত্মব্যক্তিক থেকে মুক্তি দিয়ে একটি জনগোষ্ঠীর স্বপ্ন, আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষায় উত্তীর্ণ করা — এইসব গুণ ও লক্ষণে ফররুখ আহমদ চল্লিশের কবিদের মধ্যে শুধু বিশিষ্ট নন্, একক ও তুলনারহিত।[১৯০]

চল্লিশের সময়সচেতন কবি আবুল হোসেন। তাই 'বাংলা কবিতার উচ্ছ্বাস, আবেগ এবং উচ্চসুরকে কৌশলের সঙ্গে পরিহার করে আবুল হোসেন আধুনিক কালের সময় সচেতনতায় আপন কবিতাকে উন্মুখর করেছিলেন'।[১৯১] তিনি প্রধানত মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার।[১৯২] তবে শুধু মধ্যবিত্ত জীবন সমস্যার রূপচিত্রণই নয়, সেই সঙ্গে

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বৃহত্তর দেশ ও সমাজজীবন সংকট-সমস্যার চিত্রও তাঁর কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। সৈকত আসগরের ভাষায় :

> তাঁর কবিতায় শুধু মানুষ এবং প্রকৃতিই বড়ো হয় নি। তিনি লিখেছেন অল্প, এবং সে অল্প লেখার মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছেন সমাজভাবনাকে। ঐতিহ্য-অবচেতনা ও লোক-জীবনকে, কালচেতনা-ইতিহাসচেতনা ও স্বদেশ ভাবনাকে, প্রেমভাবনা কিংবা বিজ্ঞান ভাবনাও তাঁর কবিতায় আছে, রাজনীতিও তঁর কবিতা থেকে নির্বাসিত নয়।[১৯৩]

আবুল হোসেনের প্রথম দিককার কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব লক্ষ করা যায়। তিনি তাঁর প্রথম কাব্য 'নব বসন্ত' (১৯৪০) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করেছিলেন। 'নব বসন্ত' কাব্যে কবির রোমান্টিক হৃদয়ের অন্তরঙ্গ আবেগ এবং অনুভূতির স্বচ্ছন্দ ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ লক্ষণীয়। 'নিষ্ঠুর সময়ের' পটভূমিতে ব্যক্তিগত নৈসঙ্গ্যবোধ এবং মধ্যবিত্তের সীমাবদ্ধ জীবনকেই 'নব বসন্ত' কাব্যের উপজীব্য করে তোলা হয়েছে। কবিতার শিল্প প্রকরণে কথ্য ভাষা রীতির নিপুণ ব্যবহারে তিনি আধুনিক স্বভাব পরিগ্রহ করেছেন। তাঁর সমকালীন কবি সৈয়দ আলী আহসান বলেন :

> চল্লিশের দশকের কবিদের মধ্যে যারা সাম্প্রতিক আঙ্গিককে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করে আপন স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাদের মধ্যে আবুল হোসেন একজন।[১৯৪]

আবুল হোসেনের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'বিরস সংলাপ' (১৯৬৯) প্রকাশিত হয় প্রথম কাব্য প্রকাশের তিরিশ বছর পর। ১৯৮২ সালে প্রকাশিত হয় তৃতীয় কবিতার বই 'হাওয়া তোমার কি দুঃসাহস'। এসব কাব্যগ্রন্থেও কবির সমকালীন জ্বালা-যন্ত্রণা, মানুষের অসহায়তা এবং বিক্ষুব্ধ কর্মের শাসনের কথা ব্যক্ত হয়েছে। অত্যন্ত সহজ-সরল বাণীর ভেতর দিয়ে উঠে এসেছে সমকালীন সমাজের চিত্র। আমাদের জীবনের চারপাশের গতানুগতিকতা, প্রাত্যহিকতা — অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় ফুটে উঠেছে তাঁর কাব্যে। তাই হাসান হাফিজুর রহমান আবুল হোসেনকে পূর্বপাকিস্তানের উদ্যোক্তা আধুনিক কবিদের মধ্যে প্রথম আধুনিক কবি হিসেবে আখ্যায়িত করে লিখেছেন :

> আধুনিক কবিতার মৌল স্বভাবটি তিনি সবচেয়ে ভালো বুঝতে পেরেছিলেন।[১৯৫]

তিনি বিচিত্র ছন্দে-চিত্রকল্পে এবং বৈচিত্র্যময় শব্দ-প্রয়োগে যথেষ্ট শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়ে বাংলা কবিতাঙ্গনে নিজের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

চল্লিশের দশকে ইসলামি ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কবিতা চর্চা শুরু করলেও পরবর্তীতে পাশ্চাত্য কাব্যবোধে উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন সৈয়দ আলী আহসান। চল্লিশের গোড়ার দিকে তিনি 'আলাউল প্রমুখ পূর্বসূরি বাঙালি মুসলিম সাহিত্যিকদের রচনা ও বিশেস[ষ] করে পুঁথিসাহিত্য থেকে অনুপ্রেরণা আহরণে সচেষ্ট হন এবং ভাবপ্রকাশের জন্য নজরুলের মতো আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারে আগ্রহী হন'[১৯৬]। পুঁথিসাহিত্যের অনুকরণে এসময়কালের লেখা কবিতাগুলো নিয়ে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'চাহার দরবেশ' (১৯৪৫)। প্রকাশের পর 'চাহার দরবেশে'র কবিতাগুলো তাঁকে একটা অতৃপ্তির পীড়া দিতে থাকে। ফলে তাঁর কাব্যের ভাব বদল হয় এবং 'ইসলামি ভাবাবহ অনুষঙ্গ ত্যাগ করে তিনি আধুনিক বিষয়বস্তু এবং ভাষারীতি গ্রহণে উন্মুখ হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

ওঠেন'[১৯৭]। সৈয়দ আলী আহসান চল্লিশের দশকের কবিতার প্রধান ধারা সাম্যবাদী সামষ্টিক চিন্তা-চেতনাকে সম্পূর্ণ পরিহার করে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদে বিশ্বাস স্থাপন করেন। তিনি উপলব্ধি করেন কবিতার জন্যে শুধু নতুন বক্তব্যই প্রয়োজনীয় নয়, সেই সঙ্গে প্রয়োজন নতুন আঙ্গিক ও বাক্‌প্রতিমা। তবে সৈয়দ আলী আহসান এক মতাদর্শে কখনো সুস্থিত হতে পারেন নি। সমসাময়িক কবিদের মতো কোনো একটা নির্দিষ্ট আদর্শ আঁকড়ে থাকার মতো মানসিক সুস্থিরতা তাঁর ছিল না। হাসান হাফিজুর রহমানের বক্তব্যে এ ধারণা পরিষ্কার হয়ে যায় :

> ক্রান্তিকালের অস্থিরতায় তিনি যেন আগে থাকতেই অসংলগ্ন। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সমসাময়িক অনেক উৎক্ষেপ ছুঁয়ে গেছেনই শুধু — মানসিক কিংবা চেতনাগত দিক থেকে এই যুগাদর্শ সামগ্রিকভাবে তাঁর মনের পরম নির্ভরযোগ্য আশ্রয় হিসেবে স্থায়ী হতে পারে নি শেষ পর্যন্ত। এ কারণে লক্ষণীয় যে, সৈয়দ আলী আহসানের ধর্ম-ভিত্তিক আদর্শ-চেতনা আছে, কিন্তু তার ধারাবাহিকতা নেই; কাল ও পরিস্থিতি সম্পৃক্তি রয়েছে, কিন্তু সেটাও বিচ্ছিন্ন প্রক্ষেপের ঊর্ধ্বে উঠে কোনো ধারণাগত পারম্পর্যে প্রসারিত নয়।[১৯৮]

'অনেক আকাশ' (১৯৫৯), 'একক সন্ধ্যায় বসন্ত' (১৯৬২), 'সহসা সচকিত' (১৯৬৬), 'সমুদ্রেই যাব' (১৯৮৫) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থে সৈয়দ আলী আহসানের এই অস্থির কবিচৈতন্যের ছাপ সুস্পষ্ট। তবে সেই সঙ্গে একথাও স্মরণযোগ্য যে এই নানান আবর্তনের ফলে তাঁর কবিতার ভাব-প্রবাহও হয়েছে বিচিত্রমুখী। প্রেম, প্রকৃতি, স্বদেশ প্রেম, ঐতিহ্যচেতনা, সময়সচেতনতা, সমাজ, রাজনীতি এমন কি বিজ্ঞান চেতনাও তাঁর কবিতায় নতুন আঙ্গিক ও ভাষাভঙ্গিতে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। এখানেই আধুনিক কবি হিসেবে সৈয়দ আলী আহসানের সার্থকতা।

এছাড়াও যাঁদের কবিসত্তার উন্মেষকাল চল্লিশের দশকে কিন্তু কবিপ্রতিষ্ঠা পঞ্চাশ কিংবা ষাটের দশকে — তাঁদের মধ্যে সিকান্‌দার আবু জাফর (১৯১৯-১৯৭৫), তালিম হোসেন (১৯১৮-১৯৯৯) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

সিকান্‌দার আবু জাফরের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রসন্ন প্রহর' (১৯৬৫)-এ বিধৃত আছে ১৯৪০-'৪৭ কাল পরিসরে রচিত কবির ব্যক্তিগত জীবনকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামষ্টিক চেতনা জারিত কবিতাগুলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দাঙ্গা, সাম্যবাদী চেতনাপ্রসূত মানবকল্যাণবোধ 'প্রসন্ন প্রহরে'র মূল প্রতিপাদ্য। তবে এ সময়ে সিকান্‌দার আবু জাফরের কাব্য-ভাবনার বিষয় মূলত মানুষ। মানবিক শৃঙ্খলার পক্ষে তিনি আমৃত্যু সংগ্রাম করেছেন।

তাঁর 'তিমিরান্তিক' (১৯৬৫) কাব্যগ্রন্থেও সংকলিত আছে চল্লিশের শেষ প্রান্তের কিছু কবিতা। সেগুলোতে প্রকাশ পেয়েছে মধ্যবিত্তের জীবনতৃষ্ণায় পতিত কবির প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির আশাভঙ্গের চিত্র। সিকান্‌দার আবু জাফরের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কবিতাগ্রন্থ হচ্ছে : 'বৈরী বৃষ্টিতে' (১৯৬৫), 'কবিতা ১৩৭২' (১৯৬৮), 'বৃশ্চিক লগ্ন' (১৯৭১), 'বাংলা ছাড়ো' (১৯৭১) প্রভৃতি।

সিকান্‌দার আবু জাফর সমাজসচেতন কবি। তিনি নিজেই বিভিন্ন সংগ্রাম-বিক্ষোভ-বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয়ে জনতার মিছিলে উচ্চকিত হয়ে ওঠেন।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর কবিতার ভাষাভঙ্গি ও শব্দচয়নও তাঁর এই মানসেরই অনুগামী। আর তাঁর কবিসত্তার সঙ্গে আগাগোড়া সাজুয্যপূর্ণ উপমা, প্রতীক রূপক আগে থেকেই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল প্রতিভারই স্বাভাবিক নিয়মে। তাই চল্লিশে শিকড় গেড়েই সিকান্‌দার আবু জাফর চল্লিশ পরবর্তী বাংলা কবিতায় নিজেকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি যথার্থই আধুনিক।

ধর্মীয় আদর্শবোধ ও ঐতিহ্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগী কবি তালিম হোসেনও কাব্যজগতে আত্মপ্রকাশ করেন চল্লিশের দশকে। তাঁর পাকিস্তান আন্দোলনের যুগে উৎসারিত কবিতাগুলো নিয়ে প্রকাশিত হয় প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দিশারী'। স্বাধীনতা ও মুসলমানদের হৃতগৌরব ফিরে পাওয়ার চেতনা অর্জনের উদ্বোধনী সুর এই গ্রন্থে বিধৃত। তালিম হোসেনের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'শাহীন'-এ বিধৃত আছে ব্যক্তিক ও আদর্শিক ঐতিহ্যচেতনা মিশ্রিত কিছু সফল কবিতা, আছে বৈশ্বিক বিষয় নিয়ে লেখা কবিতাও। 'শাহীন'-এ কবির সনেটগুলোর শক্তিমত্তা তুলনারহিত। তাঁর অন্যান্য কবিতাগ্রন্থের মধ্যে 'ইসলামি কবিতা' (১৯৮১), 'নূরের জাহাজ' (১৯৮৩) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

চল্লিশের দশকে সমাজ, রাজনীতি ও সময়-সচেতন কবিদের পাশে রোমান্টিক অনুধ্যানে রত একদল কবি প্রেম ও প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে কবিতায় লাবণ্য ও লালিত্যের সুচারু প্রকাশ ঘটিয়েছেন। সাম্যবাদের উচ্চসুরের পাশে তাঁদের নিচু গলার আন্তরিক উচ্চারণে শান্তরসের বর্ণাঢ্যতা সমকালীন বাংলা কবিতাকে একটি বিশেষ স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। এধারার উল্লেখযোগ্য কবিদের মধ্যে অন্যতম কবি অশোকবিজয় রাহা নিসর্গ প্রকৃতির বিচিত্র বর্ণনায় অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী। তাই জনৈক সমালোচক তাঁর প্রশংসা করে লিখেছেন :

> রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ আর জীবনানন্দের পরেও যে স্বতন্ত্র সৌন্দর্যলোক নিসর্গের বুকে রচনা করতে পেরেছিলেন অশোকবিজয় রাহা তা নিঃসন্দেহে স্বতন্ত্র।[১৯৯]

তাঁর কবিতায় সিলেটের-আসামের পাহাড়-সমতল-বনাঞ্চল-ঝর্না এমন ঐন্দ্রজালিকতা সৃষ্টি করে যে সাধারণ পাঠক তাঁর সৌন্দর্যনিষ্ঠতায় মুগ্ধ না হয়ে পারেন না। চল্লিশের দশকেই প্রকাশিত হয়েছে তাঁর ছয়টি কাব্যগ্রন্থ। স্বপ্নের মায়াজালে প্রথমেই পাঠককে আকৃষ্ট করে প্রকৃতির নানা বর্ণরাগে রঞ্জিত তাঁর কাব্যগ্রন্থের শিরোনামে। 'ডিহং নদীর বাঁকে' (১৯৪১), 'রুদ্র বসন্ত' (১৯৪১), 'ভানুমতীর মাঠ' (১৯৪৩), 'জলডম্বরু পাহাড়' (১৯৪৫), 'রক্ত সন্ধ্যা' (১৯৪৫), 'শেষ চূড়া' (১৯৪৫)— কাব্যগুলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালীন। কিন্তু আশ্চর্যভাবে সেই উত্তুঙ্গ সময়ের সংস্পর্শ থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখে তিনি স্থিত হয়েছিলেন প্রকৃতি-বন্দনায়।

অশোকবিজয় রাহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ডিহং নদীর বাঁকে'ই কবির কবিমানস সৌন্দর্যতন্ময়তা ও জীবনশিল্পীর স্বেচ্ছাচারী উদ্দামতায় দ্বিধাবিভক্ত। তিনি দ্রষ্টার মন নিয়ে যেমন দেখেছেন প্রকৃতি ও প্রকৃতি-লালিত মানুষের জীবন, তেমনি আবার দুঃসাহসী পুরুষের দূরযানী জীবন-পিপাসায় চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। 'রুদ্র-বসন্ত' এবং 'ডিহং নদীর বাঁকে'র রচনাকাল প্রায় সমসাময়িক। সে কারণে কবির কাব্যদৃষ্টি দুটিগ্রন্থেই এক। তবে

Dhaka University Institutional Repository

'ডিহং নদীর বাঁকে' যেমন কবির ভাষা ও ছন্দে ঝর্নার সহজ কলতান ব্যাপ্ত — 'রুদ্র-বসন্ত' কাব্যে তেমন প্রকৃতির রুদ্রভয়াল রূপকে মূর্ত করে তুলেছেন স্বতন্ত্র আঙ্গিক ও ছন্দমিলে।

কবির সমকালীন জগদীশ ভট্টাচার্য তাই লিখেছেন :

> 'রুদ্র বসন্ত' কাব্যগ্রন্থেই অশোকবিজয়ের প্রকৃতি চেতনার বৈশিষ্ট্যটিও উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। প্রকৃতি বিচিত্ররূপিনী। দৃষ্টিগ্রহ্য এই রূপবৈচিত্র্যকে বিচিত্ররূপে দেখার দৃষ্টি যাঁর আছে তাঁকেই বলি সার্থক প্রকৃতির কবি।
>
> [...] [...]
>
> এই রূপসৃষ্টির ক্ষমতায় অশোকবিজয় আধুনিক সাহিত্যে অদ্বিতীয়।[২০০]

কবির তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ভানুমতীর মাঠ'-এ তিনি বিশ্ব প্রকৃতির বিশাল প্রেক্ষপটে বিস্ময়কর নিসর্গলোক রচনা করেছেন। এটি বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা ভবন' থেকে 'এক-পয়সার একটি' গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। 'ভানুমতির মাঠ' কাব্যগ্রন্থে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছুটা আঁচ লক্ষ করা যায়। কবি ভাস্করের মতো নিসর্গের ভাস্কর্য তৈরি করার ফাঁকে ফাঁকে সুকৌশলে সমকালীন অসহায় ও ভীত-সন্ত্রস্ত মানসিকতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। এ কাব্যে কবির মানুষ এবং প্রকৃতির প্রতি অবিচল আশাবাদ ব্যক্ত হয়েছে। ১৯৪৫-এ এক সঙ্গে প্রকাশ পায় অশোকবিজয় রাহার তিনখানা কবিতার বই। 'জলডম্বরু পাহাড়', 'রক্ত সন্ধ্যা' ও 'শেষ চূড়া'। এ কাব্যগুলোতে কবি প্রকৃতিকে কখনো প্রিয়তমা রূপে, কখনো মাতৃরূপে আবার কখনো রুদ্রাণীরূপে কল্পনা করে নবজীবনের ধ্যানে তন্ময় হয়েছেন।

অশোকবিজয় রাহাকে 'আরণ্যক কবি' 'আশ্রমিক কবি' 'বিদগ্ধ নাগরিক' ইত্যাদি অভিধায় বিভূষিত করে জগদীশ ভট্টাচার্য লিখেছেন :

> গোত্রে ও ধর্মে অশোকবিজয় বিশুদ্ধ কবি। কাব্যভারতীর মণ্ডনকলায় যেমন রূপদক্ষ শিল্পী, বাক্‌প্রতিমা নির্মাণে তেমনি ক্লান্তিহীন বাণী-ভাস্কর।[২০১]

শব্দশিল্প নির্মাণেও কবি অসাধারণ সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কবিতার রূপকধর্মীতাও তাঁকে আধুনিক বাংলা কাব্যে স্বতন্ত্র আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

অশোকবিজয় রাহার অন্যান্য কাব্যগুলোর মধ্যে 'যেথা এই চৈত্রের শালবন' (১৩৬৮), 'ঘণ্টা বাজে : পর্দা সরে যায়' (১৩৮৮) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

চল্লিশ দশকের আরেক বিশিষ্ট রোমান্টিক কবি অরুণকুমার সরকার সমকালীন কাস্তে-হাতুড়ির ঝঞ্ঝনানি থেকে গা-বাঁচিয়ে শান্ত রসের বর্ণাঢ্যতায় কবিতাকে ভালবেসে তাকে রমণীয় করে তুলেছিলেন। কবি বিশ্বাস করতেন,

> কবির কাজ কতকটা নিরপেক্ষ ট্রাফিক পুলিশের মতো। লাঠি উঁচিয়ে নয়, আকার-ইঙ্গিতে — বাঁশি বাজিয়ে, রঙ ছড়িয়ে মানুষকে তার ইচ্ছামতো পথ দিয়ে অথচ সংঘর্ষ এড়িয়ে ঘরমুখী হতে সাহায্য করা।[২০২]

আর তাই মানুষকে ভালবেসে, এই প্রকৃতি-নিসর্গকে ভালবেসে কবিতায় বুঁদ হয়ে ছিলেন তিনি।

Dhaka University Institutional Repository

অরুণকুমার সরকারের কবিতার বইমাত্র দুটো। 'দূরের আকাশ' (১৯৫২) এবং 'যাও উত্তরের হাওয়া' (১৯৬৫)। 'দূরের আকাশ' নামকরণের মধ্যেই কবির রোমান্টিক মনের ছাপ স্পষ্ট। তবে তিনি রোমান্টিক হয়েও সমাজসচেতন। কারণ তাঁর বিচরণ 'সম্পূর্ণ বাস্তব জগতে, মায়াজগতে নয়। প্রেম ও প্রীতিময় অনুভব (সব সময়ই পরিপূর্ণ নয়), নিসর্গ এবং নিসর্গ ছাপিয়ে একান্ত বাস্তব, নাগরিক ও সাংসারিক পারিপার্শ্বের মধ্যে তিনি কাব্যকল্পনার স্ফূরণ ঘটিয়েছেন'[২০৩]। কবি নিজেই স্বীকার করেছেন, 'যদি কিছু লিখে থাকি, প্রেমের কবিতাই লিখেছি'[২০৪]। তাঁর প্রেমের কবিতায় আছে এক ধরনের সহজ-সাবলীল প্রকাশভঙ্গি যা পাঠককে আকৃষ্ট করে, ছন্দ ও মিলের স্মরণীয় গুণে হৃদয়ের ভাবলোকে দোলা জাগায়। কবিতার এই সহজ উচ্চারণ এবং স্মরণীয় প্রসাদগুণই অরুণকুমার সরকারকে চল্লিশের অন্যান্য কবিদের থেকে স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছে।

চল্লিশের দশকে কাব্যচর্চা শুরু হলেও কবিকৃতি প্রকাশ পেয়েছে পঞ্চাশ কিংবা ষাটের দশকে — এমন কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবি নরেশ গুহ। নগরজীবনের ধূসরতা, পরিত্যক্ত উদ্যান, নারী, প্রাসাদ ইত্যাদি তাঁর কবিতায় কোনো বিরল মুহূর্তের প্রীতিময় স্মৃতি ও ভালোলাগা নিয়ে বাণীমূর্তি পেয়েছে। 'নরেশগুহ এক ধরনের শৈল্পিক নৈর্ব্যক্তিকতার অধিকারী। এই মুহূর্তের দৃশ্য বা ভাবনাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আলোর দিকে তুলে ধরে তার বর্ণবিভঙ্গ, তাঁর সূক্ষ্মতার কারুকাজগুলি তুলে ধরতেই আনন্দ তাঁর'।[২০৫]

পঞ্চাশের দশকে লেখা কবিতাগুলো নিয়ে নরেশ গুহর কবিতার বই 'দুরন্ত দুপুর' প্রকাশ পায় ১৯৫১-এ। তাঁর কবিতার মধ্যে রোমান্টিক অনুভাবময়তা স্বাচ্ছন্দ্য ভাষায় ও পারিপাট্য বর্ণনায় পাঠককে অভিভূত করে। জীবন সম্পর্কে ঈষৎ দ্বিধা, কলকাতার বৈচিত্র্যহীন দিনযাপনের একঘেঁয়েমি, ক্লান্তি, বিষাদ তাঁকে কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিলেও তাঁর কবিতায় কখনোই বিষাদের অথবা ক্লান্তির সুরের তীব্রতা প্রকাশ পায় নি। জীবনের প্রতি সহজ অনুরাগে কবিতাকে রাঙিয়ে তুলেছেন নরেশ গুহ। তিনি নিরাশার কবি নন, তিনি আশাবাদী কবি।

এছাড়াও চল্লিশের দশকে প্রেম-প্রকৃতি ও নগরজীবনের নিজস্ব উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন অরুণ ভট্টাচার্য, জগন্নাথ চক্রবর্তী, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কবি। ভালোলাগা ও ভালবাসার প্রকাশে এঁদের কবিতা হয়ে উঠেছে রসোত্তীর্ণ। সুমিতা চক্রবর্তীর সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করে বলা যায়।

> কখনও তাৎক্ষণিক ভালোলাগার প্রকাশ তাঁদের কবিতায়, কখনও চলমান মুহূর্তগুলিকে ঘিরে বহুতর ভাবনার রঙ ও রেখার নক্‌শা, কখনও আরো একটু নিবিড় চিন্তিত জীবনবোধের প্রচ্ছায়, কখনও খুব গভীর প্রেম বা বিরহের অনুভব, কখনও কখনও পারিপার্শ্বিক ও সংসারের বাস্তবতার কথাও বলেছেন তাঁরা কিন্তু সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ, গণজাগরণ, শ্রেণীসংগ্রাম — এই কবিদের লেখায় প্রধান হয়ে ওঠে নি।[২০৬]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. ড. কিরণচন্দ্র চৌধুরী, আধুনিক ইওরোপ, ২০০২, ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী প্রাঃ লিমিটেড, কলকাতা; পৃ. ৪১৭।
২. শ্রী প্রভাতাংশু মাইতি, ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা (বিশ্বের ইতিহাস), ২০০৩, শ্রীধর প্রকাশনী, কলকাতা; পৃ. ১৮।
৩. শ্রী প্রভাতাংশু মাইতি, প্রাগুক্ত; পৃ. ২০।
৪. ড. কিরণচন্দ্র চৌধুরী, প্রাগুক্ত; পৃ. ৪০৪।
৫. ড. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য, ২০০২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা; পৃ. ২৮।
৬. ড. বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়, আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা, ২০০৩, প্রকাশ ভবন, কলকাতা; পৃ. ১৪।
৭. ড. কিরণচন্দ্র চৌধুরী, প্রাগুক্ত; পৃ. ৪১৭।
৮. দীপ্তি ত্রিপাঠী, আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়, ২০০৩, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা; পৃ. ২১।
৯. গোপাল হালদার (সংকলক), বাংলার ফ্যাসিস্ট বিরোধী ঐতিহ্য, ১৯৭৫, মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা; পৃ. ১৫।
১০. হায়াৎ মামুদ, সোমেন চন্দ, ১৯৮৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৩৭-৩৮।
১১. শ্রী প্রভাতাংশু মাইতি, প্রাগুক্ত; পৃ. ২৫২।
১২. প্রাগুক্ত; পৃ. ২৮৭।
১৩. শ্রী গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত (অনূবাদক), আধুনিক ভারত, ১৯৮৯, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা; পৃ. ৪৪১।
১৪. ড. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৫।
১৫. শ্রী গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত , প্রাগুক্ত; গ্রন্থের পৃ. ৩৯৯'তে বর্ণিত আছে যে, 'করাচী ক্রনিক' নামক একটি সংবাদপত্রে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের আঠোরই জুন সংখ্যায় মন্তব্যটি প্রকাশিত হয়েছিল — "একটি এশীয় জাতি যা পেরেছে, অন্য এশীয় জাতিও তা অনায়াসে করতে পারে... জাপান যদি রুশকে হঠিয়ে দিতে পারে তবে ভারতেও তেমনিভবে ইংল্যান্ডকে হঠিয়ে দিতে পারবে। আমাদের উচিত ইংরেজকে সাগরে নিক্ষেপ করে জাপানের সঙ্গে পৃথিবীর শক্তিশালী জাতিপুঞ্জের পাশে আসন গ্রহণ"।
১৬. প্রাগুক্ত; পৃ. ৪১২।
১৭. অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ভারতবর্ষের ইতিহাস (মুঘল ও ব্রিটিশ ভারত) ১৯৯০, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা; পৃ. ৫২৮।
১৮. প্রাগুক্ত; পৃ. ৫২৮।
১৯. প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়, আধুনিক ভারত (দ্বিতীয় খণ্ড) ১৯৮৮, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা; পৃ. ৬।
২০. প্রাগুক্ত; পৃ. ২২০।
২১. প্রাগুক্ত; পৃ. ২৩৩।
২২. শ্রী গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুগুপ্ত, প্রাগুক্ত; পৃ. ৫০৫।
২৩. প্রাগুক্ত; পৃ. ৫০৫।
২৪. প্রাগুক্ত; পৃ. ৫০৭।
২৫. অমলেন্দু সেনগুপ্ত, উত্তাল চল্লিশ : অসমাপ্ত বিপ্লব, ১৯৮৯, পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা; পৃ. ২২৩।

Dhaka University Institutional Repository

২৬. অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত; পৃ. ৫৫৭।
২৭. ড. বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৫।
২৮. ড. সুবোধ চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক পর্যায়), ১৯৯০, ভারত বুক এজেন্সি, কলকাতা; পৃ. ২৩২।
২৯. অরুণকুমার সরকার, 'দূরের আকাশ', তিরিশের কবিতা এবং পরবর্তী, ১৯৮১, প্যাপিরাস, কলকাতা; পৃ. ৬।
৩০. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৫৪।
৩১. ড. বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৪।
৩২. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, কল্লোল যুগ, ১৪০৫, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্‌স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা; পৃ. ৪৭।
৩৩. শ্রী সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (চতুর্থ খণ্ড), ১৯৭৬, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, কলকাতা; পৃ. ২৩০।
৩৪. ড. বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত; পৃ. ৯৪।
৩৫. জীবেন্দ্র সিংহরায়, কল্লোলের কাল, ১৯৮৭, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা; পৃ. ১২৬।
৩৬. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত; পৃ. ৭৬।
৩৭. জীবেন্দ্র সিংহরায়, প্রাগুক্ত; পৃ. ১২৮।
৩৮. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত; পৃ. ৭৯।
৩৯. প্রাগুক্ত; পৃ. ৪৭।
৪০. বুদ্ধদেব বসু, 'নজরুল ইসলাম' কালের পুতুল, ১৯৮৪, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা; পৃ. ১২৫।
৪১. শ্রী সুকুমার সেন, প্রাগুক্ত; পৃ. ২৯২।
৪২. জীবেন্দ্র সিংহরায়, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৩০।
৪৩. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৭।
৪৪. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, 'তিরিশের কবিতা', কবিতায় মানবিক উচ্চারণ ও অন্যান্য কবিতা, ১৯৯১, প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা; পৃ. ৮৯।
৪৫. প্রাগুক্ত; পৃ. ৮৯।
৪৬. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৮।
৪৭. জীবনানন্দ দাশ, কবিতার কথা, ১৩৭০, সিগনেট প্রেস, কলকাতা; পৃ. ৩৮।
৪৮. প্রাগুক্ত; পৃ. ২৩।
৪৯. প্রাগুক্ত; পৃ. ২৩।
৫০. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৪৮।
৫১. প্রাগুক্ত; পৃ. ১৪৯।
৫২. প্রাগুক্ত; পৃ. ১৫৪।
৫৩. কল্লোল (১৩৩০-১৩৩৬), কালিকলম (১৩৩১-১৩৩৫), প্রগতি (১৩৩৪-১৩৩৭), সংহতি (১৩৩০—দুবছর না পুরতেই বন্ধ হয়ে যায় বলে জানিয়েছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত); ধূপছায়া (১৩৩৪—কতদিন চলেছিল তা জানা যায় নি বলে জানিয়েছেন জীবেন্দ্র সিংহরায়)।
৫৪. মাহবুবা সিদ্দিকী, আধুনিক বাংলা কবিতায় সমাজসচেতনতা, ১৯৯৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা; পৃ. ৯।
৫৫. দীপ্তি ত্রিপাঠী, প্রাগুক্ত; পৃ. ৬৫-৬৬।
৫৬. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, প্রাগুক্ত; পৃ. ২০৩।
৫৭. শ্রী ভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, ১৯৯২, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা; পৃ. ৪১৮।

Dhaka University Institutional Repository

৫৮. শ্রী সুকুমার সেন, প্রাগুক্ত; পৃ. ৩৪৩।
৫৯. দীপ্তি ত্রিপাঠী, ড. অশোককুমার মিশ্র, মাহবুবা সিদ্দিকী প্রমুখের মতে প্রেমেন্দ্র মিত্র রবীন্দ্রযুগ ও আধুনিক যুগের মধ্যে সেতু বন্ধনের মতো বিরাজমান।
৬০. শ্রী সুকুমার সেন, ড. বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত প্রমুখ সমলোচক প্রেমেন্দ্র মিত্রকে যথার্থ আধুনিক কবি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে বলেছেন, "প্রেমেন্দ্র মিত্র যে একজন বিশিষ্ট আধুনিক কবি তাঁর কবিতাই তার প্রমাণ"।
৬১. বুদ্ধদেব বসু, 'জীবনানন্দ দাশ-এর স্মরণে', প্রাগুক্ত; পৃ. ৫৫।
৬২. প্রাগুক্ত; 'জীবনানন্দ দাশ : ধূসর পাণ্ডুলিপি'; পৃ. ৩৩।
৬৩. আবুল কাসেম ফজলুল হক, আধুনিকতাবাদ ও জীবনানন্দের জীবনোৎকণ্ঠা, ২০০৩, জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা; পৃ. ১২।
৬৪. বুদ্ধদেব বসু, 'জীবনানন্দ দাশ : বনলতা সেন', প্রাগুক্ত; পৃ. ৩৬।
৬৫. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, ১৩৯২, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা; পৃ. ৫৫৩।
৬৬. ড. অশোককুমার মিশ্র, আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা, ২০০২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা; পৃ. ১৩১।
৬৭. বুদ্ধদেব বসু, 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : ক্রন্দসী'; প্রাগুক্ত; পৃ. ৬৯।
৬৮. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত; 'তিরিশের কবিতা', প্রাগুক্ত; পৃ. ১০৮।
৬৯. ড. অশোককুমার মিশ্র; প্রাগুক্ত; পৃ. ১৬৮।
৭০. ড. বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত; পৃ. ২৮৭।
৭১. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত; 'তিরিশের কবিতা', 'প্রাগুক্ত'; পৃ. ১১৬।
৭২. ড. অশোককুমার মিশ্র; প্রাগুক্ত; পৃ. ১৩৯।
৭৩. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, প্রাগুক্ত; পৃ. ২০১-২০২।
৭৪. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৬।
৭৫. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, প্রাগুক্ত; পৃ. ২২৭।
৭৬. শ্রীভূদেব চৌধুরী, প্রাগুক্ত; পৃ. ৪৯৭।
৭৭. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, প্রাগুক্ত; পৃ. ২৭২।
৭৮. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত; পৃ. ৫৩৩।
৭৯. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত; পৃ. ৫৫।
৮০. প্রাগুক্ত; পৃ. ৫৫।
৮১. প্রাগুক্ত; পৃ. ৫৬।
৮২. প্রাগুক্ত; পৃ. ১৮৫।
৮৩. সরোজমোহন মিত্র, 'জীবন ও সাহিত্য কৃতি', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, (ভূঁইয়া ইকবাল সম্পাদিত) ১৯৭৫, বর্ণমিছিল, ঢাকা; পৃ. ১৫৫।
৮৪. প্রাগুক্ত; পৃ. ১৬৩।
৮৫. সুমিতা চক্রবর্তী, 'চল্লিশের কবিতা', 'আধুনিক কবিতার ইতিহাস' (অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত) ২০০৩, ভারত বুক এজেন্সি, কলকাতা; পৃ. ১২৯।
৮৬. প্রাগুক্ত; পৃ. ১২৯।
৮৭. চল্লিশের দশকে যে কয়েকটি পত্রিকাকে ঘিরে সাম্যবাদী লেখকেরা একত্র হয়েছিলেন ১৯৩৯-এ প্রকাশিত 'অগ্রণী'ই তাদের মধ্যে প্রথম বিশিষ্ট হয়ে ওঠে — সুমিতা চক্রবর্তী, 'চল্লিশের কবিতা', প্রাগুক্ত; পৃ. ১৩৬।
৮৭. খোকা রায়, 'সংগ্রামের তিন দশক' (১৯৮৫, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা) গ্রন্থের ৩০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন :

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪০-৪১ সনে দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁও মহকুমা এবং রংপুরের নীলফামারী মহকুমার কয়েকটি থানায় গ্রাম্য হাটে ইজারাদারদের জুলুম, অতিরিক্ত হারে তোলা আদায় (গণ্ডি) এবং মহাজনদের দেনার উচ্চ সুদের প্রতিবাদে ঐ দুটি জেলার কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষকসভার নেতৃত্বে আধিয়ার কৃষকদের আন্দোলন হয়েছিল। ঠাকুরগাঁও মহকুমা সংলগ্ন জলপাইগুড়ির দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ও বোদা থানায়ও আধিয়ারদের ঐ আন্দোলন হয়েছিল।

৮৯. ঢাকার 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'র সম্পাদক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই সময়ের দুজন কৃতী ছাত্র কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

৯০. জ্ঞান চক্রবর্তী, ঢাকা জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত যুগ, ১৯৮৭, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা-এর ৩৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন :
রায়পুরার দাঙ্গার বিবরণ সমস্ত ভারতবর্ষের পত্রিকাগুলিতে ফলাও করিয়া প্রচার করা হয় এবং তাহার ফলে একমাত্র ঢাকা জিলা কিংবা বাংলাদেশ নয়, সমস্ত ভারতবর্ষে হিন্দুদের মধ্যে এক দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। [...] দাঙ্গার অভিযোগে রায়পুরা থেকে প্রায় ১৫০০ মুসলমানকে গ্রেফতার করা হয়।

৯১. অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত; পৃ. ৫৪৬।

৯২. জ্ঞান চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত; পৃ. ৫১।

৯৩. দ্রষ্টব্য : সুকান্ত সমগ্র (বদরুদ্দীন উমর-এর ভূমিকা ও রণেশ দাশগুপ্তের স্মৃতিকথা সম্বলিত), ১৩৮০, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা; পৃ. ২৬৬, ২৭১-৭২-৭৩।

৯৪. খোকা রায়, প্রাগুক্ত; পৃ. ৪৬।

৯৫. জ্ঞান চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত; পৃ. ৬৩।

৯৬. প্রাগুক্ত; পৃ. ৬৩।

৯৭. অমলেন্দু সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৭৩-১৭৫।

৯৮. জ্ঞান চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত; পৃ. ১০৮।

৯৯. প্রাগুক্ত; পৃ. ১৩১।

১০০. জীবেন্দ্র সিংহরায়, আধুনিক কবিতার মানচিত্র, ২০০১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা; পৃ. ১৪।

১০১. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত; প্রাগুক্ত; পৃ. ১২২।

১০২. সুমিতা চক্রবর্তী, আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়, ১৯৯২, প্রজ্ঞা প্রকশনা, কলকাতা; পৃ. ৭।

১০৩. মাসুদুজ্জামান, বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার কবিতা : তুলনামূলক ধারা, ১৯৯৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা; পৃ. ২১।

১০৪. ধনঞ্জয় দাশ, 'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক প্রসঙ্গে [মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক (অখণ্ড), ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত] ২০০৩, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা; পৃ. ৯।

১০৫. প্রাগুক্ত; পৃ. ১২-১৩।

১০৬. মাসুদুজ্জামান, প্রাগুক্ত; পৃ. ২৩।

১০৭. ড. অশোককুমার মিশ্র; প্রাগুক্ত; পৃ. ২২০।

১০৮. প্রাগুক্ত; পৃ. ২২০।

১০৯. প্রাগুক্ত; পৃ. ২২০।

১১০. সুমিতা চক্রবর্তী, আধুনিক কবিতার চালচিত্র, ১৯৯৬, সাহিত্যলোক, কলকাতা; পৃ. ৬২।

১১১. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত; 'চল্লিশের কবিতা', প্রাগুক্ত; পৃ. ১২৩।

১১২. বুদ্ধদেব বসু, 'সমর সেন : কয়েকটি কবিতা' প্রাগুক্ত; পৃ. ৫৮।

১১৩. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত; পৃ. ১২৩।

১১৪. বুদ্ধদেব বসু, প্রাগুক্ত; পৃ. ৬০।

Dhaka University Institutional Repository

১১৫. জগদীশ ভট্টাচার্য, আমার কালের কয়েকজন কবি, ২০০৪, ভারবি, কলকাতা; পৃ. ২৫২।
১১৬. ড. বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত; পৃ. ৩৭৮।
১১৭. সমর সেন, তাঁর 'তিন পুরুষ' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত "২২শে জুন" কবিতায় লিখেছেন, 'আমি রোমান্টিক কবি নই, আমি মার্ক্সিস্ট'।
১১৮. সমর সেন, বাবু বৃত্তান্ত, ১৯৯১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা; পৃ. ২১।
১১৯. জগদীশ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত; পৃ. ২৫২-৫৩।
১২০. বুদ্ধদেব বসু, প্রাগুক্ত; পৃ. ৫৭।
১২১. অশোক মিত্র, 'মানুষের অস্তিত্বেরই প্রতিকৃতি : গেরিলা কবি', সমর সেন (খালেদ হোসাইন ও সাজ্জাদ আরেফিন সম্পাদিত) ২০০২, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা; পৃ. ২১৭।
১২২. সুমিতা চক্রবর্তী, 'চল্লিশের কবিতা', প্রাগুক্ত; পৃ. ১৩৬।
১২৩. প্রাগুক্ত; পৃ. ১৩৬।
১২৪. ড. অশোককুমার মিশ্র; প্রাগুক্ত; পৃ. ২৫৪।
১২৫. মাসুদুজ্জামান, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৮৬।
১২৬. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা কবিতার কালান্তর, ২০০০, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা; পৃ. ২৩৯।
১২৭. সুমিতা চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৩৬।
১২৮. 'কবিতাও তিনি লিখেছেন অল্প বয়স থেকেই, ১৯৩৪-এ তা মুদ্রিত হয়েছে 'দেশ' ও 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায়'।— সুমিতা চক্রবর্তী, 'চল্লিশের কবিতা', প্রাগুক্ত; পৃ. ১৩৮।
১২৯. দিনেশ দাস, শ্রেষ্ঠ কবিতা, ১৯৭২, ভারবি, কলকাতা; ভূমিকা।
১৩০. জগদীশ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত; পৃ. ২২৯।
১৩১. সুমিতা চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৩৯।
১৩২. দিনেশ দাস, 'কাস্তে', প্রাগুক্ত; পৃ. ৩১।
১৩৩. অনীক মাহমুদ, 'সাম্যের সহযাত্রী : কতিপয় কবিপ্রসঙ্গ', আধুনিক বাংলা কাব্যে সাম্যবাদী চেতনা, ১৯৯৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা; পৃ. ২৫৩।
১৩৪. ড. অশোককুমার মিশ্র; প্রাগুক্ত; পৃ. ২৪২।
১৩৫. প্রাগুক্ত; পৃ. ২২৬।
১৩৬. সুমিতা চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৪৩।
১৩৭. অনীক মাহমুদ, প্রাগুক্ত; পৃ. ২৫৪।
১৩৮. সুমিতা চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৪৪।
১৩৯. মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, কাব্যদৃষ্টি ও সমর সেনের 'তিনপুরুষ', [মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক (অখণ্ড), ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত], প্রাগুক্ত; পৃ. ৪৭০।
১৪০. মাসুদুজ্জামান, প্রাগুক্ত; পৃ. ৭২।
১৪১. ড. অশোককুমার মিশ্র; প্রাগুক্ত; পৃ. ২৪৬।
১৪২. মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত; পৃ. ৪৬৯।
১৪৩. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৩৫।
১৪৪. 'কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না?'— 'সকলের গান', পদাতিক, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, কবিতা সংগ্রহ, ১৯৯৩, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা; পৃ. ৩।
১৪৫. বুদ্ধদেব বসু; 'সুভাষ মুখোপাধ্যায় : পদাতিক', প্রাগুক্ত; পৃ. ৮১।
১৪৬. অশ্রুকুমার সিকদার, আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয়, ১৩৯২, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা; পৃ. ২৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

১৪৭. "'৪৮-এর পার্টি দৈনিকে টাকা তোলার জন্য লিখি 'অগ্নিকোণ'"।— এ স্বীকারোক্তি কবির নিজের। স্বীকারোক্তি দেন 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা সংগ্রহ'-এর সম্পাদক সুবীর রায়চৌধুরীর কাছে। দ্রষ্টব্য : সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা সংগ্রহ, প্রাগুক্ত; পৃ. ২০৬।

১৪৮. বুদ্ধদেব বসু; প্রাগুক্ত; পৃ. ৮০।

১৪৯. প্রাগুক্ত; পৃ. ৮০।

১৫০. ড. সৌমিত্র শেখর, 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা : ফুল থেকে ফুলকি', পদাতিক, ২০০৫, মনন প্রকাশ, ঢাকা; পৃ. ৩০।

১৫১. অনীক মাহমুদ, 'সংগ্রামের দুই পদাতিক : সমন সেন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়', প্রাগুক্ত; পৃ. ১৭৮।

১৫২. অশ্রুকুমার সিকদার, প্রাগুক্ত; পৃ. ২৫০।

১৫৩. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, 'মিছিলের মুখ', কবিতা সংগ্রহ, প্রাগুক্ত; পৃ. ৭৬।

১৫৪. আর ইংরেজি ও ফরাসি অনুবাদের মাধ্যমে হিকমতের কবিতার সঙ্গে পরিচয়ের ফলেই যে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় এলো নতুন ধরন, নতুন গড়ন এতেও কোনো সন্দেহ নেই। দ্রষ্টব্য : অশ্রুকুমার সিকদার, প্রাগুক্ত; পৃ. ২৫৫।

১৫৫. জগদীশ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত; পৃ. ২৭০।

১৫৬. প্রাগুক্ত; পৃ. ২৭২।

১৫৭. ড. বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত; পৃ. ৪০৫।

১৫৮. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়—প্রত্যয়ী পথিক', কবিতার কালান্তর, প্রাগুক্ত; পৃ. ২৩৩।

১৫৯. ড. অশোককুমার মিশ্র; প্রাগুক্ত; পৃ. ২৪০।

১৬০. বুদ্ধদেব বসু; প্রাগুক্ত; পৃ. ৮১।

১৬১. জগদীশ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত; পৃ. ২৮৫।

১৬২. প্রবোধচন্দ্র সেন, 'বাংলা ছন্দের নূতন সম্ভাবনা'। এটি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও হিরণকুমার সান্যাল সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকায় ফাল্গুন ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ সংখ্যায় প্রকাশিত।— এখানে সুভাষ মুখোপাধ্যায়, কবিতা সংগ্রহ থেকে সংগৃহীত। পৃ. ১৭০।

১৬৩. ড. অশোককুমার মিশ্র; প্রাগুক্ত; পৃ. ২৬০।

১৬৪. ড. সরোজমোহন মিত্র, সুকান্তের জীবন ও কাব্য, ১৯৯৭, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা; পৃ. ১৩৮।

১৬৫. জগদীশ ভট্টাচার্য, সুকান্ত ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত; পৃ. ৩০২।

১৬৬. সুকান্ত ভট্টাচার্য, পত্রগুচ্ছ, পত্র সংখ্যা-৪৪, রচনাসমগ্র, ২০০৪, তৃণ, ঢাকা; পৃ. ২১২।

১৬৭. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, 'সুকান্ত', সুকান্ত বিচিত্রা (বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত) ১৯৯৫, সাহিত্যম্, কলকাতা; পৃ. ৫৪।

১৬৮. ড. সরোজমোহন মিত্র, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৩৮।

১৬৯. প্রাগুক্ত, 'সুকান্তের গ্রন্থ পরিচিতি'; পৃ. ১৭০।

১৭০. প্রাগুক্ত; পৃ. ১৭০।

১৭১. জগদীশ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত; পৃ. ৩১১।

১৭২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 'কবিও পেয়ে গেছে নতুন যুগ', সুকান্ত বিচিত্রা, প্রাগুক্ত; পৃ. ২৯।

১৭৩. সুমিতা চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৪৬।

১৭৪. মাসুদুজ্জামান, 'পশ্চিম বাংলা : পঞ্চাশের দশক', প্রাগুক্ত; পৃ. ৬৫।

১৭৫. সুমিতা চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৪৬।

১৭৬. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

১৭৭. মাসুদুজ্জামান, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৮১।
১৭৮. প্রাগুক্ত; পৃ. ১৯৪।
১৭৯. সুমিতা চক্রবর্তী, 'চল্লিশের কবিতা', প্রাগুক্ত; পৃ. ১৪৫।
১৮০. সুমিতা চক্রবর্তী, 'অচ্যুত গোস্বামী : ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্ব', সহিত্যিচিন্তা, (কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত সম্পাদিত), আশ্বিন ১৪০৩; পৃ. ১৩৩।
১৮১. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, 'চল্লিশের দশকের বাংলা কবিতা', সাহিত্য পত্রিকা (মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত), কার্তিক ১৩৯৮, পঁয়ত্রিশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; পৃ. ২৫।
১৮২. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, কথা ও কবিতা, ১৯৮১, মুক্তধারা, ঢাকা; পৃ. ১৩৮।
১৮৩. ড. অশোককুমার মিশ্র; প্রাগুক্ত; পৃ. ৩৭৫।
১৮৪. মাসুদুজ্জামান, প্রাগুক্ত; পৃ. ২৭৩।
১৮৫. প্রাগুক্ত; পৃ. ২৭৩।
১৮৬. সৈয়দ আলী আহসান, 'আহসান হাবীব', আধুনিক বাংলা কবিতা : শব্দের অনুষঙ্গে, ২০০১, গতিধারা, ঢা; পৃ. ১২৩।
১৮৭. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, প্রাগুক্ত; পৃ. ২৬।
১৮৮. সৈয়দ আলী আহসান, 'ফররুখ আহমদ', প্রাগুক্ত; পৃ. ১০৬।
১৮৯. আবদুল মান্নান সৈয়দ, 'ফররুখ আহমদ : সমকালীন প্রেক্ষিত', নির্বাচিত প্রবন্ধ, ১৯৮৭, মুক্তধারা, ঢাকা; পৃ. ১৩১।
১৯০. প্রাগুক্ত; পৃ. ১৩৩।
১৯১. সৈয়দ আলী আহসান, 'আবুল হোসেন', প্রাগুক্ত; পৃ. ১২৪-২৫।
১৯২. হাসান হাফিজুর রহমান, 'পূর্ব পাকিস্তানের কাব্য সাহিত্য : কবি-মানস ও ভূমিকা বিচার (দ্বিতীয় পর্যায়)', আধুনিক কবি ও কবিতা, ১৯৭৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা; পৃ. ২৫৫।
১৯৩. ড. সৈকত আসগর, 'আবুল হোসেন', বাংলা কবিতার শিল্পরূপ : চল্লিশের দশক, ১৯৯৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা; পৃ. ১৫৯।
১৯৪. সৈয়দ আলী আহসান, প্রাগুক্ত; পৃ. ১২৪।
১৯৫. হাসান হাফিজুর রহমান, প্রাগুক্ত; পৃ. ২৫৪।
১৯৬. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, প্রাগুক্ত; পৃ. ২৮-২৯।
১৯৭. দিলারা হাফিজ, 'বাংলাদেশের কবিতার বিষয় ও আঙ্গিক (১৯৪৭-১৯৭১)', সাহিত্য পত্রিকা (ওয়াকিল আহমদ সম্পাদিত), আষাঢ় ১৪০৫, ৪১ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; পৃ. ৫০।
১৯৮. হাসান হাফিজুর রহমান, প্রাগুক্ত; পৃ. ২৬১।
১৯৯. সুমিতা চক্রবর্তী, 'চল্লিশের কবিতা', আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাস, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৫০।
২০০. জগদীশ ভট্টাচার্য, 'অশোকবিজয় রাহা', প্রাগুক্ত; পৃ. ২১০-১১।
২০১. প্রাগুক্ত; পৃ. ২০২।
২০২. অরুণকুমার সরকার, 'দূরের আকাশ', প্রাগুক্ত; পৃ. ৬।
২০৩. সুমিতা চক্রবর্তী, 'চল্লিশের কবিতা', প্রাগুক্ত; পৃ. ১৫১।
২০৪. অরুণকুমার সরকার, প্রাগুক্ত; পৃ. ১০।
২০৫. সুমিতা চক্রবর্তী, 'চল্লিশের কবিতা', প্রাগুক্ত; পৃ. ১৫২।
২০৬. প্রাগুক্ত; পৃ. ১৫২।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত : জীবন ও মানস

কবির জীবন ও কবিতা একসূত্রে গাঁথা। কেননা কবিতা গগনপ্রসূত কোনো বায়বীয় বস্তু নয়। জীবন ও জগতের সঙ্গে বোধের মিথস্ক্রিয়ায় কবিতার জন্ম। বলা যায়, কাব্যের মধ্যেই কবির বসবাস; তাঁকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব তাঁরই রচিত কবিতার প্রতিটি ছত্রে ছত্রে। কবির জীবন হচ্ছে সামাজিক জীবন। অনেক মানুষ নিয়ে সমাজ, তাই অনেক জীবন নিয়েই সমাজজীবন। কবিকে এই বৃহৎ সমাজজীবন নিয়েই ভাবতে হয়। সমাজের বিধি-নিষেধ, দায়-দায়িত্ব ও সংস্কারের সঙ্গে তিনি জড়িত। ফলে শুধু কাব্য সৃষ্টির দায়িত্বই নয়—তাঁকে সামাজিক কর্তব্যবোধেও সচেতন হতে হয়। 'যিনি প্রকৃত শক্তিশালী কবি তাঁর কাব্য যে সমাজের বিভিন্ন স্তরের অন্য সকলের মনকেও অভিভূত করে তার কারণ, কবি যে ভাব ও কল্পনাকে রূপ দেন তা জনসাধারণের অভিজ্ঞতার এলাকায় পড়ে। যে কবির জীবনবোধ নিতান্তই "ব্যক্তিগত ব্যাপার" তাঁর কাব্যকে বলা যায় "পলায়নবাদী কাব্য"— বোঝা গেল তিনি সামাজিক জীব হিসেবে নিজের দায়িত্ব এড়াতে চান'।[১] সুতরাং কবিকে বুঝতে হলে তাঁর জীবন ও মানস জানা জরুরি হয়ে ওঠে। কবির জীবন-মানস গড়ে ওঠে তাঁর সমাজ-সংসার ও সমকালীন সময়কে কেন্দ্র করে। তাই কবিজীবনের সামগ্রিক ধারণা পাবার জন্যে কবির যুগকেই উপলব্ধি করতে হয়।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ঢাকার তাঁতিবাজার সংলগ্ন বাসাবাড়ি লেনে ১৯১৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বিজয়শঙ্কর সেনগুপ্ত ছিলেন ঢাকা শহরের তখনকার দিনের একজন নামকরা অধ্যাপক; ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের ভূগোল বিভাগের প্রধান। কবি তাঁর স্মৃতিআলেখ্য 'চল্লিশের দশকের ঢাকা'য় লিখেছেন :

> সে সময় যেসব ছাত্র ভূগোল নিয়ে পড়তেন তাঁরা ছাড়াও যাঁরা অন্যবিষয় নিয়ে পড়তেন, সকলেই একজন কৃতী অধ্যাপকের দৃষ্টান্ত দিতে হলে আমার পিতৃদেবের নামের উল্লেখ করতেন।[২]

বিজয়শঙ্কর সেনগুপ্ত ভালো অর্গান বাজাতেন এবং ছিলেন ভূগোল বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক প্রণেতা। অত্যন্ত সাদাসিধে এবং সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করতেন তিনি। তাঁর চারপাশ ঘিরে একটা অকৃত্রিম আভিজাত্য বিরাজ করত। বাইরে অধ্যাপকের মেজাজ থাকলেও বিজয়শঙ্কর ছিলেন অত্যন্ত স্নেহশীল ও শিক্ষাসচেতন পিতা। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের ছোট

Dhaka University Institutional Repository

বোন অধ্যাপক ইভা দাশগুপ্ত পিতার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বর্তমান গবেষকের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন :

> বাবা আমাদের অর্থ দিতে পারেন নি — কিন্তু শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষের সঙ্গে কেমন করে মিশতে হবে — গুরুজনদের প্রতি কেমন আচরণ করতে হবে — এইসব তিনি শিখিয়েছেন।
>
> আমার যখন দশ বছর বয়স তখন আমার মা মারা যান। তারপর থেকে আমরা বাবার দুচোখের সামনে বড় হয়েছি। তিনি ছিলেন আমাদের Friend, Phylosopher and Guide.[৩]

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের মা মায়াময়ী দেবী ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বন্ধু 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' গ্রন্থের লেখক এবং 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মনস্বী রজনীকান্ত গুপ্তের কন্যা। বিদূষী ও স্নেহবাৎসল মা সম্পর্কে উক্ত স্মৃতিআলেখ্যে কবির ভাষ্য :

> আমার মা তাঁর সুন্দর স্বভাব ও আচরণের জন্যে পাড়ার মহিলামহলে বেশ জনপ্রিয় ও পরিচিতা ছিলেন।[৪]

কিরণশঙ্কররা ছিলেন চার ভাই ও ছয় বোন। বাবা বিজয়শঙ্কর ব্যস্ত থাকতেন অধ্যাপনা নিয়ে এবং সাধারণত বাড়িতে ফিরতেন রাতে — সাড়ে নয়টার দিকে। তাই এই দশ পুত্র কন্যার পড়াশুনা, আব্দার, অত্যাচার সামাল দিতে হত মা মায়াময়ীকে। এবং তিনি তাঁর স্নেহ, ভালবাসা ও মিঠেকড়া শাসন দিয়ে পুত্রকন্যাদের আগলে রাখতেন। পিতা বিজয়শঙ্করের কাছে কখনো কোনো নালিশ বা বিচার দিতে হয় নি তাঁকে।

কিরণশঙ্করদের পরিবার সে সময় ঢাকায় উচ্চশিক্ষিত বলে স্বীকৃত ছিল। কিরণশঙ্করের বড়দাদা প্রফুল্লশঙ্কর ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সহপাঠী ছিলেন আশুতোষ ভট্টাচার্য (বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস গ্রন্থের রচয়িতা ও অধ্যাপক), অবনী কুশারী (আইএএস অফিসার ও কবি কেতকী কুশারী ডাইসনের বাবা) ও স্বনামধন্য আরো অনেকে। তাঁরা সকলেই পড়ালেখার বিষয়ে প্রফুল্লশঙ্করের প্রশংসা করতেন। কিরণশঙ্কর লিখেছেন :

> ইংরেজি সাহিত্যে দাদার ব্যুৎপত্তি ছিলো এবং আমার অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্যের কাছে শুনেছি ছাত্রাবস্থায় দাদা ইংরেজি কবিতা পড়ে তাঁদের শোনাতেন এবং বোঝাতেন। পরবর্তীকালে বুদ্ধদেব বসুও আমাকে একবার বলেছিলেন যে, যে বয়সে ছাত্র মাত্রেই আমোদ প্রমোদ ও লঘু ঠাট্টা কৌতুকে সময় কাটিয়ে দেয় সেই বয়সেই প্রফুল্লশঙ্কর সাহিত্য নিয়ে এবং অন্যান্য আরো বিষয় নিয়ে পড়াশোনায় ডুবে যেতেন।[৫]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই প্রফুল্লশঙ্কর ইংরেজিতে ফার্স্টক্লাশ নিয়ে এম.এ পাশ করেন এবং পরে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের অধীনে শিক্ষাদপ্তরে ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। কবি বিষ্ণু দে মৌলানা আজাদ কলেজে কিছুদিন ছিলেন প্রফুল্লশঙ্করের সহকর্মী। দুজনেই পড়াতেন ইংরেজি। ফলে দুজনের মধ্যে বেশ সখ্য গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে বিষ্ণু দে যখনই কিরণশঙ্করকে চিঠি দিয়েছেন তখনই তিনি প্রফুল্লশঙ্করের খোঁজখবর নিতেন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রফুল্লশঙ্করও যৌবনে কবিতা লিখতেন। বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্ত সম্পাদিত 'প্রগতি' পত্রিকায় তাঁর দুটি সনেট ছাপা হয়েছিল। কিরণশঙ্করের অন্যান্য ভাই বোনদের মধ্যেও কেউ কেউ অধ্যাপনা ও শিক্ষকতা করতেন। কবির ছোট বোন অধ্যাপক ইভা দাশগুপ্তও গল্প লিখতেন। সতের বছর বয়সে তাঁর লেখা গল্প তৎকালীন 'দেশ' পত্রিকাসহ আরো কোনো কোনো পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল বলে তিনি জানিয়েছেন।[৬]

কিরণশঙ্করদের পরিবার ১৯৩০ সাল পর্যন্ত বাসাবাড়ি লেনেই ছিলেন। ১৯৩০ সালে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার পরে তাঁরা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ তাঁতিবাজার এলাকায় চলে আসেন। বাসাবাড়ি লেনের অধিকাংশ বাড়ি ছিল একতলা এবং ঘেঁষাঘেঁষি করে তৈরি। একতলা বাড়িগুলোর কোনোটারই ছাদে রেলিং ছিল না। ফলে একবাড়ির ছাদ থেকে অন্যবাড়ির ছাদে অনায়াসে যাতায়াত করা যেত।

শৈশবে কিরণশঙ্কর ছিলেন দুরন্ত প্রকৃতির এবং তাঁর নেশা ছিল ঘুড়ি ওড়ানো। এই ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা এক বাড়ির ছাদ থেকে অন্যবাড়ির ছাদে লাফিয়ে লাফিয়ে পার হতেন। তাঁদের এই উচ্ছৃঙ্খল দাপাদাপিতে স্বাভাবিকভাবেই প্রতিবেশীদের দুপুরের দিবানিদ্রার ব্যাঘাত ঘটত। এ নিয়ে অন্যদের মতো তাঁর বাড়িতেও নালিশ যেত। কিন্তু তাঁর দুরন্তপনায় কখনো বাঁধা পড়ে নি। এর কারণ উল্লেখ করে তিনি 'চল্লিশের দশকের ঢাকা'য় লিখেছেন :

> লেখাপড়ায় ভালো ছিলাম বলে — অর্থাৎ ভালোভাবে পাশ করে যেতাম বলে — পাড়ায় পরিবারের সুনাম আমার শৈশব-কৈশোরের চরম দুরন্তপনা সত্ত্বেও কখনো তেমন বিঘ্নিত হয় নি।[৭]

তবে এই ঘুড়ি ওড়াতে গিয়েই একদিন একতলা বাড়ির ছাদ থেকে তিনি পড়ে গিয়েছিলেন এবং সেই প্রথম তাঁকে অধ্যাপক পিতার হাতের চপেটাঘাত সহ্য করতে হয়েছিল।[৮]

বাসাবাড়ি লেনে তাঁর বন্ধুদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম সোমেন চন্দের। সোমেন চন্দ এবং কিরণশঙ্কর উভয়ের প্রিয় খেলা ছিল ঘুড়ি ওড়ানো। এবং দুজনেই এই ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে ছাদ থেকে নিচে পড়ে গিয়েছিলেন। ছেলেবেলায় কিছুদিন পায়রা ওড়ানোর শখও মিটিয়েছেন কিরণশঙ্কর। অবশ্য বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দুরন্তপনাও স্তিমিত হয়ে আসে।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের লেখাপড়া শুরু হয় সদরঘাটের বিখ্যাত ব্যাপটিস্ট মিশন স্কুলে। সম্ভবত ১৯২৫ সালে তাঁকে কে.জি. শ্রেণিতে এখানে ভর্তি করানো হয়। প্রথম শ্রেণি পর্যন্ত ব্যাপটিস্ট মিশন স্কুলেই ছিলেন। এসময় তিনি কালাজ্বরে আক্রান্ত হন এবং ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা করানো হয়। ফলে প্রায় বছরখানেক তিনি ঘুড়ি উড়িয়ে এবং পাড়ার গলিতে হকিস্টিক খেলে কাটিয়ে দেন।

ব্যাপটিস্ট মিশন স্কুলের কাছে ছিল ব্যাপটিস্ট মিশন হোস্টেল — সেখানে বহিরাগত কলেজের ছাত্ররা থাকত। ছাত্রাবাসটি শ্বেতাঙ্গ মিশনারিদের দ্বারা পরিচালিত হত। এবং এখানে নিয়মিতভাবেই ঢাকার নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হত। বালক কিরণশঙ্করকে সে-সব অনুষ্ঠান খুবই আকর্ষণ করত।

Dhaka University Institutional Repository

১৯২৭ সালে কিরণশঙ্করকে আরমানিটোলা সরকারি স্কুলে ক্লাস থ্রি-তে ভর্তি করে দেওয়া হয়।

স্কুল জীবনে তিনি ছিলেন মধ্যমসারির ছাত্র। পাঠ্যপুস্তকের চেয়ে বাইরের বইয়ের প্রতি ছিল অধিক মনোযোগ। এমনকি যখন পরীক্ষা খুব কাছে এসে পড়ত তখনো তিনি বাইরের নানান কিশোরপাঠ্য গল্প-উপন্যাস লুকিয়ে-চুরিয়ে পড়তেন। বই নিয়ে স্কুল জীবনে কখনো বাছবিচার করেন নি। হাতের কাছে যা পেয়েছেন পড়ে ফেলেছেন। বইপড়া নিয়ে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন :

> ছেলেবেলায় অজস্র বই পড়েছি, তার সম্পূর্ণ উল্লেখ এখন প্রায় অসম্ভব। তবু কয়েকটি বাংলা বইয়ের নাম করা যেতে পারে : বনে-জঙ্গলে (যোগীন্দ্রনাথ সরকার), আবোল-তাবোল (সুকুমার রায়), কুটকুটের দপ্তর (যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়), শয়তানের সুমতি (যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়), আশ্চর্য দ্বীপ (অনুবাদ : কুলদারঞ্জন রায় এবং তাঁরই অনূদিত বাস্কারভিল কুক্কুর), বেপরোয়া (অখিল নিয়োগী), রাজকাহিনী (অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর), আজব দেশ (সীমা দেবী ও শান্তা দেবী), গল্পগুচ্ছ (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর), লালকুঠি (সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়) ইত্যাদি। বিবেকানন্দের পত্রাবলী, নেপোলিয়ন বোনাপার্ট-এর জীবনী, নিগ্রোজাতির কর্মবীর বুকার ওয়াশিংটন, সতীশ দাশগুপ্ত অনূদিত গান্ধীজীর আত্মজীবনী পড়েছিলাম যখন স্কুলের অষ্টম বা নবম শ্রেণীতে পড়ি।[৯]

নবম-দশম শ্রেণিতে পড়ার সময় তাঁর মেজদিদি কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আনীত বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত'; বুদ্ধদেব বসুর 'যেদিন ফুটলো কমল', 'মিসেস গুপ্ত', রডোডেনড্রনগুচ্ছ', 'লাল মেঘ'; প্রবোধ স্যান্যালের 'সরল রেখা', 'প্রিয় বান্ধবী'; অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'ছিনিমিনি', 'কাকজ্যোৎস্না'; শৈলজানন্দের 'পাতালপুরি', 'খরস্রোতা' প্রভৃতি পড়েও তাঁর তরুণ মন নতুন ভাবনায় উদ্বেলিত হয়েছিল।

কিরণশঙ্কর যখন পঞ্চম-ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র তখন কোনো কোনো দিন তাঁর বড় কোনো দিদি সন্ধ্যার নিভৃত অবসরে বসে অবনীন্দ্রনাথের রাজকাহিনির গল্পগুলো পড়ে শোনাতেন। লণ্ঠনের আলোয় প্রায়ান্ধকার পরিবেশে রাজকাহিনির গল্পগুলো শুনতে শুনতে কিশোর কিরণশঙ্কর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতেন। গল্পের শিলাদিত্য বাপ্পাদিত্য তাঁর চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠত।

স্কুলজীবনে ছোটদের পত্র-পত্রিকার মধ্যে কিরণশঙ্করের প্রধান আকর্ষণ ছিল 'শিশুসাথী' ও 'মৌচাক'। স্মৃতিচারণে লিখেছেন :

> উপেন্দ্রকিশোরের লেখা টুনটুনির বই, মহাভারত এবং সুখলতা রাওয়ের আরো গল্প মনে পড়ছে। মনে পড়ছে সুখলতার গল্পের অন্তর্ভুক্ত 'কাঁপুনি শিখতে হবে' ছবিটির কথা। সীতাদেবী ও শান্তা দেবীর হিন্দুস্থানী উপকথার ছবিগুলোও আমার মতো কিশোরের কাল্পনাকে বহুবিস্তৃত করতে সাহায্য করেছিলো।[১০]

আরমানিটোলা স্কুলে যখন তিনি সপ্তম শ্রেণির ছাত্র তখন তাঁদের বাসাবদল হয়। বাসাবাড়ি লেন থেকে চলে আসেন তাঁতিবাজারে। সোমেন চন্দরাও সে সময় বাসাবদল করে দক্ষিণ মৈশণ্ডীতে চলে যান। কিরণশঙ্করের স্বাস্থ্য তখনো তেমন ভালো ছিল না। মাঝে-মধ্যেই তিনি সর্দি-জ্বরে আক্রান্ত হতেন। নতুন পাড়ায় এসে অনেক নতুন সমবয়সীর

Dhaka University Institutional Repository

সঙ্গে পরিচয় হয় তাঁর। তাঁদেরই একজন একদিন তাঁকে পাড়ারই একটি বাড়িতে ডেকে নিয়ে গেলেন। বাড়িটির একটি ঘরে ছিল ব্যায়ামাগার। পাড়ার কিছু তরুণ সেখানে নিয়মিত ব্যায়ামচর্চা করতেন। ঐদিনই কিরণশঙ্কর সেখানে ভর্তি হলেন এবং পরবর্তী চার বছর ঐ-বাড়িতে তাঁর নিয়মিত ব্যায়ামচর্চা অব্যাহত ছিল। কিরণশঙ্কর লিখেছেন :

> আমার অসুস্থতা, জ্বর সর্দিকাশি যে কোথায় পালালো জানি না, শরীর ক্রমে ক্রমে হয়ে উঠলো সম্পূর্ণ সুস্থ। একদিন জানতে পারলাম স্বাস্থ্য রক্ষাকারী ঔসব তরুণ সকলেই কোনো একটি রাজনৈতিক দলের সদস্য; আমাকেও তারা নানা বইপত্র পড়িয়ে সদস্য হবার যোগ্যতার অধিকার দিয়েছিলো।[১১]

ছেলেবেলায় কিরণশঙ্করের সিনেমা দেখার খুব শখ ছিল। পরিবারের সঙ্গে কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে কখনো-বা একা প্রচুর ছবি দেখেছেন তিনি। তাঁর দেখা নির্বাক যুগের ছবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইংরেজি ছবিগুলো হচ্ছে : চার্লি চ্যাপলিনের 'সার্কাস', 'গোল্ড রাস', 'দ্যা কিড'; রুডলফ ভ্যালেন্টিনো অভিনীত 'ঈগল'; জন ব্যারিমোর অভিনীত 'বিলাভেড রোগ'; লন চ্যানির 'হাঞ্চব্যাক অব নটারডেম' ইত্যাদি। তাঁর প্রিয় অভিনেতা ছিলেন ডগলাস ফেরার ব্যাঙ্কস — তাঁর অভিনীত ছবির মধ্যে 'রবিন হুড', 'ব্ল্যাক পাইরেট', 'দি থ্রি মাস্কেটিয়ার্স', 'গচো', 'থিফ অব বাগদাদ' উল্লেখযোগ্য। তিনি অনেক বাংলা ও হিন্দি ছবিও দেখেছেন — কিন্তু সেগুলো ছিল অনেক নিচুমানের। তার মধ্যেও 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'কপালকুণ্ডলা', 'কণ্ঠহার', 'চরিত্রহীন', 'জয়দেব', 'নার্স', 'আনারকলি' ইত্যাদি ছবিগুলো তাঁকে আকর্ষণ করেছিল। কিরণশঙ্কর মনে করেন :

> তখনকার দিনে স্বাধীনতা সংগ্রামের সুস্থ চিন্তার পাশাপাশি সিনেমার প্রভাব তেমন ক্ষয়কারী আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে পারে নি। বরং একটি নতুন শিল্পমাধ্যম হিসেবে সিনেমা সাধারণ মানুষের মনের পরিধিকে বিস্তৃত করতে সাহায্য করেছিলো।[১২]

ছেলেবেলা থেকেই কিরণশঙ্কর অর্গান বাজাতে শিখেছিলেন এবং ভালো অর্গান বাজাতেন তিনি। ক্লাসিক্যাল গানের প্রতিও তাঁর প্রবল অনুরাগ ছিল। পরবর্তীকালে তিনি গ্রামোফোন কিনেছিলেন এইসব গান শোনার জন্যে — জানিয়েছেন সঞ্জয়শঙ্কর সেনগুপ্ত।[১৩]

আরমানিটোলা স্কুলে যখন নবম-দশম শ্রেণির ছাত্র তখনই কিরণশঙ্করের লেখক সত্তার প্রকাশ দেখা যায়। স্কুলের হাতে লেখা ম্যাগাজিন 'আগন্তুক' সম্পাদনা করেন তিনি। এ ব্যাপারে তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিলেন তাঁর সহপাঠী শঙ্খ চৌধুরী। শঙ্খ চৌধুরী ছিলেন বিখ্যাত কবি মণীষ ঘটকের শ্যালক, পরবর্তীকালে তিনি নিজেও নামী ভাস্কর হয়েছিলেন। 'আগন্তুক'-এর লেটারিং করেছিলেন তিনি। আর এ কাজে তাঁদের উৎসাহ যুগিয়েছিলেন তাঁদের বাংলা শিক্ষক প্রাণবল্লভ বাবু; যিনি মিরাট ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী নেপাল বসাকের কাকা। প্রাণবল্লভ বাবুদের নবাবপুর রোডের বাড়িতে ছিল 'অ্যালবার্ট লাইব্রেরি' বলে একটি পুস্তক প্রকাশনা ও বিক্রয় কেন্দ্র। কিরণশঙ্কর সেখান থেকেই প্রথম গ্রেট ব্রিটেনে ছাপা হার্ড কভার জ্যাকেটে সজ্জিত শেক্সপিয়র, বার্নার্ড শ, আলডুস হাক্সলি প্রমুখের বইগুলো পড়েন।

১৯৩৫ সালে আরমানিটোলা হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ভর্তি হন ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে। বিষয় বিজ্ঞান। তাঁর বাবা ছিলেন এই কলেজেরই ভূগোল বিভাগের প্রধান।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের লাইব্রেরিটি ছিল খুবই সমৃদ্ধ। আসত বিদেশ থেকে সদ্য প্রকাশিত বিভিন্ন ধরনের ইংরেজি বই। পাঠক কিরণশঙ্কর এই লাইব্রেরির সংগ্রহশালা থেকে নিজেকে সমৃদ্ধ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাছাড়া এই কলেজে পড়াকালীন তিনি গভীর সাহচার্য পেয়েছিলেন 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা কাজী আবদুল ওদুদের। তাঁর সান্নিধ্যেই বোধহয় কিরণশঙ্কর অর্জন করেছিলেন সাহিত্য-সমালোচনায় উদার দৃষ্টিভঙ্গির।

'ইন্টারমিডিয়েট কলেজে যখন বিজ্ঞান নিয়ে পড়ছি তখনই কিন্তু লেখালেখির সূত্রপাত' স্মৃতিচারণ করেছেন কিরণশঙ্কর।[১৪] এ সময় তিনি লিখেছেনও প্রচুর। তাই ১৯৩৬ সালেই তাঁর জুটে গেল 'আধুনিক কবি'র খ্যাতি। বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত ত্রৈমাসিক 'কবিতা' পত্রিকার আশ্বিন (১৩৪৩) সংখ্যায় মুদ্রিত হল তাঁর দুটি কবিতা : 'শত্রু' ও 'দৃষ্টান্ত'। ছাপার অক্ষরে প্রথম প্রকাশিত কবিতা। কিরণশঙ্কর লিখেছেন :

> ওই বছরেই [১৯৩৬] সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত পরিচয় পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় বেরুলো আমার তৃতীয় কবিতা 'অধ্যায়'। হঠাৎ যেন গণ্যমান্যদের মাঝে ঠাঁই পেয়ে গেলাম। কেননা ওই দুটি পত্রিকায় তখন যাঁরা লিখতেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব, অজিত দত্ত, মনীষ ঘটক, প্রেমেন্দ্র মিত্র।[১৫]

শুধু কবিতা নয় — এসময় তিনি গদ্য রচনায়ও আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

১৯৩৬-এ ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'সোনার বাংলা' পত্রিকায় তাঁর 'আধুনিক বাংলা গদ্য কবিতা' সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধ প্রকাশ পায়। 'সোনার বাংলা' তখন ঢাকার একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ও জাতীয়তাবাদী পত্রিকা এবং এর সম্পাদক ছিলেন 'বাংলার বিপ্লববাদ' বইয়ের লেখক নলিনীকিশোর গুহ। 'বাংলার বিপ্লববাদ' বইটিও কিরণশঙ্করের পড়া ছিল। সে সময় 'সোনার বাংলা' পত্রিকায় বাংলাদেশের নামকরা লেখকরা লিখতেন। সুতরাং কবি ও প্রাবন্ধিক হিসেবে অচিরেই তাঁর নাম সবার কাছে বেশ পরিচিত হয়ে গেল। এ সময় তিনি 'দেশ', 'আনন্দবাজার', 'যুগান্তর', 'স্বদেশ', 'খেয়ালি', 'দীপালি', 'নবশক্তি' প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ লিখেছেন। ফলে ১৯৩৭-এ যখন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ. ক্লাসের ছাত্র তখন ঢাকা হলের (বর্তমানে শহীদুল্লাহ্ হল) 'শতদল' পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। তাঁর আগে 'শতদল' পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব পেতেন শুধু এম.এ. ক্লাসের ছাত্ররা। তিনিই একমাত্র বি.এ'র ছাত্র হয়েও প্রথম এই পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব পান। পত্রিকার উপদেষ্টামণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন স্বনামধন্য আধুনিক কবি ও অধ্যাপক মোহিতলাল মজুমদার। বুদ্ধদেব গোষ্ঠীর সাহিত্যকে তিনি সবসময় 'অতি-আধুনিক সাহিত্য' বলে ব্যঙ্গ করতেন। ১৯৩৭ সালে পাটনায় প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে সাহিত্য শাখার সভাপতিরূপে মোহিতলাল যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার সমালোচনা করে কিরণশঙ্কর ঢাকার মাসিক 'শান্তি' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ঘটনাচক্রে সেই সমালোচনাটি মোহিতলালের নজরে পড়ে। কিরণশঙ্কর তখন তাঁর প্রত্যক্ষ ছাত্র। প্রতিদিন তাঁর ক্লাস করছেন — অথচ তিনি যে তাঁর বক্তৃতার এমন সমালোচনা লিখবেন সেটা মোহিতলাল কল্পনাও করেন নি। ছাত্রের এই ঔদ্ধত্যে

Dhaka University Institutional Repository

তিনি ভীষণ রাগান্বিত হলেন এবং 'অতি-আধুনিক' সাহিত্যের বিরুদ্ধে তীব্র গালাগাল করলেন। যদিও শিক্ষক রুচি বজায় রেখেই কিরণশঙ্করের নাম ধরে তিনি গালাগাল করেন নি। পরে অবশ্য মাসিক 'পরিচয়ে' প্রকাশিত কিরণশঙ্করের 'গলিত নখ' কবিতাটি পড়ে ছাত্রের কবিত্বশক্তি সম্পর্কে তাঁর আস্থা জাগে এবং কাছে ডেকে উৎসাহ দেন। 'শতদল' পত্রিকা সম্পাদনার সময়ে কিরণশঙ্কর সম্ভবত মোহিতলালের পূর্বের বিরূপতা ভোলেন নি; তাই উপদেষ্টার উপদেশ গ্রহণের পরিবর্তে 'শতদল' ছেপে বাঁধাই করা কপি নিয়ে শিক্ষকের কাছে উপস্থিত হলেন। তরুণকবির এই ঔদ্ধত্যেও মোহিতলাল নিশ্চয়ই কুপিত হয়েছিলেন কিন্তু পত্রিকার সম্পাদকীয় পড়ে সম্পাদকের ভাষাজ্ঞান সম্পর্কে ধারণায় সন্তুষ্ট হয়ে এবারও ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। 'শতদল'-এর মুখবন্ধ লিখেছিলেন সে সময়কার ঢাকা হলের প্রভোস্ট ড. জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ। মোহিতলাল সম্পর্কে কিরণশঙ্করের শ্রদ্ধাবোধ ছিল অনেক উঁচুতে। তিনি স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন :

> সাহিত্যের একজন জিজ্ঞাসু ছাত্র হিসেবে আমি দু'বছর তাঁর কাছে পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম এবং ওই দু'বছরের মধ্যেই প্রধানত তাঁর বক্তৃতা ও আলোচনা আমার সাহিত্য বিচারের পরিধি ও রসবোধকে ব্যাপকতর করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলো। বস্তুত সৎ সাহিত্যের এই স্রষ্টার কাছেই মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে গভীরভাবে পড়বার ও ভাবিত হবার প্রেরণা প্রথম লাভ করেছিলাম।[১৬]

কাব্যপাঠ বিষয়টি যে কী বস্তু তাও তিনি মোহিতলালের কাছেই শিখেছিলেন। এবং জেনেছিলেন সাহিত্যচর্চা শুধু যুগের হুজুগ মাত্র নয়, সারাজীবনের অধ্যবসায়, উদ্যোগ ও যত্নের মাধ্যমে তাকে করায়ত্ত করতে হয়। তাই মোহিতলালের ভর্ৎসনা কিরণশঙ্কর মনে রাখেন নি, কিন্তু সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে যে অসামান্য শিক্ষা তিনি লাভ করেছিলেন তাঁর কাছে সে কথা সারা জীবনেও ভোলেন নি। তাঁর কবিজীবন গঠনে মোহিতলালের অবদান অপরিসীম।

436741

এ সময় কিরণশঙ্করের কবিমানস গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিলেন আরো একজন অধ্যাপক সুশীলকুমার দে। এঁর কাছ থেকে তিনি বাংলা ছন্দ সম্পর্কে পরিষ্কার জ্ঞানলাভ করেছিলেন। সুশীলকুমার দে'র 'প্রাক্তনী' ও 'লীলায়িত' কাব্যগ্রন্থ দুটির সনেটগুলোও কিরণশঙ্করের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল।

বি.এ'তে কিরণশঙ্করের ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র কাছেও পাঠ নেবার সুযোগ হয়েছিল। পেয়েছিলেন পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীনকেও। জসীম উদ্‌দীন তাঁকে বোঝাতেন যে বুদ্ধদেব বসুর কবিতা খাঁটি বাংলা কবিতা নয়, কেননা সেগুলো পাশ্চাত্য প্রভাবে দুষ্ট এবং তাঁর নিজের লেখা কবিতাগুলোই গ্রামবাংলার জীবনকে রূপ দিয়েছে। অতএব তা খাঁটি বাংলা কবিতা।

ছাত্রাবস্থায় কিরণশঙ্কর গ্রীষ্ম, পুজো বা বড়োদিনের ছুটিতে প্রায়ই কলকাতা যেতেন। কলকাতায় শেয়ালদার কাছে চাঁপাতলায় ছিল তাঁর মামাবাড়ি। সেখানে থেকে তিনি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টপাধ্যায় প্রমুখের সঙ্গে পরিচিত হন এবং সখ্য গড়ে তোলেন। কিরণশঙ্করের ভাষায় :

Dhaka University Institutional Repository

> বলতে গেলে কাব্যচর্চার শুরুতে সহযাত্রী হিসেবে এঁদেরই আমি পেয়েছিলাম। ফলে তখনকারদিনে আধুনিক কবিতা কী ধরনের হওয়া উচিত এ বিষয়ে মোটামুটি একটা ধারণা গড়ে উঠেছিল।[১৭]

বি.এ পড়ার সময়ই কিরণশঙ্কর ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক 'শান্তি' পত্রিকার সহযোগী সম্পাদকের দায়িত্ব পান। 'শান্তি' এবং 'সোনার বাংলা' পত্রিকা দুটি ছিল তখন ঢাকার সাহিত্যচর্চার কেন্দ্রস্থল। তাই সেই অল্প বয়সে 'শান্তি' পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব পেয়ে তিনি সৎসাহিত্য সম্পর্কে ক্রমশ সচেতন হয়ে উঠলেন। ১৯৩৭ থেকে '৪০ পর্যন্ত তিনি 'শান্তি' পত্রিকা সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। চেয়েছিলেন পত্রিকাটির গতানুগতিক রূপকে কিছুটা পরিবর্তিত করে আধুনিক করতে। তাই তিনি সে সময়কার ঢাকা ও কলকাতার প্রতিষ্ঠিত ও নবীন কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমন্ত্রণ জানালেন 'শান্তি' পত্রিকায় লেখার জন্যে। তাঁর আমন্ত্রণে ঢাকার যাঁরা 'শান্তি'তে লিখেছেন সেইসব প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন তরুণ লেখকদের মধ্যে রণেশ দাশগুপ্ত, অচ্যুত গোস্বামী, সোমেন চন্দ, ভবানীপ্রসাদ দত্ত প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। প্রতিষ্ঠিত কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ, বিমলচন্দ্র ঘোষ, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, হরপ্রসাদ মিত্র, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, গোপাল ভৌমিক, গোবিন্দ চক্রবর্তী, জীবানন্দ ঘোষ, দ্বিজেন মৈত্র প্রমুখ কিরণশঙ্করের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে কবিতা বা অন্য কোনো রচনা প্রেরণ করেছিলেন। এ সকল কবির সঙ্গে প্রথম থেকেই তাঁর ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপন হয়েছিল এবং কবিতার ক্ষেত্রে পরস্পরের সহযোগী হিসেবে ভাবতে শিখেছিলেন। এ সময় পরিসরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যে 'শান্তি'তে লিখতেন মোহিতলাল মজুমদার, কাজী আবদুল ওদুদ, হরিদাস ভট্টাচার্য, আশুতোষ ভট্টাচার্য, জসীম উদ্‌দীন প্রমুখ মনস্বী কবি ও সাহিত্যিকগণ।

১৯৪০ সালে 'শান্তি' বন্ধ হয়ে গেলে সে সময়ে 'সোনার বাংলা'-ই হয়ে উঠেছিল ঢাকার শিল্প-সাহিত্যচর্চার একমাত্র অবলম্বন। জাতীয়তাবাদী পত্রিকা হলেও 'সোনার বাংলা'য় প্রগতিবাদী, সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় বিশ্বাসী তরুণ লেখকরাও সমান আগ্রহে লিখতেন। 'চল্লিশের দশকের শুরু থেকেই 'সোনার বাংলা' পত্রিকায় আমার অনেক লেখা প্রকাশিত হয়েছিলো। বোধহয় এই দশকটি ছিলো এই পত্রিকার সবচেয়ে উজ্জ্বল অধ্যায়'— স্মৃতিচারণ করেছেন কিরণশঙ্কর।[১৮] তাঁর 'আধুনিক কবিতার রূপ' এবং 'কাব্যনাট্যের সম্ভাবনা' 'সোনার বাংলা'য় প্রথম প্রকাশিত হয়। এছাড়াও তাঁর ডি.এইচ. লরেন্স, আলডুস হাক্সলি ইত্যাদি বিষয়ক লেখাও এ সময় 'সোনার বাংলা'য় ছাপা হয়। 'বৃটিশ আমলে ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'সোনার বাংলা' সে সময় পূর্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে সমাদৃত হয়েছিলো'।[১৯] সেই সময় 'সোনার বাংলা'য় লিখেছেন প্রবোধকুমার সান্যাল, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, বিমল মিত্র, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রমেশ মজুমদার, সুকুমার সেন প্রমুখ সুপ্রতিষ্ঠিত কবি, সাহিত্যিক ও প্রবন্ধকারগণ।

বস্তুত তিরিশের একেবারে শেষ দিকে কলকাতার মতো ঢাকাতেও সাহিত্যে আধুনিকতার আন্দোলন ঘনীভূত হয়। অবশ্য আধুনিক সাহিত্য আন্দোলনে বিশের

Dhaka University Institutional Repository

দশকে ঢাকা থেকে প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্ত সম্পাদিত 'প্রগতি' (১৯২৭) পত্রিকার অবদান অনস্বীকার্য। কিরণশঙ্কর লিখেছেন :

> পরবর্তীকালে এই পত্রিকার দু'তিনটি সংখ্যা পড়েই সাহিত্যের আধুনিকতার সূত্রগুলো সম্পর্কে কিছুটা সচেতন হয়েছিলাম।[২০]

এ পর্যন্ত আলোচনায় একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ১৯৪০-এর আগে ঢাকায় তেমনভাবে কোনো আধুনিক সাহিত্য আন্দোলন গড়ে ওঠে নি। এ সময় কিছু কিছু কবিতায় বিদেশী কবিতার প্রভাবকেই আধুনিকতা বলে বিবেচনা করা হত। প্রেম-বিরহ, নরনারীর দেহজ সম্পর্ক, সংশয় ও নৈরাশ্য, বিরূপ পরিবেশে আত্মহননের আভাস — এরকম একাধিক বিষয়ের প্রতিফলনের ভিত্তিতে কবিতা রচনায় তন্বিষ্ট ছিলেন সে সময়কার কবিরা। আদর্শ হিসেবে সামনে ছিলেন প্রথমত তিরিশের কবিরা — বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ ও আরো কেউ কেউ; এবং দ্বিতীয়ত অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ। কিরণশঙ্করের স্বীকারোক্তি :

> প্রথম কবিতা লেখা শুরু করেছিলাম, অর্থাৎ ১৯৩৬-৩৮-এ, তখন পর্যন্ত আধুনিক কবিতা লিখতে হবে, নতুন রীতির প্রতিষ্ঠা করতে হবে, বহুকালের প্রচলিত কাব্যধারাকে বর্জন করা দরকার — এই ধরনের মনোভাব নিয়েই শুরু হয়েছিল। আমাদের পূর্ববর্তী তিরিশের কবিরা তখন খুবই সক্রিয় এবং সে-কারণেই নতুন ধরনের কবিতা লেখার দৃষ্টান্ত চোখের সামনেই ছিল। কিন্তু রবীন্দ্র প্রতিভাসৃষ্ট ঐতিহ্যকে সরাসরি বর্জন করা সহজ ছিল না।[২১]

১৯৩৭-এ সাপ্তাহিক 'নবশক্তি' পত্রিকায় প্রকাশিত দুটি কবিতার কয়েকটি চরণ উল্লেখ করে কিরণশঙ্করের মন্তব্যকে স্পষ্ট করা যায় :

> অয়ি সুচিস্মিতা!
> শ্রীমণ্ডিত দেহে জ্বালি কামনার চিরন্তনী শিখা
> রচিবে আপন হাতে আপনার সর্ব্বনাশা চিতা?
> আমারো কি এই ছিলো স্ফীতরগ ললাটেতে লিখা?
> শুধু নারী লয়ে যাবে দিন আর কিছু নয়?
> মিনিটের রতি-স্বাদ জীবনের শ্রেষ্ঠ সঞ্চয়?[২২]

অথবা

> আমার প্রিয়ার বুকে এই মুখ রাখিয়াছি
> কতোরাতে আমি কতো দিন;
> ফুলের ভিতরে বুঝি লুকায়েছে দুষ্টু মৌমাছি,
> মৌমছি ফুলেতে বিলীন![২৩]

প্রথমটিতে রবীন্দ্রনাথ এবং দ্বিতীয়টিতে জীবনানন্দ দাশ ভাষায় ও প্রকরণে পূর্বসূরির দাবি নিয়েই উপস্থিত। নতুনত্ব যেটুকু আছে তা হচ্ছে বক্তব্য বিষয়ের স্পষ্টতা।

এ প্রসঙ্গে সুমিতা চক্রবর্তীর অভিমতটি তাই বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য :

> ঢাকা শহরের আধুনিক সাহিত্যাদর্শটি ১৯৩৬-৩৭-এ ছিলো 'কল্লোলীয়' ধারারই কিছু আধুনিকতর রূপ। সে আধুনিকতা বিষয়বস্তুতে ছিলো সর্বত্রচারী, আগ্রহী ছিলো পশ্চিমী কবিতার প্রসঙ্গ ও প্রকরণে, রাবীন্দ্রিক সৌষম্যবোধের মধুর, শালীন, অথচ প্রশান্ত গভীর অনুভবলোক থেকে সরে এসে তা হয়েছিলো একটু খরতাময়, কিছু যৌনতাগন্ধী।[২৪]

Dhaka University Institutional Repository

কিরণশঙ্কর এই ভাবাদর্শেই তখনো পর্যন্ত কবিতাচর্চায় মনোযোগী ছিলেন। এ সময় তিনি যা লিখেছেন তার বেশিরভাগ রচনাই প্রেমের কবিতা এবং নানা ধরনের রোমান্টিক লিরিক। তাঁর ১৩৪৪-এর পৌষ সংখ্যা 'কবিতা'য় প্রকাশিত 'আমি নহি স্বর্গের দেবতা' কবিতাটি ছাপতে গিয়ে সম্পাদক বুদ্ধদেব বসুকে বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। কারণ 'শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস'— যেখানে 'কবিতা' পত্রিকা মুদ্রিত হত — তার কর্মকর্তারা কবিতাটিতে 'অশ্লীলতা' লক্ষ করে মুদ্রিত কপিগুলো আটকে দিতে চেয়েছিলেন। তখন বুদ্ধদেব বসু কিরণশঙ্করের পক্ষে দাঁড়িয়ে অতুলচন্দ্র গুপ্তের কাছ থেকে সার্টিফিকেট লিখিয়ে নিয়ে গিয়ে প্রেস কর্মকর্তাদের মন গলিয়েছিলেন।[২৫] 'আমি নহি স্বর্গের দেবতা' কবিতাটির কয়েকটি লাইন এরকম :

আমার অবোধ ওষ্ঠ যদি তব মধু ওষ্ঠ চুমি'
মুহূর্তের মুধুস্বাদে ভরে নেয় ইন্দ্রিয়ের দ্বার,
দেহে আনে কামনার কবোষ্ণ জোয়ার,
কখনো কি ক্ষমা নাই তার?
ওইখানে ভুল!
আমাকে ভেবেছো তুমি নিরুপম দেবতা অতুল!
মোর দুই উপবাসী আঁখি
তোমার উরুতে খোঁজে কামনার অদ্ভুত ইসারা,
তব যুগ্ম পূর্ণ পয়োধর — কী ধারণ করিয়াছে তারা?
সব কথা অকপটে বলিবার নয়,
আমারি রক্তের ঢেউ আমি করি ভয়!

কবিতায় আদি রসের উগ্রতা নেই, কিন্তু শারীরিকতার অনুষঙ্গ বেশ প্রত্যক্ষ।

১৯৩৬ থেকে '৩৮-এর মধ্যে রচিত কবিতাগুলো নিয়ে ১৯৩৮-এর ডিসেম্বরে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'স্বপ্ন-কামনা'র ভূমিকা লিখতে গিয়ে জীবনানন্দ দাশ 'হে ললিতা ফেরাও নয়ন' কবিতা সম্পর্কে মন্তব্য লিখেছিলেন :

> বিষয়বস্তু অত্যন্ত মর্মান্তিক; নিতান্তই দৈহিক কামনা।[২৬]

অবশ্য এটি তাঁর অপেক্ষাকৃত আধুনিক রচনা উল্লেখ করে তিনি প্রশংসাও করেছিলেন। লিখেছিলেন :

> আবেগের আন্তরিকতা অনেকেই বোধ করেন; কিন্তু হৃদয়ে কল্পনা ও কল্পনার ভিতর চিন্তা ও অভিজ্ঞতার যে স্বতন্ত্র সারবত্তা তাকে কাব্যে পরিণত করে, আমার মনে হয় এ কবিতাটির ভিতর সেসবের প্রায় সম্পূর্ণ সফলতা আমি ছাড়া আরো কেউ কেউ অনুভব করতে পারবেন।[২৭]

এই কবিতাটি তখনকার তরুণ কাব্যপ্রেমীদের মুখে মুখে ফিরত। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে কিরণশঙ্করের 'হে ললিতা ফেরাও নয়ন' কবিতা প্রসঙ্গে অশোক মিত্র লিখেছেন :

> তিনি তখন প্রতিষ্ঠিত কবি, সমর সেন-কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-সুভাষ মুখোপাধ্যায় যাদের প্রায় কাছাকাছি বলয়ে তাঁর উপস্থিতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসঘরে, করিডরে, ঘাসঠাসা প্রাঙ্গণে, চায়ের আড্ডায় তাঁর কবিতা, পংক্তিমূর্চ্ছনা : হে ললিতা ফেরাও নয়ন,

Dhaka University Institutional Repository

> 'স্বপ্নকামনা'র আরো অনেকগুলি কবিতা আমরা পরস্পরকে অবিশ্রান্ত শোনাই, বারবার জিহ্বাকে হ্লাদিত করি : যদি শুভ্র শ্রী দেহের স্বাদ / আর নৈশ আশ্লেষ শয়ন / মুক্তিস্নান এনেছে জীবনে / দূরে থাক লোক পরিবাদ। প্রায় লজের মতো মুখে মুখে শব্দত্রয় ফিরি হয় : দূরে থাক লোক পরিবাদ।[২৮]

১৯৪০-এ প্রকাশিত হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও আবু সয়ীদ আইয়ুব সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হল কিরণশঙ্করের 'হে ললিতা ফেরাও নয়ন' কবিতাটি।

এখানে উল্লেখ যে, ১৯৩৮ সালেই কিরণশঙ্করের মা মায়াময়ী দেবী লোকান্তরিত হন। ছেলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ তিনি দেখে যেতে পারেন নি। তবে মৃত্যুর আগেই পুত্রের কবিখ্যাতি শুনে তিনি প্রীত হয়েছিলেন। কবির ছোট বোন অধ্যাপক ইভা দাশগুপ্ত স্মৃতি থেকে জানিয়েছেন :

> আমি শুনেছি মা প্রায়ই নাকি বলতেন, বলাই [কিরণশঙ্করের ডাক নাম] আমার অষ্টম গর্ভের সন্তান, ওর দ্বারাই এ বংশের মুখ উজ্জ্বল হবে।[২৯]

কথাটি পরবর্তীকালে সত্যিই হয়েছে। কবির ছোট ভাই সঞ্জয়শঙ্কর সেনগুপ্তও জানিয়েছেন :

> অষ্টম গর্ভের সন্তান বলে চিনিদা [কিরণশঙ্করকে তাঁর ছোট ভাই-বোনেরা এ নামেই সম্বোধন করতেন] বাবা-মায়ের বিশেষ স্নেহ ও প্রশ্রয় পেতেন।[৩০]

১৯৩৯ সালে বি.এ পাশ করে কিরণশঙ্কর এম.এ-তে ইংরেজি সাহিত্য নিলেন। ইংরেজির অধ্যাপকদের মধ্যে পরবর্তীকালে দুজন অধ্যাপকের নাম তিনি খুব স্মরণ করেছেন। একজন হচ্ছেন অধ্যাপক প্রফুল্লকুমার গুহ, যাঁর কাছে তিনি শেক্সপিয়র সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করেছিলেন। আরেকজন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ করা ইংরেজ তরুণী অধ্যাপক মিস ম্যাকাই। তাঁর কাছ থেকে স্প্যানিশ ট্রাজেডি সম্পর্কে লাভ করেছিলেন গভীর জ্ঞান।

কিরণশঙ্কর যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখন বুদ্ধদেব বসু মাঝে মধ্যে ছুটিতে কলকাতা থেকে ঢাকা আসতেন। তাঁর শ্বশুর বাড়ি ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় নিকটবর্তী। কিরণশঙ্কর এবং আরো কেউ কেউ তখন বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। তিনিও তাঁর এসব অনুরাগী ভক্তদের সঙ্গে কাব্য-বিষয়ক আলোচনায়, বিতর্কে যোগ দিতেন। সে সময়কার স্মৃতিচারণ করে কিরণশঙ্কর লিখেছেন :

> তখন জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অজিত দত্ত, মণীষ ঘটক, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে প্রভৃতির কবিতায় তাজা যৌবনের চিহ্ন সুস্পষ্ট : আমরা দারুণ অভিভূত ছিলাম। মনে পড়ছে তখন ঢাকায় বুড়িগঙ্গা তীরে বাকল্যান্ড বাঁধের ওপর নবাববাড়ির পেছনে অপেক্ষাকৃত নির্জন জায়গায় গোল হয়ে বসে গভীর রাত পর্যন্ত চলতো আমাদের সাহিত্যের আড্ডা; নবাববাড়ির ঘড়িতে ঢঙ ঢঙ করে রাত দশটা বাজতেই আমরা যেন অনেকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাড়ি ফিরতে বাধ্য হতাম।[৩১]

১৯৩৯ পর্যন্ত এ অবস্থা অব্যাহত ছিল। এ সময় কিরণশঙ্কর গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ সবই লিখেছেন। আর ঢাকা এবং কলকাতা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রিকায় তা ছাপা হচ্ছে। কিরণশঙ্করের ভাষায় :

Dhaka University Institutional Repository

> তখন কলকাতা থেকে কবিতা পত্রিকা বেরুচ্ছে। পরিচয় ত্রৈমাসিক থেকে মাসিকে রূপান্তরিত হয়েছে; সাপ্তাহিক দেশ এবং সিনেমাঘেঁষা সাপ্তাহিক খেয়ালি দীপালি সন্দেশ ইত্যাদি নিয়মিত বেরুচ্ছে। আমাদের লেখার জায়গার অভাব ছিলো না। এইসব পত্রপত্রিকায় ইচ্ছেমতো লেখার সুযোগ পেয়েছি।[৩২]

তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় 'অগ্রগতি'তে। এ পত্রিকাতেই তাঁর ধারাবাহিক বড়গল্প 'নিরুদ্দেশ মেঘ'ও প্রকাশ পায়। আগাথা ক্রিস্টির প্লট থেকে ধার করে লেখা গল্প 'করবীর ইঙ্গিত' বেরিয়েছে কৃষ্ণেন্দু ভৌমিকের সাপ্তাহিকে। 'স্বদেশ' পত্রিকাসহ নানান পত্রিকায় আরো কিছু গল্প তিনি লিখেছেন এ সময় এবং এরপরেও। তবে পরবর্তীকালে কিরণশঙ্কর তাঁর সেসব গল্পকে স্বীকার করেন নি এবং সে সময় পর্যন্ত কমিটেড লেখক বলে যে কেউ থাকতে পারে তা তিনি ভাবতে পারতেন না।

এ সময়ই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র প্রতিনিধি হিসেবে কলকাতার ছাত্র-ছাত্রীদের মুখপত্র 'শ্রীহর্ষ' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন কিরণশঙ্কর। 'শ্রীহর্ষে'র সূত্রেই পরিচিত হয়েছিলেন বিজন মিত্র, সমর সেন, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ প্রমুখের সঙ্গে।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত এম.এ পাস করেন ১৯৪২-এ। যদিও ১৯৪১ সালেই তাঁর এম.এ ফাইনাল দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার কারণে '৪১-এ পরীক্ষা পিছিয়ে গেল। ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তখন বার্ষিক উৎসবের মতো ছিল। সরদার ফজলুল করিমের ভাষায় 'ক্রনিক দাঙ্গা'। তিনি 'চল্লিশের দশকের ঢাকা'য় লিখেছেন :

> ঢাকায় দাঙ্গা আমাদের সেকালের ম্যালেরিয়ার মতো আমরা সহ্য করেছি। তা নিয়ে জীবনযাপন করেছি।[৩৩]

এ সময় দাঙ্গা হত মুসলমানদের মহররম কিংবা হিন্দুদের শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উৎসবকে কেন্দ্র করে। কিংবা ভারতের কোনো অংশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় কেউ নিহত হওয়ার সংবাদ প্রচার হলে। তবে ঢাকার এ সমস্ত দাঙ্গা কখনো মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে নি এবং গণহত্যার মতো ঘটনাও ঘটে নি। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত লিখেছেন :

> ১৯৩০-এর পর ১৯৪০ পর্যন্ত ঢাকায় অবশ্য হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ ছিলো। এই সময়টা আমার নিজের কৈশোর থেকে যৌবনে পৌছাবার কাল। এই সময়ের স্মৃতি সুখবহ, সুস্থির ও তরঙ্গিত; এই দশটা বছর যেন আমার জীবনে সোনার ঝাঁপির মুখ খুলে দিয়েছিলো।[৩৪]

বস্তুত ঢাকায় বিশের দশকের প্রথম দিকে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ভালোই ছিল। ১৯২৬-এ কলকাতা ও বরিশালে দাঙ্গা হওয়ার পরে ঢাকায় কিছুটা গুমোট অবস্থার সৃষ্টি হয়। ১৯৩০-এর জন্মাষ্টমীর উৎসবকে কেন্দ্র করে সেই গুমোটভাব ঝড়ের মতো আছড়ে পড়ে ঢাকায়, বেঁধে যায় দাঙ্গা। এরপর অবশ্য ১৯৪০ পর্যন্ত ঢাকায় আর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধে নি। বিশ শতকের শুরু থেকেই দৈশিক ও বৈশ্বিক পরিস্থিতি — কি রাজনৈতিক, কি সামাজিক, কি অর্থনৈতিক — কোনো না কোনো অস্থিরতার মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করছিল। যদিও এই সময়কার বিস্তারিত বিবরণ এ অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে পরিবেশিত হয়েছে, তবুও কিরণশঙ্করের জীবন ও মানস বুঝতে অত্যন্ত সংক্ষেপে কিছু কথা যোগ করা সমীচীন বোধ করছি।

Dhaka University Institutional Repository

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত যখন জন্মগ্রহণ করেন তখনো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছে এবং সে বছরের শেষদিকে এই যুদ্ধ শেষ হয়। (১৯১৮ সালের ১২ই নভেম্বর)। যুদ্ধের মধ্যেই গঠিত হয়েছে বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়া (১৯১৭)। তারও আগে এদেশে বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) আন্দোলন সম্পন্ন করে আবার তা জোড়া লাগানো হয়েছে (১৯১১)। ইংরেজদের স্বৈরাচারী ঔদ্ধত্যের বাড়াবাড়িতে সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডের ব্যাপকতা বেড়েছে। 'অনুশীলনী দল', 'যুগান্তর দল', 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স বা বি.ভি.', 'শ্রী সংঘ', 'মুক্তি সংঘ' প্রভৃতি বিপ্লবীদলের এবং এসব বিপ্লবীদলের ত্যাগী নেতা হিসেবে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, অরবিন্দ ঘোষ (ঋষি অরবিন্দ), রাসবিহারী বসু, হেম ঘোষ, অনিল রায়, লীলা রায়, বিপিন গাঙ্গুলী, বাঘা যতীন প্রমুখ নেতৃবৃন্দের আবির্ভাব ঘটেছে। ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়েছে (১৯০৮); বাঘা যতীন শহীদ হয়েছেন (১৯১৫)। ১৯১৮ সালে সরকার নিযুক্ত রাউলাট রিপোর্টে লেখা হয় যে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত অনুশীলন সমিতির শাখা ছিল ৫০০ এবং বিভিন্ন প্রদেশেও এর শাখা ছিল।[৩৫]

কিরণশঙ্করের বয়স যখন প্রায় এক বছর তখনই ইতিহাসের সবচেয়ে ঘৃণিত ও বীভৎসতম জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় (১৯১৯)। ১৯২১ থেকে ১৯২৫ সালের মধ্যে কিছু ঘটনায় বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীদের মাঝে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। ১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতবর্ষের সমগ্র হিন্দু-মুসলমান মিলিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রবল গণআন্দোলনের সৃষ্টি হয়। ধারণা করা হয় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সময়ের ব্যাপার মাত্র। কিন্তু ১৯২২-এ গান্ধী ও কংগ্রেস এই অসহযোগ আন্দোলন থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিলে সারা দেশব্যাপী আশাভঙ্গের কালো ছায়া নেমে আসে। ফলে জাতীয় আন্দোলনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে অনেকেই কমিউনিজমের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ঢাকাতে ১৯২২ সালের দিকে জার্মানি থেকে প্রকাশিত 'ভ্যানগার্ড' নামে কমিউনিস্টদের একটি প্রচারপত্রিকা গোপনে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। ১৯২৩ সালে বিপ্লবী এম.এন. রায়ের প্রতিনিধি হিসেবে নলিনী গুপ্ত এবং অবনী মুখার্জী নামে দুজন প্রবাসী বিপ্লবী ঢাকায় এসে কিছুকাল অবস্থান করেন। ঢাকার অনুশীলন সমিতি তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করে। এ সময় বেশ কিছু সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীকর্মী এঁদের সংস্পর্শে আসেন এবং কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্বন্ধে ধারণা লাভ করে কমিউনিজমের প্রতি আকৃষ্ট হন। এঁদের মধ্যে নলীন্দ্র সেন ও গোপাল বসাক ছিলেন অন্যতম। এঁরা কলকাতা ও অন্যান্য অঞ্চলের কমিউনিস্ট নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ১৯২৬ সালের দিকে ঢাকাতে কমিউনিজমকে ভিত্তি করে একটা সংগঠন দাঁড় করাতে চেষ্টা করেন। ১৯২৭ সালে যুবসম্মেলন উপলক্ষে কমরেড মুজফ্‌ফর আহমেদ ও ডা. উপেন দত্ত আমন্ত্রিত হয়ে ঢাকায় আসেন। এ সম্মেলনে কমরেড মুজফ্‌ফর আহমেদ স্বাধীনতা সংগ্রামে কৃষক ও শ্রমিকদের ভূমিকা উল্লেখ করে যে ভাষণ দেন তা ঢাকার যুবক ও বিপ্লবীদের সামনে একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় তুলে ধরে। ১৯২৮ সালে ঢাকায় এলেন ইংল্যান্ডের বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা ফিলিপ স্প্রান্ট। এ বছরই কমিউনিস্ট নেতৃত্বে নারায়ণগঞ্জের ঢাকেশ্বরী মিলে শ্রমিক ধর্মঘট হয়। এতে গোপাল বসাক ও তাঁর মুষ্টিমেয় সহকর্মী শ্রমিকদের মাঝে ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। ১৯২৯ সলে মিরাট ষড়যন্ত্র মামলায়

Dhaka University Institutional Repository

গোপাল বসাক গ্রেফতার হন এবং ১৯৩০ সালে নলীন্দ্র সেনও বিনাবিচারে আটক হলে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে ভাটা পড়ে। ১৯৩৪-'৩৫ সালে গোপাল বসাক ও আরো কেউ কেউ এবং ১৯৩৭ সালে নলীন্দ্র সেন মুক্তি পান। ১৯৩৭ সালেই ঢাকায় কমিউনিস্ট পার্টির সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয় এবং নলীন্দ্র সেন সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৩৭-'৩৮ সালে আন্দামান ও অন্যান্য জেল থেকে মুক্তি লাভ করে বহু সংখ্যক অভিজ্ঞ ও নেতৃস্থানীয় বিপ্লবী ঢাকায় আসেন এবং কমিউনিস্ট আদর্শ গ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে নেপাল নাগ, বিনয় বসু, জ্ঞান চক্রবর্তী, সত্যেন সেন, বারীন দত্ত, সতীশ পাকড়াশী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৮ সালের মধ্যেই ঢাকা প্রেস শ্রমিক ইউনিয়ন, ধাঙ্গর ইউনিয়ন, ইলেকট্রিক সাপ্লাই ওয়ার্কস ইউনিয়ন, রেলওয়ে ওয়াকার্স ইউনিয়ন প্রভৃতি ইউনিয়নগুলো গড়ে ওঠে। ১৯৩৯ সালে ছাত্র ফেডারেশনের সংগঠনও বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ছাত্রনেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন কালীপদ গাঙ্গুলী, রমেশ রায়, নিরঞ্জন গুপ্ত, সুধীর কর প্রমুখ। এ সময় ঢাকাতে কংগ্রেস, ফরোয়ার্ড ব্লক ও আরো কিছু কিছু রাজনৈতিক দলের শক্তিশালী অবস্থান ছিল।

এই সময় পরিসর হচ্ছে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের শৈশব-কৈশোর-যৌবনকাল। তাঁর শৈশবে বাসাবাড়ি লেনে থাকতেন বিখ্যাত স্বদেশী নেতা অনীল রায়, রণা রায় ও অমূল্য সেন। অনীল রায়ের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ছিল নিকট আত্মীয়ের। দুই পরিবারের মধ্যে বেশ যাতায়াত ছিল। অমূল্য সেনের ছোট ভাই অমিয় ছিলেন কিরণশঙ্করের খেলার সাথী। তাই দশ বছর বয়সেই তিনি 'স্বদেশী' শব্দের অর্থ জানতে পেরেছিলেন। যখন তাঁতিবাজারে তাঁরা থাকতে আরম্ভ করেন তখন (১৯৩১) তিনি সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। পাড়ায় ব্যায়ামচর্চা করতে গিয়ে পরিচিত হন একটি গোপন রাজনৈতিক দলের সদস্যদের সঙ্গে। এবং তারাই নানা বইপত্র পড়িয়ে তাঁকে তাদের সেই গোপন রাজনৈতিক দলের সদস্য হবার যোগ্য করে নিয়েছিলেন।[৩৬] ১৯৩০-'৩৪ পর্যন্ত সময়টা ছিল স্বদেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের নানান কর্মকাণ্ডে আন্দোলিত। এ সময় মাস্টারদা সূর্যসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ঘটনা ঘটেছে। বিপ্লবী নেতা অনিল দাস প্রাণ দিলেন ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে। বিপ্লবীদের গুলিতে ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালের লোমান সাহেব মারা গেলেন। এসব সহিংস ঘটনার পাশাপাশি গান্ধীজির অহিংস লবণ আইন অমান্য করার আন্দোলনের ঢেউ এসেও পৌঁছেছে ঢাকায়। সব মিলিয়ে এই সময়টা স্বদেশপ্রেম ও সামাজিক আশা-আকাঙ্ক্ষা নানাদিক থেকে সাধারণ মানুষকে তরঙ্গিত করে তুলেছিল।

কিরণশঙ্কর তার ব্যতিক্রম নন। তিনি লিখেছেন :

> মাস্টারদার মন্ত্র তখনই আমার মতো অনেক কিশোরের কানে এসে পৌঁছেছে।[৩৭]

এই সময়ে তাঁদের পাড়ার বিপ্লবী নেতা বারীন রায়ের বাড়িতে তিনি যাতায়াত করতেন। বারীন রায় তখন জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়িতে থাকতেন। কিরণশঙ্কর তাঁর কাছে বসে বিপ্লববাদের কাহিনি শুনতেন। গোপন রাজনৈতিক দলের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ অক্ষুণ্ন ছিল। কিরণশঙ্কর লিখেছেন :

Dhaka University Institutional Repository

> ঢাকা শহরের কয়েকটি জায়গা ছিলো যেখানে সন্ধ্যার অন্ধকারে পুলিশের চোখ এড়িয়ে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা হতো। যেদিন যে জায়গায় উপস্থিত থাকবার নির্দেশ দেয়া হতো সেদিন সে জায়গায় আগেই উপস্থিত হয়ে সঙ্গোপনে বসে থাকতে হতো মাঠের ঘাসের ওপর। হয়তো শীত, হয়তো বৃষ্টি, এক-একদিন যেতে মোটেই ইচ্ছে হতো না, তবু শেষ পর্যন্ত যেতে হতো।[৩৮]

তবে 'স্বদেশী' হবার এই কৃচ্ছ্র সাধনে তিনি বেশিদিন স্থিত হন নি, এবং এই গোপন রাজনৈতিক দলের আদর্শগতভাব তাঁর পরবর্তী জীবন গঠনে তেমন কোনো ছাপ ফেলে নি।

বস্তুত সময়টা ছিল পরিবর্তনের কাল। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন থেকে গণ-আন্দোলনের দিকে রাজনীতি বাঁক নিচ্ছিল। ফলে বিভিন্ন দলের কর্মীরা নতুন রাজনীতির পথে চলতে শুরু করেছিল। তিরিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে ঢাকায় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন গণ-আন্দোলনে রূপ নিতে শুরু করে।

১৯৩৭ সালে যখন কিরণশঙ্কর বি.এ'র ছাত্র তখন থেকেই প্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতন্ত্রবাদী চিন্তাধারা ছাত্রদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। কালীপদ গাঙ্গুলী, অজিত রায় প্রমুখের নেতৃত্বে কখনো কখনো তাঁদের পরিচালিত মিছিলে অংশ নিয়ে তিনি ঢাকা শহর পরিক্রমা করেছেন।

মোটকথা তিরিশের দশকের প্রায় শেষ দিকে এসে বামপন্থী রাজনীতির ঢেউ এসে লাগল ঢাকা শহরে। তার প্রভাব দেখা দিল সাহিত্যেও। ১৯৩৭ সালে প্রগতি লেখক সংঘের শাখা খোলার জন্যে ঢাকায় এলেন 'নিলিখ ভারত প্রগতি লেখক সংঘে'র সম্পাদক অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও অন্যতম সংগঠক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ১৯৩৮ সালের শেষ দিকে আন্দামান ফেরত সাম্যবাদে দীক্ষিত বিপ্লবীরা ঢাকার দক্ষিণ মৈশুণ্ডির জোড়পুল লেনে 'কমিউনিস্ট পাঠচক্র' নামে একটি গোপন অফিস প্রতিষ্ঠা করেন, সেখানে ক্লাসের মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণি ও যুবকদের মার্কসবাদ-লেলিনবাদের বিপ্লবী দর্শনে উদ্বুদ্ধ করা হত। এই পাঠচক্র পরিচালনা করতেন সতীশ পাকড়াশী, জ্ঞান চক্রবর্তী, রণেশ দাশগুপ্ত প্রমুখ বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ। 'প্রগতি পাঠাগার' নামে এই পাঠচক্রের একটি প্রকাশ্য শাখা ছিল এবং সেটি পরিচালনা করতেন রণেশ দাশগুপ্ত। কিরণশঙ্করের বাল্যবন্ধু সোমেন চন্দ থাকতেন দক্ষিণ মৈশুণ্ডিতে। তিনি 'প্রগতি পাঠাগারে' নিয়মিত যাতায়াত করতেন। একদিন তাঁরই আহ্বানে কিরণশঙ্করও 'প্রগতি পাঠাগারে' যোগ দেন। ১৯৩৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে যখন ঢাকার কমিউনিস্ট-হিউম্যানিস্ট-প্রগতিশীল লেখকদের উদ্যোগে 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ' গঠিত হয় তখন অন্যান্যের সঙ্গে কিরণশঙ্করও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই সংঘের মূল স্থপতি রণেশ দাশগুপ্ত সেদিনকার স্মৃতিচারণে লিখেছেন :

> ঢাকার প্রগতি লেখক সংঘের শাখা স্থাপিত হয়েছিল একটা সন্ধিক্ষণে। শাখা স্থাপনের প্রস্তুতির মূলে ছিলেন কয়েকজন তরুণ লেখক, যাঁরা ভাবছিলেন প্রগতি লেখক সংঘের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও গণমুখী ঘোষণাপত্র অনুযায়ী অবিলম্বে কিছু করা দরকার। যাঁরা এই প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে তরুণ বয়সী ছিলেন সোমেন চন্দ, যার বয়স তখন আঠারো, আর সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন সতীশ পাকড়াশী

Dhaka University Institutional Repository

> ('অগ্নিযুগের কথা'র লেখক), বাংলার অগ্নিযুগের পথিকৃতদের একজন, যাঁর বয়স সে সময়ে পঁয়তাল্লিশ অতিক্রম করেছে। সোমেনের দুই সমবয়সী বন্ধু একেবারে গোড়ার দিকে উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন। একজন কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত — সে সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, অতি আধুনিক কবিতা লিখে নাম করেছিলেন, তাঁর কবিতার বই 'স্বপ্ন-কামনা' তখন প্রকাশনার পথে — ভূমিকা লিখে দিয়েছেন জীবনানন্দ দাশ। অপরজন অমৃতকুমার দত্ত।[৩৯]

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত লিখেছেন :

> প্রগতি লেখক সংঘের প্রথম সভায় যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের প্রায় সকলকেই ভালো লাগলো তাঁদের কথাবার্তা ও আলোচনা শুনবার পর। রণেশ দাশগুপ্ত, সরলান্দ সেন, অমৃত দত্ত, অচ্যুত গোস্বামী, সোমেন চন্দ ছাড়াও আরো কেউ কেউ ছিলেন। এক বছরের মধ্যেই ঢাকার প্রগতি লেখক সংঘ দস্তুর মতো একটি প্রভাবশালী সংগঠনে পরিণত হয়েছিলো।[৪০]

সন্ত্রাসবাদী দল থেকে মুক্ত হয়ে কিরণশঙ্কর প্রগতি লেখক সংঘে যোগ দিয়ে নতুন করে দায়বদ্ধ হলেন। তাঁর এ দায়বদ্ধতা আমৃত্যু ছিল।

১৯৪০ সালের মাঝামাঝিতে গেন্ডারিয়া হাইস্কুল প্রাঙ্গণে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের প্রথম আনুষ্ঠানিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন 'বুদ্ধির মুক্তির' আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা, ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর সংগঠক কাজী আবদুল ওদুদ। সম্মেলনে রণেশ দাশগুপ্তকে সম্পাদক ও সোমেন চন্দকে সহ-সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। ১৯৪০-এর ডিসেম্বরে ঢাকা জগন্নাথ ইন্টারমিডিয়েট কলেজের এ্যাসেম্বলি হলে অনুষ্ঠিত হয় প্রগতি লেখক সংঘের বার্ষিক প্রীতি সম্মেলন। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কবি বুদ্ধদেব বসু। সাহিত্যপাঠের আসরে কবিতা-গল্প ও প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, সোমেন চন্দ, ভবানীপ্রসাদ দত্ত, নৃপেন ভট্টাচার্য, অমৃত কুমার দত্ত প্রমুখ। সাহিত্যবিষয়ক আলোচনায় অংশ নেন অধ্যাপক অমলেন্দু বসু, প্রাবন্ধিক নবেন্দু বসু এবং অধ্যাপক জুলফিকার আলী। ডিসেম্বরের প্রীতি সম্মেলনের আগে সংঘের উদ্যোগে ঢাকার পুরানা পল্টন ও রমনা এলাকায় আরো কয়েকটি সাহিত্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এসব অনুষ্ঠানে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, অধ্যাপক অমিয়কুমার দাশগুপ্ত, অধ্যাপক পৃথ্বীশ চক্রবর্তী প্রমুখ মনস্বীগণ উপস্থিত থেকে সংঘের সদস্যদের উৎসাহ প্রদান করেন। ১৯৪১ সালের অক্টোবরে ব্যাপটিস্ট মিশন হলে ঢাকার প্রগতি লেখক সংঘের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কাজী আবদুল ওদুদের সভাপতিত্বে। এ সম্মেলনে সংঘের সম্পাদক হিসেবে সোমেন চন্দ এবং সহ-সম্পাদক হিসেবে অচ্যুত গোস্বামী নির্বাচিত হন। সাহিত্য পাঠের আসরে কবিতা-গল্প ও প্রবন্ধ পাঠ করেন কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, সোমেন চন্দ, অচ্যুত গোস্বামী, সরলানন্দ সেন, রণেশ দাশগুপ্ত প্রমুখ। এ সময় প্রগতি সাহিত্যের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার জন্যে ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় কাজী আবদুল ওদুদ, বুদ্ধদেব বসু, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখ গুণীজনের সভাপতিত্বে বেশ কয়েকটি সাহিত্য-সভা অনুষ্ঠিত হয়। ফলে অল্প সময়ের মধ্যে প্রগতি লেখক সংঘের সঙ্গে অনেক তরুণ লেখকের যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

কলকাতা 'প্রগতি লেখক সংঘে'র উদ্যোগে 'প্রগতি' (১৯৩৯) সংকলন প্রকাশ হলে ১৯৪০ সালে রণেশ দাশগুপ্তের তত্ত্বাবধানে ঢাকা জেলা প্রগতি লেখক সংঘের লেখকদের লেখা নিয়ে প্রকাশিত হল 'ক্রান্তি' নামের ১৬০ পৃষ্ঠার সাহিত্য সংকলন। সংঘের পক্ষ থেকে সংকলনের প্রকাশক হলেন সোমেন চন্দ। সংকলনটির লেখক সূচির অন্যতম ছিলেন রণেশ দাশগুপ্ত, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, সোমেন চন্দ, অচ্যুত গোস্বামী, সরলানন্দ সেন প্রমুখ। প্রগতিশীল চিন্তাধারার পরিপোষক এরকম একটি সাহিত্য সংকলন প্রকাশিত হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা ও কলকাতার লেখক সমাজ এই লেখকগোষ্ঠীকে অভিনন্দন জানান। এ সময় থেকেই দুই বাংলার প্রগতিশীল সাহিত্যকর্মীদের মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপিত হয়। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত লিখেছেন :

> 'ক্রান্তি' সঙ্কলন প্রকাশের পর থেকে ঢাকা 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘে'র আসর জমজমাট হয়ে উঠেছিলো। এই সময় থেকে তরুণ মুসলমান লেখকরাও কেউ কেউ যাতায়াত শুরু করেন।[৪১]

উল্লেখ্য যে চল্লিশের দশকের আগে মুসলমান তরুণ সমাজের মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া রাজনীতি কিংবা সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তেমন অংশগ্রহণ লক্ষ করা যায় নি।

১৯৪০-'৪১-'৪২-এ ঢাকার প্রগতি লেখক সংঘের সদস্যরা যেন একটা সাহিত্যিক ঘোরের মধ্যে থাকতেন। প্রতি সন্ধ্যায় কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, অচ্যুত গোস্বামী, সোমেন চন্দ, অমৃতকুমার দত্তসহ আরো কেউ কেউ ভিক্টোরিয়া পার্ক কিংবা বুড়িগঙ্গার তীরে জমায়েত হতেন। অধিকাংশ সময়ই তাঁদের কাটত প্রগতি সাহিত্য এবং মানুষের মুক্তির সংগ্রাম বিষয়ে আলোচনা করে। সেখানে যেমন বাংলা সাহিত্য আলোচনা হত, তেমনি আলোচনা হত রুশ ও ইংরেজি সাহিত্য নিয়েও। শুধু সাহিত্য কিংবা সংস্কৃতি ভাবনায় তাঁরা মশগুল থাকতেন না — প্রয়োজনে প্রগতি লেখক সংঘের সদস্যরা সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেও অংশ নিতেন। চল্লিশের দশকের প্রথম দিকে ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধে প্রগতি লেখক সংঘের সক্রিয় ভূমিকা ছিল।

১৯৪১-এ সোভিয়েত রাশিয়া হিটলার বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হলে 'প্রগতি লেখক সংঘ' ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে রূপান্তরিত হয়। এ সময় ঢাকা প্রগতি লেখক সংঘের উদ্যোগে 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি' গঠন করা হয়। এই সমিতির সম্পাদক পদে যুগ্মভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ও দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় — তাঁরা তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সেদিনের স্মৃতিচারণে বলেছেন :

> সোভিয়েত সুহৃদ সমিতিতে কিরণবাবুই আমাকে ডেকে নিয়ে যান এবং সূত্রাপুরের ডালপট্টির মোড়ে অতুল বাবুর বাড়িতে মিটিং হয়। সেখানে যুগ্মভাবে আমাদের দুজনকে সম্পাদক করা হয়।[৪২]

সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির পক্ষ থেকে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন-এর নতুন সমাজ ও সভ্যতার বহুমুখী অগ্রগতির বিষয়টি তুলে ধরে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ঢাকার ব্যাপটিস্ট মিশন হলে এক সপ্তাহ ব্যাপী চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। প্রদর্শনীর দ্বার-উদ্ঘাটন করেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এবং তিনি এ প্রদর্শনীর নাম দেন 'সোভিয়েত মেলা'। কিরণশঙ্কর লিখেছেন :

Dhaka University Institutional Repository

> আজ শুনতে অবাক লাগবে যে তখনকার দিনে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজজীবন সম্পর্কিত চিত্রাবলী সংগ্রহ সহজসাধ্য ছিলো না। অল্প সময়ের মধ্যে যেসব বই সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিলো তা থেকেই বিভিন্ন ছবি ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে স্থানীয় চিত্রশিল্পীদের সাহায্যে বড়ো আকারের প্রায় শ'খানিক ছবির এই প্রদর্শনী করা হয়েছিলো। ঢাকা শহরে এই ধরনের একটি ব্যাপার তখনকার দিনে একেবারেই নতুন।[৪৩]

সোভিয়েত মেলা ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল তখনকার ঢাকার সাধারণ মানুষ ও গুণীজনদের মনে।

১৯৪২ সালের ৮ই মার্চ সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির পক্ষ থেকে ঢাকায় ফ্যাসিবাদ বিরোধী একটি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এ সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন কলকাতা থেকে আগত বঙ্কিম মুখার্জী, জ্যোতি বসু, শামসুল হুদা, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, স্নেহাংশু আচার্য প্রমুখ এবং ঢাকার ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, কাজী আবদুল ওদুদ, জ্ঞান চক্রবর্তী, সতীশ পাকড়াশী, রণেশ দাশগুপ্ত, ফণী গুহ, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অচ্যুত গোস্বামী, অমৃত দত্ত, নেপাল নাগ, অনিল মুখার্জী প্রমুখ শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতা। এই সম্মেলনে যোগ দিতে আসার পথে বিরোধী রাজনৈতিক দুষ্কৃতকারীদের হাতে তরুণ কথাসাহিত্যিক সোমেন চন্দ নৃশংসভাবে খুন হন। সোমেনের মৃত্যু দেশের প্রগতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের প্রবলভাবে আলোড়িত ও বিক্ষুব্ধ করে তোলে। সোমেন চন্দের মৃত্যুতে কিরণশঙ্কর ভীষণ বিচলিত হন। তিনি লিখেছেন :

> সোমেন চন্দের মৃত্যু আমার সাহিত্যচেতনাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়ে গিয়েছিলো। প্রগতি লেখক সংঘের অন্য তরুণ বন্ধুরাও নতুন করে ভাবতে শুরু করেছিলেন। ১৯৪২-এ দেশ-বিদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল। ইউরোপের যুদ্ধ আফ্রিকায় ও সুদূর প্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। স্বদেশেও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সঙ্কটের ছায়া ক্রমবর্ধমান। ১৯৪০-এ আমাদের সাংস্কৃতিক ভাবনাকে রূপ দিতে চেয়েছিলাম ক্রান্তি নামের সঙ্কলন গ্রন্থটিতে। সোমেনের তিরোধান আমাদের হতম্লান করার পরিবর্তে আরো প্রত্যয়দৃঢ় করলো। সবাই মিলেমিশে প্রকাশ করলাম ঢাকা থেকে প্রতিরোধ পত্রিকা।[৪৪]

সোমেন চন্দের স্মৃতি স্মরণে তিনি লিখেছেন :

> আজ তুমি নেই। কিন্তু তোমার জীবন
> অবিচল আত্মদানে দিয়েছে নির্দ্দেশ
> সায়াহ্নের কর্ত্তব্যের , তাই প্রাণপণ
> দুষমণদের সাথে লড়ে সারা দেশ।
> হে বন্ধু, বুকের মাঝে যতো রক্ত থাকে —
> আরো লাল করে দিলো রক্ত-পতাকাকে।[৪৫]

'প্রতিরোধ' পাক্ষিক পত্রিকার সম্পাদক নির্বাচিত হলেন কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ও অচ্যুত গোস্বামী; এবং লেখক সূচিতে ছিলেন সত্যেন সেন, রণেশ দাশগুপ্ত, অজিতকুমার গুহ, সরলানন্দ সেন, অমিত সেন, মুনীর চৌধুরী, সরদার ফজলুল করিম, সানাউল হক, সৈয়দ নূরুদ্দিন, রণেন মজুমদার প্রমুখ।

Dhaka University Institutional Repository

'প্রতিরোধ' পত্রিকা চেয়েছিল দুবাংলার প্রবীণ ও নবীন লেখকদের দেশের দুর্দিনে তাঁদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে। সেজন্যে প্রথম থেকেই সম্পাদকেরা ঢাকা ও কলকাতার বিশিষ্ট লেখকদের সঙ্গে সবসময় যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। কিন্তু নানা অসুবিধার কারণে 'প্রতিরোধ' ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। এই সময় পরিসরে এর লেখক তালিকা যাঁরা সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের মধ্যে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, হুমায়ুন কবীর, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, সমর সেন, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্র মৈত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নির্মল ঘোষ, বীরেন দাশ, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অজিত দত্ত, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, রণেশ দাশগুপ্ত, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, দক্ষিণারঞ্জন বসু, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, জীবনানন্দ দাশ, সুকান্ত ভট্টাচার্য, সুবোধ ঘোষ, অমৃতকুমার দত্ত, সরলানন্দ সেন, মুনীর চৌধুরী, সরদার ফজলুল করিম, গোপাল হালদার, অন্নদাশঙ্কর রায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

প্রগতি লেখক সংঘের বার্ষিক সংকলন 'ক্রান্তি' প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ পর্যন্ত। উল্লেখ্য যে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত 'ক্রান্তি' সংকলনও সম্পাদনা করেছেন।

১৯৪২ সালে কলকাতায় নিখিল বঙ্গ ফ্যাসিস্টবিরোধী সম্মেলনে ঢাকা প্রগতি লেখক সংঘের পক্ষ থেকে ডেলিগেট হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ও অচ্যুত গোস্বামী।

১৯৪২ থেকে '৪৪-এর মধ্যে ঢাকার প্রগতি লেখকদের উদ্যোগে বেশ কয়েকটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এসব অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সময় কলকাতা থেকে যোগ দিতে এসেছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিনয় রায়, বিনয় ঘোষ, গোপাল হালদার প্রমুখ কবি ও সাহিত্যিকগণ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, কাজী মোতাহার হোসেন, অধ্যাপক পরিমল রায়, অমিয়কুমার দাশগুপ্ত, পৃথ্বীশ চক্রবর্তী প্রমুখ মনস্বীগণও এসব অনুষ্ঠানে কখনো সভাপতি হিসেবে, কখনো আলোচক হিসেবে উপস্থিত থেকে সংঘের সদস্যদের উৎসাহিত করেছেন। এই সময় থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনে সম্পৃক্ত হন। এবং ১৯৪৫-'৪৬ সাল থেকে প্রগতি লেখক সংঘের কর্মকাণ্ড প্রায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক নির্ভর হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর উক্তি স্মরণযোগ্য :

> যুদ্ধের চরিত্র ব্যাখ্যা-প্রতিব্যাখ্যা মুসলিম ছাত্রদের চিন্তা ও আলোচনার কোনো উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিলো বলে মনে হয় না। কিন্তু এ-প্রসঙ্গে যেটা উল্লেখযোগ্য তা হল এই যে, ঢাকা শহরের এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন হিন্দু ছাত্র এবং মধ্যবিত্ত অন্য কর্মীরা তাদের নিজেদের সমাজে তীব্র বিরোধের সম্মুখীন হলেও মুসলিম ছাত্র, বিশেষ করে তার মধ্যকার উদার অসাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ছাত্রদের কাছে বেশ সমদর পেতে লাগল। এই ধারাতেই চল্লিশের দশকে, বিশেষ করে ৪২ থেকে ৪৫-৪৬ সালে ছাত্র ফেডারেশনের এবং ঢাকার প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের কর্মীদের সম্পর্ক তৈরি হয় এই সময়কার মুসলিম ছাত্রদের সঙ্গে।[৪৬]

এবং

> সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সেদিনকার ঢাকার বামপন্থী গুণীদের মধ্যে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত (কবি), রণেশ দাশগুপ্ত, অচ্যুত গোস্বামী— এঁরা যে ক্রমান্বয়ে আমাদের নিকটবর্তী হচ্ছিলেন এবং আমরা যে তাঁদের দিকে এগুচ্ছিলাম, এ ভাবটি তো আমার আজো মনে জাগে।[৪৭]

এ সময়ের উল্লেখযোগ্য প্রগতিশীল সাহিত্যকর্মী হিসেবে মুনীর চৌধুরী, হাসান হাফিজুর রহমান, সৈয়দ নূরুদ্দিন, ওসমান জামাল, সরদার ফজলুল করিম, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, সানাউল হক, আবদুল্লাহ আলমুতী শরফুদ্দিন, অরবিন্দ সেন, মদনমোহন বসাক, কল্যাণ দাশগুপ্ত, আখলাকুর রহমান প্রমুখের নাম স্মরণীয়।

১৯৪৯ সাল পর্যন্ত নানান প্রতিকূলতার মধ্যেও ঢাকার প্রগতি লেখক সংঘ তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পেয়েছিল। ১৯৫০ সালের মাঝামাঝিতে সংঘের অস্তিত্ব পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ১৯৫০-এ দেশত্যাগ করার আগ পর্যন্ত সংঘের সঙ্গে একাত্ম ছিলেন।

১৯৪৩-'৪৪ দু'বছর কিরণশঙ্কর ঢাকা জেলা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। কিন্তু সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তিনি কখনো জড়িত হন নি। তাঁর নিজের স্বীকারোক্তি :

> প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি কখনো করি নি, দেয়ালে পোস্টার লাগাই নি কিংবা রাজনৈতিক সভার মঞ্চ থেকে কখনো বক্তৃতা করি নি। কিন্তু রাজনীতি ও সাহিত্যকে মিলিয়ে নিতে সচেষ্ট ছিলাম।[৪৮]

তাঁর এ-বক্তব্যের প্রেক্ষিতে এই সময়ে লেখা দুএকটি কবিতা উদাহরণ হিসেবে তুলে দেয়া যেতে পারে :

হে মজুর, হে কৃষাণ! জানি আজ আমি তোমাদের
একজন না হয়ে পারি না। তীব্র বিপ্লবীশিখার
আলো যেন আমাকেও ছোঁয়। রক্ত-বিজয়টীকার
চিহ্ন চাই আমারো ললাটে।[৪৯]

অথবা

এতোকাল কাটায়েছি পথে। ছায়া দিলে
তুমি বুঝি আজ। যুগ্ম, মিলিত প্রাণের
মুখর হ'য়েছে স্রোত। অশান্ত নিখিলে
বাসা বেঁধে বাসা ভেঙে মরি। খড়্গসম
তবু স্বপ্ন, তবু ভালোবাসা আমাদের।
হট্টগোল রয়েছে বাহিরে। প্রাণপণ
লড়ে জনগণ। কণ্ঠ স্তিমিত দস্যুর।
যোগসূত্র রাখি। গাঁথি আমার জীবন
সহস্রের সাথে। আর বুক ভরপুর
পূর্ব্বরাগে। জয়ী হলে বিপ্লবী জনতা
তবেই তো প্রণয়ের যত সার্থকতা।[৫০]

Dhaka University Institutional Repository

কবিতাগুলোর মধ্যে কবি কিরণশঙ্করের সেই সময়ের মানস-চেতনা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বিশ্ব রাজনীতির সে এক সংরক্ত সময়। তিনিও সেই সময়ের সংস্পর্শ এড়াতে চান নি। বরং প্রণয়ের সার্থকতা খুঁজেছেন বিপ্লবীজনতার বিজয়ের সঙ্গে সামিল হয়ে। সাহিত্যের আবরণে সত্যিই তিনি রাজনীতিকে মিলিয়ে নিতে পেরেছিলেন।

১৯৪০ সালের দিকে ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত সাহিত্যানুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন কিরণশঙ্কর। সঙ্গী ছিলেন সোমেন চন্দ। কিন্তু পুলিশের রিপোর্ট বিরূপ থাকায় দুতিনটে অনুষ্ঠানেই মাত্র অংশগ্রহণ করতে পেরেছিলেন তাঁরা। অবশ্য ১৯৪৪ সালে রেডিও কর্তৃপক্ষ পুনরায় কিরণশঙ্করকে আমন্ত্রণ জানান এবং ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত ঢাকা বেতারের সঙ্গে তাঁর সম্মানজনক সম্পর্ক বজায় ছিল। রেডিও'র অনুষ্ঠানে মূলত কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠ করতে হত তাঁকে। কখনো কখনো যোগ দিয়েছেন সাপ্তাহিক সাহিত্যবাসরে। তাঁর বেতারস্থ কবিতা ও প্রবন্ধের কয়েকটি সে সময় 'বেতার জগত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

পুলিশের বিরূপ রিপোর্টের কারণে এম.এ পাস করেও কোনো সরকারি চাকরি পান নি কিরণশঙ্কর। তাই ১৯৪৩ সালে ঢাকার বেসরকারি প্রিয়নাথ স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি নেন তিনি। এখানেই পরিচিত হন তরুণ শিক্ষক অজিত গুহের সঙ্গে। স্কুলের চাকরি বেশি দিন করা হয় নি তাঁর। ১৯৪৪ সালে নারায়ণগঞ্জে কাকার সাপ্লাইয়ের ব্যবসা দেখাশোনার দায়িত্ব এসে পড়ে তাঁর কাঁধে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি ১৯৫০ সাল পর্যন্ত এই ব্যবসাতেই স্থিত ছিলেন। এবং ঢাকার তাঁতিবাজারের বাসা থেকেই সপ্তাহে ছয়দিন নারায়ণগঞ্জে গিয়ে ব্যবসা দেখাশোনা করতেন। ১৯৪৬ সালে তিনি নারায়ণগঞ্জের 'আর্মি এন্ড নেভি স্টোর্স' নামক বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের মালিক বনে যান কাকার বদৌলতে। সে সময়ের স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন :

> বেশ ছিলাম সে সময়, টাকা-পয়সা রোজগার করতে শিখেছি, সিগারেট ও মদ্যপানের সুবর্ণ সুযোগ ছিলো; কিন্তু ঐ তাজা প্রথম যৌবনেও কোনো নেশাই আমাকে স্পর্শ করতে পারে নি। এর একটি কারণ বোধ হয় আমার আদর্শবাদ যা তরুণ বয়সের বিপ্লবী ধ্যানধারণার সমীপবর্তী।[৫১]

এ সময়েও কিরণশঙ্কর প্রগতি লেখক সংঘের বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ অক্ষুণ্ন রেখেছেন। লিখেছেন প্রচুর কবিতা ও গদ্য এবং সেগুলো ঢাকা ও কলকাতার বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছাপাও হয়েছে। তিনি নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতেন কলকাতার লেখক বন্ধুদের সঙ্গেও।

১৯৪৬ সালে তিনি সম্পাদনা করেছেন 'ক্রান্তি', সঙ্গে অমৃতকুমার দত্ত। 'ক্রান্তি'র এ সংখ্যাতেই ছেপেছিলেন সুকান্ত ভট্টাচার্যের দুটি বিখ্যাত কবিতা : 'অবাক পৃথিবী অবাক করলে তুমি' এবং 'বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে' — যার শিরোনাম ছিল 'অনুভব'। ১৩৫০-এর দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় সুকান্ত ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'আকাল' কাব্যসংকলনেও কিরণশঙ্করের কবিতা স্থান পেয়েছিল এ সময়।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৭-এ দেশ বিভাগ হল। পরিবারের সবাই স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্যে পশ্চিমবঙ্গে চলে গেলেন; শুধু থেকে গেলেন কিরণশঙ্কর — একা। ঢাকা থাকা অবস্থায়ই ১৯৪৯ সালে কলকাতায় গিয়ে বিয়ে করলেন সোমেন চন্দের মাসি বীণা বিশ্বাসকে। সস্ত্রীক ঢাকা ফিরে এসে জানলেন রণেশ দাশগুপ্ত জেলে। পাকিস্তানি পুলিশ কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের খোঁজ করছে। এবং প্রগতি লেখক সংঘের উপর পাক-শাসকের বিরূপ মনোভাবের কারণে সংঘের সদস্যরা সন্ত্রস্ত। এই সব নানাবিধ কারণে কিরণশঙ্কর শেষ পর্যন্ত নারায়ণগঞ্জের ব্যবসা গুটিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্যে পশ্চিমবঙ্গে চলে যান ১৯৫০-এ। কিরণশঙ্কর লিখেছেন :

> কখনো ভাবি নি ঢাকা ছেড়ে চলে আসতে হবে।[৫২]

পরিস্থিতিই তাঁকে চলে যাবার পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে আশ্রয় পেলেন চন্দন নগরে। সেখানে পরিবারের সবাই আগে থেকেই বসবাস করছিলেন। বেকার জীবন; তাই চন্দননগর থেকে প্রায়ই কলকাতায় যেতেন চাকরির সন্ধানে। কিছু দিন বন্ধু ঊষারঞ্জনের সঙ্গে নিউ মার্কেটের পাশে একটা টেইলারিং শপ খুলে বসেছিলেন। কিন্তু তা চলে নি। পরে ১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রিলিফ অফিসার পদে চাকরি পেয়ে নিশ্চিন্ত হন।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের কাব্যচর্চায় নতুন বাঁকের সন্ধান মেলে ১৯৩৯-এ ঢাকায় 'প্রগতি লেখক সংঘ' প্রতিষ্ঠার সূচনা লগ্ন থেকে। এই সময়েই তিনি মার্কসবাদ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হন এবং ক্রমশ মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। চল্লিশের গোড়ার দিকে তাঁর হাতে এসে পৌঁছে ক্রিস্টফার কডওয়েলের 'ইলিউশন এন্ড রিয়ালিটি' এবং র‍্যালফ ফক্সের 'নভেল এন্ড দি পিপল' বই দুটি। এই গ্রন্থদ্বয় পাঠে প্রগতি সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর ধারণা পোক্ত হয়। কাছাকাছি সময়ে আরো দুটি বিদেশী সংকলনগ্রন্থ কিরণশঙ্করের সাহিত্যভাবনায় নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল। তার একটি হচ্ছে 'লেফট রিভিয়্যু', যেটি আমেরিকা থেকে প্রকাশিত গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ ও রিপোর্তাজ-এর সংকলন; অন্যটি ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত 'পেনগুইন নিউ রাইটিং' — যার সম্পাদক ছিলেন জন লেমান। কিরণশঙ্করের ভাষায় :

> প্রগতি লেখক হিসেবে আমরা যে ধরনের লিখতে চেষ্টা করছিলাম এই দুটি সঙ্কলনগ্রন্থের অনেক রচনায় তার যেন একটি সুষ্ঠু শিল্পসম্মত রূপের আভাস পাওয়া গেল। এই সঙ্কলন দুটির মধ্য দিয়ে আমেরিকা, ইংল্যান্ড, পশ্চিম ইউরোপ, সোভিয়েত রাশিয়া, চীন প্রভৃতি অনেক দেশের প্রবীণ ও নবীন লেখক আমাদের আপনজন হয়ে উঠলেন। দেশ-বিদেশের লেখকের স্বাধীন সমাজচিন্তার বৃহত্তর পরিধিতে আমরা এই প্রথম মনেপ্রাণে একটি আন্তর্জাতিক ঐক্য অনুভব করলাম।[৫৩]

বস্তুত চল্লিশের দশকে পৌঁছে ঢাকার সে সময়কার তরুণ কবিদের কবিতায় আধুনিকতা একটা নতুন মাত্রা পায়। ঢাকার প্রগতি লেখক সংঘের অনেকেই সাম্যবাদী ভাবধারায় বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন। সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় আকৃষ্ট হওয়ার ফলে এসব তরুণ লেখকের লেখা নতুন কবিতায়ও তার প্রতিফলন ঘটল। যে তরুণ কবি প্রেমের কবিতা

Dhaka University Institutional Repository

দিয়ে শুরু করেছিলেন কাব্যচর্চা, তাঁর কবিতায় ক্রমশ প্রকাশ পেল সমাজচিন্তার প্রাধান্য। কিরণশঙ্করের স্বীকারোক্তি :

> কবিতা রচনার একেবারে প্রথম পর্বে প্রেম ও নিসর্গ চেতনাযুক্ত এক-ধরনের রোমান্টিক অনুভূতিময় কবিতাই লিখেছিলাম। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে এই অবস্থার পরিবর্তন হয়। পৃথিবীর দিকে তাকানো, সমাজের পরিবেশ ও মানুষের দিকে তাকাবার ফলে কিছুটা নতুনভাবে সমাজমনস্ক লেখা লিখতে শুরু করি। সেই থেকে আজ পর্যন্ত নানা বাঁক নিলেও আমার কবিতা সমকালীন জগৎ ও স্বদেশের পারিপার্শ্বিকতাকে কেন্দ্র করে নতুন কালের উপলব্ধির মাল্যরচনা সম্ভব করে তুলেছে বলে আমি মনে করি।[৫৪]

এই সময় ঢাকার তরুণ কবিরা আলেকজান্ডার ব্লক, মায়াকোভস্কির কবিতায় নিবিষ্ট হচ্ছেন। একাত্মতা অনুভব করছেন ইংল্যান্ডের অডেন গোষ্ঠীর রচনার সঙ্গে। একদিকে এলিয়ট প্রবর্তিত কাব্যে পাচ্ছেন আধুনিকতার সন্ধান, অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নেবার চেষ্টা। আর তার ছাপ পড়ছে তাঁদের কবিতায়। ফলে তিরিশের যুগের আধুনিকতার সঙ্গে চল্লিশের দশকের কবিতার আধুনিকতার পার্থক্য ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। এবং 'তিরিশ দশকে ঢাকা থেকে পুরোপুরি লিরিকধর্মী কবিতা যে-কবি লিখেছিলেন সেই কবির চল্লিশ দশকের কবিতায় পাওয়া গেলো সমাজচিন্তার নতুন পরিবেশে বিষয়বস্তু আঙ্গিকের দ্রুত পরিবর্তন'[৫৫]। কিরণশঙ্করও এই পরিবর্তনে সামিল হয়েছেন। পূর্বের রোমান্টিক কবিমনের সঙ্গে মিলিত হয়েছে নতুন সমাজচিন্তার অঙ্গীকার। একটি উদাহরণ দিয়ে কিরণশঙ্করের এই সময়ের কবি মানসচেতনাকে উপলব্ধি করা যেতে পারে। ১৩৪৯ (১৯৪২)-এ প্রকাশিত 'সাম্রাজ্যভস্মের পূর্ব্বে' কাব্যনাট্যের প্রথম দিকে চারুকুমারের ভাষ্যে যেন পুরোনো রোমান্টিক কিরণশঙ্কর উপস্থিত :

> [.....]
> তোমার কথাও আমি ভুলি নি ত'। রয়েছে উদ্যত
> সে স্নিগ্ধ শরীরী স্মৃতি। জীবনের স্তম্ভিত কাহিনী
> ভোলাও সম্ভব নয়।

এর পরেই তাঁর মানস পরিবর্তন ঘটে :

> দেখি রাজপথে আজ উজ্জ্বল মিছিলে হেঁটে চলে
> নির্য্যাতিত অযুত শ্রমিক। শেষ হয়েছে প্রত্যয়
> প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারি একমাত্র জনতার বলে।
> শ্রমিক, কৃষাণ সেনা সাড়া তোলে ক্লান্ত চিত্তময়।

কিন্তু তখনো যেন সংশয় কাটিয়ে উঠতে পারেন নি, মনে খানিক দ্বিধা —

> কিন্তু কোন্ গুণ আছে আমাদের জানিনে আমরা
> সম্বল তো দৃষ্টির ক্ষীণতা। ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতার
> ঊর্দ্ধে উঠেছি কি? দৃপ্ত শ্রমিকের কৃষাণের গড়া
> বিপ্লবের ঘূর্ণাবর্ত্তে পারবো তো হ'তে অংশীদার?

এবং শেষ পর্যন্ত তিনি সুস্থিত হতে চলেছেন —

> দুর্গম রক্তাক্ত পথ। তবু জানি সূর্য্য-সম্ভাবনা
> নবতম জীবনের এ পথেরি শেষ বাঁকে আছে!

Dhaka University Institutional Repository

অন্ধকার ঠেলে যতো সমুদ্যত বাধা-বিড়ম্বনা
দুর্ভিক্ষে মড়কে ঝড়ে আমরা চলেছি তার কাছে।[৫৬]

সাম্যবাদের প্রধান লক্ষণ আশাবাদ ব্যক্ত করে সমাপ্ত হয়েছে এই দীর্ঘ কবিতা। এ কবিতার মধ্য দিয়েই কিরণশঙ্করের চল্লিশের দশকের প্রগতিমনস্কতার রূপটিও পরিষ্কারভাবে অনুভব করা যায়। এ সময়ে কিরণশঙ্কর এলিয়টের দ্বারাও অনুপ্রাণিত হয়েছেন এবং তাঁর বেশ কিছু কবিতায় এলিয়টের কাব্যাদর্শ অনুসৃত হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে তিনি সেসব কবিতায় নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে কবি নিজেই 'স্বর' কবিতাটির উল্লেখ করেছেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে দেওয়া গেল :

অন্ধকারে যেন কা'র ভারী কণ্ঠস্বর।
কা'র স্বর!
পাষাণে অশ্বত্থ-শাখা, হৃদয় পাথর
অকস্মাৎ থলথলে স্বর।
এই ঘরে অনেকেরই দীর্ঘ প্রেতচ্ছায়া
এ ঘর নিথর,
অকস্মাৎ সেই কণ্ঠস্বর।[৫৭]

এলিয়টের এই কাব্যশৈলীকে কিরণশঙ্কর সচেতনভাবেই বাংলায় আত্মস্থ করেছিলেন। 'স্বর' কবিতা প্রসঙ্গে মনস্বী ভবতোষ দত্ত প্রদত্ত অভিমতটি স্মরণযোগ্য :

> কিরণশঙ্কর অবশ্য নতুন কাব্যশৈলীর পরীক্ষায় খুবই সফল হলেন। তাঁর কবিতাটি বুদ্ধদেব বসু 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশ করলেন। আমার তো মনে হয় এটা আমাদের সৌভাগ্য যে তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেই তাঁর কর্তব্য শেষ করলেন না। তিনি জীবন, সমাজ, মানুষকে সোজাসুজি স্বীকার করে নিলেন অবশ্য এই মর্মে নয় যে god in his heaven and alls right with the world তাঁর কবিতায় সমাজের সম্পর্কে প্রশ্ন এল, বিরক্তি ও বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত হল। ওদিকে সুকান্ত ভট্টাচার্য আর এদিকে কিরণশঙ্কর একই সময়ে সমাজের অসন্তোষকে ভাষা দিলেন — একজন উচ্চকণ্ঠে আর একজন শান্ত স্বরে। স্বপ্ন কামনার কবি বাস্তবজীবনের কবি হলেন।[৫৮]

১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের রিলিফ অফিসার পদে চাকরিতে যোগ দিতে হাজির হলেন কোচবিহার। কোচবিহার থেকে মাথা-ভাঙায় এবং মাথা-ভাঙা থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে কলকাতায় চলে এলেন ১৯৫২ সালে — এক বছরের মাথায়। এই এক বছরের সরকারি কাজের চাপের মধ্যেও তাঁর কবিতা চর্চা থেমে থাকে নি। তাঁর ভাষায় :

> এই পরিবেশেও আমার সাহিত্যচর্চা স্তব্ধ হয়ে যায় নি। দেশ আনন্দবাজার যুগান্তর পরিচয়ের বিশেষ সংখ্যায় কবিতা ছাপা হচ্ছে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু এবং অন্যান্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিদের চিঠিপত্র আসছে আমার মাথা-ভাঙার ঠিকানায় যা আমার দীর্ঘকালের কবিমনকে তাজা করে রেখেছিল।[৫৯]

এই প্রসঙ্গে ১৯৫২ সালে কিরণশঙ্করকে লেখা মাথাভাঙার ঠিকানায় প্রেরিত সৈয়দ মুজতবা আলীর একটি চিঠি তুলে দেয়া যেতে পারে :

Dhaka University Institutional Repository

C/O P.K. Roy Esq.
"Times of India"
Daryaganj
Delhi 9. 3. 52

সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্র পেয়েছি কিন্তু মাস খানেক ধরে ম্যালেরিয়ায় ভুগছি বলে পূর্বে পত্রোত্তর দিতে পারিনি। আশা করি অপরাধ নেবেন না।

বোধহয় ডাকের গোলমালে আপনার প্রেরিত বইখানা পাইনি।

'দেশে বিদেশে'র সমালোচনা তখনই পড়েছিলুম। এবং পড়ে বুঝতে পেরেছিলুম আপনি বইখানা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়েছেন। যেকোনো লেখক তাতে খুশী হয়। আপনি আমার ধন্যবাদ জানবেন।

আশা করি কুশলে আছেন।

নমস্কারান্তে
মুজতবা আলী[৬০]

কলকাতায় এসেও কিরণশঙ্করের সাহিত্যচর্চা অব্যাহত রইল। ঢাকার বন্ধু সরলানন্দ সেন 'যুগান্তর' পত্রিকায় কাজ করছেন, পাশাপাশি পাড়ায় বাস করার সুবাদ পুরোনো বন্ধুত্ব জমে উঠেছে। এসময়েই পরিচিত হলেন কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে — যা পরবর্তীকালে গভীর সখ্যে পরিণত হয়েছিল।

১৯৫৬ সালে বদলি হয়ে গেলেন বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে। বাঁকুড়াতে তিনি প্রচুর পড়ার এবং লেখার অবসর পান। কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'নতুন সাহিত্য', 'সাহিত্যপত্র', 'উত্তরসূরি' প্রভৃতি নতুন পত্রপত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশ পায় এ সময়। বিষ্ণুপুরে থাকতেই তিনি অনেকগুলো চতুর্দশপদী কবিতা রচনা করেন। তাঁর কবিতা লেখার ধরন বদল হবার সঙ্গে সঙ্গে কবিতার উচ্চারণের ক্ষেত্রেও ভিন্নতা প্রকাশ পায়। এ সময়ের রচিত চতুর্দশপদীজাতীয় কবিতাগুলোতে কবির কবি ও কর্মীমানস অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। উদাহরণ স্বরূপ —

> কর্মেই আনন্দ শুধু : আশাদৃপ্ত চেতনা-বিস্তার
> মনে-প্রাণে, নামহীন মানুষের অজ্ঞাত বিবরে;
> সবল বাহুতে, যতো রাত্রিজাগা উদ্দীপিত স্বরে;
> সর্বত্র সৃষ্টিকে ঘিরে সমষ্টির শ্রেষ্ঠ অঙ্গীকার।[৬১]

কিংবা,

> কী তবে আমার কাজ : আমিও তো নিরীহ মানুষ
> শান্তি খুঁজি জীবিকা অর্জনে; আরো অনেকের মতো
> সংসারের ঘূর্ণাবর্তে হন্যে হয়ে ওড়াই ফানুস
> অপার্থিব কল্পনার;[৬২]

১৯৫৭ সালে বদলি হয়ে এলেন চন্দনগর। কলকাতার কাছেই। ছিলেন ১৯৬০ পর্যন্ত। বাংলাদেশ থেকে প্রথমে গিয়ে এই চন্দনগরেই উঠেছিলেন — সেবার কেউ চিনত না। এবার তাঁর কবিখ্যাতি এখনে বেশ ছড়িয়ে পড়ল। '৬০-এর দিকে তিনি চলে গেলেন

Dhaka University Institutional Repository

চব্বিশ পরগনার আলিপুরে। বড় অফিস — প্রচুর হট্টগোল। তবু তাঁর লেখা থেমে ছিল না কখনো। আলিপুরেই পরিচিত হন পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে।

১৯৬১'র চৈত্র সংক্রান্তির দিন কিরণশঙ্করের পিতৃবিয়োগ ঘটে। পিতার মৃত্যুর স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন :

> আমার অল্প বয়সে মার মৃত্যুতে খুবই শোকার্ত হয়েছিলাম কিন্তু পিতৃদেবের মৃত্যুতে অভিভূত হয়েছিলাম অনেক বেশি।[৬৩]

পিতৃদেবের স্মৃতিতে লিখেছিলেন :

> চল্লিশ বছর আমি এই শান্ত বটের ছায়ায়
> আদিম শিশুর মতো সমর্পিত।
> তিমিরবিনাশী স্বচ্ছ বর্ণের ধারায়
> মুগ্ধ চোখ কিছু অভিভূত।
> আমার রক্তের ঢেউয়ে
> সর্বদা করেছি অনুভব
> শান্ত পত্র, প্রশাখার স্নেহ সঞ্চলন।
> গ্রীষ্ম বর্ষা শীতে
> নিশ্বাসে নিয়েছি টেনে রক্তের ভিতরে
> অকৃত্রিম চেতনার সূক্ষ্ম আশীর্বাদ
> অলক্ষ্যে, সুচারু পদ্ধতিতে।[৬৪]

১৯৬২-তে হুগলীর চণ্ডীতলায় যোগ দিয়েছিলেন বি.ডি.ও. হিসেবে প্রমোশন পেয়ে। এখানে থাকতে গিয়েছিলেন দার্জিলিং, শিলং, ওড়িষায় — সরকারি খরচে ভ্রমণে। দেখেছিলেন বুদ্ধদেব বসুর 'চিল্কায় সকাল' খ্যাত চিল্কা, কোনারকের সূর্যমন্দির, আর সবচেয়ে আশ্চর্য হয়েছিলেন খণ্ডগিরি উদয়গিরিতে জৈন সাধুদের গুহাগুলো দেখে। লিখেছিলেন :

> কঠিন পর্বত্রগাত্রে যত শিলালিপি
> মুহূর্তে মনকে ডেকে নিয়ে যায় দূরে
> অন্য স্বপ্নে ইতিহাসে, বিলপ্ত আঁধারে।

ভেবেছিলেন —

> আহা এই লিপিমালা যদি জানতাম!
> যদি তীক্ষ্ণ অনুভবে গুহায় গোপন
> বিপন্ন বিস্ময়ময় গুপ্তদ্বার অতিক্রম করে নিমেষেই
> ত্যাগ তপস্যার শুদ্ধ নির্মল নিবিড়ে
> যেতে পারতাম![৬৫]

চণ্ডীতলা থেকেই ফের কলকাতায় প্রত্যাবর্তন ১৯৬৫ সালে ওয়েস্ট বেঙ্গল গেজেটিয়ার্স ইউনিটে যোগ দিয়ে। এবং এখানেই স্থিত হন শেষ পর্যন্ত।

কলকাতায় স্থিত হবার পর কিছুদিন কলকাতা লেখক সমবায় সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সে সময় তিনি যাঁদের সঙ্গে নিয়মিত সাহিত্য-সঙ্গ লাভ করতেন তাঁদের মধ্যে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চিত্ত ঘোষ, বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত, সত্যপ্রিয় ঘোষ, তারাপদ

Dhaka University Institutional Repository

গঙ্গোপাধ্যায়, মণীন্দ্র মিত্র, জ্যোৎস্না সিংহ রায়, অরবিন্দ পোদ্দার প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এসব বন্ধু সমাবেশে তারা সাহিত্যের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করতেন।

দীর্ঘদিন চাকরি সূত্রে কলকাতার বাইরে থাকার কারণে কবি হিসেবে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত কলকাতায় অনেকটাই উপেক্ষিত ছিলেন। যদিও লেখা তাঁর কখনো বন্ধ হয় নি এবং নিয়মিত ছোটবড়ো সে সময়কার প্রায় সকল পত্রপত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশ পেয়েছে — তবুও পাঠক ও গবেষক মহলে তিনি উপেক্ষিতই ছিলেন। ফলে তাঁর কবিতা বিভিন্ন পত্রিকাতে যে হারে প্রকাশ পেয়েছে সেভাবে কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ পায় নি। কিরণশঙ্কর এ বিষয়ে লিখেছেন :

> বড়ো বড়ো প্রকাশক সংস্থার সঙ্গে আমার কখনো যোগাযোগ ছিল না, বইয়ের পাণ্ডুলিপি নিয়ে কলকাতার কোনো বৃহৎ পুঁজি পরিচালিত প্রকাশক সংস্থায় যাতায়াত করিনি, কোনো প্রতিষ্ঠিত লেখককে মুরুব্বী ধরে তাঁর সুপারিশপত্র নিয়ে দরজায় হানা দেবার বহু সুযোগ থাকলেও সে পথে যেতে কেমন যেন রুচিতে বেধেছে।[৬৬]

সাক্ষ্য পাওয়া যায় কবি প্রফুল্লকুমার দত্তের কথায়ও —

> রবীন্দ্র পুরস্কার পাওয়ার পরও তাঁর কবিতার বই ছাপার পাবলিশার পাওয়া যায় নি — এটা তাঁর আক্ষেপ ছিল।[৬৭]

অথচ চল্লিশের দশকের ঢাকার ঐতিহ্য ও ইতিহাসের যে মূল্যবান মূলধন তিনি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গে — সে রকম ঐশ্বর্য কলকাতার অনেকেরই ছিল না। এই গৌরবময় অতীত নিয়েই কিরণশঙ্কর আজীবন শিল্প সাহিত্য চর্চায় নিবেদিত থেকেছেন — ঢাক ঢোল পিটিয়ে নিজের গৌরবগাঁথা প্রচার করেন নি। এটাই তাঁর স্বতন্ত্রতার বড়ো পরিচয়। নিজস্ব আদর্শকে তিনি সব সময় সমুন্নত রেখেছেন — বিকিয়ে দেন নি। যেটা তাঁর যুগের অনেকেই দিয়েছিলেন। ফলে জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তে এসে পেলেন রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি, পেলেন রবীন্দ্র পুরস্কার (১৯৯০)।

এ প্রসঙ্গে অস্ট্রেলিয়া থেকে পাঠানো অতীন্দ্র মজুমদারের ২২.৬.৯০ তারিখের চিঠির একটি প্যারা উদ্ধৃত করা যায় :

> [...]
> দীর্ঘ ৬০ বছর ব্যাপী আপনার সাহিত্য সাধনা। আপনি যেমন কবিতা রচনা করেছেন, তেমনি কবি ও কাব্য বিষয়ক আলোচনাও কম করেন নি। সাহিত্যের সমস্ত ধারার সঙ্গে আপনার পরিচয় এবং সেই অন্তরঙ্গ, বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন অনুধাবনের ফল বাংলাভাষী সমস্ত সাহিত্যানুরাগীই ভোগ করেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে আপনার অন্তরঙ্গতার কথা আমরা জানি — তার বহুবিধ আলোচনার সঙ্গেও আমাদের পরিচয় হয়েছে। এইসব বিবেচনায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার আপনাকে সম্মানিত করে নিজেরাই সম্মানিত হয়েছেন। ...[৬৮]

পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে 'সংহিতা' নামে একটি ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয় কলকাতা থেকে — কিরণশঙ্কর তার অন্যতম সম্পাদক হিসেবে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত যুক্ত ছিলেন। ১৯৬২ সালে সম্পাদনা করেন ষান্মাসিক 'উত্তরণ' নামে কবিতা ও প্রবন্ধের পত্রিকা। ১৯৭০-এ 'উত্তরণ' বন্ধ হয়ে গেলে তিনি 'সাহিত্যচিন্তা' নামে আরেকটি

Dhaka University Institutional Repository

ষান্মাসিক সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদনা শুরু করেন। 'সাহিত্যচিন্তা'র প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৩৭৮ (১৯৭১)-এ শারদীয় সংকলনরূপে। এরপর ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত তিনি 'সাহিত্যচিন্তা' নিয়মিত সম্পাদনা করেছেন। এই দীর্ঘ সাতাশ বছরে লেখক হিসেবে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবাংলার বহু গুণী ও মনস্বী ব্যক্তিবর্গ 'সাহিত্যচিন্তা'র সঙ্গে যুক্ত হন। কিরণশঙ্কর একই সঙ্গে প্রবীণ ও নবীন সাহিত্যকর্মীকে 'সাহিত্যচিন্তা'য় প্রকাশ করে তাঁর আধুনিক ও উদার মানসিকতার পরিচয় দেন। একবার যাঁর সঙ্গে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত পরিচিত হয়েছেন তিনি তাঁর সরল, নম্র ও আত্মাভিমানহীন বিদগ্ধ মনের পরিচয় পেয়ে অভিভূত হয়েছেন। সুপ্রতিষ্ঠিত কবি, প্রাবন্ধিক, গবেষক, সাহিত্যানুরাগী, সুপণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ কিংবা নবীন নিবেদিতপ্রাণ কবি-সাহিত্যিক সকলেরই তিনি ছিলেন পরম শ্রদ্ধাভাজন। তাঁর সম্পাদকীয় দক্ষতা দৃষ্টান্ত-বিরল।

কিরণশঙ্করের সমগ্র সত্তা ছিল সাহিত্য-অনুশীলনে উৎসর্গীকৃত। তেরটি কাব্যগ্রন্থের পাশাপাশি প্রকাশিত হয়েছে তাঁর চারটি প্রবন্ধ সংকলন। সম্পাদনা করেছেন পাঁচটি অমর সাহিত্যগ্রন্থের। ১৯৮৭ সালে অমিত চক্রবর্তীকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে কিরণশঙ্কর জানিয়েছিলেন :

> ১৯৩৬ থেকে শুরু করে প্রায় ৫০ বছর আমি কবিতার জগতে আছি বলতে পারি এবং এমন বছর যায়নি যে পত্রপত্রিকায় আমি লিখিনি। সংখ্যায় কম করেও হাজার দেড়েক তো হবেই।[৬৯]

এরপর আরো দশবছর তিনি সক্রিয়ভাবে লিখেছেন। অথচ তাঁর গ্রন্থভুক্ত কবিতার সংখ্যা পাঁচশয়ের কিছু বেশি। তাঁর অনুবাদ কবিতার সংখ্যাও অন্যূন কিছু নয়। অনুবাদ করেছেন এজরা পাউন্ড, ল্যাঙস্টন হিউস্, হুয়ান র‍্যামন হিমেনেথ, ভিনসেন্ট হুইডোব্রো, ডাবল্যু এইচ অডেন, প্রাচীন চীনের কবিতা, চিলির কবিতাসহ আরো অনেক কবি ও দেশের কবিতা। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি প্রমা প্রকাশনের প্রকাশকের কাছ থেকে হারিয়ে গেছে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের যাবতীয় বিদেশী কবিতার অনুবাদ।[৭০] তাঁর গদ্য রচনাও অজস্র।

কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত শেষ জীবনে জন্মভূমি বাংলাদেশকে স্মরণ করে ভীষণ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়তেন। কবি রানা চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষ্য থেকে সে কথা সুস্পষ্ট হয় :

> কবি শেষ জীবনে খুব নস্টালজিক ছিলেন। প্রায়শই বাংলাদেশ এবং তাঁর ছেলেবেলার কথা বলতেন, ভালোবাসতেন ঢাকা প্রগতি আন্দোলন, সোমেন চন্দ— এসব বিষয়ে কথা বলতে।[৭১]

১৯৮৭ সালের প্রথম দিকে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত নিজের জন্মভূমিতে এসেছিলেন। স্মৃতিচারণে সেবার বাংলাদেশে আসার প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> ২০ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭'র সন্ধ্যায় আমার জন্মভূমি ঢাকায় পৌঁছলাম এবং প্রায় তিন সপ্তাহ বাস করে আমার শৈশব ও প্রথম যৌবনের স্মৃতিময় ঢাকা শহরের নতুন রূপান্তর দেখে মুগ্ধ হলাম।[৭২]

১৯৯৫ সালে স্ত্রী বীণা সেনগুপ্ত এবং ১৯৯৭-তে মতাদর্শিক সুহৃদ ও বান্ধব রণেশ দাশগুপ্তের মৃত্যুতে কবি কিরণশঙ্কর দেহে ও মনে অনেকখানি বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

সন্তানদের কেউই কাছে থাকতেন না। ফলে ভীষণ নিঃসঙ্গতা ও একাকিত্ব তাঁকে দ্রুত নিস্তেজ করে ফেলছিল। কবির জীবনের শেষ দিকে ধরা পড়েছিল 'অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস'। দুর্বল শরীরে কথা বলতেও কষ্ট হত তাঁর। সাহিত্যের এই নিরলসকর্মী এসবের মধ্যেও পরিকল্পনা করেছিলেন 'সাহিত্যচিন্তা'য় রণেশ দাশগুপ্ত স্মরণ সংখ্যা করার; প্রয়াত স্ত্রী বীণা সেনগুপ্তের নামে মহিলা কবিদের পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজনের। আজীবন আশাবাদে প্রত্যয়বদ্ধ কবির শেষ আশাগুলো পূরণ হতে সময় পাওয়া গেল না— তার আগেই অমোঘ মৃত্যু এসে তাঁকে টেনে নিয়ে গেল অন্ধকার অতল গহ্বরে।[৭৩] ১৯৯৮ সালের ১লা মে— মহান মে দিবসে মহাপ্রয়াণ ঘটল একজন সৎ-নিষ্ঠাবান ও দায়বদ্ধ মহৎ সাহিত্যকর্মীর; যিনি তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'স্বপ্ন-কামনা'র প্রথম কবিতা 'মৃত্যু'তেই লিখেছিলেন :

> আমরা মরে গিয়ে ব্যঙ্গ করতে চাই মৃত্যুকে,
> আত্মবিলোপে চাই আত্ম-প্রতিষ্ঠা!

নিজের মৃত্যু দিয়েই কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত তাঁর এ কবিতার পঙক্তিগুলোর সার্থকতা প্রমাণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, কবিতায় মানবিক উচ্চারণ ও অন্যান্য ভাবনা, ১৯৯১, প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা; পৃ. ১৭।
২. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, চল্লিশের দশকের ঢাকা [সরদার ফজলুল করিম সহযোগে], ২০০১, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা; পৃ. ১৫।
৩. অধ্যাপক ইভা দাশগুপ্তের কলকাতার গড়িয়া স্টেশন রোডের বাড়িতে ১৭.১১.০৩ তারিখে বর্তমান গবেষককে যে সাক্ষাৎকার তিনি দিয়েছিলেন তার রেকর্ডকৃত অংশ থেকে উদ্ধৃত।
৪. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, চল্লিশের দশকের ঢাকা; প্রাগুক্ত; পৃ. ১৬।
৫. প্রাগুক্ত; পৃ. ২৮।
৬. অধ্যাপক ইভা দাশগুপ্ত, প্রাগুক্ত।
৭. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, চল্লিশের দশকের ঢাকা; প্রাগুক্ত; পৃ. ১৬।
৮. অধ্যাপক ইভা দাশগুপ্ত, প্রাগুক্ত।
৯. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, চল্লিশের দশকের ঢাকা, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৮।
১০. প্রাগুক্ত; পৃ. ২৭।
১১. প্রাগুক্ত; পৃ. ১৭।
১২. প্রাগুক্ত; পৃ. ২৩।
১৩. কবির ছোট ভাই সঞ্জয়শঙ্কর সেনগুপ্ত কলকাতায় তাঁর নিউ বালিগঞ্জের বাড়িতে ১৯.১১.০৩ তারিখে বর্তমান গবেষককে যে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন তার রেকর্ডকৃত অংশ থেকে উদ্ধৃত।
১৪. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, চল্লিশের দশকের ঢাকা, প্রাগুক্ত; পৃ. ২৯।
১৫. প্রাগুক্ত; পৃ. ৩১।
১৬. প্রাগুক্ত; পৃ. ৩৭।
১৭. অমিত চক্রবর্তী, 'কবির মুখোমুখী : কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের সঙ্গে সাক্ষাৎকার', সাহিত্যচিন্তা, (কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত সম্পাদিত), বৈশাখ ১৪০৪, কলকাতা; পৃ. ৩৩।
১৮. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, চল্লিশের দশকের ঢাকা; প্রাগুক্ত; পৃ. ৫০।
১৯. প্রাগুক্ত; পৃ. ৫০।
২০. প্রাগুক্ত; পৃ. ৪৮।
২১. অমিত চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত; পৃ. ৩৯।
২২. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, 'Last words to Miriam(2)', স্বপ্ন-কামনা, ১৯৩৮, ঢাকা; পৃ. ৫।
২৩. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, 'অনন্ত-জিজ্ঞাসা', প্রাগুক্ত; পৃ. ৭।
২৪. সুমিতা চক্রবর্তী, আধুনিক বাংলা কাব্যের দ্বিতীয় পর্যায়, ১৯৯২, প্রজ্ঞা প্রকাশন, কলকাতা, পৃ. ১০৪।
২৫. এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্যে সুমিতা চক্রবর্তীর 'আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়', প্রজ্ঞা প্রকাশন থেকে প্রকাশিত বইটি দ্রষ্টব্য।
২৬. জীবনানন্দ দাশ, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত রচিত 'স্বপ্ন-কামনা'র ভূমিকাংশ দ্রষ্টব্য।
২৭. প্রাগুক্ত।
২৮. অশোক মিত্র, 'শ্রী দেহের স্বাদ', সাহিত্যচিন্তা (কল্যাণ চন্দ সম্পাদিত), ডিসেম্বর ১৯৯৮, কলকাতা; পৃ. ১০৬-১০৭।
২৯. অধ্যাপক ইভা দাশগুপ্ত; প্রাগুক্ত।
৩০. সঞ্জয়শঙ্কর সেনগুপ্ত; প্রাগুক্ত।
৩১. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, চল্লিশের দশকের ঢাকা, প্রাগুক্ত; পৃ. ৪১-৪২।
৩২. প্রাগুক্ত; পৃ. ৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

৩৩. সরদার ফজলুল করিম, 'চল্লিশের দশকের ঢাকা' [কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত সহযোগে] ২০০১, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা; পৃ. ১৩৭।

৩৪. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, চল্লিশের দশকের ঢাকা, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৯।

৩৫. অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ভারতবর্ষের ইতিহাস, (মুঘল ও ব্রিটিশ ভারত) ১৯৯০, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা; পৃ. ৫২৮।

৩৬. সঞ্জয়শঙ্কর সেনগুপ্ত জানিয়েছেন সেই গোপন রাজনৈতিক দলের নাম 'শ্রী সংঘ' এবং তার নেতা ছিলেন বারীন রায়।

৩৭. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, চল্লিশের দশকের ঢাকা, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৯।

৩৮. প্রাগুক্ত; পৃ. ২৭।

৩৯. রণেশ দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'সোমেন চন্দের গল্পগুচ্ছ' ১৯৭৩, ঢাকা; পৃ. ভূমিকাংশ। [দ্রষ্টব্য : কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত সম্পাদিত 'সাহিত্যচিন্তা' পত্রিকার আশ্বিন ১৩৯৭, সংখ্যায় বিশ্বজিৎ ঘোষ লিখিত 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ; ঢাকা', প্রবন্ধ থেকে সংকলিত; পৃ. ৫৬]

৪০. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, চল্লিশের দশকের ঢাকা, প্রাগুক্ত; পৃ. ৫৬।

৪১. প্রাগুক্ত; পৃ. ৫৭।

৪২. দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কলকাতায় তাঁর সুশীল সেন রোডের বাড়িতে ১৮.১১.০৩ তারিখে বর্তমান গবেষককে দেওয়া সাক্ষাৎকারের রেকর্ডকৃত অংশ থেকে উদ্ধৃত।

৪৩. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, চল্লিশের দশকের ঢাকা, প্রাগুক্ত; পৃ. ৫৭।

৪৪. প্রাগুক্ত; পৃ. ৫৮।

৪৫. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, 'সোমেন চন্দের স্মৃতিতে', নতুন আঁচড়, ১৯৪৩, প্রতিরোধ পাবলিশার্স, ঢাকা, পৃ. ৯।

৪৬. সরদার ফজলুল করিম, 'অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর স্মৃতিচারণ', চল্লিশের দশকের ঢাকা, প্রাগুক্ত; পৃ. ৯৪।

৪৭. প্রাগুক্ত; পৃ. ৯৮।

৪৮. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, চল্লিশের দশকের ঢাকা, প্রাগুক্ত; পৃ. ৬১।

৪৯. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, 'চতুর্দশপদী', নতুন আঁচড়, প্রাগুক্ত; পৃ. ৭।

৫০. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, 'মণির জন্য কবিতা', প্রাগুক্ত; পৃ. ১০।

৫১. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, চল্লিশের দশকের ঢাকা, প্রাগুক্ত; পৃ. ৬৮।

৫২. প্রাগুক্ত; পৃ. ৬৮।

৫৩. প্রাগুক্ত; পৃ. ৩২-৩৩।

৫৪. অমিত চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত; পৃ. ৩৪।

৫৫. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, 'চল্লিশের দশকের ঢাকা', প্রাগুক্ত; পৃ. ৫৪।

৫৬. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, 'সাম্রাজ্যভস্মের পূর্ব্বে', নতুন আঁচড়, প্রাগুক্ত; পৃ. ১০-১৪।

৫৭. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, 'স্বর', স্বর ও অন্যান্য কবিতা, ১৯৫৩, মডার্ন পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ১১।

৫৮. ভবতোষ দত্ত, 'কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক বাংলা কবিতার চর্চা' সাহিত্যচিন্তা (কল্যাণ চন্দ সম্পাদিত), অগ্রহায়ণ, ১৪০৫; পৃ. ১১৩।

৫৯. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, 'সময় অসময়', সাহিত্যচিন্তা (কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত সম্পাদিত), শারদীয়া সংখ্যা ১৯৯৫; পৃ. ৫৮।

৬০. 'কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত 'দেশে বিদেশে' গ্রন্থটির একটি বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন সাপ্তাহিক 'সোনার বাংলা'য়, সম্ভবত ১৯৪৮-৪৯ সালে।' [দ্রষ্টব্য : সাহিত্যচিন্তা, শারদীয়া সংখ্যা ১৩৮৭, পৃ. ৬৬]

Dhaka University Institutional Repository

৬১. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, 'কর্মেই আনন্দ খুঁজি', দিনযাপন, ১৩৬৯, কবিতা পরিষদ, কলকাতা, পৃ. ২৭।
৬২. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, 'দিনযাপন', প্রাগুক্ত; পৃ. ২৩।
৬৩. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, 'সময় অসময়', প্রাগুক্ত; পৃ. ৭২।
৬৪. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, 'শান্ত বটের ছায়ায়', দিনযাপন, প্রাগুক্ত; পৃ. ৭০।
৬৫. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, 'সময় অসময়', প্রাগুক্ত; পৃ. ৭৫।
৬৬. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, 'সময় অসয়ম', সাহিত্যচিন্তা (কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত সম্পাদিত), শারদীয়া সংখ্যা ১৯৯৬; পৃ. ৫২।
৬৭. প্রফুল্লকুমার দত্ত তাঁর 'হ্যাপিলুক' বাসভবনে ২১.১১.০৩ তারিখে বর্তমান গবেষককে দেওয়া সাক্ষাৎকারের রেকর্ডকৃত অংশ থেকে উদ্ধৃত।
৬৮. কল্যাণ চন্দ (সংকলক), 'পত্রপরিচিতি', সাহিত্যচিন্তা (কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত সম্পাদিত), বিশেষ সাহিত্য সংখ্যা ১৯৯৬; পৃ. ৩৯।
৬৯. অমিত চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত; পৃ. ৩৮।
৭০. কবি প্রফুল্লকুমার দত্ত, রাণা চট্টোপাধ্যায় এবং আরো কেউ কেউ বর্তমান গবেষককে জানিয়েছিলেন যে, কিরণশঙ্করের প্রকাশিত এবং পত্রপত্রিকায় অপ্রকাশিত সমস্ত কবিতার ক্লিপিং কবির কাছে সংরক্ষিত ছিল। থাকারও কথা, কারণ তিনি ছিলেন খুবই গোছানো স্বভাবের মানুষ — সবচেয়ে বড় কথা নিজে ছিলেন গবেষণা-মনস্ক, সুতরাং সব কিছুকেই তিনি যত্নের সঙ্গে রক্ষা করতেন। এ বিশ্বাসে বর্তমান গবেষক কবির প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতার খোঁজে কবির পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও বাস্তবতা হচ্ছে তাঁর পরিবারের অমনোযোগিতায় কিংবা অন্য কোনো কারণে বা বলা যেতে পারে পরিবারের অসহযোগিতার কারণে সেগুলো পাওয়া যায় নি। যতটুকু পেয়েছি তার প্রায় পুরোটাই শহিদ সোমেন চন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রদ্ধেয় কল্যাণ চন্দের বদান্যতায়।
৭১. রাণা চট্টোপাধ্যায় কলকাতায় তাঁর নিউ পার্ক, গড়িয়া স্টেশন রোডের বাড়িতে ২০.১১.০৩ তারিখে বর্তমান গবেষককে দেওয়া সাক্ষাৎকারের রেকর্ডকৃত অংশ থেকে উদ্ধৃত।
৭২. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, 'সময় অসময়', প্রাগুক্ত; পৃ. ৫১।
৭৩. কল্যাণ চন্দ তাঁর কলকাতার পার্ক স্ট্রিটের বাড়িতে ১৬.১১.০৩ তারিখে বর্তমান গবেষককে দেওয়া সাক্ষাৎকারের রেকর্ডকৃত অংশ থেকে উদ্ধৃত।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের কবিতা : বিষয়বৈচিত্র্য ও শিল্পরূপ

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত সময়-ভাবিত কবি, পূর্বজ কবিদের বৈশিষ্ট্য ধারণ করেও নিজে নতুন পথের নির্মাতা। বাংলাদেশে জন্মেছেন, যৌবন অতিবাহিত করেছেন। কিন্তু উত্তর-যৌবন থেকে মৃত্যুপূর্বকালে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গে। বাংলার এই দুই অঞ্চলেরই মানুষ, ভূপ্রকৃতি, সময়, সমকালকে তিনি ধারণ করেছেন কবিতায়। বাস্তুভূমি তাঁকে ত্যাগ করতে হয়েছিল, কিন্তু তাই বলে তিনি ত্যাগ করেন নি আবাল্যে ধারণকৃত অসাম্প্রদায়িক আদর্শবোধকে। বরং ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব বন্ধু, সুহৃদদের সঙ্গেই কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত আন্তরিক যোগাযোগ রেখেছিলেন আমৃত্যু। আদর্শবোধের ব্যাপ্তি ও গভীরতা কতোটা বিস্তৃত ও গভীর হলে এটা সম্ভব, তা বোঝা দুষ্কর নয়। কবি কিরণশঙ্করের প্রতিটি কাব্যগ্রন্থেই তাঁর লালিত আদর্শবোধের ছায়া আছে। এই বোধ নিশ্চয়ই একরৈখিক ছিল না; কারো ক্ষেত্রেই থাকে না — কিন্তু তাই বলে কবি আদর্শবোধের বিপ্রতীপ মেরুতে পৌঁছান নি। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের কবিতা গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে কবিমনের এই লেখচিত্র উদ্‌ঘাটন করা অনেকটাই সম্ভব।

কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা তেরটি : 'স্বপ্ন-কামনা' (১৯৩৮), 'নতুন আঁচড়' (১৯৪৩), 'স্বর ও অন্যান্য কবিতা' (১৯৫৩), 'দিনযাপন' (১৩৬৯), 'এই এক সময়' (১৩৮০), 'বৃষ্টি এলে' (১৯৭৩), 'রুক্ষ দিনের কবিতা' (১৯৮৩), 'মানুষ জানে' (১৯৮৫), 'নির্বাচিত কবিতা' (১৯৮৯), 'ছায়া হেঁটে যায়' (১৯৯২), 'ভিতরে-বাইরে' (১৯৯৪), 'দৃশ্য বদলের দিন' (১৯৯৫) ও 'আশি-নব্বুই-এর কবিতা' (১৯৯৭)।

'স্বপ্ন-কামনা'য় কিরণশঙ্করের দৃষ্টিভঙ্গি রোমান্টিক এবং প্রেমের গীতিকবিতা রচনার দিকেই তাঁর ঝোঁক। সে সময়টাও অনুকূল ছিল প্রেমের কবিতা লেখার। তাঁর পূর্বজ তিরিশের কবিরা এবং রবীন্দ্রনাথ আদর্শ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সামনে। ফলে পুরোনো ঐতিহ্য তখনো বর্জন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে নি। উদাহরণ —

অকাল বসন্ত বুঝি অন্ধ হয়ে হানা দিলো দ্বারে
বক্ষে লয়ে বিশ্বের বারতা।
শীতের আবিল জড়তা —
দুই হাতে ছিঁড়ে ফেলি' দখিনা বাতাস দেহে দিলো দুরন্ত স্পন্দন;

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীদেহের উষ্ণ রক্তে কামনা-ক্রন্দন
তারি সাথে উঠিল ধ্বনিয়া! (Last words to Miriam, *স্বপ্ন-কামনা*)

অথবা

হাতগুলি শাদা-শাদা, আরো শাদা ধবধবে বুক,
ওই বুকে মুখ রেখে পুরুষের সেরেছে অসুখ!
(হাজার বছর আগে, *স্বপ্ন-কামনা*)

অথবা

হে ললিতা, কাছে এসো শোনো —
হিমসিক্ত তোমার চুম্বনে
শেষ হবে মোর পরমায়ু! (হে ললিতা, ফেরাও নয়ন, *স্বপ্ন-কামনা*)

কবি কিরণশঙ্কর 'শ্রীদেহের উষ্ণ রক্তে কামনা', 'শাদা ধবধবে বুক' এবং 'হিমসিক্ত চুম্বন'-এর তীব্র রোমান্টিক জগত থেকে দ্রুত এসে গেলেন প্রতিদিনের প্রাত্যহিক জগতে — যেখানে শুধু স্বদেশ নয় বহির্বিশ্বের — বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপ ও দূরপ্রাচ্যের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক নানান উত্তাল ঘটনার মুখোমুখি হলেন। সাম্যবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে দায়বদ্ধ হলেন। তাঁর কবিতায় সময় ও সমাজ-সচেতনতার দেখা মিলল। এ সময়কার কবি মানসের পরিচয় বিধৃত হল 'নতুন আঁচড়' (১৯৪৩) কাব্যগ্রন্থের কবিতায়। পূর্বের কামনা লোলুপ কবিমন নতুন পরিচয়ে আবির্ভূত হচ্ছেন —

কামনা যা ছিল মৃগতৃষ্ণায় হ'লো ফতুর,
নিশীথ শয়নে আর তো ডাকে না অন্তঃপুর —
ঘাত-প্রতিঘাতে অধুনা হৃদয় ভরপুর। (ডায়েরী, *নতুন আঁচড়*)

কারণ —

সারাক্ষণ কানে বাজে ধ্বনি। রেডিয়ো ও গ্রামফোন
সকাল-সন্ধ্যায় পথে। অন্তহীন রেঁস্তোরার ভীড়।
সন্ত্রাস সহরময়। কোথায় ধরেছে যেন চিড়।
উদ্ধত দাপটে হাটে চৌরঙ্গীতে গোরা সৈন্যগণ।
(চতুর্দ্দশপদী, *নতুন আঁচড়*)

এবং কবি জনতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে জনতার বিজয়ে প্রণয়ের সার্থকতা খুঁজে পেলেন —

গাঁথি আমার জীবন
সহস্রের সাথে। আর বুক ভরপুর
পূর্ব্বরাগে। জয়ী হ'লে বিপ্লবী জনতা
তবেই তো প্রণয়ের যত সার্থকতা। (মণির জন্য কবিতা, *নতুন আঁচড়*)

যুদ্ধকালীন চল্লিশের দশকে কবি ক্রমশ পরিচিত হচ্ছেন বামপন্থী নানান গ্রন্থের সঙ্গে — অনুপ্রাণিত হচ্ছেন সেসব গ্রন্থের নানান অভিমতে। এলিয়টের কাব্যাদর্শ গ্রহণ করে কবিতায় তার প্রকাশও ঘটালেন — 'স্বর ও অন্যান্য কবিতা' (১৯৫৩) গ্রন্থের কয়েকটি কবিতায় এবং পিছনের ধূসর অতীত ফেলে ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা শুরু করেছেন —

Dhaka University Institutional Repository

পিছনে পৃথিবী এক
বিলুপ্ত, ধূসর,
ক্লান্ত গতি, তৃষিত অধর;
এ যাত্রার কবে হবে শেষ? (যাত্রা, *স্বর ও অন্যান্য কবিতা*)

এবং কবি সে যাত্রা পথে পেয়ে যান —

আমার দুর্গম-পথে শুধুমাত্র সে-মুখ নির্ভর।
এ-মুখ মসৃণ নয়, এ-মুখ নয়তো রমণীর,
জনতার শ্রমদৃপ্ত এ মুখের প্রশান্তি গভীর। (মুখ, *স্বর ও অন্যান্য কবিতা*)

কবিহৃদয় প্রফুল্লিত হয় নতুন আবিষ্কারে —

নবরূপে তবু লভিলাম।
সহরসীমান্ত ছেড়ে
হে আমার দেশ,
এখানে তোমাকে ফের নবরূপে আজ লভিলাম।
(নির্জন মুহূর্তের প্রার্থনা, *স্বর ও অন্যান্য কবিতা*)

চল্লিশের দশকে সমাজ ও সময়ের কাছে দায়বদ্ধ কবি পরবর্তীকালেও দায়মুক্ত হন নি। সরে আসেন নি মানুষের কাছ থেকে। তবে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে কবিতার বিষয় আঙ্গিক ও উচ্চারণে এসেছে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। 'দিনযাপন' (১৩৬৯) কাব্যগ্রন্থের কবিতায় পাই তার সাক্ষ্য :

কর্মেই আনন্দ শুধু। জঞ্জালের গর্ভকোষ হতে
জন্মে বীজ জন্মে আশা জন্মে নব প্রাণের অঙ্কুর
বিচিত্র স্পন্দনে, ছন্দে: (কর্মেই আনন্দ খুঁজি, *দিনযাপন*)

আত্মপ্রত্যয়পূর্ণ দিনযাপনের এই দীর্ঘ যাত্রায় তিনি বেছে নেন মহাপয়ার, যার ফলে কবিতায় আঙ্গিক ও আঙ্গিক নিহিত ভাব ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যায়। কিন্তু যে লক্ষে একদিন তিনি যাত্রা করেছিলেন সে অভিষ্টে তখনো পৌঁছতে পারেন নি —

আমার সে-পথে যাত্রা হলো না হলো না।
সময়ের করাঘাত স্বেদাক্ত শরীরে রেখে গেছে
নিষ্ঠুর বিদ্রুপ কিংবা নির্মম যৌতুক: (কবিতা মেলায়, *দিনযাপন*)

তবে কি ফিরেই যেতে হবে আগের অতীতে? কবি নিজের কাছেই প্রশ্ন রাখেন —

তবে কি ফিরেই যাবে! তবে কি আকাশ
শঙ্কায় স্তম্ভিত; দীর্ঘশ্বাস
পথে-পথে বনে-বনে স্তরে স্তরে তুহিন হাওয়ায়
সর্বত্র ছড়িয়ে তুমি ফিরে যাবে,
অন্তর্বেগবতী কোনো উন্মাদিনী নদীর কান্নায়
লীন হবে,
অশনীমন্থিত মেঘে ক্ষয়ে যাবে
শেষ যন্ত্রণায়? (বিপ্রলব্ধা, *দিনযাপন*)

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু না, ক্ষয়ে গেলে তো চলবে না, কবি যে দায়বদ্ধ সমাজের কাছে, মানুষের কাছে — তাঁকে পৌঁছতে হবে পরিশুদ্ধ জীবনের দিকে। তাই 'এই এক সময়' (১৩৮০) কাব্যগ্রন্থে দেখি কবিতার কাছে অনেক প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন তিনি, কেননা —

কবিতাই তীক্ষ্ণ অসি, ছিন্ন করে দিতে পারে
ভীতিপ্রদ ছায়ার বিকার।

ছলনার নানা বাঁক পার হয়ে কবিতা এখন
ক্রমশ এগিয়ে যেতে চায়
প্রতিশ্রুত পথ ধরে রৌদ্রে জলে ঝড়ে
পরিশুদ্ধ জীবনের দিকে।

(কবিতা এখন, *এই এক সময়*)

কবি কিরণশঙ্করের কবিতায় আবার পরিবর্তন এল। দেখা গেল অলংকার বাহুল্যের পরিবর্তে গদ্য কবিতার স্বাতন্ত্র্য। পরিবর্তন ধ্বনিত হল কবির পূর্বের ভাবনারও —

যা ঘটছে ঘটুক না
আমার নাক গলাবার
কী দরকার। (যে ভূমিকায় প্রতিদিন, *এই এক সময়*)

কবি ফিরে গেলেন অতীতে — পুরোনো বাড়িতে (বৃষ্টি এলে, ১৯৭৩); কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখলেন —

পুরনো বাড়িতে ফিরে এসে
সব ক'টি অপরিচিত মুখ
আমার সামনে;
যেন রক্ত মাংসের মানুষ নয়
আমি তাদের দিকে তাকিয়ে আছি। (বাড়ি, *বৃষ্টি এলে*)

এইসব অপরিচিত মুখ এবং ভয়াবহ নিস্তব্ধতা কবিকে বিচলিত করেছে। সেখানে শুধু অন্ধকার, শুধুই শূন্যতা। তাই তিনি কিছুদিন আগে করা প্রতিজ্ঞা ভুলে আবার যেন ফিরে আসতে চান —

প্রতিজ্ঞা ছিল ফিরে আসব না,
ফিরে এলাম।
সংকল্প ছিল সন্ধি করবো না,
সন্ধি করলাম। (ফিরে এলাম, *বৃষ্টি এলে*)

কেননা কবি জানতে পেরেছেন —

ইচ্ছে হলেই সব হয় না অপেক্ষা করতে হয়।
অঙ্কুর থেকে আস্তে আস্তে ফুল
সময় লাগে;
বীজ থেকে আস্তে আস্তে ধান
সময় লাগে;
বাষ্প থেকে আস্তে আস্তে বৃষ্টি
সময় লাগে;
অনুভব থেকে আস্তে আস্তে প্রেম
সময় লাগে। (কখন সময় হবে, *বৃষ্টি এলে*)

Dhaka University Institutional Repository

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের স্বকাল ও সমাজ এবং তাঁর চারপাশের মানুষজন নিয়েই ছিল তাঁর জীবন, তাঁর কবিতা। এক সচেতন দেশপ্রেমিক সত্তা তাঁর কবিতার মধ্যে উপস্থিত। তাঁর 'মানুষ জানে' (১৯৮৫) কবিতায় দেখতে পাই —

মানুষ জানে
দুর্ভিক্ষ আর মন্বন্তরের কালো হাওয়ায়
কীভাবে গড়ে তুলতে হয় ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ।
মৃত্যুর ভ্রুকুটি উপেক্ষা ক'রে গভীরতার
অন্ধকারে
কীভাবে এগিয়ে যেতে হয়। (মানুষ জানে, *মানুষ জানে*)

এবং

লক্ষভ্রষ্ট হলেই
আবার কবন্ধ অন্ধকার
ভিড় করে আসবে। (লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেই, *মানুষ জানে*)

কবি যে সূর্যের দিকে তাকিয়ে নদীর দিকে মুখ রেখে নতুন যাত্রার কথা শুনিয়েছিলেন সে কথাও তিনি ভোলেন নি। কিন্তু তিনি তো সময়কে এড়িয়ে যেতে পারেন না — কারণ,

সড়কে এখন রক্ত, ঘটনা ও দুর্ঘটনা মিলে
সমস্ত স্বদেশ যেন মিলেছে মিছিলে।
(সড়কে এখন রক্ত, *মানুষ জানে*)

এই সময় তিনি সকল মানুষের সঙ্গে মিশে যান — আলাদা অস্তিত্ব থাকে না তাঁর। তাই 'ছায়া হেঁটে যায়' (১৯৯২) কাব্যে দেখি কবিতা প্রাণিত হয়ে চলে যায় মানুষের দিকে। এখানে এসে কবি কিরণশঙ্করের শিল্পমনস্ক গভীরতাসন্ধানী কবিমন মানবিক উচ্চারণে নিবিষ্ট হয়েছে। তাঁর এসময়ের কবিতায় কোনো বক্রতা নেই, অনুভবে রিক্ততা নেই। এই একই মানস-প্রবণতা লক্ষ করা যায় তাঁর 'ভিতরে-বাইরে' (১৯৯৪), 'দৃশ্য বদলের দিন' (১৯৯৫) কাব্য গ্রন্থদ্বয়েও।

রোমান্টিক শরীরী প্রেমের জগত থেকে সেই চল্লিশের দশকে যে যাত্রা তিনি শুরু করেছিলেন জনতাকে ভালবেসে, সমাজ-স্বকালকে স্বীকার করে নতুন দিনের অঙ্গীকারে, সেই যাত্রার শেষে তাঁর মুখ থেকে শুনি —

দুঃখ করো না আমি আবার আসব।
আমি ব্যর্থ নই শূন্য নই (আমি আসব, *ভিতরে বাইরে*)

তিনি দেখলেন —

সময়ের ছবি ভাঙে, ইতিহাস দ্রুত বদলায়,
পৃথিবীতে অস্থিরতা মানুষের দৃপ্ত অভিযানে।
(নভেম্বরের যাত্রা, ১৯৯২, *দৃশ্য বদলের দিন*)

এই প্রত্যাশাদৃপ্ত মানস-প্রবণতা কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের ১৩টি কাব্য সংকলনের মধ্যেই বর্তমান।

Dhaka University Institutional Repository

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত কাব্যচর্চা শুরু করেছিলেন প্রেমের তীব্র শরীরী প্রকাশের মধ্য দিয়ে। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর কাব্যে দেখা গেল ভালবাসার নতুন প্রকাশ। কবিতায় স্থান পেল সাধারণ জনতা। প্রেমের শরীরী ভাষা গেল বদলে। তিনি দায়বদ্ধ হলেন। সমাজের প্রতি — মানুষের প্রতি — সময়ের প্রতি। আর তার প্রতিফলন ঘটল তাঁর প্রায় আটত্রিশ বছরের কাব্যচর্চায়। ব্যক্তি কিরণশঙ্কর যেমন শান্ত, বিনয়ী, নম্র — কিন্তু প্রত্যয়দৃঢ় — সংকল্পে অবিচল — তাঁর কবিতায়ও সে ভাব বর্তমান। তাঁর কবিতায় বিদ্রোহ আছে কিন্তু সুকান্তের মতো তীব্র ভাষায় নয় — বিনম্র বিদ্রোহ। আছে নিসর্গ-প্রকৃতি, প্রেম, মানবতার কবিতা। অত্যন্ত সহজ-সরল। দুর্বোধ্য অভিধায় তাঁকে আক্রমণ করা যাবে না। কবিতায় আঙ্গিক বা প্রকরণ নিয়ে খুব বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা তিনি করেন নি। তাঁর মানস সেরকম ছিল না — যা ভাবনায় এসেছে — তাকে তিনি কবিতায় রূপ দিয়েছেন। বিশুদ্ধ কবিতার প্রতি ঝোঁক থাকায় সাম্যবাদী হয়েও পুরোপুরি সাম্যবাদী তিনি নন। আবার দায়বদ্ধতায় আবদ্ধ বলে পুরোপুরি রোমান্টিকও তিনি নন। এই মানস-প্রবণতাই তাঁর সমগ্র কবিজীবনে পরিলক্ষিত হয়। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের প্রতিটি কাব্যগ্রন্থ পৃথকভাবে গভীরতর পাঠ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে এসব পর্যবেক্ষণ ও ধারণার রূপ-রূপান্তর স্পষ্টতর হবে।

Dhaka University Institutional Repository

১. স্বপ্ন-কামনা

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নামকরণের মধ্যেই একধরনের রোমান্টিক অনুভব অনুভূত হয় : স্বপ্ন-কামনা। তাঁর আঠার থেকে বিশ বছর বয়সে রচিত কবিতাগুলো নিয়ে 'স্বপ্ন-কামনা' প্রকাশিত হয় ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে, অর্থাৎ ১৯৩৮-এর ডিসেম্বরে। গ্রন্থের প্রকাশক কবি নিজে। গ্রন্থটি তিনি উৎসর্গ করেন ''বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ'-এর প্রথম সম্পাদক, সিপাহিযুদ্ধের ইতিহাস প্রভৃতির গ্রন্থকার মাতামহ স্বর্গীয় রজনীকান্ত গুপ্ত''কে। আর এ বইয়ের ভূমিকা লিখেছিলেন তিরিশের অন্যতম প্রধান কবি জীবনানন্দ দাশ। 'স্বপ্ন-কামনা' প্রকাশিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আধুনিক কবি হিসেবে কিরণশঙ্কর বিখ্যাত হয়ে ওঠেন।

১৯৩৬ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত 'কবিতা', 'পরিচয়', 'নবশক্তি', 'শান্তি' ও 'জীবাণু' পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতাগুলোর মধ্যে থেকে মাত্র উনিশটি কবিতা 'স্বপ্ন-কামনা'য় সংকলিত হয়েছে। গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলোর মধ্যে 'কবিতা' পত্রিকায় ৬টি, 'পরিচয়'-এ ২টি, 'নবশক্তি'তে ৭টি, 'শান্তি'তে ৩টি এবং 'জীবাণু' পত্রিকায় ১টি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯৩৬ সালে 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত হয় 'অধ্যায়' কবিতাটি। ১৯৩৭ সালে 'কবিতা' পত্রিকায় 'মৃত্যু', 'আমি নহি স্বর্গের দেবতা', 'I Should have been ... Flame' ও 'রূপকথা'; 'নবশক্তি' পত্রিকায় 'রহস্য', 'Last words to Miriam', 'অনন্ত-জিজ্ঞাসা' ও 'হে সমীর'; 'শান্তি' পত্রিকায় 'হাজার বছর আগে' কবিতাগুলো প্রকাশিত হয় এবং ১৯৩৮ সালে 'কবিতা' পত্রিকায় 'স্বপ্ন-কামনা', 'হে ললিতা, ফেরাও নয়ন'; 'পরিচয়' পত্রিকায় 'জাতিস্মর'; 'নবশক্তি' পত্রিকায় 'কোকিল', 'নীল চোখ' ও 'দুইটি কবিতা'; 'শান্তি' পত্রিকায় 'নীল রাত' ও 'দুই রূপ' এবং 'জীবাণু' পত্রিকায় 'আছি' কবিতাগুলো প্রকাশ পায়। এক নজরে বোঝার জন্যে নিচে ছকের সাহায্যে প্রকাশিত কবিতার প্রকাশকাল ও পত্রিকার নামসহ দেখানো হল :

সাল	কবিতা	পরিচয়	নবশক্তি	শান্তি	জীবাণু
১৯৩৬	-	'অধ্যায়'	-	-	-
১৯৩৭	'মৃত্যু', 'আমি নহি স্বর্গের দেবতা', 'I Should have been ... Flame'. 'রূপকথা'	-	'রহস্য', 'Last words to Miriam', 'অনন্ত-জিজ্ঞাসা', 'হে সমীর',	'হাজার বছর আগে'	-
১৯৩৮	'স্বপ্ন-কামনা', 'হে ললিতা', ফেরাও নয়ন'!	'জাতিস্মর'	'কোকিল', 'নীল চোখ', 'দুইটি কবিতা'	'নীল রাত', 'দুই রূপ'	'আছি'

Dhaka University Institutional Repository

এই সময়ে কিরণশঙ্কর সবেমাত্র কবিতাচর্চা শুরু করেছেন এবং তাঁর লক্ষ, কবির নিজের ভাষাতেই যদি বলা যায়, তাহলে এমন — 'আধুনিক কবিতা লিখতে হবে, নতুন রীতির প্রতিষ্ঠা করতে হবে, বহুকালের প্রচলিত কাব্যধারাকে বর্জন করা দরকার'[১]। তবু তিনি পূর্বজ শক্তিশালী কবিদের প্রভাব কাটিয়ে উঠে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করতে পারেন নি। আবার একথাও ঠিক যে একজন নবীন কবি হিসেবে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত প্রথম উন্মেষে তাঁর কবি-প্রতিভার যথেষ্ট স্বাক্ষর 'স্বপ্ন-কামনা'য় অঙ্কন করতে সমর্থ হয়েছেন। জীবনানন্দ দাশ তাই বইয়ের ভূমিকাংশে উল্লেখ করেছেন, 'তাঁর গদ্যকবিতার উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যে নেই তা নয়, কিন্তু — তবুও — স্বকীয়তাটুকুও নজর এড়ায় না'[২]। এবং 'পদ্যকবিতায় কিরণশঙ্কর যে স্বকীয়তা ও শক্তি দেখিয়েছেন তা তাঁর পরিস্ফুট চেতনায় না হোক, অবচেতন মনে তাঁর নিজের জন্য অনাদি ট্রাডিশনের দেশে একটা পথ কেটে রাখছে হয়তো'[৩]।

একদিকে তীব্র রোমান্টিকতার প্রাবল্য, অপরদিকে জন্ম-মৃত্যু-রহস্যের উন্মোচনে কবিমানস এখানে আন্দোলিত। তবে তাঁর প্রত্যেকটি কবিতা এই দোলাচালের মধ্যেও একটা নতুন আশায় উত্তীর্ণ হয়েছে। যে আশাবাদ উচ্চকিত করে তুলেছে কবির জীবনবোধকে।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত নিজেই স্বীকার করেছেন, 'কবিতা রচনার একেবারে প্রথম পর্বে প্রেম ও নিসর্গ চেতনাযুক্ত এক ধরনের রোমান্টিক অনুভূতিময় কবিতাই লিখেছিলাম'[৪]। জীবনানন্দ দাশও লিখেছেন : 'দেখলাম কিরণশঙ্করের প্রায় সমস্ত কবিতাই নিজেকে ও প্রেমাস্পদাকে নিয়ে'[৫]। তবে তাঁর 'স্বপ্ন-কামনা'র সব কবিতাই যে একান্ত প্রেম-কেন্দ্রিক তা বলা যায় না। বরং প্রেম-মৃত্যু-জীবনস্মৃতি ইত্যাদি অনুষঙ্গও তাঁর কবিতায় দুর্লক্ষ্য নয়। এবং এটাও লক্ষণীয় যে কখনো কখনো কোনো একটি কবিতায় একই সঙ্গে জন্ম-মৃত্যু ভাবনার সঙ্গে প্রেম কিংবা প্রেমভাবনার সঙ্গে মৃত্যুচেতনা মিলেমিশে কবিতাকে অর্থবহ করে তুলেছে। সুতরাং তাঁর 'স্বপ্ন-কামনা'র কবিতাগুলোতে আমরা বিষয়বৈচিত্র্যের দিক থেকে তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য লক্ষ করি; সেগুলো হচ্ছে :

এক. জন্মমৃত্যু-রহস্য
দুই. প্রেম
তিন. নিসর্গ-প্রকৃতি

এক.

'স্বপ্ন-কামনা' কাব্যগ্রন্থের 'মৃত্যু' ও 'রহস্য' কবিতাগুলোতে জন্ম-মৃত্যু ভাবনাই প্রবল। 'স্বপ্ন-কামনা'র প্রথম কবিতা 'মৃত্যু'। এ কবিতায় কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত জন্ম-মৃত্যু ভাবনায় আন্দোলিত। তবে তিনি মৃত্যুকে ভয় পান না — তাই কবিতার শুরুতেই দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি তাঁর প্রেমাস্পদাকে বলেন —

তোমাকে বলেছিলাম মৃত্যু কিছু নয়। (মৃত্যু)

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর কাছে মৃত্যু মানে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া নয়। কারণ তিনি জানেন —

যদি আমরা মৃত্যুকে সহ্য করতে পারি
মৃত্যুও সহ্য করবে আমাদের :
আমাদের ঘিরে আছে মৃত্যু-লীলার প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ, (ওই)

কিরণশঙ্কর ১৯৩৬-'৩৭ সালে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে পড়াশোনা করতেন বিজ্ঞান বিষয়ে। কবিতাটি তখনই লেখা। বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে পৃথিবীতে কোনো কিছুরই সম্পূর্ণ বিনাশ বা বিলোপ হয় না — শুধু অবস্থার পরিবর্তন বা রূপান্তর ঘটে।[৬] 'মৃত্যু' কবিতায় বিজ্ঞানের ছাত্র কিরণশঙ্কর সেই উপলব্ধি কার্যকর করেছেন। অবশ্য একথাও বলা যায় যে হিন্দু, মুসলমান বা খ্রিস্টান সম্প্রদায় ধর্মীয় ভাবে বিশ্বাস করে যে মানুষের পুনর্জন্ম বা পুনরুত্থান হয়। হিন্দুদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ উপনিষদে বর্ণিত আছে :

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্
নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥[৭]

অর্থাৎ আত্মার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, কোনো কারণ থেকে এর উৎপত্তিও হয় নি; এই আত্মা অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ। শরীর বিনষ্ট হলেও এর বিনাশ নেই।
'মৃত্যু' কবিতায় যেন এরই প্রতিধ্বনি শুনি —

'আমাদের অবিকৃত মৃত্যুর পর
তোমার পুরুষ-দেহ মাটি হয়ে যাবে কি পরিমাণে?'
তারপর নতমুখে বলেছিলে,
'আমি যেন ফুল হ'য়ে ফুটে থাকি
তোমার দেহের ঐ ধূসর মৃত্তিকায়।' (মৃত্যু)

ধূসর মৃত্তিকায় ফুল হয়ে ফুটে থাকার বাসনায় দুটি নরনারীর গভীর ভালবাসার নিরুপম চিত্র আমাদের চোখের সামনে মূর্ত হয়ে ওঠে; যারা মৃত্যুর মধ্য দিয়েও নিজেদের প্রতিষ্ঠা দাবি করে উচ্চারণ করে —

আমরা ম'রে গিয়ে ব্যঙ্গ করতে চাই মৃত্যুকে
আত্মবিলোপে চাই আত্ম-প্রতিষ্ঠা! (ওই)

'আত্মবিলোপে চাই আত্ম-প্রতিষ্ঠা' পঙক্তিটি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে ভানুসিংহ ঠাকুর (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)-এর 'মরণ' কবিতার কথা স্মরণ হয় :

মরণ রে,
তুঁহুঁ মম শ্যামসমান।
মেঘবরণ তুঝ, মেঘজটাজূট
রক্ত কমলকর, রক্ত অধরপুট,
তাপবিমোচন করুণ কোর তব
মৃত্যু অমৃত করে দান।
তুঁহুঁ মম শ্যামসমান।[৮]

মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এখানেও অমৃত দান অর্থাৎ অমরত্বের আশাবাদ ব্যক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'মরণ' কবিতা যে অর্থে আরোপিত কবিতা (কারণ প্রথম যৌবনে মৃত্যু চিন্তা

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের নয়), সে অর্থে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের 'মৃত্যু' কবিতাও আরোপিত। উনিশ বছর বয়সে কিরণশঙ্করের এই মৃত্যুবোধ তাঁর পূর্বজদের কাছ থেকেই ধার করা।

মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আত্ম প্রতিষ্ঠার এই দুরন্ত আকাঙ্ক্ষা 'স্বপ্ন-কামনা'র দ্বিতীয় কবিতা 'রহস্য'তেও বর্তমান। এখানেও কবি জাতিস্মরতত্ত্বে বিশ্বাস স্থাপন করে ঘোষণা করেন :

হয়তো বা হবো না স্থবির।
মোর দেহে কোনোদিন জরা আর করিবে না ভীড়।
তারি বহু আগে মৃত্যু এসে আগেভাগে
মুছে নেবে সব
অন্য কোনো দূরলোকে মোরে মৃত্যু করিবে প্রসব! (রহস্য)

মৃত্যুকে কখনোই কবি অস্বীকার করেন নি; কারণ তিনি জানেন মৃত্যু অমোঘ। তিনি জানেন —

'একদিন কালমৃত্যু আসিবে নিশ্চয়' (ওই)

জীবনানন্দের কবিতার চরণের এই উদ্ধৃতি কিরণশঙ্করের কবিতায় একদিকে যেমন এক ধরনের নতুন ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে — অপরদিকে মৃত্যুকে নারীরূপে কল্পনা করে তিনি চমক সৃষ্টি করতেও সক্ষম হয়েছেন —

মনে হয় স্তব্ধ মৃত্যু নারীরূপ ধরি
প্রতারণা করিছে আমায়! (ওই)

এই প্রতারণা কবির কাছে অসহ্য বোধ হয়। ফলে —

এই কথা ভেবে-ভেবে
মাঝে মাঝে আত্মা মোর রুদ্ধশ্বাস হয়। (ওই)

কবিতায় জীবনানন্দের প্রভাব লক্ষযোগ্য হলেও কিরণশঙ্করের নিজস্ব চেতনাও বেশ সচেতনভাবে পরিলক্ষিত হয়।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের 'Last words to Miriam', 'হে সমীর', 'নীল চোখ', 'হাজার বছর আগে', 'আছি', 'জাতিস্মর' কবিতাগুলোতেও টুকরো টুকরোভাবে জন্ম-মৃত্যু ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে।

Last words to Miriam কবিতার তৃতীয় অংশে মৃত্যু ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে কবির প্রেমাস্পদাকে উপলক্ষ করে। তার অন্তরে কবির জন্যে যে ভালবাসা উজ্জ্বল দীপশিখার মতো প্রজ্বলিত, সেটিও একদিন নিভে যাবে। এবং তখন —

একদিন এই ব্যস্ততার — অপরূপ উন্মাদনার অবশ্য বিলয়
চক্রমুখর কালস্রোতে
নির্বিকার নির্বিরোধে
অধুনা সে হবে চ্যুত বিস্মৃত মৃত।
(Last words to Miriam)

'হে সমীর!' কবিতায় কবি কিরণশঙ্করের মৃত্যু ভাবনা পার্থিব জগতের নয় — তিনি শুনতে পান —

Dhaka University Institutional Repository

শব্দহীন স্তব্ধ অর্দ্ধরাতে
কেন যেন মনে হয় অন্ধকারে বিষণ্ন ব্যথায়
আত্মা কার কাঁদে। (হে সমীর)

পঙক্তিগুলো জীবনানন্দ দাশকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বস্তুত এই অশরীরী বিষণ্ন ব্যথাতুর আত্মার প্রতি কবি গভীর অনুরাগ পোষণ করেন। তাই রাতের বাতাসকে তিনি মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হওয়ার অনুরোধ জানিয়ে বলেন—

'আমারে জানিতে দাও আত্মা কার অন্ধকারে
অতৃপ্তিতে ঘোরাফিরা করে!
অর্দ্ধরাতে কার দীর্ঘশ্বাস
ধমনীতে বহে আনো হে অভ্রান্ত শীতল বাতাস?' (ওই)

'নীল চোখ' কবিতায় আবার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব লক্ষণীয়। অপার্থিব জগতের সম্পদকে পৃথিবীতে টেনে এনে জীবন সাজানোর বাসনায় এখানে কবির 'অন্ধ আত্মা' ঈশ্বরের কাছে মিনতি জানিয়ে উচ্চারণ করে,

এই নীল আলো যেন কভু কোনোদিন
নীলাভ আকাশ থেকে মুছে নাহি যায়;
আমার মৃত্যুর আগে না-হয় বিলীন। (নীল চোখ)

জীবনানন্দ দাশের কাব্য থেকে 'নীল' শব্দগুচ্ছ কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত কত সহজে তাঁর কবিতায় তুলে এনেছেন। বস্তুত এই 'নীল' শব্দ দ্বারা মৃত্যু ভাবনার চেয়ে জীবনবোধই এখানে প্রবল হয়ে উঠেছে।

'হাজার বছর আগে' কবিতায় কবি কিরণশঙ্কর হাজার বছর আগেকার মৃতদেহের মধ্যেও প্রাণের সঞ্চার করেন, বাস্তবে যার সন্ধান মেলা সম্ভব নয়।

হাজার বছর আগে যেইসব মৃত নর-নারী
ম্যামি হ'য়ে বালু হ'য়ে আজ শুধু পিরামিডে স্থির,
বহুদিন পরে তারা কালরাতে মৃতদেহ ছাড়ি'
আমার চোখের 'পরে নানারূপে করেছিলো ভীড়। (হাজার বছর আগে)

এখানেও জীবনানন্দীয় ভাবনা লক্ষযোগ্য। জীবনানন্দের মতো এ কবিতায় কবি ইতিহাসচেতনা বোধেও যেন খানিকটা আচ্ছন্ন। 'সিজার', 'ক্লিয়োপেট্রা', 'এন্টোনী' প্রমুখের মৃত আত্মা কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের কাছে রক্তমাংসের মানুষ হয়ে উঠেছেন। তবে তা সাময়িক। কারণ মৃত্যু এমন এক স্বাভাবিক ঘটনা এবং জীবনের নির্দিষ্ট পরিক্রমায় তা যেমন আসতে পারে, পরে তা পারে না। তাই শেষ পর্যন্ত কবির মনেও অস্বস্তি জাগে — এবং তিনি উপলব্ধি করেন —

হাজার বছর আগে আজিকার কাফনের ঘ্রাণ
এতো ক্ষীণ ছিলো নাকো — অস্বস্তিতে ফেঁপে ওঠা প্রাণ
ম্যামি-র ভিতরে গিয়ে হয় নাই এতো নির্ব্বিকার,
কোনো রাতে এতো ঘুম কভু তারা পায় নাই আর! (ওই)

Dhaka University Institutional Repository

'আছি' কবিতায় কবি তাঁর প্রেমাস্পদাকে প্রশ্ন করেছেন —

মনে পড়ে কোনোদিন মুছে যাবো এই মাটী হ'তে
তখন কাঁদিবে নাকি শয্যাপ্রান্তে আমাকেই স্মরি'? (আছি)

মাটি থেকে মুছে যাওয়ার মধ্যেই পাই মৃত্যুর আভাস। মৃত্যুবোধের ধারণা যেমন কবিতে কবিতে আলাদা, তেমনি এক কবিও সবসময় মৃত্যুকে একইভাবে দেখেন না। সময় ও উপলক্ষ অনুসারে অথবা মৃত্যুর চরিত্র অনুসারে কবিতায় মৃত্যুকে দেখার নানা রূপান্তর বৈচিত্র্য ঘটে। 'হে ললিতা, ফেরাও নয়ন!' কবিতায় —

অদূরেতে কৃষ্ণ মৃত্যু কাঁপে,
তবু যেন তৃণের মতন
ভেসে চলি অন্তিম বিপাকে,
আকাঙ্ক্ষায় স্তব্ধ অচেতন,
মৃত্যু আনে নৈশ পরিশ্লেষ! (হে ললিতা, ফেরাও নয়ন)

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের কবিতার মূল সুর হল পরিবর্তন — জীবনের সমস্ত কিছুর বদলে যাওয়া, বর্তমান থেকে দ্রুত অতীতে পৌঁছে যাওয়া কিংবা অতীতের সঙ্গে সংযোগ রচনা :

অতীতের সাধনায় বুঝি
আকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু-বরাভয়
লভিয়াছি দেহপ্রান্ত খুঁজি!
ক্লান্ত তনু সুন্দর অক্ষয়। (ওই)

বিষাদ, ভালবাসা, সংশয় ও আশাবাদের মধ্য দিয়েই কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের কবিতায় জন্ম-মৃত্যুবোধ সঞ্চালিত হয়েছে। আর জন্ম-মৃত্যু বোধের এই বিচিত্রমুখী দোলাচালের মধ্যেও তাঁর কবিতা রোমান্টিকতার পথেই পরিক্রমণ করেছে। যদিও 'স্বপ্ন-কামনা'র শেষ কবিতায় দেখি —

প্রেম আজ পলাতক! পৃথিবীর ঘৃতাচীর গান
অতীত জোয়ার আর জাগায় না মোর মরলোকে, —
সমুদ্র শুকায়ে গেছে, শুধু তার অন্তিম আহ্বান
বিক্ষোভের বহ্নি-জ্বালা জ্বালে আজো রক্তবর্ণ চোখে। (জাতিস্মর)

তবু এখানেই সাক্ষাৎ মেলে নতুন প্রেমের পথে যাত্রার। সব কিছু শেষ হয়ে যায় নি তখনো, অন্তিম আহ্বান কবি শুনেছেন। মৃত্যুবোধের মধ্যে জীবনের দিকে ব্যক্ত এই আশাবাদ কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের কবিতার এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

দুই.

জন্মমৃত্যু-রহস্য অনুধ্যানের পাশাপাশি অনেকটা সমান্তরাল, কখনো বা কিছুটা উচ্চতর ভূমিকায় যে বিষয়টি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের প্রথম কাব্যে প্রাণরস সঞ্জীবিত করেছে তাহল প্রেম। বলা যায় কিরণশঙ্করের 'স্বপ্ন-কামনা'র মুখ্য আবেদন হচ্ছে প্রেম।

'স্বপ্ন-কামনা' কাব্যগ্রন্থের প্রায় সব কবিতার মধ্যেই প্রেমচেতনা লক্ষযোগ্য। আর এসব প্রেমের কবিতায় নিরাশার চেয়ে আশাবাদের মনোভাবই প্রবল হয়ে উঠেছে।

Dhaka University Institutional Repository

'মৃত্যু', 'Last words to Miriam', 'হাজার বছর আগে', 'আমি নহি স্বর্গের দেবতা', 'স্বপ্ন-কামনা', 'নীল রাত', 'কোকিল', 'নীল চোখ', 'আছি', 'দুই রূপ', 'হে ললিতা, ফেরাও নয়ন', 'অধ্যায়', 'I Should have been ... Flame', 'দুইটি কবিতা' প্রভৃতি কবিতায় কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের প্রেমচেতনা অত্যন্ত স্পষ্ট। তাঁর প্রেমের কবিতাগুলোতে শান্ত সমাহিত ভাবই প্রধান, তবে প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁর উচ্চারণের দৃঢ়তা তাঁকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে।

'স্বপ্ন-কামনা'র প্রথম কবিতা 'মৃত্যু'তেই কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের এই উচ্চারণের বলিষ্ঠতা লক্ষণীয়। এই কবিতায় আবহমান বাংলার নর-নারীর প্রেমভাবনা পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। বাঙালির প্রেমের প্রাচীন ঐতিহ্য হচ্ছে জীবনে-মরণে তারা পরস্পর অবিচ্ছিন্ন থাকার কথাই ভাবে। প্রেমিক-প্রেমিকা তাদের মধ্যকার প্রেমের সম্পর্ককে জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধন বলে মনে করে। 'মৃত্যু' কবিতায় দেখি কবির মৃত্যুর পর তাঁর পুরুষ-দেহ মাটিতে বিলীন হয়ে গেলেও তাঁর প্রেমাস্পদা তাঁকেই আশ্রয় করে থাকার কথা মৃদু অথচ দৃঢ় উচ্চারণে বলে —

'আমি যেন ফুল হয়ে ফুটে থাকি
তোমার দেহের ঐ ধূসর মৃত্তিকায়।' (মৃত্যু)

শুধু তাই নয়, তাদের প্রেমের অবিনশ্বরতাও দাবি করে সে। কবিতায় তার প্রকাশ দেখি এভাবে —

আকাঙ্ক্ষার অন্ত নেই।
তবু কী সাজ্ঘাতিক স্পর্দ্ধা,
আমরা ম'রে গিয়ে ব্যঙ্গ করতে চাই মৃত্যুকে,
আত্মবিলোপে চাই আত্ম-প্রতিষ্ঠা! (ওই)

এ কবিতায় মৃত্যুকে তুচ্ছ করে প্রেমের জয় ঘোষিত হয়েছে। একই মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে 'রহস্য' কবিতায়ও। মৃত্যুকে কবি এখানে নারীরূপে কল্পনা করে নতুন চমক সৃষ্টি করেছেন। মৃত্যুর প্রতারণায় পুণ্যপূর্ণিমায় কবি মধুরাতে তাঁর প্রেয়সীকে সন্দেহ করেছেন, প্রিয়া বিরহের বিচ্ছেদ যন্ত্রণায় ক্রন্দন করেছেন এবং মৃত্যু নিশ্চিত জেনে মাঝে মাঝে রুদ্ধশ্বাস হয়ে শব্দহীন অর্ধরাতে সঙ্গোপনে তারই কথা ভেবেছেন। শেষ পর্যন্ত অমোঘ মৃত্যুর কাছে পরাজয় স্বীকার করেও নতুন জীবনের আশাবাদে সুস্থিত হয়েছেন —

হয়তো বা হবো না স্থবির।
মোর দেহে কোনোদিন জরা আর করিবে না ভীড়।
তারি বহু আগে মৃত্যু এসে আগে ভাগে
মুছে নেবে সব :
অন্য কোনো দূরলোকে মোরে মৃত্যু করিবে প্রসব! (রহস্য)

প্রেমের এই লোকোত্তর মহিমার উপলব্ধি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের কবিতাকে এক ধরনের নতুনত্ব দান করেছে। এ পর্যন্ত কবির প্রেমের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে এই বোধই জাগ্রত হয় মনে যে, তাঁর প্রেম শুদ্ধ-পবিত্র। প্রেমিক-প্রেমাস্পদা যেন স্বর্গীয় ভাবনায় আচ্ছন্ন। কিন্তু আমরা জানি কিরণশঙ্করের প্রথম পর্যায়ের কাব্যভাবনায় তিরিশের কবিদের প্রভাব প্রবল। বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, জীবনানন্দ দাশ প্রমুখের দ্বারা তিনি

Dhaka University Institutional Repository

উদ্বোধিত। সুতরাং তাঁর কবিতায় প্রেমের এমন পরিশুদ্ধ রূপ দেখতে পাওয়া মনে হয় বেমানান। আধুনিক কবিদের কবিতায় প্রেমিকার দেহকে প্রেমের উপাচার করে ফুটিয়ে তোলাতেই যেন কবিতার সার্থকতা। আবার আমাদের এ কথাও মনে আছে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত রবীন্দ্রনাথকে কখনো অস্বীকার করেন নি। ফলে প্রেমের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বিশুদ্ধ ধারা এবং তিরিশের দেহবাদী ধারা তাঁর কবিতায় পাশাপাশি বর্তমান। 'স্বপ্ন-কামনা'র তৃতীয় কবিতা 'Last words to Miriam' কবিতায় প্রথম সাক্ষাৎ পাই,

অকাল বসন্ত বুঝি অন্ধ হয়ে হানা দিলো দ্বারে
বক্ষে লয়ে বিশ্বের বারতা।
শীতের আবিল জড়তা —
দুই হাতে ছিঁড়ে ফেলি' দখিনা বাতাস দেহে দিলো দুরন্ত স্পন্দন:
শ্রীদেহের উষ্ণ রক্তে কামনা-ক্রন্দন
তারি সাথে উঠিল ধ্বনিয়া! (Last words to Miriam)

এখানে অকাল বসন্তে দখিনা বাতাসে 'শ্রীদেহের উষ্ণ রক্তে কামনা' ধ্বনিত হয়ে কবির হৃদয়ে এক অনির্বচনীয়, নৈসর্গিক আবেশ সৃষ্টি করেছে। তাই প্রেমের এ পর্যায়ে নিসর্গও কবিকে উৎসাহ প্রদান করেছে :

কুসুমের দল আর কোকিলের গান,
গাছের রঙীন পাতা, সমাচ্ছন্ন ফসলের ঘ্রাণ —
অহোরাত্র ভাবাবেগে স্তব্ধ কৌতূহলে
শুনি যেন নিরুচ্চারে বারে-বারে বলে,
'রাখিয়ো, রাখিয়ো বন্ধু, আজিকার বসন্তের সৌখীন সম্মান।' (ওই)

কিন্তু কবির প্রেমিকা তো এখানে নেই — অন্য কোনোখানে। ফলে কবি তাকে সম্বোধন করে বলেছেন —

অয়ি সুচিস্মিতা!
শ্রীমণ্ডিত দেহে জ্বালি কামনার চিরন্তনী শিখা
রচিবে আপন হাতে আপনার সর্ব্বনাশা চিতা?
আমারো কি এই ছিলো স্ফীতরগ ললাটেতে লিখা? (ওই)

কিছুপূর্বের আনন্দ এখন ক্ষোভে পরিণত হয়েছে।

শুধু নারী লয়ে যাবে দিন আর কিছু নয়?
মিনিটের রতি-স্বাদ জীবনের শ্রেষ্ঠ সঞ্চয়? (ওই)

তিনি তাঁর প্রেমাস্পদাকে পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং তাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন —

তোমার বিষাক্ত নিশ্বাস দিগন্ত সঞ্চারি'
ক্ষতি যেন করে না আমার। (ওই)

এবং

আর তুমি সখী, আপনার পুরুষের ধ্বনিময় স্মৃতিঘেরা ঘরে,
অর্দ্ধরাতে নিশার প্রহরে
তারকার চোখে চেয়ে একাকী যাপিবে প্রহর-বসন্তের এই বিশ্লেষণ! (ওই)

Dhaka University Institutional Repository

কিরণশঙ্করের কবিতায় কখনো কখনো বাস্তবতার অতিরিক্ত একটা অনুভব আমাদের কাছে নতুন রূপে উন্মোচিত হয়। এখানেও দেখি যে-প্রিয়ার নিশ্বাসকে তিনি বিষাক্ত মনে করে দূরে ঠেলে দিয়েছেন, সেই তাকেই তিনি ভুলতে পারছেন না। এই বাস্তবতাকেও আমরা অস্বীকার করতে পারি না। একদিন কবি থাকবেন না, তাঁর প্রেয়সীর মনেও হয়তো এই প্রণয় আর দোলা দেবে না। তবুও কবি বলেন —

কানে-কানে তবু আমি বলি,
একদিন আমাকে যে অন্ধ হয়ে বেসেছিলে ভালো এই কথা নিয়ে
কারো সাথে তুমি কিন্তু করো না বিরোধ:
জীবন আর যৌবনের টুকরো টুকরো সৌরক্ষণগুলি
যদি পার মনে রেখো আজ শুধু এই অনুরোধ॥ (ওই)

জীবনানন্দ দাশ যেন কবি কিরণশঙ্করকে মোহগ্রস্ত করে রেখেছেন। 'স্বপ্ন-কামনা'র অধিকাংশ কবিতায় তাঁর কোনো না কোনোভাবে উপস্থিতি লক্ষণীয়। 'অনন্ত-জিজ্ঞাসা' কবিতায় যখন দেখি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত তাঁর প্রেমাস্পদাকে প্রশ্ন করেন —

ছাদের উপরে রাত্রি জেগেছো কি তুমি কোনোদিন?
ঠাণ্ডা শীতের রাত্রি — কনকনে, হিম,
অর্দ্ধরাত্রে একা-একা জেগেছো কি কোনো একদিন? (অনন্ত-জিজ্ঞাসা)

তখন জীবনানন্দ দাশ চোখের সামনে ভেসে ওঠেন।

নিজেরে ঢালিয়া দিয়া মেঘেদের হাতে,
অপলকে কাটায়েছো তারাদের সাথে
কখনো কি কোনো একদিন?...
নিঃসাড় পউষ রাত্রি — শীতল, তুহিন। (ওই)

মনে হয় কবিতার লাইনগুলো পুরোপুরি জীবনানন্দ দাশেরই। তবুও এ কবিতায়ই কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত আমাদের নতুনত্বের সন্ধান দেন।

একরাশ অন্ধকারে আকাশের ঘরে
মেঘেরা জটলা করে,
জ্বলজ্বলে তারাদের ঝাঁক হাওয়ায় ঢেউয়ের মতো নড়ে!
আমার বুকের উপর কুয়াশা গলিয়া পড়ে।
পউষের ঝরঝরে শীতের কুয়াশা,
হাওয়ায় কিসের হতাশা?... (ওই)

এ প্রশ্নের উত্তর কবি নিজেই দিয়েছেন এভাবে —

আমার প্রিয়ার বুকে এই মুখ রাখিয়াছি
কতোরাতে আমি কতো দিন:
ফুলের ভিতরে বুঝি লুকায়েছে দুষ্ট মৌমাছি,
মৌমাছি ফুলেতে বিলীন! (ওই)

এখানে কবি নিজস্বতা খুঁজে পেয়েছেন। এ কবিতায় বার বার 'জ্বলজ্বলে তারাদের ঝাঁক / হাওয়ায় ঢেউয়ের মতো নড়ে' ব্যবহার করে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত আমাদের একটা নতুন ভাবনায় আন্দোলিত করেন। এবং ঢেউগুলো যখন 'আমার দেহের উপর অযথা গলিয়া পড়ে' তখনই সৃষ্টি হয় এ কবিতার চরম উৎকর্ষতা :

Dhaka University Institutional Repository

শীতের শিশির বুঝি উহাদের লালসার রস,
জ্বলজ্বলে তারাগুলি একঝাঁক বিষণ্ণ সারস! (ওই)

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের প্রায় সমস্ত কবিতায়ই কবি নিজেকে ও প্রেমাস্পদাকে নিয়ে সারাক্ষণ উপস্থিত :

শব্দহীন স্তব্ধ অর্দ্ধরাতে
কেন যেন মনে হয় হয় অন্ধকারে বিষণ্ণ ব্যথায়
আত্মা কার কাঁদে। (হে সমীর)

এ মৃত আত্মা কবির প্রেমাস্পদার কিনা তা নিয়ে তিনি সন্ধিহান —

আমার প্রিয়ার কান্না নাহি হয় যেন
মোর লাগি' ঢের তো সয়েছে সে, —
আর কেন! (ওই)

কবির প্রিয়তমা তাঁর জন্যে অনেক যাতনা গঞ্জনা সহ্য করেছেন। তাই সমীর অর্থাৎ বাতাসকে তিনি অনুরোধ করে বলেছেন :

তার চেয়ে এক কাজ কর :
অন্যপথ ধর!
আকাশের তলে শ্রান্ত পৃথিবী ঘুমায়,
তারে তুমি জাগায়োনা আর;
আমি-ই জাগিয়া রবো কিন্তু কোনো মতে
ঘুম যেন ভাঙে না উহার!
হে সমীর, এই পথে এসো নাকো আর। (ওই)

'আমি-ই জাগিয়া রবো কিন্তু কোনোমতে ঘুম যেন ভাঙে না উহার' — প্রিয়ার প্রতি প্রিয়তমের কী গভীর প্রেম! প্রেমিকার প্রতি এখানেই লক্ষ করি কবির এক ধরনের আস্থা এবং সংবেদনশীলতা প্রকাশ পেয়েছে।

'কোকিল' কবিতায় কোকিল যেন বিরহের, বিচ্ছেদের প্রতিনিধি। কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত নিজের সঙ্গে কোকিলের সাযুজ্য লক্ষ করেছেন —

তোমারো কি দেহমন সত্যি কোনো শোকে
আমারি মতন খুবি দগ্ধ মুহ্যমান?...
যে-যাতনা চেয়ে দেখি ছলোছলো চোখে,
বোধকরি ভুল নয় এই অনুমান! (কোকিল)

এখানে কবি কিরণশঙ্কর যেন 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র রোহিণীর দ্বৈত রূপ আর কোকিলই তাদের মধ্যস্থতাকারী। রোহিণীর মনের অবস্থা বোঝাতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যেমন কোকিলকেই আশ্রয় করেছিলেন[৬] — কবি কিরণশঙ্করও তেমনি তাঁর বিরহ-বিচ্ছেদকে কোকিলের মধ্যে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন।

মাঝরাতে অন্ধকারে পেছন বাগানে
শুনি যেন, হে কোকিল, ক্লান্ত ক্ষীণস্বরে
কারে যেন ডেকে ফেরো তুমি সবখানে;
কারো কোনো সঙ্গ চেয়ে মন কেঁদে মরে! (কোকিল)

Dhaka University Institutional Repository

এ যেন রোহিণীরই চিত্র! বাল্যবিধবা রোহিণী কোকিলের অসময়ের ডাকে তার মনের মানুষ না পাওয়ার বেদনায় পুকুর ঘাটে বসে কেঁদেছিল — এখানেও সেই ক্রন্দন ধ্বনি শোনা যায় — সে কি শুধু কোকিলের? সে কান্না বিরহী কবিরও। তাই তো কবি তাঁর প্রেমাস্পদাকে বলেছেন —

নক্ষত্রের নীল আলো নিতল নয়নে
লুকায়ে রেখেছো তুমি, কুমারী অপ্সরী,
যে-যাতনা জ্বলে মোর ভারাক্রান্ত মনে,
স্তিমিত করেছো তারে নীল রূপ ধরি। (নীল চোখ)

প্রেমিকাকে অনুরোধ করে বলেন —

সুচিস্মিতা, অসহ উচ্ছ্বাসে আজ তুমি
ঢেকো নাকো দুই হাতে নীল দুটি চোখ;
আকাঙ্ক্ষার জ্বালা মুছে মধুওষ্ঠ চুমি'
বক্ষে আজ জ্বালি যেন সুনীল আলোক! (ওই)

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের কবিতায় প্রেমের রূপ ও গতি বিচিত্র। কবিতার নায়ক বা কবি কখনো বিরহ, পর মুহূর্তে মিলন আকাঙ্ক্ষায় কাতর; কখনো বর্তমানে — পুরোপুরি বাস্তবতায় কঠোর, আবার তিনি অতীতের ধূসর জগতে বিরাজমান।

জানালার একপাশে অন্ধকারে দাঁড়ায়ে একাকী
রূপের আগুন জ্বেলে' রূপসীরা বসে' আছে দেখি;
চক্‌চকে নীলচোখ — শাদা দাঁতে ঝক্‌মকে হাসি
মনায়েছে বেশ ঠোঁটে, — কোনোদিন হবে নাকো বাসি!
হাতগুলি শাদা-শাদা, আরো শাদা ধবধবে বুক,
ওই বুকে মুখ রেখে পুরুষের সেরেছে অসুখ! (হাজার বছর আগে)

সুমিতা চক্রবর্তী এই কবিতাটিকে জীবনানন্দের কবিতার উপর কাগজ রেখে লেখার কথা বলেছেন।[১০] তাঁর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করার কোনো অবসর নেই।

'আমি নহি স্বর্গের দেবতা' তাঁর একটি বিখ্যাত প্রেমের কবিতা। এ কবিতায় প্রেম চূড়ান্ত শরীরীরূপে প্রকাশিত। কবির প্রেমাস্পদা স্বর্গের দেবতুল্য পুরুষ বলে যতই তাঁকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে চায়, ততই তিনি বিরক্ত হয়ে উচ্চারণ করেন —

কতোবার! আর কতোবার?
কতোবার ক'বো এক কথা?
আমি নহি স্বর্গের অভ্রান্ত দেবতা,
তবু তুমি বৃথা বার-বার
আমার অন্তরে চাহ ঈশ্বরের অন্ধ উদারতা! (আমি নহি স্বর্গের দেবতা)

কবি মানুষ। মানুষের মতোই যে-প্রেম শরীর কেন্দ্রিক; অতীন্দ্রিয় নয়, একেবারেই ইন্দ্রিয় নির্ভর — তার যথাযথ প্রকাশ এ কবিতায় —

আমার প্রলুব্ধ দৃষ্টি যদি তব সুপ্রচ্ছন্ন স্তনপ্রান্ত চুমি'
মুহূর্তের মধুস্বাদে ভ'রে নেয় ইন্দ্রিয়ের দ্বার,
দেহে আনে বাসনার বিহ্বল জোয়ার,
কখনো কি ক্ষমা নাই তার? (ওই)

Dhaka University Institutional Repository

কবি বলেন —

ওই তব কুমারীর কমনীয় দেহ
একদিন লভিবে তো কেহ?
কিংবা ক্রুর কালচক্রে অকস্মাৎ কোনো একদিন
তব স্নিগ্ধ তনুজ্যোতি বিনিঃশেষে হবে তো বিলীন?
অনাগত দিবসের ওই সব কথা
মনে-মনে ভেবো একবার :
দেখিবে তোমারও দেহে মোর সব হৃদয়ের ব্যথা
ধ্বনিয়া উঠিছে বার-বার! (ওই)

প্রেমাস্পদা তখনো কবিকে সুকৌশলে ফিরিয়ে দিচ্ছে। আর কবির বুকের মধ্যে রক্তের মধ্যে প্রেয়সীর সুরভিত চুলের সুবাস, চারু চোখ, শুভ্র গ্রীবা, স্তনযুগ, আরক্ত অধর ক্রমশ ফুঁসে উঠছে। তিনি অব্যক্ত যন্ত্রণায় ছটফট করছেন এবং প্রেমাস্পদার দক্ষিণ দুয়ার বন্ধ দেখে অনুনয় করে বলছেন —

আমার অবোধ ওষ্ঠ যদি তব মধুওষ্ঠ চুমি'
মুহূর্তের মধুস্বাদে ভ'রে নেয় ইন্দ্রিয়ের দ্বার,
দেহে আনে কামনার কবোষ্ণ জোয়ার,
কখনো কি ক্ষমা নাই তার?
ওইখানে ভুল!
আমাকে ভেবেছো তুমি নিরুপম দেবতা অতুল!
মোর দুই উপবাসী আঁখি
তোমার উরুতে খোঁজে কামনার অদ্ভুত ইসারা,
তব যুগ্ম পূর্ণ পয়োধর — কী ধারণ করিয়াছে তারা?
সব কথা অকপটে বলিবার নয়,
আমারি রক্তের ঢেউ আমি করি ভয়! (ওই)

এ কবিতায় আদি রসের উগ্রতা দেখেছিলেন 'কবিতা' পত্রিকার মুদ্রণকার্যে যে প্রেস ব্যবহৃত হত সেই প্রেসের কর্মকর্তারা। বুদ্ধদেব বসু অবশ্য আদিরসের তেমন উগ্রতা এ কবিতায় পান নি। কিন্তু একথাও ঠিক যে এখানে উগ্রতা না থাকলেও আদিরসের স্পষ্টতা দৃষ্টি এড়ায় না। শরীর এবং শরীরের আর্তির নিরাবরণ উচ্চারণ প্রেমের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান বৈশিষ্ট্য — কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের এ পর্যায়ের কবিতায় তার প্রকাশ বেশ স্পষ্টভাবেই লক্ষ করা যায়।

'রূপকথা' কবিতটি যেন রূপকথাই। তবু এ কবিতায় এক ঝলক দেখা দেয় শরীরী আভাস :

পাশ ফিরে ঘুমোবার চেষ্টা করি।
ছোট বউএর ঘর থেকে
অকস্মাৎ কে যেন চীৎকার ক'রে হেসে উঠেছে।
বউএর স্বামী ছাড়া আর কে হবে?
বয়সের এত ব্যবধান!
আর স্বামীসঙ্গ-ক্লান্ত সেই বিষণ্ণ বালিকা!

Dhaka University Institutional Repository

স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি তার অস্ফুট কাতরোক্তি,
স্বামীর সৌখীন সামীপ্যকে সহ্য করবার
হয়তো আর কোনো শক্তি নেই তার।
কিন্তু কে শোনে তার অনুনয়? (রূপকথা)

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের 'রূপকথা' কবিতার প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর কোনো কোনো কাহিনীর কথা স্মরণে আসে। এ কবিতার মধ্যে এক ধরনের শীতল বিদ্রোহ আছে—বৈধব্যের কারণে যৌবন উপভোগ করতে না পারার বেদনা চাপতে চাপতে ক্লান্ত এ বাড়ির বৌটি ভাবে—

এইবার আমি বিদ্রোহ করবো!
কী হবে এই চেষ্টাকৃত সামাজিক সাধনায়?
তার চেয়ে হতুম যদি ও-বাড়ির মেজ বৌ,
হ'তে পারতুম যদি ঐ বিষণ্ণ বালিকা!
আমার বৈচিত্র্যহীন ধূসর জীবনে
ওরা কি চিরকাল দুঃস্বপ্ন হ'য়েই থাকবে? (ওই)

কাব্যগ্রন্থের নাম-কবিতা 'স্বপ্ন-কামনা' কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের একটি উৎকৃষ্ট কবিতা। এ কবিতার 'ললিতা' কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের এক মূর্তিমতী প্রেমাস্পদ। কোনো 'ইনটেলেকচ্যুয়াল বিউটি' নয়। জীবনানন্দের যেমন 'শঙ্খমালা', 'সুজাতা', 'সবিতা'; বুদ্ধদেব বসুর 'কঙ্কাবতী', অজিত দত্তের 'মালতী'; কিরণশঙ্করের 'ললিতা' তেমনি এক শরীরিণী 'প্রেমিকা'। 'মালতী' বা 'কঙ্কাবতী' নাম দিয়ে যেমন অজিত দত্ত বা বুদ্ধদেব বসু প্রেমকে ইন্দ্রিয় গোচর করে ও মূর্তিমতী করে দিয়েছেন—কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত সেই দেহী প্রেম নিয়েই তাঁর যা কিছু কল্পনা এবং ভাষা সৌন্দর্য দিয়ে, মদির ছন্দে 'ললিতা'কে অপরূপ করে সৃষ্টি করেছেন।

সুলোচনা হে ললিতা শোনো,
একথা কি ভেবেছো কখনো
ধূলিরুক্ষ বাতায়ন-তলে
আমাদের উদ্দাম প্রণয়
স্থগিত রাখিবো কোন্ ছলে? (স্বপ্ন-কামনা)

এবং

রক্তরাত্রি হবে যবে ভোর
বিচ্ছেদের ঝাপটের মুখে
আমাকে কি জড়ায়ে তখনো
কাছাকাছি আরো কাছে বুকে
রবে দুটি নগ্ন বাহুডোর? (ওই)

তার পরেই দেখি প্রেমাস্পদার জন্যে কবি লোকনিন্দাকেও তুচ্ছজ্ঞান করেছেন :

হে ললিতা, ফেরাও নয়ন!
যদি শুভ্র শ্রীদেহের স্বাদ
আর নৈশ আশ্লেষ-শয়ন
মুক্তিস্নান এনেছে জীবনে,
দূরে থাক্ লোক-পরিবাদ। (হে ললিতা, ফেরাও নয়ন)

Dhaka University Institutional Repository

'হে ললিতা, ফেরাও নয়ন' কবিতাটি সম্পর্কে জীবনানন্দ দাশ মন্তব্য করেছিলেন : 'অনেকদিন মাটির নিচে থেকে মদ পেকে গেছে'[১১]। তিনি বলেছিলেন, 'বিষয়বস্তু — অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক : নিতান্তই দৈহিক কামনা। কিন্তু মানুষের এই আদিম আবেগকেও আগুণের সঙ্গে তুলনা করতে পারা যায় কিংবা জলের সঙ্গে — অথবা আকাশের সঙ্গেও তেম্নি অনাদিরসপ্রতিষ্ঠ — কোনো ব্যক্তি বিশেষের কল্পনায় চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তার ভিতর তার অমোঘ নবীন জন্ম লাভ হয়'[১২]।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের সত্যিই নবীন জন্ম লাভ হল। তিনি এ পর্যায়ে এসে তাঁর কবিতা ভাবনায় নতুনত্ব নিয়ে এলেন। ভাষা এবং ছন্দে, আঙ্গিক এবং প্রকরণে, বিষয়বৈচিত্র্যে তিনি পুরোপুরি আধুনিক হলেন।

উতরোল নিবিড় রজনী।
খোলো রক্ত লাজ-আবরণ,
লজ্জা-অপমান-শঙ্কা ছাড়ো!
শোনো মোর ধমনীর ধ্বনি,
আগে রাখো মানুষের মন! (হে ললিতা, ফেরাও নয়ন)

তিনি ক্রমশ ব্যাপৃতি অর্জন করছেন। যদিও তখনো পূর্বসূরিদের প্রভাব কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয় নি।[১৩] তবুও তিনি যে পরিণতির দিকেই এগুচ্ছেন তার প্রমাণ —

হে ললিতা, কাছে এসো শোনো —
হিমসিক্ত তোমার চুম্বনে
শেষ হবে মোর পরমায়ু! (হে ললিতা, ফেরাও নয়ন)

হিমসিক্ত চুম্বনের ভয়াবহতাকে আমরা যেন স্পর্শ করতে পারি; তার স্বাদ অনুভব করি ঠোঁটে, শরীরে। আমাদের ভয়াবহ অন্ধকারকে নাড়া দিয়ে যায় এই হিমসিক্ত চুম্বন। তারপরেই দেখি —

অদূরেতে কৃষ্ণ মৃত্যু কাঁপে,
তবু যেন তৃণের মতন
ভেসে চলি অন্তিম বিপাকে,
আকাঙ্ক্ষায় স্তব্ধ অচেতন,
মৃত্যু আনে নৈশ পরিশ্লেষ! (ওই)

প্রেমাস্পদার জন্যে অন্ধকার মৃত্যুকেও আলিঙ্গনে কবির ভাবনা নেই। এবং শেষ পর্যন্ত —

এই লহো মোর দুই হাত
অতীতের সাধনায় বুঝি
আকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু-বরাভয়
লভিয়াছি দেহপ্রান্ত খুঁজি!
ক্লান্ত তনু সুন্দর অক্ষয়।
(ওই)

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত প্রেমিকার দেহপ্রান্তে তৃপ্তিতে উত্তীর্ণ হয়েছেন। জীবনানন্দ দাশ তাই মন্তব্য করেছেন :

> কিরণশঙ্করের নিঃসংশয় আবেগের পথে অন্যকোনো তৃতীয় ছায়া এসে যে দাঁড়ায়নি, এটা আমার কাছে অত্যন্ত আশ্চর্য্য মনে হয়। কারণ, 'অদূরেতে কৃষ্ণ মৃত্যু কাঁপে' সে

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তবিকই কেউ নয়; কবিতাটির এই আগ্নেয় ধাত : মানুষের মেধাবী কামনা সম্পর্কে, — আমাকে এমন একটি কলমের পরিচয় দেয় যা কয়েক মুহূর্তের জন্য সঙ্গতি লাভ করতে পেরেছিল।[১৪]

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের 'ললিতা' আরো একবার আমাদের সামনে উপস্থিত হয় 'দুইটি কবিতা' শীর্ষক সনেটের মাধ্যমে। কবি ঘন অন্ধকারময় পথ অতিক্রম করে রাত জেগে, পথশ্রমে ক্লান্ত, পিপাসাকাতর হয়ে যখন তাঁর প্রেমাস্পদার নিকটে পৌঁছেছেন — তখন দেখতে পান,

তুমিও পালঙ্কে জেগে নিদ্রাহীনা যৌবনে কাতর,
লোকোত্তর কারুশিল্প কুমারীর উদ্যত শরীরে;
চারিদিকে দেখ চেয়ে দৃষ্টি কার আছে দেহ ঘিরে,
আসি যদি আরো কাছে বুকে কাঁপে উদ্বেল সাগর! (দুইটি কবিতা)

কবি বলেন,

হে ললিতা, ঢেকে রাখো ক্ষরদীপ্তি ঐশ্বর্য্যের ভার,
অমাশেষে ভাঁটা এলো উৎসবের দুর্দ্দম জোয়ারে।
স্বেদাক্ত বাতাস আনে স্তূপীকৃত নিশ্বাস নিঃসাড়
প্রিয় মোর, সুকুমারী, গতিবেগ ফেরাও এবারে।
ভেসে কোথা চলিয়াছি জীবনের সেই সত্য জানো?
পরস্পর মুখোমুখি কতোদিন জ্যোৎস্নামত্তা রাতে
কামনার স্বাদ পেয়ে জাগিয়াছি হাত রেখে হাতে।
তৃপ্তিহীন সেই রাত জীবনের সার বলে' মানো? (ওই)

মানুষের সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে বসবাস — ভালবাসা বিনিময় করেও, পাশে বসেই এক দূরতম দূরত্ব তৈরি হয়; প্রিয়তমাকে দেখার আকাঙ্ক্ষা তখনো মনে থাকে কিন্তু তবু এই পৃথিবীর চরম সত্য মেনে নিয়ে নতুন পথের পরিক্রমায় কণ্টকিত পথে যাত্রা করতে হয়। সে পথে শুধু একা যেতে হয় — কিরণশঙ্করের মুখেও ধ্বনিত হয় সেই প্রতিধ্বনি —

সঙ্গীহীন পথ-চলা বিতৃষ্ণার উদ্যত আহ্বানে
অদৃষ্টেরে সঁপিয়াছি স্বপ্ন-সাধ উগ্র আকাঙ্ক্ষার।
কণ্টকিত যাত্রাপথ। এ পথের নাহিকো ঠিকানা;
যেতে হবে একা যাবো চিত্তে শুধু এইটুকু জানা। (ওই)

'ললিতা' কবি কিরণশঙ্করের মানসী, বুকের রক্তে লেখা একটি নাম। কারণ তাঁর 'ললিতা' যেমন প্রেমের আনন্দদায়িকা, তেমনি তার পাশে পাশে সবসময় 'কৃষ্ণমৃত্যু'র ছায়া কবিকে বেদনায় মথিত করে। একটুখানি পাওয়ার আনন্দের চেয়ে বিচ্ছেদের বেদনা যেন বেশি করে বাজে কবির ললিতার ভালবাসা ঘিরে। এবং শেষ পর্যন্ত দেখতে পাই তৃপ্তিহীন কবি তাঁর প্রেয়সী-মানসী-প্রিয় সুকুমারী ললিতাকে ছেড়ে নিরুদ্দেশে যাত্রা করেছেন।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের কবিমন দুরন্ত প্রেমিক। তাঁর প্রেমই যেন তাঁর কবিতা। তাঁর কাব্যে শুধু প্রেমেরই জয়গান। প্রেম ছাড়া তিনি থাকতে পারেন না — ভাবেতে চান না — 'ললিতা'কে ঘিরে তাঁর যত হতশ্বাস — তা যেন কাটিয়ে উঠে তিনি অন্য কোনো

Dhaka University Institutional Repository

প্রেমিকার খোঁজ পেয়ে যান। তাকে ঘিরে ভুলে যেতে যান অতীতের ব্যথা, রঙিন নবীন স্বপ্নে ডুব দিতে চান।

দিনমান কর্ম্মব্যস্ত রুদ্ধশ্বাস নগরীর ভিড়ে
মনে হয় বৃথা গেলো এজনমে জীবন-যৌবন, —
তারপর রাত এলে, অবসাদ কেটে গেলে ধীরে,
ঠাণ্ডা হাওয়ায় শুনি মহুয়ার নব-নিমন্ত্রণ!
[...] [...] [...]
অতএব এই রাতে ঘাসমাখা ভূমি বিছানায়
তোমার নরম কোলে মাথা রেখে ঊর্দ্ধমুখে শুয়ে
বিবশ শরীর মোর যেন তৃপ্ত আলস্যে ঘুমায়,
তুমিও ঘুমিয়ে পড়ো আমার কপালে গাল থুয়ে! (নীল রাত)

আবার কখনো,

নিদ্রাচোরা চাঁদ কাঁপে আধোরাতে দূর নভোনীলে,
চুম্বনের চারু-রেখা অধরোষ্ঠে স্নেহে আঁকি দিলে,
দক্ষিণের সিড়ি ভেঙে ঘরে ঢুকে হিমেল বাতাস।
শিয়রের ধারে বসে' জাগি একা নিশীথ প্রহর,
মোর কাঁধে মাথা রেখে বাহুডোরে তব কটিদেশ,
বাতায়ন-পথে চোখ ছায়াপথ নীলে নিরুদ্দেশ,
ভবিষ্যের কথা ভাবি থরো থরো কাঁপিছে অন্তর!
(আছি)

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের মধ্যে মধ্যযুগের প্রেমচেতনাজাত বিচ্ছেদের একটা ক্ষীণ ছায়া লক্ষ করা যায় — 'দুঁহুঁ কোরে দুঁহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া'[১৫] জাতীয় একটা ভীতি তাঁর মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। তাইতো প্রিয়া মিলনের কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখতে পাই তিনি একটা বিরহের আভাস ফুটিয়ে তোলেন।

কিন্তু যবে চলে' আসি সন্তর্পণে তোমার দুয়ারে
বুক কাঁপে থরোথরো, কী-যে হয় নাহি পাই ভাষা, —
স্নায়ুকোষে বহ্নি জ্বলে, অন্ধ আত্মা সঙ্কোচের ভারে
অবনত হ'য়ে শোনে অন্তরের বিপুল প্রত্যাশা!
চোখে চোখ পড়ে যদি স্তব্ধ ত্রাসে আঁখি করি নত,
তোমারি রূপের কাছে অচেতন, ক্রীত-পদানত॥ (দুই রূপ)

এ যেন বৈষ্ণব পদাবলীর সুস্পষ্ট ছায়া। দয়িতার কাছে দয়িতের বিনম্র আত্মনিবেদন।

'অধ্যায়' কবিতাটি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের আরেকটি সুবিখ্যাত কবিতা। কবিতাটির বৈদগ্ধ্য জীবনানন্দ দাশকে ভালো লাগিয়েছিল। বিস্মৃতির বর্ষার কোনো এক ছুটির দিনে বিকেলের দিকে আকাশে যখন মেঘ করেছিল, সে সময় কবির প্রেমাস্পদার সঙ্গে ঘটেছিল সাময়িক বিচ্ছেদ। আর তাই —

তোমার চোখেতে বিরাগের বন্যা
এসেছিলো নেমে,
জানালা দিয়ে বাইরের আকাশে

Dhaka University Institutional Repository

হয়ত বা দেখেছিলে মেঘের মাধুর্য্য;
আর আমি আকস্মিক অধ্যবসায়ে
হাতের হতচ্ছাড়া টাইমটেবিলটাকে
উল্‌টিয়ে দেখছিলাম, বিনা উদ্দেশ্যে।   (অধ্যায়)

অন্যায়ের মতো অর্থহীন নিঃস্তব্ধতার মুহূর্তগুলোতেও কবির মনে হয়েছিল তাঁর প্রেমাস্পদা তবু তো কাছেই আছে — স্পর্শ করার দূরত্বে। সেজন্যেই বোধহয় তাঁর মনে এই নিঃশব্দতা ভালো লেগেছিল সেই উত্তেজনাহীন বর্ষণ সন্ধ্যায়। কিন্তু হঠাৎ যেন সব এলোমেলো হয়ে গেল —

অকস্মাৎ বিদ্যুৎ ঝলকে
চিড়-খাওয়া আকাশ উঠলো আর্ত্তনাদ ক'রে;
সঙ্গে সঙ্গে সে আলোর দ্যুতিশিহরণে
তোমার অধ্যবসায় গেল তলিয়ে।
বিদ্যুৎকে এতো ভয় কর
সেটা কে জানতো বল?
মুহূর্ত্তের জন্যে নেমে এলো আমার চোখের ওপর
তোমার চুলের বন্যা;
সে স্পর্শের উষ্ণ উদারতায়
ছিঁড়ে গেলো আমার স্বপ্নের সঙ্গীত,
হাতের হতচ্ছাড়া টাইমটেবিলটা...   (ওই)

আধুনিক মানবের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভূখণ্ডে দাঁড়িয়ে কবির এই যে অনুভব, এই অনির্বচনীয় কবিস্বপ্নের জগতেই আমাদের প্রেমচেতনা নবীন অর্থদ্যোতনায় পরিস্ফুট হয়।

'I should have been cruel enough to bring you through the Flame'. — D.H. Lawrence-এর একটি পুরো চরণই কবিতার শিরোনাম হিসেবে ব্যবহার করেছেন কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। নামকরণের মধ্যেই তাঁর এক ধরনের নতুনত্ব — যা আধুনিক চিন্তারই প্রতিফলন — আমাদের অভিভূত করে। কবিতার ভেতরেও যখন দেখি 'শ্রীদেহের স্বাদ' পেতে যে কবির আগ্রহ ছিল প্রবল, সেই কবি তাঁর প্রেমাস্পদাকে সাবধান করে বলছেন,

তোমার চোখের কোনে কামনার যে দীপকণা জ্বলে,
তোমার বিন্যস্ত বুক বিকাশের যে বিদ্যুৎ হানে,
তাকে তুমি সংহত কর, করুণাময়ী।

(I should have been ... Flame)

তখন আমরা আরো আশ্চর্যান্বিত হই। কিছুকাল পূর্বেও দেহের সৌন্দর্যের আধারেই কবি প্রেমের প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী ছিলেন এবং সেটাই ছিল আধুনিক কবিতার অভিজ্ঞান, তবু এখানে সেই পুরোনো তীব্র শরীরী প্রকাশকে তিনি এড়িয়ে যেতে চাইছেন এবং নশ্বর প্রেমের মধ্যে অবিনশ্বরতা দান করে লিখলেন —

তোমার বিদ্যুৎ আর দীপকণা নিয়ে
হ'য়ো কোনো জ্বলন্ত জোনাকী,

Dakha University Institutional Repository

ছড়িয়ে দিয়ো ডানা-ছড়ানো গুঁড়ো গুঁড়ো আলো
আমার অন্ধকারে আচ্ছন্ন আকাশে। (ওই)

প্রেমের অপরিসীম শক্তি ও মহিমায় উদ্ভাসিত কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত জোনাকির ডানা-ছড়ানো গুঁড়ো গুঁড়ো অপার্থিব আলোয় নিজের মনের আকাশকে যেমন রাঙিয়ে তুললেন, তেমনি রোমান্টিক প্রেমের নবীন আদর্শে তাঁর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও ভাষা-সৃষ্টিকারী ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

তিন.

জন্ম-মৃত্যু ও প্রেম ভাবনাকে সাঙ্গীকৃত করে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের 'স্বপ্ন-কামনা' কাব্যগ্রন্থের কিছুসংখ্যক কবিতায় নিসর্গ-প্রকৃতিচেতনা লক্ষ করা যায়। এই নিসর্গ-প্রকৃতিচেতনা এককভাবে বা ধারাবাহিকভাবে তাঁর কবিতায় চিহ্নিত করা যায় না — এগুলো কবিতার বিষয়-অনুষঙ্গে মাঝে মধ্যে এসে পড়েছে; কবিতার মূল ভাবনা জন্ম ও মৃত্যুবোধের মধ্যে প্রেমচেতনা কিংবা প্রেমের মধ্যে জন্ম ও মৃত্যুচেতনার সঙ্গে নিসর্গ-প্রকৃতিযুক্ত হয়ে কবিতাকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা বৈচিত্র্য দান করেছে। যেমন —

আকাশে দেখেছি শুধু হেমকান্তি নক্ষত্রের ভীড়। (রহস্য)

কিংবা

উতলা হ'য়েছে প্রহর।
মেঘলুপ্ত পূর্ণশশী, স্তব্ধবনান্তর!
বসন্তের বন হ'তে গন্ধ লয়ে দুরন্ত পবন
কারে যেন করে অন্বেষণ :
আমারো আত্মার তটে আছাড়িছে কবোষ্ণ ক্রন্দন। (ওই)

এখানে কবিতার মূল ভাবনা মৃত্যুচেতনাকে কবি নৈসর্গিক আবহে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছেন। ঠিক তেমনিভাবে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত প্রেমভাবনাকেও অনির্বচনীয়তা দান করার জন্যে নিসর্গকে ব্যবহার করেন —

একরাশ অন্ধকারে আকাশের ঘরে
মেঘেরা জটলা করে,
জ্বলজ্বলে তারাদের ঝাঁক হাওয়ায় ঢেউয়ের মতো নড়ে!
আমার বুকের উপর কুয়াশা গলিয়া পড়ে।
পউষের ঝরঝরে শীতের কুয়াশা, (অনন্ত-জিজ্ঞাসা)

কখনো কখনো নিসর্গের ব্যবহারেই কবিতা উত্তীর্ণ হয়ে যায় শিল্পভাবনায় —

শীতের শিশির বুঝি উহাদের লালসার রস,
জ্বলজ্বলে তারাগুলি একঝাঁক বিষণ্ন সারস! (ওই)

আবার কখনো কখনো কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের কবিতায় লক্ষ করা যায় নিসর্গের মানবায়ন :

দক্ষিণের দুরন্ত বাতাস
ঘরে ঢুকে করে হাঁসফাঁস :

Dhaka University Institutional Repository

বায়ুরও লেগেছে বিস্ময় এই ঘরে ঢুকে?
শুচিহীন অস্বস্তিতে ধুঁকে! (হে সমীর)

বায়ুকে কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত মানব চরিত্রের বৈশিষ্ট্য দান করে কবিতাটিতে স্বতন্ত্রতা সৃষ্টি করেছেন। 'নীল চোখ' কবিতায় কবির নিসর্গ যেন নীলময়। নীল আলো, নীল আকাশ, নীল রাত্রি, নীল দিন, নীল উপবন, নীল দ্বীপ, নীল দুটি চোখ, সুনীল আলোক — এই নৈসর্গিক উপকরণ দিয়ে সাজিয়ে কবি কবিতার মূলভাবনা প্রেম ও মৃত্যুচেতনাকে অনির্বচনীয় করে তুলেছেন। একইভাবে 'স্বপ্ন-কামনা'য় দেখতে পাই নিসর্গের ছোঁয়ায় কবিতার প্রেমভাবনা অনন্য হয়ে উঠেছে :

নক্ষত্রেরা রাতের আকাশে
আজো উঠে, আজো তারা হাসে,
নভোনীলে চাঁদ একফালি
নীল-লাল ফুলের দেয়ালি,
এইসব কে-না ভালোবাসে! (স্বপ্ন-কামনা)

'নীল রাত' কবিতার বিষয়ও প্রেম। নিসর্গ ও প্রকৃতি এই প্রেমচেতনাকে আশ্রয় করে আমাদের জীবনানন্দীয় ভাবনায় আচ্ছন্ন করে :

এইখানে বসো এসে মোর পাশে ঘাসের উপরে,
চেয়ে দ্যাখ তৃণদল শিশিরে ঈষৎ যেন নড়ে!
আকাশে উঠেছে চাঁদ — মেঘেদের ফাঁকে-ফাঁকে হাসে,
চুলগুলি খুলে দাও, গুচ্ছগুলি উরুক্ বাতাসে। (নীল রাত)

কিংবা

নীল-লাল ফুলগুলি সবুজ পাতার ছাওয়ায়
শিশিরের জলে ভিজে ঠাণ্ডা শাদা হিম হ'য়ে আছে, —
অঝোরে শিশির ঝরে' ঘনীভূত গাছের পাতায়,
ঘাসের বিছানা ছেড়ে এই রাতে কেউ নাকি বাঁচে! (ওই)

কখনো কখনো নিসর্গই যেন তাঁর কবিতায় ভয়ংকর মৃত্যুকে ডেকে আনে —

উপরেতে আকাশ ছড়ানো,
নীচে কাঁপে মদালসা বায়ু
হে ললিতা, কাছে এসো শোনো —
হিমসিক্ত তোমার চুম্বনে
শেষ হবে মোর পরমায়ু! (হে ললিতা, ফেরাও নয়ন)

কখনো কখনো আবার নিসর্গই হয়ে ওঠে প্রিয়ার গভীর সান্নিধ্য পাবার মাধ্যমে :

অকস্মাৎ বিদ্যুৎ ঝলকে
চিড়-খাওয়া আকাশ উঠলো আর্ত্তনাদ ক'রে;
সঙ্গে সঙ্গে সে আলোর দ্যুতিশিহরণে
তোমার অধ্যবসায় গেল তলিয়ে।
বিদ্যুৎকে এতো ভয় কর
সেটা কে জানতো বল?
মুহূর্ত্তের জন্যে নেমে এলো আমার চোখের ওপর

Dhaka University Institutional Repository

তোমার চুলের বন্যা;
সে স্পর্শের উষ্ণ উদারতায়
ছিঁড়ে গেলো আমার স্বপ্নের সঙ্গীত,
হাতের হতচ্ছাড়া টাইমটেবিলটা... (অধ্যায়)

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের 'স্বপ্ন-কামনা'র কবিতায় মৃত্যু প্রসঙ্গেই নিসর্গের বেশি ব্যবহার হয়েছে। 'জাতিস্মর' কবিতায় নিসর্গই যেন মূল সুর — মৃত্যুভাবনা তার সঙ্গী :

অনেক স্থবির রাত্রি, ক্লান্ত সন্ধ্যা, তিক্ত দীর্ঘদিন
আর বহু উষাকাল, মধ্যাহ্নের বন্ধ্য দাবদাহ
স্পন্দিত জীবনে এসে স্নায়ু সবি ক'রে গেছে ক্ষীণ,
হৃদয়ে এনেছে যতো জ্বরা আর মৃত্যুর আগ্রহ!

আকাশের অন্ধকারে অগণিত নক্ষত্রের ভিড়
সমগ্র রজনী ভোর জ্বলে'-জ্বলে' স্তিমিত মন্থর,
ছন্নছাড়া জীবনের ছন্দ-সুখ সেও তো স্থবির,
যাতনায় ঝিঁ-ঝিঁ করে স্নায়ুগুলি দেহের ভিতর।

দিন আর রাত্রি ভরে' ছায়াময় কালো ভয়গুলি
শিহরায় আশে-পাশে যেন তারা লুব্ধ অজগর, —
মৃত চাঁদ ভয়ে কাঁপে — তারাগুলি নতশির তুলি'
তাকায় পৃথিবী-পানে, পিপাসায় ম্লান কলেবর। (জাতিস্মর)

'তারাগুলি নতশির তুলি' তাকায় পৃথিবী-পানে, পিপাসায় ম্লান কলেবর' পঙক্তিটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমরা বুঝে নেই নৈরাশ্য-অতিক্রমী একটা আশার সুর শুনিয়ে কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থে ইতিবাচক জীবন-জিজ্ঞাসাকেই অঙ্গীকার করেছেন।

কবিতা যেহেতু একটি জটিল শিল্পমাধ্যম, সেহেতু তার নির্মিতিও অনায়াসাধ্য নয়। কবির অন্তর্জাগতিক অনুভূতি কিংবা সংবেদনার গভীরতা পাঠকের চিত্তে জাগিয়ে তুলবার জন্যেই উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার, উপমা নির্বাচন অথবা চিত্রকল্প সৃষ্টি কবিতার ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি। প্রকাশভঙ্গি অথবা নির্মাণ কৌশলের প্রশ্নে 'স্বপ্ন-কামনা'য় কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তকে তিরিশের কবিকুল থেকে পৃথক করে দেখা যায় না। যেহেতু পশ্চাদ্গামিতায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না, সেহেতু রবীন্দ্রসৃষ্টির বিস্তৃত বলয়ে প্রত্যাবর্তন তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই সমাজ ও সময়বিবিক্ত অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি তিরিশের কাব্য নির্মাণ কৌশলকেই অনুসরণ করেছেন। কবিতার ভাব ও ভাষা প্রয়োগ, শব্দ-নির্বাচন এবং কখনো কখনো চরণবিন্যাসেও কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত তিরিশের কাব্য-ঐতিহ্য অনুসারী। যেমন —

১. মৃতরাত্রি হয়েছে গভীর।
আমি একা জেগে-জেগে বাতায়নে বসি'
আকাশে দেখেছি শুধু হেমকান্তি নক্ষত্রের ভীড়। (রহস্য)

২. ছাদের উপরে রাত্রি জেগেছো কি তুমি কোনোদিন?
ঠাণ্ডা শীতের রাত্রি — কনকনে, হিম
অর্দ্ধরাতে একা-একা জেগেছো কি কোনো একদিন? (অনন্ত জিজ্ঞাসা)

Dhaka University Institutional Repository

৩. জানালার একপাশে অন্ধকারে দাঁড়ায়ে একাকী
রূপের আগুণ জ্বেলে' রূপসীরা বসে' আছে দেখি;
চক্‌চকে নীলচোখ — শাদা দাঁতে ঝক্‌মকে হাসি
মানায়েছে বেশ ঠোঁটে, — কোনোদিন হবে নাকো বাসি!
হাতগুলি শাদা-শাদা, আরো শাদা ধবধবে বুক,
ওই বুকে মুখ রেখে পুরুষের সেরেছে অসুখ! (হাজার বছর আগে)

এ সমস্ত কবিতার ভাব ও ভাষা প্রয়োগ, শব্দ-নির্বাচন এবং চরণবিন্যাসে তিরিশের অন্যতম প্রধান কবি জীবনানন্দ দাশের প্রবল প্রভাব লক্ষণীয়। উদাহরণ আরো দেওয়া যেতে পারে, কেননা আমরা আগেও দেখে নিয়েছি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের 'স্বপ্ন-কামনা' কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতায়ই কোনো না কোনোভাবে জীবনানন্দের প্রভাব বর্তমান। এমনকি কবিতার নামকরণেও ('মৃত্যু', 'হাজার বছর আগে' ইত্যাদি) জীবনানন্দের সরব উপস্থিতি। এছাড়া বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত-এর অল্প বিস্তর প্রভাবও 'স্বপ্ন-কামনা'র কোনো কোনো কবিতায় কবি স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে এর মাঝেও কিছু কবিতায় কবির নিজস্বতা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যেমন —

হে ললিতা, ফেরাও নয়ন!
যদি শুভ্র শ্রীদেহের স্বাদ
আর নৈশ আশ্লেষ-শয়ন
মুক্তিস্নান এনেছে জীবনে,
দূরে থাক্ লোক পরিবাদ।
[...]
হৃদয়ের ব্যাকুল শ্বাপদ
খুঁজে ফেরে আরক্ত শিকার,
কান পেতে স্থির হ'য়ে শোনে
পক্ষধ্বনি শত বলাকার।
ঘুম নাই নিদ্রালু নয়নে। (হে ললিতা, ফেরাও নয়ন)

'ঘুম নাই নিদ্রালু নয়নে' অথবা 'নিদ্রাচোরা চাঁদ কাঁপে আধোরাতে দূর নভোনীলে' (আছি) ইত্যাদি বাক্যে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের চমৎকারিত্ব লক্ষণীয়। বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে এ একেবারেই নতুন আমদানি। আর এখানেই কবি কিরণশঙ্কর পূর্বসূরিদের প্রভাব বলয় থেকে স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছেন। স্বকীয়তা তিনি তাঁর গদ্যকবিতার ক্ষেত্রেও অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। উদাহরণ —

১. তোমাকে বলেছিলাম মৃত্যু কিছু নয়।
যদি আমরা মৃত্যুকে সহ্য করতে পারি,
মৃত্যুও সহ্য করবে আমাদের : (মৃত্যু)

২. পাশ ফিরে ঘুমোবার চেষ্টা করি।
ছোট বউ-এর ঘর থেকে
অকস্মাৎ কে যেন চীৎকার ক'রে হেসে উঠেছে। (রূপকথা)

৩. চোখ না ফিরিয়ে দেখেছিলাম,
তোমার চুলগুলো যেন সন্ধ্যার আকাশ,

Dhaka University Institutional Repository

গুচ্ছগুলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে বাতাসে;
সহজে অথচ সহজে নয়। (অধ্যায়)

মুখের ভাষার মতোই সহজ, অলংকারবিহীন অথচ কাব্যিক ব্যঞ্জনায় তাঁর গদ্যভাষা সম্পর্কে জীবনানন্দ দাশ আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন 'তাঁর [কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত] গদ্যকবিতার ... স্বকীয়তাটুকুও নজর এড়ায় না।'

আধুনিক কবিতার মেজাজের সমীপবর্তী হয়েই কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত 'স্বপ্ন-কামনা'র কবিতাসমূহে অলংকারের বিচিত্র সমাবেশ ঘটিয়েছেন। অলংকার শাস্ত্রের সব অলংকার তাঁর কবিতায় নেই; শব্দালংকার ও অর্থালংকারের অল্প-বিস্তর প্রয়োগেই তাঁর কবিতাকে তিনি শিল্পসমৃদ্ধ করে তুলেছেন। আমরা তাঁর কবিতা থেকে অলংকারের কতিপয় উদাহরণ উদ্ধার করছি :

শব্দালংকার

সরল অনুপ্রাস :

১. তোমার চোখের কোণে কামনার যে দীপকণা জ্বলে,
তোমার বিন্যস্ত বুক বিকাশের যে বিদ্যুৎ হানে,
তাকে তুমি সংযত কর, করুণাময়ী। (I should have been ... Flame)

২. কিংবা ক্রূর কালচক্রে অকস্মাৎ কোনো একদিন
তব স্নিগ্ধ তনুজ্যোতি বিনিঃশেষে হবে তো বিলীন?
(আমি নহি স্বর্গের দেবতা)

অন্ত্যানুপ্রাস :

নক্ষত্রের রাতের আকাশে
আজো উঠে, আজো তারা হাসে,
নভোনীলে চাঁদ একফালি,
নীল-লাল ফুলের দেয়ালি,
এইসব কে-না ভালোবাসে! (স্বপ্ন-কামনা)

গুচ্ছানুপ্রাস : গুচ্ছগুলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে বাতাসে; (অধ্যায়)

ছেকানুপ্রাস : লোকে জানে আমি কোনো সত্যনিষ্ঠ বলিষ্ঠ পুরুষ, (দুই রূপ)

শ্রুত্যানুপ্রাস :

ক খ : ১. হাতগুলি শাদা-শাদা, আরো শাদা ধবধবে বুক,
ওই বুকে মুখ রেখে পুরুষের সেরেছে অসুখ! (হাজার বছর আগে)

র ড় : ২. এইখানে বসো এসে মোর পাশে ঘাসের উপরে,
চেয়ে দ্যাখ তৃণদল শিশিরে ঈষৎ যেন নড়ে! (নীল রাত)

অর্থালংকার

উপমা :

১. ওই সব জ্বলজ্বলে তারাদের ঝাঁক
হাওয়ায় ঢেউয়ের মতো নড়ে; (অনন্ত জিজ্ঞাসা)

২. দু'জনেরই সেই মুহূর্তগুলোর মাঝে
নেমেছিলো নিঃশব্দতার নগ্নতা,
অন্যায়ের মতো অর্থহীন। (অধ্যায়)

Dhaka University Institutional Repository

উৎপেক্ষা : ১. শীতের শিশির বুঝি উহাদের লালসার রস,
জ্বলজ্বলে তারাগুলি একঝাঁক বিষণ্ন সারস! (অনন্ত জিজ্ঞাসা)

২. শব্দহীন স্তব্ধ অর্দ্ধরাতে
কেন যেন মনে হয় অন্ধকারে বিষণ্ন ব্যথায়
আত্মা কার কাঁদে। (হে সমীর)

সমাসোক্তি : ১. চুম্বনের চারু-রেখা অধরোষ্ঠে স্নেহে আঁকি দিলে,
দক্ষিণের সিঁড়ি ভেঙে ঘরে ঢুকে হিমেল বাতাস। (আছি)

২. দক্ষিণের দুরন্ত বাতাস
ঘরে ঢুকে করে হাঁসফাঁস :
বায়ুরও লেগেছে বিস্ময় এই ঘরে ঢুকে?
শুচিহীন অস্বস্তিতে ধুঁকে। (হে সমীর)

চিত্রকল্প : মুহূর্ত্তের জন্যে নেমে এলো আমার চোখের ওপর
তোমার চুলের বন্যা;
সে স্পর্শের উষ্ণ উদারতায়
ছিঁড়ে গেল আমার স্বপ্নের সঙ্গীত,
হাতের হতচ্ছাড়া টাইমটেবিলটা ... (অধ্যায়)

'স্বপ্ন-কামনা'র কোনো কোনো কবিতায় দেখা যায় উপমাই প্রায় সময় চিত্রকল্প হয়ে যায়। যেমন —

স্বপ্নে রাতে দেখিলাম প্রাচীন সে নগরীর মাঝে
পথে-পথে ঘরে-ঘরে দলে-দলে বহু লোকজন, —
দোকানে-বাজারে তারা ব্যতিব্যস্ত নিজেদের কাজে,
অন্দরেও রমণীরা কাজ করে মাছির মতন। (হাজার বছর আগে)

ছন্দ

'স্বপ্ন-কামনা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলোর ছন্দ সম্পর্কে গ্রন্থের ভূমিকাংশে জীবনানন্দ দাশ বলেছেন, 'ছন্দপতন তিনি [কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত] এড়াতে পারেন নি, মাঝে মাঝে ভাষা কেমন যেন আড়ষ্ট — '। বস্তুত প্রথম যৌবনের রচনা বলেই হয়তো কবি ছন্দের প্রতি তেমন গুরুত্ব দেন নি; ফলে তাঁর উত্তীর্ণ কবিতাগুলোতেও ছন্দ শৈথিল্য লক্ষণীয়। তবে এর মধ্যেও কিছু কবিতায় তাঁর ছন্দের কৌশলী প্রয়োগ আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। এ কাব্যগ্রন্থে স্বরবৃত্ত ছন্দের কোনো কবিতা নেই। মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্তের দিকেই, বিশেষ করে অক্ষরবৃত্তের দিকেই কবির ঝোঁক বেশি। কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল :

মাত্রাবৃত্ত : সুলোচনা হে ললিতা শোনো,
এ কথা কি ভেবেছো কখনো
ধূলিরুক্ষ বাতায়ন-তলে
আমাদের উদ্দাম প্রণয়
স্থগিত রাখিবো কোন্ ছলে! (স্বপ্ন-কামনা)

Dhaka University Institutional Repository

অক্ষরবৃত্ত : একটা কথা শোনো, হে সোনার কোকিল,
তোমাকে আমার কিন্তু খুবি ভালো লাগে;
ডানায় মেখেছো যতো আকাশের নীল
স্মৃতিপথে প্রেয়সীর চোখ মনে জাগে! (কোকিল)

এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে এ কাব্যগ্রন্থে তিনটি সনেট আছে এবং প্রতিটি সনেটই কবি কিরণশঙ্করের রচনাগুণে শিল্পসফল। সনেটগুলো তিনি রচনা করেছেন শেক্সপিয়রিয় রীতির আদলে এ দেশীয় মিশ্রণ ঘটিয়ে। উদাহরণ —

হে ললিতা, ঢেকে রাখো ক্ষরদীপ্তি ঐশ্বর্য্যের ভার,
অমাশেষে ভাঁটা এলো উৎসবের দুর্দ্দম জোয়ারে।
স্বেদাক্ত বাতাস আনে স্তূপীকৃত নিশ্বাস নিঃসাড়
প্রিয় মোর, সুকুমারী, গতিবেগ ফেরাও এবারে।
ভেসে কোথা চলিয়াছি জীবনের সেই সত্য জানো?
পরস্পর মুখোমুখি কতোদিন জ্যোৎস্নামত্তা রাতে
কামনার স্বাদ পেয়ে জাগিয়াছি হাত রেখে হাতে।
তৃপ্তিহীন সেইরাত জীবনের সার বলে' মানো?

আজিও তেমনি যেন ভাবাবেগে চাহি মুখপানে,
চোখে আর নাহি কোনো উত্তেজিত দৃষ্টি প্রত্যাশার।
সঙ্গীহীন পথ-চলা বিতৃষ্ণার উদ্যত আহ্বানে
অদৃষ্টেরে সঁপিয়াছি স্বপ্ন-সাধ উগ্র আকাঙক্ষার।
কণ্টকিত যাত্রাপথ। এ পথের নাহিকো ঠিকানা;
যেতে হবে একা যাবো চিত্তে শুধু এইটুকু জানা। (দুইটি কবিতা : ২)

এ কাব্যগ্রন্থের প্রত্যেকটি সনেটই কখ কখ ঃ গঘ ঘগ ঃ ঃ ঙচ ঙচ ঃঃ ছছ মিলবিন্যাসে ১৮ মাত্রার (৮+১০) পঙক্তি সমবায়ে গঠিত। এসব কবির গভীর ভাব ও নিগূঢ় ভাবনা সুরময় বাণীরূপ লাভ করেছে।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'স্বপ্ন-কামনা'য় প্রবলভাবে পূর্বসূরিদের প্রভাব লক্ষ করা গেলেও কোথাও কোথাও তাঁর স্বাতন্ত্র্য নজর এড়ায় না। কবিতায় বিষয়বৈচিত্র্য এবং আঙ্গিক রচনায় জীবনানন্দ দাশও একটা নতুনত্বের আস্বাদ পেয়েছিলেন। তিনি লক্ষ করেছিলেন 'প্রেমাস্পদা ও প্রণয়ীয় কেন্দ্র ত্যাগ করে হয় তো অন্য কোনো চেতনা সম্বন্ধে ক্রমে ক্রমে জাগরুক হয়ে উঠেছে'[১৬] কিরণশঙ্করের কবিতা। তাঁর কবিতাগুলো আলোচনা শেষে মনে হয় একজন নবীন কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ হিসেবে 'স্বপ্ন-কামনা' যথেষ্ট পরিণত এবং কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশ সার্থক।

Dhaka University Institutional Repository

২. নতুন আঁচড়

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'নতুন আঁচড়' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৫০ বঙ্গাব্দে (ইংরেজি ১৯৪৩) ঢাকার *প্রতিরোধ পাবলিশার্স* থেকে। ১৩৪৬ থেকে ১৩৫০ বঙ্গাব্দের মধ্যে লেখা মোট ১৩টি কবিতা সংকলিত হয়েছে এ গ্রন্থে। এর মধ্যে ১৩৪৬-এ ১টি, ১৩৪৭-এ ২টি, ১৩৪৮-এ ১টি, ১৩৪৯-এ ৪টি এবং ১৩৫০-এ ৫টি কবিতা রচিত হয়েছে বলে গ্রন্থভুক্ত প্রতিটি কবিতার শেষে উল্লেখ আছে। এক নজরে বোঝার জন্যে নিচে ছকের মধ্যে রচনাকাল, কবিতার শিরোনাম ও সংখ্যা বিস্তারিতভাবে তুলে দেওয়া হল :

রচনাকাল	কবিতার নাম	সংখ্যা
আশ্বিন, ১৩৪৬	'আজকের এই মুহূর্ত্ত'	১টি
আশ্বিন, ১৩৪৭ আশ্বিন, ১৩৪৭	'একটি কথা' 'চীন'	২টি
পৌষ, ১৩৪৮	'ডায়েরী'	১টি
আশ্বিন, ১৩৪৯ শ্রাবণ, ১৩৪৯ ফাল্গুন, ১৩৪৯ চৈত্র, ১৩৪৯	'ইতস্ততঃ' 'জাপান' 'সোমেন চন্দের স্মৃতিতে' 'সাম্রাজ্যভস্মের পূর্ব্বে'	৪টি
বৈশাখ, ১৩৫০ বৈশাখ, ১৩৫০ আষাঢ়, ১৩৫০ ভাদ্র, ১৩৫০ আশ্বিন, ১৩৫০	'ক্ষণিক' 'চতুর্দ্দশপদী' 'ষ্টালিন' 'মণির জন্য কবিতা' 'পঞ্চপদী'	৫টি

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের 'নতুন আঁচড়' কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কোথাও কোনো আলোচনা বা সমালোচনা হয়েছে বলে জানা যায় না। প্রকাশের পর পরই সম্ভবত এর প্রথম প্রকাশ নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। এ গ্রন্থটির খোঁজ পরবর্তীকালে স্বয়ং কবির কাছেও ছিল বলে মনে হয় না। কেননা ১৯৮৭ সালে অমিত চক্রবর্তীকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কবি তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের যে তালিকা প্রদান করেন সেখানে 'নতুন আঁচড়'-এর উল্লেখ নেই। তিনি বলেন :

> এ পর্যন্ত প্রকাশিত আমার সাতটি কবিতার বইয়ের নাম, প্রকাশকাল ও মোট কবিতার সংখ্যা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই এজন্যে যে কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ এখন একেবারেই দুষ্প্রাপ্য। স্বপ্ন কামনা : ১৯৩৮ : ১৯ ॥ স্বর ও অন্যান্য কবিতা : ১৯৫৩ : ২১ ॥ দিনযাপন : ১৯৬২ : ৪৬ ॥ বৃষ্টি এলে : ১৯৭২ : ২৩ ॥ এই এক সময় : ১৯৭২ : ৫৭ ॥ রুক্ষ দিনের কবিতা : ১৯৮৩ : ২৪ ॥ মানুষ জানে : ১৯৮৫ : ৬৭।[১৭]

Dhaka University Institutional Repository

এই তালিকা ধরেই সম্ভবত ১৯৯২ সালে প্রকাশিত 'আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়' বইতে সুমিতা চক্রবর্তী কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ হিসেবে 'স্বর ও অন্যান্য কবিতা' গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন।[১৮] গ্রন্থটির প্রথম উল্লেখ দেখতে পাই কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের মৃত্যুর পরে ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত 'সাহিত্যচিন্তা'য় 'রণেশ দাশগুপ্ত ও কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত স্মরণ' সংখ্যার ২২৭ পৃষ্ঠায় 'কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের বই' এর তালিকায়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বুদ্ধদেব বসুর কবিতা ভবন থেকে প্রকাশিত 'এক পয়সার একটি' সিরিজের অনুকরণে ঢাকার প্রতিরোধ পাবলিশার্স থেকেও এরকমের কয়েকটি গ্রন্থ চল্লিশের দশকের প্রথম দিকে প্রকাশ করা হয়। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের 'নতুন আঁচড়' কাব্যগ্রন্থটি সেগুলোর মধ্যে একটি।

বর্তমান অভিসন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা জেনেছি ১৯৩৯ সালেই কিরণশঙ্কর ঢাকায় প্রগতি লেখক সংঘের সঙ্গে জড়িত হয়েছেন এবং ক্রমশ সাম্যবাদের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন— বিদেশী লেখকদের নানান বই পড়ে কবিতার আধুনিক চিন্তাভাবনার সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন।

বস্তুত স্পেনের গৃহযুদ্ধের পর থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত সময় কবির তারুণ্য ও প্রথম যৌবনকে উত্তাল ঘটনায় মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিবেশে একান্তে বসে রোমান্টিক কবিতা লেখার উপায় অনেক কবির জন্যেই তখন ছিল না। ফলে 'স্বপ্ন-কামনা'র রোমান্টিক প্রেমের জগত থেকে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত খুব দ্রুত যেন এসে গেলেন প্রতিদিনের প্রাত্যহিক জগতে, যেখানে শুধু স্বদেশে নয় বহির্বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপে ও দূরপ্রাচ্যে রাজনৈতিক সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে। তাই 'স্বপ্ন-কামনা'য় কবির যে তীব্র রোমান্টিকতা পরিলক্ষিত হয়েছিল— সে রোমান্টিকতার উপর এ সময়ে সাম্যবাদ এবং সমসাময়িক বিপর্যস্ত কালের নানান ঘটনায় 'নতুন আঁচড়' পড়েছে। সে জন্যেই তিনি রোমান্টিক প্রেমের স্বপ্নালু জগত থেকে অধিকতর বাস্তবজগতে ফিরে এলেন— ফিরে এলেন জনতার তথা মানুষের অপূর্ণতার দুঃখ ও বেদনাজাত বিক্ষোভের, পৃথিবীব্যাপী ফ্যাসিস্ট সাম্রাজ্যবাদী দানবের কালো থাবার অত্যাচারে-নিষ্পেষণে জর্জরিত বিপন্নের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের নিজেরই ভাষ্য :

> বস্তুত আগে যেভাবেই লিখি না কেন মার্কসবাদী ধ্যান ধারণার প্রভাবে আমার লেখায় পরিবর্তন এসেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে যেসব কবিতা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লিখেছিলাম সেগুলো সাক্ষ্য।[১৯]

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের এই উক্তির যথার্থ প্রয়োগ দেখতে পাই 'নতুন আঁচড়'-এ। একাব্যগ্রন্থের সমস্ত কবিতাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমসাময়িক ঘটনা দ্বারা উদ্বোধিত। তবে তাঁর কাব্য-প্রতিভার বিশিষ্টতার কারণে গ্রন্থভুক্ত কবিতায় বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। কাব্যগ্রন্থের শুরুতে কবির দৃষ্টিভঙ্গি কিছুটা নৈরাশ্যব্যঞ্জক হলেও শেষ পর্যন্ত তিনি প্রবল আশাবাদে উত্তীর্ণ হয়েছেন। এই আশাবাদী মানস-প্রবণতাই কবি কিরণশঙ্করের কবি-প্রতিভার প্রধান লক্ষণ। এ গ্রন্থের কোনো কোনো কবিতায় কবি সবকিছু প্রত্যক্ষ

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন অত্যন্ত নিস্পৃহ দৃষ্টিতে; তবে সবক্ষেত্রেই তিনি সাঙ্গীকৃত করেছেন জনতাকে। সাম্যবাদে দীক্ষিত দায়বদ্ধ কবি হিসেবে তিনি তখন জনতারই একজন।

এই সব বিবেচনায় 'নতুন আঁচড়' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো মোটামুটিভাবে তিনটি ধারায় ভাগ করে আলোচনা করা যায়, সেগুলো হচ্ছে :

এক. নিরাশার মধ্যে আশাবাদ
দুই. প্রেমভাবনা
তিন. বিবিধ

এক.

'নতুন আঁচড়' কাব্যগ্রন্থের যে কবিতাগুলোতে কবি নিরাশার মধ্য দিয়ে আশাবাদে উত্তীর্ণ হয়েছেন সে কবিতাগুলো হচ্ছে, 'আজকের এই মুহূর্ত্ত', 'ডায়েরী', 'ক্ষণিক', 'চতুর্দ্দশপদী' ও 'পঞ্চপদী'।

'নতুন আঁচড়' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা 'আজকের এই মুহূর্ত্ত' কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের সময় ও সমাজসচেতন একটি কবিতা; যে কবিতায় কবি ছোট ছোট বাক্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন ভারতবর্ষের বেকারত্ব, দারিদ্র্য এবং সুবিধাভোগী বণিক শ্রেণির চিত্র তুলে ধরেছেন। এই সময়টাই নৈরাশ্যের। কবির ভাষায় :

সঙ্গ হোল আরাধনা এইবার নির্ব্বিকার মন।
অধুনা বেকার-বেশী শিয়রে তো শূন্য ভবিষ্যৎ।
সীমান্তে মহড়া চলে সমরের নব আয়োজন।
রৌদ্রতাপে ঘুরে মরি স্পর্শভিক্ষু যাযাবরবৎ। (আজকের এই মুহূর্ত্ত)

দমবন্ধ করা পরিবেশে দারিদ্র্যের সুস্পষ্ট চিহ্নও বর্তমান,

পাঞ্জা[ঞ্জা]বীটা জোড়াতালি, চুলগুলি কটা তৈলহীন। (ওই)

এরই মাঝে বৈঠকে তামাশা চলে, তাকিয়ায় ঘাড় গুঁজে সুবিধাবাদী বৈশ্য তার মুনাফার হিসেব কষে।

টাকা কুড়ি হ'লে পরে মেলে বটে মুখোস গ্যাসের, (ওই)

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত এই পরিস্থিতিতে 'বঙ্গভঙ্গ' প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। আরো অনেকের মতো তাঁরও বিশ্বাস ছিল হয়তো বঙ্গ ভঙ্গ হলে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটত। বর্তমানের এই দুঃসহ পরিবেশ-পরিস্থিতি তাঁকে মোকাবিলা করতে হত না — বস্তুত এ ধারণা শুধু তাঁর নয় — সে সময়কার বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রায় সকলের। কবি কিরণশঙ্করের কবিতায় তাই লক্ষ করি একটা হতাশার সুর —

যুক্তরাষ্ট্রে ভাগাভাগি যে সুযোগ এলো এতো পরে,
কী আশ্চর্য্য! সিমলায় সে-সুযোগ নষ্ট হলো ফের।
(ওই)

Dhaka University Institutional Repository

কবির এ হতাশা স্থায়ী নয় — এই যুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যে তিনি শুনতে পান নতুন উৎসবের আগমনী এবং তিনি আনন্দিত ও বিস্মিত হন —

বেয়োনেট নিচে জ্বলে, বিমানেতে ভরেছে আকাশ।
কোথা থেকে এরি মাঝে এলে তুমি সোনালী আশ্বিন? (ওই)

'আশ্বিন' শব্দটির মধ্যেই বাঙালির আশাবাদের প্রাণভোমরা লুকিয়ে আছে। কেননা আশ্বিন মানেই তো নবান্ন; নতুন ধান আর শারদীয় উৎসবের উচ্ছলতা।

'আজকের এই মুহূর্ত'-এর ব্যক্তিগত আশা-নিরাশা 'ডায়েরী' কবিতায় সমষ্টিগত রূপ নিয়েছে। এ কবিতায় কবি নিজেকে ধনিক শ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে দাঁড় করিয়ে জনতার বিজয় ঘোষণা করেছেন। পুঁজিপতি ব্যবসায়ীর একদিন পৃথিবীব্যাপী ব্যবসা ছিল — বণিকবুদ্ধিতে ঔপনিবেশিক কূটকৌশলে তার, যে স্বপ্নের সৌধ গড়ে উঠেছিল আজ তার ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠেছে। তার মুখোস খুলে গেছে —

মুখোস খসেছে, সোণার পৃথিবী তাই ফাঁকা।
চরম দৈন্য শত চেষ্টাতে যাবে না ঢাকা —
পুড়ে' খাক হ'লো কঠিন রৌদ্রে জীবন-শাখা। (ডায়েরী)

তাই,

বণিকবুদ্ধি মহা প্রভাবিত, কপালে রেখা।
পিছনে তাকালে বর্ত্তিকামালা যায় না দেখা,
কেবল চকিত অকাল-মৃত্যু আড়ালে লেখা? (ওই)

বণিকের হৃদয় আজ ঘাত-প্রতিঘাতে ক্ষতবিক্ষত। কারণ,

যদিচ ছিলাম এতোকাল ধরে' ধনী, দাতা —
এলো বেগে ঝড়, ঝরে যতো পচা জীবন পাতা;
হিসাব ক'রতে বসে' দেখি একি শূন্য খাতা! (ওই)

পৃথিবীব্যাপী নিষ্পেষিত জনতা জেগে উঠেছে, তাদের বিদ্রোহ-অনলে বণিকের পৃথিবী বেসামাল —

দেখি পথে আজ বিক্ষোভময় মজুর দল,
ওদের চোখেতে রোষের বহ্নি, বজ্রানল —
ওদের প্রতাপে আমার পৃথিবী টলমল। (ওই)

বণিকের ধ্বংসের মধ্যেই সাধারণ জনতার বিজয়ের আশাবাদ ব্যক্ত হয়েছে এখানে।

'ইতস্ততঃ' কবিতায় কবিকে দেখি আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে। যারা ফ্যাসিবাদী শক্তির সাহায্যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আশা করে তাদেরকে তিনি 'পরপদলেহী' বলে আখ্যায়িত করে বলেছেন —

চিরকাল পরপদলেহী। চোখে ছানি।
অক্লেশে তারিফ করি নব্য তৈমুরের।
সম্প্রতি দুঃস্বপ্ন দেখি প্রভু বদলের।
সারমেয় চিত্ত ভাবে আসুক জাপানী। (ইতস্ততঃ)

Dhaka University Institutional Repository

মূলত সুভাষচন্দ্র বসু এবং তাঁর 'ফরোয়ার্ড ব্লক'কে লক্ষ করেই এই তীব্র ব্যঙ্গোক্তি। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত তখন মনে প্রাণে কমিউনিস্ট। কমিউনিস্ট-কংগ্রেস একজোট। তাঁদের বিশ্বাস দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজদের সাহায্য করলেই স্বদেশের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের সমকালীন কবি ও কমিউনিস্ট কর্মী সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও ঠিক একই ধারণার বশবর্তী হয়ে লিখেছিলেন তাঁর বিখ্যাত 'জনযুদ্ধের গান' :

বজ্রকণ্ঠে তোলো আওয়াজ,
রুখবো দস্যুদলকে আজ,
দেবে না জাপানী উড়োজাহাজ
ভারতে ছুঁড়ে স্বরাজ।[২০]

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত এইসব 'সারমেয় চিত্তে'র লোকগুলো যে পৃথিবীব্যাপী গণবিপ্লবের খবর রাখে না সে বিষয়ে বিস্ময়বোধ করেন। কবি অবাক হয়ে দেখেন তাদের —

চীনের সঙ্কল্প চিত্তে আনে না জোয়ার।
পাই না প্রেরণা কোনো যুদ্ধে রুশিয়ার। (ইতস্ততঃ)

আর ভাবেন —

অবিকল অভিনয় কূপমণ্ডুকের। (ওই)

কবি জানেন —

এদিকে অদূরে
সঙ্ঘবদ্ধ জনগণ তৈরী আছে জানি। (ওই)

এবং তারা

... তাদের তীক্ষ্ণ দৃঢ় হাতিয়ারে
করবে দলিত পিষ্ট স্বস্তিকাসেনারে? (ওই)

কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের এই আশাবাদী দৃঢ় মনোভাব পুনর্ব্যক্ত হয়েছে 'ক্ষণিক' ও 'চতুর্দ্দশপদী' কবিতা দুটোতে। এ দুটো কবিতায়ও কবির সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভঙ্গি সুস্পষ্ট। 'ক্ষণিক' কবিতায় দেখি ভারতবর্ষের আকাশে জাপানি যুদ্ধ বিমানের সামরিক মহড়ায় জনজীবন বিপর্যস্ত। ভীত-চকিত-আতঙ্কিত মানুষের ঘুমহীন চোখ ভারী হয়ে এসেছে। আর এজন্যে তিনি দায়ী করেছেন কিছু লোকের মূঢ়তাকে। তবে এই সংকট থেকে উত্তরণে কবি আশাবাদী। কেননা কবি দেখেছেন —

যুগান্তের গলিত পাতার
এদিকে বিজিত লোক দৃঢ় ঐক্য গড়ে তোলে এক। (ক্ষণিক)

'চতুর্দ্দশপদী' কবিতায় সমাজসচেতন কবি সাম্রাজ্যবাদী শোষণের তাণ্ডবে উদ্ভূত দুর্ভিক্ষ, ফ্যাসিবাদী আগ্রাসন, কালোবাজারিদের দৌরাত্ম্যে মতিভ্রান্ত জনতার অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টের অনেকটাই ফুটিয়ে তুলেছেন। কবি লক্ষ করেছেন,

কোথায় ধরেছে যেন চিড়।
উদ্ধত দাপটে হাটে চৌরঙ্গীতে গোরা সৈন্যগণ।
[...] [...] [...]
অন্যদিকে চালের বাজার
মতিভ্রান্ত করে জনতাকে। (চতুর্দ্দশপদী)

Dhaka University Institutional Repository

এরই মধ্যে একদল এখনো ফ্যাসিবাদী হিটলার, জাপানিবাহিনীর আগমন প্রত্যাশা করে। ভারতে এ সময়ই কংগ্রেসকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়েছে আর সুযোগসন্ধানী সুবিধাবাদীরা দলত্যাগ করে নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত হয়েছেন।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত দেখলেন এই,

ক্রান্তিকালে রুশ, চীন, পীড়িতের বুকে দেয় বল। (ওই)

কবি দেখেছিলেন —

সাম্রাজ্যবাদের গর্ভে জন্ম নিলো গূঢ় ফ্যাসিবাদ।
অজগর নিয়ে খেলা করেছিলো মূঢ় বণিকেরা।
ক্রমে স্ফীততর হয়ে কৃষ্ণসর্প করেছে আঘাত
জীবনের মর্ম্মমূলে। বিষবাষ্পে পৃথিবীটা ঘেরা
আজ তাই। (ওই)

এই বিষবাষ্পে ঘেরা পৃথিবীকে রক্ষা করতে হবে। সেজন্যে জনতাই একমাত্র ভরসা। পৃথিবীব্যাপী কৃষাণ, মজুর আজ একতাবদ্ধ হচ্ছে। কবিও তাঁদের সঙ্গে একাত্ম হতে চান —

হে মজুর, হে কৃষাণ! জানি আজ আমি তোমাদের
একজন না হ'য়ে পারি না। তীব্র বিপ্লবীশিখার
আলো যেন আমাকেও ছোঁয়। রক্ত-বিজয়টীকার
চিহ্ন চাই আমারো ললাটে। (ওই)

যে বিশাল সাম্রাজ্যবাদী-ফ্যাসিস্ট ড্রাগন জেগে উঠছিল পৃথিবীর কোনায় কোনায়, তাকে ধ্বংস করতে —

সবাই এগিয়ে চলি হৃদয়ের আশাদীপ জ্বেলে। (ওই)

এ পথের পথিক জনতা আর 'একতাই জনতার বল'। কবি তাই সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন,

হে মজুর, হে কৃষাণ আজ তোমরাই
দুর্য্যোগে পথের বন্ধু! মুক্তিযুদ্ধে সৈনিক সবাই॥ (ওই)

'সমস্যাকন্টকিত নৈরাশ্যবাদীর উদ্দেশ্যে' 'পঞ্চপদী' কবিতাটি রচিত হয়েছে। কবিতায় প্রথমেই চিহ্নিত হয়েছে নৈরাশ্যের বেদনাঘন ছায়া।

জানি খুব বিচলিত তুমি। শস্যশ্যামল সোনা-ফলানো সে ভূমি
বঙ্গদেশ নয় আর, ভঙ্গ তার প্রাণের মৃত্তিকা —
বিক্ষোভপ্লাবিত দিন, উদ্যত দুর্দ্দিন পুঞ্জমেঘহীন
পথে-পথে আচম্বিত মৃত্যু ডেকে আনে বারংবার। (পঞ্চপদী)

'পঞ্চপদী' কবিতাটি মূলত তেতাল্লিশের মন্বন্তর ও দুর্ভিক্ষকে কেন্দ্র করে রচিত।

ঊনিশশ' তেতাল্লিশ সালের মন্বন্তরে বিপর্যস্ত জনজীবন সমসাময়িক আধুনিক কবিদের প্রত্যেককেই নাড়া দিয়েছিল। সুকান্ত ভট্টাচার্য আঠারজন কবির 'আকাল' সম্বন্ধীয় কবিতার এক সংকলন সম্পাদনা করেছিলেন 'আকাল' নাম দিয়েই। সেখানে ছাপা হয়েছিল কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের 'মেঘমুক্ত' কবিতাটি।[২১] 'মেঘমুক্ত' কবিতা তাঁর কোনো কাব্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয় নি।[২২]

Dhaka University Institutional Repository
সাম্রাজ্যবাদ আর তার দোসরদের শোষণের যৌথচক্রে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষের নিষ্ঠুর ছোবলে উপমহাদেশের মানুষ নিঃস্ব হয়েছে, মৃত্যুবরণ করেছে লাখে লাখে। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের কবিতায় দেখতে পাই এর নারকীয় বীভৎসতার চিত্র :

মৃতপুত্র ক্রোড়ে রুগ্ন মাতা, কুকুরের মতো ভ্রষ্টগতি
বুভুক্ষুপ্রাণের; (পঞ্চপদী)

মনে পড়ে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের সেই বিখ্যাত 'মন্বন্তর' চিত্রটির কথা। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ফ্যান' কবিতায়ও এরকম চিত্র লক্ষিত হয় :

নগরের পথে পথে দেখেছি অদ্ভুত এক জীব
ঠিক মানুষের মতো
কিংবা ঠিক নয়,
যেন তার ব্যঙ্গ-চিত্র বিদ্রূপ-বিকৃতি!
জঞ্জালের মতো নড়ে চড়ে, কথা বলে, আর
উচ্ছিষ্টের আস্তাকুঁড়ে বসে বসে ধোঁকে,[২৩]

একসময় এদেশের মানুষের মনে ছিল শান্তি ও স্ফূর্তি। প্রকৃতি মধু-মালতীর তীব্র সুগন্ধে ভরে দিত হাওয়া, পূর্ণিমা রাতের অপরূপ সৌন্দর্যে মাদকতা ছড়াতো সকলের প্রাণে।

কিন্তু আজ বিকারের চরম রিক্ততা
হৃদয়কে ক্রমে ঘিরে ফেলে। (পঞ্চপদী)

আর

ক্ষোভে, ব্যর্থতায়
আত্মগ্লানি অপমানে পদানত বিমূঢ় জীবন
নৈরাশ্যের মধ্যে খোঁজে আত্মার আশ্রয়। (ওই)

নিরন্ন মানুষের কাছে জীবনের কোনো বৈচিত্র্য থাকে না। যখন সে চোখে দেখে বিত্তশালী ব্যবসায়ী সুকৌশলে গোপনে স্বর্ণমুদ্রা গোনে, চোরাকারবারীদের অন্ধকার গর্ভে জমে অন্ন-বস্ত্র-রূপা ও রতন — তখন সে সুতীব্র বেদনার ভাষা প্রকাশ করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। তখন মনে হয়,

মৃত্যুই তো ভালো, জীবনের যখন কোনও
স্থিতিস্থাপকতা নেই — স্বস্তিলাভ আত্মোবিলোপেই? (ওই)

'স্বপ্ন-কামনা'য় কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তকে দেখা যায় 'আত্মবিলোপে চাই আত্ম-প্রতিষ্ঠা'র দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করতে। সেই তিনি যেন এখন খানিকটা ম্রিয়মাণ! কিন্তু আমরা জানি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের মানবচৈতন্য আশাবাদেই গড়া — তিনি তো নৈরাশ্যবাদী নন! তাই তো কিছুক্ষণ পরেই দেখি তিনি কুয়াশা-উদ্বেল সময় পার হয়ে দুর্নিবার সংগ্রামের পথে এগিয়ে চলেছেন — যেখানে 'মৃত্যু নয়, প্রাণ জয়ী হবে'।

ভ্রষ্টপথে অন্ধকারে নয়,
অমরপ্রাণের যাত্রা নিত্য নব উষার আলোকে। ভয়,
সংশয় যদি থাকে হবে লুপ্ত বজ্রগর্ভ প্রত্যূষের ডাকে —
যদিও ছড়ানো পথে দুর্ভিক্ষ মড়ক, যদিও সড়ক
ভরে' ওঠে মৃতদেহে বহু ভগ্নস্তূপে, তবুও জীবন

Dhaka University Institutional Repository

অজেয় ষ্টালিনগ্রাদ, প্রতিরোধে উৎসর্গিত সারা প্রাণমন।
আর নয় ব্যর্থতা, হতাশা। ক্রান্তিকালে রাখুক প্রত্যাশা
রক্তস্রাবী প্রাণমন, দৃঢ় হোক খড়গসম নির্ভীক যৌবন। (ওই)

দলমত জাত-পাত নির্বিশেষে সকল মানুষ এই চরম দুর্দিনে মিলিত হয়েছে। দেশময় জাতীয় সংহতির দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করে ঘোষিত হয়েছে অগ্রযাত্রার আহ্বান —

ক্রম-আগুয়াণ দৃঢ়পদে
যে যাত্রা হ'য়েছে শুরু তার দোলা যেন লাগে হৃদয়ের হ্রদে। (ওই)

এবং অগ্নিবর্ষী, ধ্বংসবীজ সাম্রাজ্যলোলুপ দস্যুদল ও হীনবল চক্রান্তকারী বণিকরাজকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কবি বলেছেন —

তারে ঠেলে এসো পথ কাটি, দৃঢ়পদে হই অগ্রসর — জোরে হাটি,
তাতে উদ্দীপিত হবে ক্রমে হৃতবাক উত্তেজিত অশান্ত অন্তর। (ওই)

দুই.

প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'স্বপ্ন-কামনা'য় কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ছিলেন তীব্রভাবে রোমান্টিক এবং প্রেমের শরীরী প্রকাশে তিরিশের আধুনিক কবিদের মতবাদে আস্থাশীল। 'নতুন আঁচড়'-এ খুবই প্রাসঙ্গিকভাবে প্রেমের প্রসঙ্গ এসেছে, তবে সে প্রেম পূর্বের মতো তীব্র রোমান্টিকতায় দোলায় না, শরীরী শিহরণ জাগায় না। এখানে প্রেমের হাত ধরে এসেছে সমকাল; সাম্যবাদের নতুন মন্ত্রে উজ্জীবিত শ্রমিক-কৃষাণ, এসেছে ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার যৌথ প্রতিজ্ঞা। 'নতুন আঁচড়'-এ এধারার কবিতা মাত্র দুটি — 'মণির জন্য কবিতা' এবং 'সাম্রাজ্যভস্মের পূর্ব্বে'।

'মণির জন্য কবিতা'য় দেখি কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত খণ্ড খণ্ড বাক্যে অখণ্ড প্রেমের কথা অত্যন্ত সাদামাটাভাবে প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং মন্বন্তরের চরম দুঃসময়েও তাঁর প্রেমাস্পদার কথা স্মরণে এনে মনে তিনি শক্তি সঞ্চয় করেন।

আকাশে বিধ্বস্ত মেঘ। পথে শবাধার
তবু মনে পূর্ব্বরাগ ; তবু তো প্রণয়।
হাতে হাত রাখি। যেন কোনো ভয়
আর নেই। গুপ্ত শক্তি জেগেছে আবার। (মণির জন্য কবিতা)

জীবনের চলার ক্ষেত্রে পদে পদে বাধা। পথে পথে ক্রুদ্ধ মৃত্যুর আহ্বান। শাণিত নখরে তার রক্তচিহ্ন। এর মাঝেও কবি তাঁর প্রিয়ার অধরে খুঁজে পান প্রাণের সূর্যের ছায়া। তাই তিনি মৃত্যুবাণ উপেক্ষা করেন। নতুন সুর আর গানে ভরিয়ে তোলেন জীবনকে। কিন্তু — তবুও তৃপ্তি যেন মেলে না।

অশান্ত নিখিলে
বাসা বেঁধে বাসা ভেঙে মরি। (ওই)

কেননা প্রেমের ভাবালুতায় 'অশান্ত নিখিলে'র কঠিন বাস্তবতাকে অস্বীকার করা যায় না। বাইরে জনতা প্রাণপণ লড়ে যাচ্ছে সম্রাজ্যলোলুপ দস্যুদের সঙ্গে, কালোবাজারি

Dhaka University Institutional Repository

মুনাফাখোরদের বিপক্ষে, ক্ষুধা-দারিদ্র্য আর দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে। কবিও তাদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন। বলেন,

গাঁথি আমার জীবন
সহস্রের সাথে। (ওই)

কারণ কবি বুঝতে পেরেছেন,

জয়ী হ'লে বিপ্লবী জনতা
তবেই তো প্রণয়ের যত সার্থকতা। (ওই)

এ বক্তব্যে আমরাও বুঝতে পারি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত শুধু রোমান্টিক কল্পনায় বিভোর নন, সমাজ ও সময় সচেতনতা তাঁর প্রেমের কবিতায় উপস্থিত করেছেন। তাই শুধু প্রেমের গৎ বাঁধা রোমান্টিক কথার মালায় তিনি নিজেকে এবং আমাদেরও ভুলিয়ে রাখেন নি; অতি সাধারণভাবে সাধারণ জনতার সঙ্গে তিনি একাত্ম হয়ে গিয়েছেন।

'সম্রাজ্যভস্মের পূর্ব্বে' কবিতাটিতেও লক্ষ করি অতি সাধারণ নরনারীর প্রেমভাবনা ক্রমে সমষ্টির সঙ্গে মিলিত হয়ে নতুন সূর্য-সম্ভাবনায় নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

'সাম্রাজ্যভস্মের পূর্ব্বে' কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৪৯ সালের 'অভিবাদন'-এর শারদীয় সংখ্যায় ফ্যাসিস্ট বিরোধী কবিতা হিসেবে।[২৪]

কবিতার শুরুতেই দেখতে পাই এক ক্রান্তিকালের মধ্য দিয়ে কবিতার নায়ক-নায়িকার জীবনযাত্রা অতিবাহিত হচ্ছে। তাদের চারপাশে 'রিক্ত বাতাসে ছড়ানো হাড়ের দুরন্ত ঘ্রাণ', 'সূর্য্যোত্তাপে আকাশ চৌচির', 'মরুময় শূন্য পথ ঘাট' আর 'দীর্ঘ দেবদারু ছড়ায় বিষণ্ন ছায়া'। তাদের অন্তরে জ্বালাময়ী গান, চক্ষু নিদ্রাহীন। তাদের 'জীবনের স্তম্ভিত কাহিনী' 'ভারবাহী শকটের মতো আঁকাবাঁকা পথে চলে শ্লথগতি'তে। এরই মাঝে পূর্বের শরীরী প্রণয়ের স্মৃতি জাগৃত হয়। তারা একে অপরের প্রতি যে গভীর প্রণয়াশক্ত সে কথা আমাদেরও জানা হয়ে যায় যখন বীরভদ্রা বলে,

দলিত দ্রাক্ষার মতো নিজেকে দিয়েছি নির্ব্বিশেষে
যতো দিন ছিল উত্তেজনা। যতোদিন ছদ্মবেশে
আসেনি কালের স্রোত যুক্তিহীন জীবনের তীরে। (সাম্রাজ্যভস্মের পূর্ব্বে)

এখন ক্রান্তিকাল। এখন শূন্য মাঠে চাষা চেয়ে থাকে বৃষ্টিহীন শূন্যতার দিকে, রাজপথে উজ্জ্বল মিছিলে হেঁটে চলে নির্যাতিত অযুত শ্রমিক। চারুকুমার ও বীরভদ্রারও ইচ্ছে হয় যোগ দিতে জনতার দলে। তারা অনুভব করে

শ্রমিক, কৃষাণ সেনা সাড়া তোলে ক্লান্ত চিত্তময়। (ওই)

তবু তাদের মনে কিছুটা সংশয়,

কিন্তু কোন্ গুণ আছে আমাদের জানিনে আমরা।
সম্বল তো দৃষ্টির ক্ষীণতা। ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতার
উর্দ্ধে উঠেছি কি? দৃপ্ত শ্রমিকের কৃষাণের গড়া
বিপ্লবের ঘূর্ণাবর্ত্তে পারবো তো হ'তে অংশীদার? (ওই)

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমশ চারুকুমার সমস্ত সংশয় কাটিয়ে ওঠে। এবং তার শরীরী ভালবাসাকে এই দেশ এই পৃথিবীর মধ্যে ছড়িয়ে দেবার বাসনায় বলে,

পৃথিবীকে ভালোবাসি, ভালোবাসি জীবন আমার।
ভালোবাসি সর্ব্ব অঙ্গ, সুমধ্যমা, তোমার শরীর।
ভালোবাসি খোলা মাঠ, শস্যশ্যাম ক্ষেত ও খামার।
ভালোবাসি সূর্য্য-জ্বলা রমণীয় রূপ ধরণীর। (ওই)

বীরভদ্রাকেও কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে শুনি,

রক্তশূন্য পৃথিবীতে ঘোর
লেগেছে যে কালের গ্রহণ চাই অবসান তার।
যৌবনের যাদু আজ মুক্তিরূপে জ্বলুক আবার। (ওই)

তারা লক্ষ করে 'দুর্ভিক্ষে ও রৌদ্রেঝড়ে' 'সুপ্তিহীন দিবস-শর্ব্বরী'তে শক্তিশেল সহ্য করে 'সংসারের বিকারে ও জ্বরে' মানুষ আজ বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। আর যে-কৌশলে বিত্তহীনদের শোষণ করেছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও তাদের দোসর মধ্যসত্ত্বভোগী দালালরা, তাদের শক্তিও আজ শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। ফলে,

অন্ধকার ভেঙে আজ উঠে আসে নির্ম্মম, কঠিন
উদ্দীপিত জনগণ। ইতিহাসে রাখে নিজ সই। (ওই)

আর কোনো পিছুটান নয়, তারা চিনে নিয়েছে কারা পিছনে থেকে জীবনকে সমস্যামগ্ন করে তুলেছে, মানুষের অধিকার সঙ্কুচিত করেছে। এইসব ঘৃণ্য-লোলুপ তস্কর, বুকে যাদের 'চিহ্নিত স্বস্তিকা', ফ্যাসিবাদ যার নাম — তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছে —

সাম্রাজ্যের গর্ভকোষে কলঙ্কিত জারজ সন্তান!
নির্ম্মম সাক্ষর তাই সংগ্রামের স্রোতে রাখিলাম।
লেগেছে যে কালের গ্রহণ তার চাই অবসান। (ওই)

এবার সামনে অগ্রসর হবার পালা। কারণ 'নবতম জীবনের এ পথেরি শেষ বাঁকে আছে' 'সূর্য্য-সম্ভাবনা'। এই আশাবাদে উন্নীত হয়ে শেষ পর্যন্ত তারা সমস্বরে ঘোষণা করে —

অন্ধকারে ঠেলে যতো সমুদ্যত বাধা-বিড়ম্বনা
দুর্ভিক্ষে মড়কে ঝড়ে আমরা চলেছি তার কাছে। (ওই)

তাদের পূর্বের রোমান্টিক ভাবালুতাময় প্রেম শেষ পর্যন্ত অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মনোভাবে দৃঢ়তায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

তিন.

'নতুন আঁচড়' কাব্যগ্রন্থে এ দুই ধারার কবিতার বাইরেও কিছু সংখ্যক কবিতা আছে যেগুলোর বিষয়বস্তু বিচিত্র। কোনো ব্যক্তি যেমন, 'ষ্টালিন', 'সোমেন চন্দের স্মৃতিতে'; কোনো দেশ যেমন, 'চীন', 'জাপান'; কোনো বিশেষ চিন্তা ও সমসাময়িক কোনো ঘটনাকে নিয়ে যেমন, 'একটি কথা' — এধারার কবিতাগুলো রচিত। এসব কবিতায়ও সমকাল, সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিস্ট বিরোধিতা এবং জনতার সম্পৃক্ততার কথা অনুল্লেখ

Dhaka University Institutional Repository

থাকে নি। সর্বোপরি এ কবিতাগুলোও আশাবাদে উত্তীর্ণ হয়ে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের কবি-মানস-প্রবণতার প্রধান লক্ষণের সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

'একটি কথা' কবিতায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন কিছু চিত্র টুকরো টুকরো বাক্যে তুলে এনেছেন কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। যেখানে একদিন নিসর্গ-প্রকৃতির নয়নাভিরাম দৃশ্য বিরাজ করত — আজ সেখানে বোমারু বিমানের আনাগোনা; যে মানুষ ধনে-জনে-প্রাণে ছিল অফুরন্ত শান্তি ও স্ফূর্তির আধার এই কিছুদিন আগেও, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের অধরে এখন সবহারাদের গান। এমনই দুঃসময় যে,

বসন্ত এলো, সে-কথা বলে না কেউ। (একটি কথা)

সে কারণেই কবির উক্তি,

ইতিহাসে পাতা উল্টায় বুঝি ফের। (ওই)

কেননা বাঙালির মন-মানসিকতা গড়ে উঠেছে 'লাখ-লাখ যুগ দিয়ে হিয়া রাখা' প্রাচীন ঐতিহ্য ধারণ করে। তাদের গোলা ভরা ছিল ধান — গোয়াল ভরা গরু — পুকুর ভরা মাছ আর গলা ভরা ছিল গানে। এখন মাঠে সোনার ফসলের আভাস নেই, আছে শ্বেত বণিকের কৌশলী শোষণ। ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনে 'পুরানো প্রয়াস ভেঙে-ভেঙে গুঁড়ো হয়'। আজ বাংলার সাধারণ জনতার 'নীলিম গভীর চোখের পাতায় ভয়' যেন আষ্টেপৃষ্ঠে দানা বেঁধেছে। প্রাচীন ঐতিহ্যের ভিত আজ ধ্বসে পড়ার উপক্রম করছে। এই চরম নৈরাজ্যের মধ্যে কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের আশাবাদী মন দেখে আত্মত্যাগী কিছু মানুষ সংকট উত্তরণের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষায় ধনতান্ত্রিক ষড়যন্ত্রের অপকৌশল ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ঐক্য ও সংগ্রামী মনোভাবে দৃঢ় হচ্ছে। তিনিও তাদের সঙ্গে একাত্মবোধ করেন। তাই সকলকে আহ্বান জানিয়ে বলেন,

কোনো ভয় নেই খুলেই তাহ'লে বলি,
আগত বিপদ, সেদিকে ফেরাও কান।
এসো না কৃষাণ মজুরের সাথে চলি,
অধরে আসুক সবহারাদের গান! (ওই)

তিনি উপলব্ধি করেন সম্মিলিত সম্প্রীতির বন্ধনে সবাই একত্রিত হয়ে যদি সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসিস্ট শক্তিকে প্রতিরোধ করা যায় তবেই আমাদের এই পাথরের মতো ভারী দিনের অবসান সম্ভব হবে এবং আবারো দেখা দেবে —

আমার হৃদয়ে তোমার হাসির জের। (ওই)

সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসিস্ট শক্তির আগ্রাসী লিপ্সার চরম বহিঃপ্রকাশ এবং তার সুতীব্র প্রতিরোধের চিত্র মূর্ত হয়ে উঠেছে 'চীন' কবিতায়।

সমরের অট্ট রোলে, মৃতস্তূপে ঘনালো দুর্দ্দিন।
এরিমাঝে স্থিরনেত্রে তুমি আজো জেগে আছো চীন।
বণিক-সভ্যতাসূর্য্য পৃথিবীকে অন্ধকারে টানে,
তোমার প্রাচীরে দেখি জাপানীরা মৃত্যুবাণ হানে।
পৃথিবীর সমতলে স্ফীতোদর লোভীদের ভীড়,
তোমাকে ভেবেছে এরা নিতান্তই দুর্ব্বল স্থবির। (চীন)

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বমানবতার শত্রু সাম্রাজ্যবাদী অপশক্তি ও ফ্যাসিবাদী আগ্রাসকদের উলঙ্গ কোন্দলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সৃষ্টি হলেও কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত জার্মানি, জাপান ও ইটালির ভূমিকাকে চরম ঘৃণ্য ও পৈশাচিক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের পথ ধরে ১৯৩৭ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর জাপানি বোমারু বিমান চীনের উপর বোমাবর্ষণ করে। এতে সমস্ত বিশ্বের মতো ভারতেও সাম্রাজ্যবাদী বিরোধী আন্দোলন বেগবান হয়ে ওঠে। কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল নেহেরু ২৬শে সেপ্টেম্বর সর্বত্র 'চীন দিবস' উদ্‌যাপনের আহ্বান জানান।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চীনে ফ্যাসিস্ট জাপানি আক্রমণের বিরুদ্ধে নিন্দা ও ভর্ৎসনা জানান। এবং চীনের জনগণের প্রতি সাহায্য ও সহমর্মিতা প্রকাশে গঠিত 'চীন তহবিলে' তিনি ৫০০ টাকা দান করেন।[২৫]

কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তও প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের মহাপীঠ চীনের মানুষের বিপর্যয়ে বেদনার্ত হন। তবে সেই সঙ্গে তিনি চীনের সংগ্রামী জনতার বীরত্বের প্রতি আস্থা স্থাপন করেন। মদমত্ত জাপানি ভেবেছিল খুব সহজেই তারা চীনকে পরাস্ত করে দখল করে নেবে। কিন্তু তাদের ধারণা ভুল বলে প্রমাণিত হল অচিরেই—

কিন্তু যতো মদমত্ত, বোঝে নাই তোমার স্তব্ধতা,
বিমানে বিষাক্ত গ্যাসে আর নিচে বোমা বেয়োনেটে
ভেবেছে এবারে বুঝি হবে লুপ্ত প্রাচীন সভ্যতা,
সাম্রাজ্যবাদীর লিপ্সা মহাচীনে লবে পথ কেটে!
অযুত সৈনিক মরে সংগ্রামের জ্বলন্ত চিতায়,
তোমার বিক্রম তবু দিন-দিন আরো বেড়ে যায়। (চীন)

চীন সম্পর্কে প্রায় এরকমই ভাবনায় আন্দোলিত হয়ে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় লেখেন :

হিংস্র পশু মাটি চায়—
এশিয়ার হবে দণ্ডধর;
হঠকারী আক্রমণ নিষ্ঠুর থাবায়।
সে লুব্ধ দুরাশা ভাঙে;
চীনের পল্টন আজ দুঃসাহসী খুঁড়েছে কবর।[২৬]

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত শেষ পর্যন্ত লক্ষ করেন—

অযুত আঘাতে কমে শত্রুপক্ষ হ'য়েছে মলিন,
তোমার বিক্রম তারা সসম্ভ্রমে ক'রেছে স্মরণ।
শূন্য তাই শূন্য নয়, আছো আজো সঙ্কল্পে অটল;
মহাশক্তি জন্ম লবে মহাযুদ্ধে সার্থক, সফল। (চীন)

ফ্যাসিস্ট জাপানের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে দৃঢ় শপথ বাক্য উচ্চারণ করে কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত রচনা করেন 'জাপান' কবিতাটি। জাপানের পররাজ্য দখলের যে লোলুপতা, তার উলঙ্গ প্রকাশ দেখতে পাই চীন অধিকৃত কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া দখলের ঘটনায়; ক্রমে ক্রমে নানকিং, হ্যাঙ্কাও, ক্যান্টন, সাংহাই, হংকং দখল করে নেয় জাপানিবাহিনী। ১৯৪২ সালে সিঙ্গাপুর দখলের পর জাপানিবাহিনী ভারতীয় সুমাত্রা,

Dhaka University Institutional Repository

জাভা, বালি প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করে। ১৯৪২-এর ৮ই মার্চ বার্মা (বর্তমানে মিয়ানমার) দখল করে ভারতের মণিপুর ও আসাম সীমান্তে আক্রমণ চালায়।[২৭] সমাজসচেতন ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত এ পরিস্থিতিতে লেখেন—

নররূপী বানরকে নিয়েছি তো চিনে।
মালয় বর্ম্মায় ঢুকে অবাধ লুণ্ঠন
সম্প্রতি তোমার পেশা, পুণ্য বাসস্থানে
এ ভারতে দিলে হানা বোমারু বিমানে,
মাদ্রাজে ও চট্টগ্রামে চলে বরিষণ। (জাপান)

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বোমার আঘাতে মানবতা যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ, তখন এ সময়ে তিনি ভারতবর্ষের সবাইকে সংঘবদ্ধ হবার আহ্বান জানান। জনগণের শক্তির প্রতি কবির গভীর আস্থা। সে কারণেই তিনি সাম্রাজ্যবাদের দোসর ফ্যাসিবাদী জাপানিবাহিনীকে সাবধান করে তিনি উচ্চারণ করেন :

গণশক্তি সঙ্ঘবদ্ধ, যোগ্য প্রত্যুত্তর
পাবে যদি ঢোকো এই দেশের ভিতর। (ওই)

শপথের এই দৃঢ়তা কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত লাভ করেছিলেন লেনিন প্রমুখ সাম্যবাদী নেতার জীবনাচরণ থেকে। তাঁর 'ষ্টালিন' কবিতায় দেখতে পাই তারই স্বাক্ষর। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়ার অবিসংবাদিত নেতা লেনিনের মৃত্যুর পর তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন স্টালিন। স্টালিনের নেতৃত্বেই রাশিয়ায় আধুনিক বৃহৎ ও মৌলিক শিল্প কারখানা গড়ে ওঠে এবং অতি অল্প দিনেই পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ দেশে পরিণত হয়। কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের 'ষ্টালিন' কবিতাটি এই কর্মী ধ্যানী ও দৃঢ়চেতা নেতার বন্দনাগানে মুখরিত।

সিদ্ধহস্ত সুপুরুষ। ক্রমে-ক্রমে বিপ্লবী যৌবনে
মজুরের অধিপতি। লেনিনের গড়া রুষদেশ
উন্মোচিত নব-নব রূপে। (ষ্টালিন)

তাঁর অঙ্গুলিনির্দেশে শ্রমজীবী সংগ্রামী ও বিপ্লবী চেতনায় তেজোদ্দীপ্ত মানুষ পেয়েছে নতুন পথের সন্ধান। কবির গভীর বিশ্বাসের কাব্যরূপ পেয়েছে এভাবে :

রক্তহীন পৃথিবীতে একমাত্র আশার প্রতীক
তোমার জীবন-বেদ। (ওই)

কেননা পৃথিবীর সর্বহারা, শোষিত-বঞ্চিত সাধারণ মানুষগুলোকে স্টালিনই শিখিয়েছেন 'শত্রুজয়ী বীজমন্ত্র'—'তাই তারা সাহসে নির্ভীক'। তিনি সকল শ্রমজীবী মানুষের দুরন্ত প্রেরণা। আর 'পররাজ্যলোভী তস্করের' তিনি 'অন্তক-স্বরূপ'। সে কারণেই কবি স্টালিনকে উদ্দেশ্য করেই বলেন :

আজ পৃথিবীর যতো স্বাধীনতাকামী সৈনিকের
একমাত্র দলপতি। (ওই)

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীকালে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'কমরেড স্তালিন' কবিতায়ও পাওয়া যায় এ সুরের অনুরণন :

আমাদের চোখ থেকে
মুছে নিলে ভয়
যে দিকে তাকাই
দেখি
স্পন্দমান তোমার হৃদয়।
এ পৃথিবী তোমার হৃদয়।[২৮]

'ষ্টালিন' কবিতায় কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত স্টালিনের প্রতি আন্তরিক অনুরোধ জানিয়ে লেখেন :

যে কীর্ত্তি গঠিত হলো আজ তারে রক্ষা করো বীর!
গণবাহিনীর দল তোমার পেছনে আছে স্থির। (ষ্টালিন)

কবি নিজেও এই গণবাহিনীর একজন হয়ে যান শেষ পর্যন্ত। কবিতার বক্তব্য এবং কবির বিশ্বাস এক নবচেতনায় লীন হয়ে যায়। কবির ব্যক্তিজীবন এবং সামষ্টিক-জীবন একাত্ম হয়েই সার্থক করে তোলে কবিতাকে।

'সোমেন চন্দের স্মৃতিতে' কবিতায় কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত কিছু শ্লেষের মাধ্যমে বিরূপ সময়ের একটি রক্তাক্ত চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন।

এখানে দূষিত দিন। আকাশে গোধূলী
শেষ লগ্ন করে অতিক্রম। চরাচরে
স্বস্তিকার ছায়। (সোমেন চন্দের স্মৃতিতে)

স্বস্তিকা শব্দটি বললেই আমাদের চোখের সামনে একটা মাঙ্গলিক চিহ্ন ফুটে ওঠে। অথচ কবি প্রথমেই বলে নিয়েছেন 'এখানে দূষিত দিন'। সুতরাং আমরা বুঝে নেই এখন সময় মঙ্গলজনক নয়—চারদিকে যুদ্ধের বিভীষিকা—সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দুরন্ত ছোবলে প্রতিদিন ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে স্বদেশ-পৃথিবী। স্বদেশের 'পরপদলেহী এক পঞ্চমবাহিনী'র চোরাগোপ্তা হামলায় সাম্যবাদী শান্তিপ্রিয় মানুষের জীবন অনিশ্চিত।

১৯৪২ সালের ৮ই মার্চ ফ্যাসিবিরোধী সম্মেলনে মিছিল সহকারে যোগ দেবার পথে নিবেদিতপ্রাণ কমিউনিস্ট কর্মী ও তরুণ সাহিত্যিক সোমেন চন্দ রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের হাতে নির্মমভাবে খুন হন। সোমেনের বুকের রক্তে রঞ্জিত হয় ঢাকার রাজপথ। কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত সেই স্মৃতি বুকে ধারণ করে লেখেন :

রুক্ষ মাটীর উপরে
তোমার রক্তের স্রোতে রক্তময় ধূলি। (ওই)

তবুও,

তোমার স্মৃতিতে দীপ্ত হৃদয়ে জোয়ার।
আজ তুমি নেই। কিন্তু তোমার জীবন
অবিচল আত্মদানে দিয়েছে নির্দ্দেশ

Dhaka University Institutional Repository

সায়াহ্নের কর্ত্তব্যের, তাই প্রাণপণ
দূষমণদের সাথে লড়ে সারা দেশ। (ওই)

ফ্যাসিস্ট বর্বতার বিরুদ্ধে, গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে সোমেন চন্দ ছিলেন নিরলস কর্মী। তাঁর অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়েছিল হাজার হাজার শ্রমিক জনতা। পৃথিবীর শোষিত ও নির্যাতিত জনগণের জন্যে তাঁর হৃদয়ে ছিল অফুরন্ত দরদ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে সেই বুকের রক্ত দিয়ে প্রমাণ করতে হল তাঁর মানুষের প্রতি — স্বদেশের প্রতি — পৃথিবীর অত্যাচারিত দুর্বল কৃষাণ-মজুরের প্রতি অবিচল ভালবাসার। তাই তো কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত উচ্চারণ করেন দার্ঢ্য স্বরে :

হে বন্ধু, বুকের মাঝে যতো রক্ত থাকে —
আরো লাল ক'রে দিলো রক্ত-পতাকাকে। (ওই)

এই লাল শুধু রক্তের লাল নয় — কবির গভীর আশাবাদ ধ্বনিত হয়েছে এখানে; সোমেন চন্দের বুকের রক্তে রঞ্জিত হয়ে নবীন উষার আলো উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে নতুন পতাকায় একদিন, সেদিনের প্রত্যাশাতেই 'দূষমণদের সাথে লড়ে সারা দেশ'।

আশাবাদের এই ধারাবাহিকতায় 'নতুন আঁচড়' কাব্যগ্রন্থে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত যত বেশি বিষয় ও বক্তব্য সচেতন, তত বেশি অলংকারের সমাবেশ কিংবা কারুকাজ তাঁর এ কাব্যে নেই। ছন্দ-অলংকারের আতিশয্য এ কাব্যগ্রন্থে লক্ষ করা যায় না। অথচ তৎসম-শব্দের বহুল ব্যবহারে এ কাব্যের বক্তব্য-বিষয় হয়েছে স্পষ্ট ও ঋজু। যেমন —

১. সমরের অট্টরোল, মৃতস্তূপে ঘনালো দুর্দ্দিন।
এরি মাঝে স্থিরনেত্রে তুমি আজো জেগে আছো চীন।
বণিক-সভ্যতাসূর্য পৃথিবীকে অন্ধকারে টানে,
তোমার প্রাচীরে দেখি জাপানীরা মৃত্যুবাণ হানে। (চীন)

২. পৃথিবীকে ভালোবাসি, ভালোবাসি জীবন আমার।
ভালোবাসি সর্ব্ব অঙ্গ, সুমধ্যমা, তোমার শরীর।
ভালোবাসি খোলা মাঠ, শস্যশ্যাম ক্ষেত ও খামার।
ভালোবাসি সূর্য্য-জ্বলা রমণীয় রূপ ধরনীর। (সাম্রাজ্যভস্মের পূর্ব্বে)

ছোট ছোট বাক্যে এ কাব্যের কাব্যভাষাকে কবি দান করেছেন আত্মপ্রত্যয়ী গণশক্তির অটুট চেতনা।

আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের ১৩টি কবিতার মধ্যে মাত্র তিন-চারটি কবিতার মধ্যে দু-তিনটি শব্দালংকার ও অর্থালংকারের সাক্ষাৎ মেলে। 'নতুন আঁচড়' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলোর মধ্য থেকে অলংকারের কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল :

শব্দালংকার

সরল অনুপ্রাস :

১. গাঁথি আমার জীবন / সহস্রের সাথে। (মণির জন্য কবিতা)

২. যৌবনের যাদু আজ মুক্তিরূপে জ্বলুক আবার। (সাম্রাজ্যভস্মের পূর্ব্বে)

৩. বসন্তবাতাসে বুঝি শুনেছিলে সুবর্ণ সঙ্গীত
মদালস বসন্তসখার! (পঞ্চপদী)

Dhaka University Institutional Repository

অন্ত্যানুপ্রাস : ১. পুরানো দিনের প্রলাপ না হয় থাক।
জমেছে যে সোনা এবারে চুলোয় যাক্। (একটি কথা)

২. মুখোস খসেছে, সোণার পৃথিবী তাই ফাঁকা।
চরম দৈন্য শত চেষ্টাতে যাবে না ঢাকা —
পুড়ে' খাক হ'লো কঠিন রৌদ্রে জীবন-শাখা। (ডায়েরী)

ছেকানুপ্রাস : বঙ্গদেশ নয় আর, ভঙ্গ তার প্রাণের মৃত্তিকা — (পঞ্চপদী)

শ্রুত্যানুপ্রাস :

ত দ : কতো মধুরাতে রেখেছিলে হাত হাতে হাতে;
বাঁধা পড়েছিলো সোনার হরিণ কার ফাঁদে! (ডায়েরী)

ড় র : পৃথিবীর সমতলে স্ফীতোদর লোভীদের ভীড়,
তোমাকে ভেবেছে এরা নিতান্তই দুর্ব্বল স্থবির। (চীন)

অর্থালংকার

উপমা : ১. আমাদেরো দিন পাথরের মতো ভারী। (একটি কথা)

২. সমুদ্রের স্রোতের মতন
আমাকে ভাসিয়ে লও বিপ্লবের জোয়ারের টানে। (চতুর্দ্দশপদী)

৩. ভারবাহী শকটের মতো
আঁকাবাঁকা পথে চলে স্লথগতি কালের বাহিনী। (সাম্রাজ্যভস্মের পূর্ব্বে)

প্রতীক

আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে সাম্রাজ্যলোলুপ ফ্যাসিস্ট শক্তিকে কবি 'ড্রাগন', 'নররূপী বানর', 'দস্যু', 'দুঃশাসন' প্রভৃতির প্রতীকে এবং তাদের এদেশীয় চাটুকার, কালোবাজারি প্রভৃতিকে 'পরপদলেহী', 'পঙ্গপাল', 'স্বস্তিকাসেনা' ইত্যাদি বলে প্রতীকায়িত করেছেন। যেমন —

১. চিনে নিছি যতো পঙ্গপাল
বাহিরে ঝড়ের বেগ। শাণিত নখরে
রক্তচিহ্ন তার। (মণির জন্য কবিতা)

২. আর, তোমার কেশের
মাঝে হাত দেয় সেই ঘৃণ্য বন্য হিংস্র দুঃশাসন। (সাম্রাজ্যভস্মের পূর্ব্বে)

প্রথম উদাহরণে 'পঙ্গপাল' সাম্রাজ্যলোলুপ দস্যুর এদেশীয় সঙ্গী ও চাটুকার কালোবাজারি, মুনাফাখোর শ্রেণির মানুষ রূপধারী পশুর প্রতীক। যাদের ধারালো নখে লেগে আছে দারিদ্র্যলাঞ্ছিত, শ্রমজীবী গণমানুষের রক্ত। দ্বিতীয় উদাহরণে ফ্যাসিবাদী শক্তিকে 'হিংস্র দুঃশাসনে'র প্রতীকে প্রতীকায়িত করে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত তাঁর সংগ্রামী চেতনাকেই শৈল্পিকভাবে উপস্থাপন করেছেন।

ছন্দ

ছন্দ রচনার ক্ষেত্রে কবি 'নতুন আঁচড়'-এ মাত্রাবৃত্ত ও সনেটকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এ কাব্যগ্রন্থে একটিও স্বরবৃত্ত ছন্দের কবিতা নেই। তবে একটি সমিল প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত

Dhaka University Institutional Repository

ছন্দের কবিতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সনেট রচনায় শেক্সপিয়রিয় রীতিই তাঁর পছন্দ; এছাড়াও দেবেন্দ্রনাথ সেন, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখের মতো প্রচলিত রীতির মিশ্রণ ঘটিয়ে অনিয়মিত ধাঁচের সনেটও তিনি লিখেছেন। এ কাব্যগ্রন্থে একটি কবিতা আছে যার অন্ত্যমিল নেই কিন্তু অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কবি কিরণশঙ্কর প্রতি পঙক্তির মধ্যমিল দিয়েছেন। 'নতুন আঁচড়' কাব্যের কবিতাগুলো থেকে কবির ছন্দের বৈচিত্র্য দেখাতে কতিপয় দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা হল।

মাত্রাবৃত্ত :

যদিও জড়তা সোনার শরীর ঘিরে,
অধরে আসুক সবহারাদের গান।
আকাশ যেখানে নেমেছে নদীর তীরে,
এখন সেখানে বোমারু বাষ্পজান। (একটি কথা)

সমিল প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত :

আমিও রব না উদাসীন। সুপ্তিহীন সংগ্রামের দিনে
উত্তাল বক্ষের মাঝে উদ্যত যে ঝড় সামুদ্রিক।
বেরিয়েছি রাজপথে। রৌদ্রে ঝড়ে লবো পথ চিনে।
রমণীর কটি যেন কলঙ্কিত করে না বণিক। (সাম্রাজ্যভস্মের পূর্ব্বে)

সনেট :

১. পথে ভাঙা মিনারের সারি। ম্লান, সুবর্ণ গম্বুজে
শোণিত প্রলেপ তমিস্রার। হয়তো এমনি হয় —
যখন শতাব্দী শেষ, সভ্যতার চোখ আসে বুজে,
প্রাসাদ দিল্লীর দ্বার লক্ষ অশ্বখুরে বিষময়।
ক্ষীণ সন্ধ্যালোকে পথ চলি। গুণ গুণ ক'রে গাই
প্রহরশেষের গান, শূন্যে জাপ পুষ্পকের সারি
ছিন্ন করে শেষ স্তব্ধতাকে। নীচে নিরুক্ত সবাই
শীতাতপে কণ্টকিত রাত্রি জাগরণে চোখ ভারী।
বিষণ্ন আমলাতন্ত্র। নিঃশেষিত নিজ ক্ষমতায়
আজো আস্থাবান। আর নিত্য নব সঙ্কট অনেক
সৃষ্টি করে দৈন্যে মূঢ়তায়। যুগান্তের গলিত পাতায়
এদিকে বিজিত লোক দৃঢ় ঐক্য গড়ে তোলে এক।
কালের সমরে আজ রিক্ত উষ্ট্র বালুঝড়ে মরে,
এখানে অনেক লোক মরে গিয়ে সিনেমার ঘরে। (ক্ষণিক)

এটি কখ কখ ঃ গঘ গঘ ঃঃ ঙচ ঙচ ঃঃ ছছ রীতিতে এবং ১৮ মাত্রায় (১০+৮) বিন্যস্ত।

২. চিরকাল পরপদলেহী। চোখে ছানি।
অক্লেশে তারিফ করি নব্য তৈমুরের।
সম্প্রতি দুঃস্বপ্ন দেখি প্রভু বদলের।
সারমেয় চিত্ত ভাবে আসুক জাপানী।
রাখিনা খবর আজো গণবিপ্লবের।
চীনের সঙ্কল্প চিত্তে আনে না জোয়ার।
পাইনা প্রেরণা কোনো যুদ্ধে রুশিয়ার।
অবিকল অভিনয় কূপমণ্ডুকের।
গোলক ধাঁধাঁয় মন আজো মরে ঘুরে।

Dhaka University Institutional Repository

বলতো আসবে কবে তৈমুর সেনানী
বিবাগী ভারতবর্ষে? এদিকে অদূরে
সঙ্ঘবদ্ধ জনগণ তৈরী আছে জানি।
তবে কি তাদের তীক্ষ্ণ দৃঢ় হাতিয়ারে
করবে দলিত পিষ্ট স্বস্তিকাসেনারে? (ইতস্ততঃ)

এটি কখ খক ঃ গঘ ঘগ ঃঃ ঙচ ঙচ ঃঃ ছছ রীতিতে এবং ১৪ মাত্রায় (৮+৬) বিন্যস্ত।

'নতুন আঁচড়ে'র ৯টি সনেটের মধ্যে ৪টি ১৪ মাত্রার ও ৫টি ১৮ মাত্রা বিশিষ্ট। এগুলো শুধু কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের বিন্যাস-কুশলতার সূত্রেই বিশিষ্ট নয়, এর নাটকীয়তার গুণেও বাংলা সাহিত্যে বিশেষ মর্যাদা পাবার দাবি রাখে।

Dhaka University Institutional Repository

৩. স্বর ও অন্যান্য কবিতা

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'স্বর ও অন্যান্য কবিতা'; কলকাতার *মডার্ন পাবলিশার্স* থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। গ্রন্থটির প্রচ্ছদপট অঙ্কন করেছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন। ১৯৪৩ থেকে ১৯৫৩ এই দীর্ঘ দশ বছরের রচিত মাত্র একুশটি কবিতা স্থান পেয়েছে 'স্বর ও অন্যান্য কবিতা' গ্রন্থে। এই সময়ের মধ্যে ১৯৪৩-'৪৪ দুবছর তিনি ঢাকা জেলা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। যদিও প্রত্যক্ষ রাজনীতি তিনি কখনোই করেন নি, কিন্তু রাজনীতি ও সাহিত্যকে তিনি মিলিয়ে নিতে সচেষ্ট ছিলেন। ফলে এই সময় থেকে তাঁর কবিতার সঙ্গে রাজনৈতিক চেতনা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা ওতপ্রোতভাবে মিশে গিয়েছিল বলা যায়।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগ হল। নানান প্রতিকূলতার মধ্যেও ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ঢাকাতেই ছিলেন এবং থাকতেও চেয়েছিলেন আজীবন। কিন্তু তখন সময়টা ছিল চরম বিরুদ্ধ — কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ দুটো দলই ছিল কমিউনিস্ট-বিরোধী। সরকারিভাবে কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করায় কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের অত্যন্ত ঘনিষ্ট ও বন্ধুস্থানীয় রণেশ দাশগুপ্ত এবং আরো কেউ কেউ তখন পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের রোষের শিকার হয়ে জেলে। তাই বাধ্য হয়েই তিনি পশ্চিম বাংলায় চলে গেলেন ১৯৫০-এ। প্রথমে চন্দনগরে, পরে কলকাতায় গিয়ে পশ্চিমবাংলা রাজ্য সরকারের অধীনে সরকারি চাকরিতে যোগ দেন।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের কবিতা-বিষয়ক উদার ও শিল্পগুণের প্রতি আগ্রহী মনোভাব এসময় থেকেই পরিণত হয়ে ওঠে। ফলে তাঁর কবিতার বৈচিত্র্যে দেখা দেয় হৃদয়মূল-স্পর্শী চেতনা — যা শিল্পকে জনজীবনের সঙ্গে অন্বিত করে প্রত্যক্ষরূপে প্রকাশ পায়। আমরা আগেই দেখেছি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত 'স্বপ্ন-কামনা'য় অবলম্বন করেছিলেন তীব্র রোমান্টিক প্রেম; 'নতুন আঁচড়'-এ তিনি জনতা-সম্পৃক্ত হয়ে প্রকাশ করলেন আশাবাদের মন্ত্র। 'স্বর ও অন্যান্য কবিতা'য় তুলে ধরেছেন চল্লিশের দশকের যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দিনের ছবি, আশা-নিরাশা এবং মুক্তি-সংগ্রাম-সংকল্প-দৃঢ় মনের প্রেম-অনুভব। কবির নিজের উক্তি :

> আমার 'স্বর ও অন্যান্য কবিতা' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৩-এ। বলা যায় আমার যুদ্ধকালীন চল্লিশ দশকের নানা পর্বের স্বাক্ষর রয়েছে এই বইটির স্বল্প সংখ্যক কবিতাবলীতে।[২৯]

বস্তুত কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের 'স্বর ও অন্যান্য কবিতা' কাব্যগ্রন্থে একদিকে যেমন আছে আধুনিক সভ্য জীবনের নৈরাশ্যবোধের দৃষ্টিভঙ্গি, তেমনি আছে আশা-বিষাদ-নৈঃসঙ্গ-ক্রোধ সম্পৃক্ত গভীর জীবনবোধ। আলোচনার সুবিধার্থে 'স্বর ও অন্যান্য কবিতা' গ্রন্থের কবিতাগুলোকে নিম্নোক্ত পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন :

এক. নৈরাশ্যবোধমূলক কবিতা

দুই. আশাবাদমূলক কবিতা

Dhaka University Institutional Repository

তিন. জীবনবোধজাত কবিতা
চার. প্রেমভাবনামূলক কবিতা
পাঁচ. বিবিধ বিষয়ক কবিতা

এক.

তিরিশ-উত্তর বাংলা কবিতায় আধুনিকতার অন্যতম লক্ষণ হচ্ছে নৈরাশ্যবোধ। বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপক সংহার-তাণ্ডব, দেশে দেশে ক্ষমতার অধিকারের নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতা ও সাধারণ মানুষের অসহায়তা এতটাই সর্বগ্রাসী আকারে দেখা দিয়েছিল যে নৈরাশ্যবোধের একটা বিশেষ ছায়া সাহিত্যকে নবতর মহিমা দান করেছিল। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের কবিতায় এই নৈরাশ্যবোধের তীব্র প্রকাশ লক্ষ করা যায় 'স্বর ও অন্যান্য কবিতা' গ্রন্থের কয়েকটি কবিতায়। তবে তাঁর কবিতায় যে নৈরাশ্যবোধ, তা প্রধানত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বিপন্ন সময়ের, খরা ও আকালের নিরাশাবোধের চিত্র। এ ধারার কবিতাগুলো হচ্ছে : 'শীতরাত', 'যাত্রা', 'প্রথম গ্রীষ্ম', 'গলিত নখ' ও 'স্বরণী'।

'স্বর ও অন্যান্য কবিতা' গ্রন্থের প্রথম কবিতা 'শীতরাত'। এ কবিতার প্রথমেই কবি নিশীথিনীকে সম্বোধন করে 'অন্ধকারে কদম্বের রোমাঞ্চ' ছড়াতে বলেও আবরণ মুখে টেনে দেবার কথা বলেন। কেননা —

> আসঙ্গলোলুপ আশা
> হারায়েছে দীপ-রশ্মি রক্ততপ্ত বিকাশের ভাষা,
> এ রজনী কুয়াশা-স্থবির,
> এ হৃদয় কুয়াশা-স্থবির। (শীতরাত)

কারণ —

> বিপর্যস্ত কৃষ্ণচূড়া অরণ্যেরও আসন্ন দুর্দিন,
> শস্যক্ষেত্র রিক্ত শস্যহীন।
> চাদরেতে মুখ ঢেকে ধুরন্ধর গোয়েন্দারা ঘোরে
> অন্ধকারে শীতের প্রহরে,
> জনগণ সম্মিলনে রক্তাভ পতাকা মাঠে বাতাসেতে নড়ে।
> (ওই)

এই পরিস্থিতিতে কবির দৃষ্টি ক্রমে ফিকে হয়ে আসে। অতীতের পলাতক বহু স্মৃতি তাঁর মনে আসে — আবার ছিন্নভিন্ন হয়। এবং তিনি উপলব্ধি করেন,

> কণ্টকিত এই শীত রাতে
> আমি রিক্ত, জরাজীর্ণ আবর্তের মাঝে
> একদৃষ্টে থাকি চেয়ে অন্ধকার প্রান্তরের দিকে,
> ক্ষীয়মাণ দেহে নামে ধূলিলিপ্ত অদ্ভুত জড়তা,
> মনে হয় সঙ্কটের নাই আর শেষ
> গন্তব্যের পাই না উদ্দেশ। (ওই)

গন্তব্যের উদ্দেশ না পেয়ে হতাশার মহাসমুদ্রে এই যে যাত্রা 'যাত্রা' কবিতায় শোনা যায় তারই প্রতিধ্বনি। কবি দেখতে পান,

Dhaka University Institutional Repository

পিছনে পৃথিবী এক
বিলুপ্ত, ধূসর:
ক্লান্ত গতি, তৃষিত অধর; (যাত্রা)

কবির মনে প্রশ্ন জাগে,

এ যাত্রার কবে হবে শেষ? (ওই)

কবি দুই হাতে তমিস্রার দুর্দম জোয়ারে কোনোমতে ভেসে চলেন। যেতে যেতে দেখতে পান আবদ্ধ পথের ধারে ভিক্ষার আশায় বসে থাকা ইহুদি মেয়েটিকে। অজ্ঞাত আহ্বানে গিয়ে ভেড়েন সিনেমা ও চায়ের দোকানে। এই মরলোক, আজকের বসন্তের অন্ধকার রাতের হৃদয়ের গুঞ্জন সব মৃত্যু ভয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়। তিনি দেখেন —

কৃষ্ণচূড়া শাখার পিছনে
আজো হাসে ক্ষীণকটি তৃতীয়ার চাঁদ
যুবতীর মতো; (ওই)

তারই পাশে অজ্ঞাত বিলাপে শীতল বাতাস এসে দিগন্তের দিকে চলে যায়। প্রতিকূল সময় তাই কুন্দ-বাহু, স্ফিত শুভ্র বুকের প্রসন্ন যৌবনবতী সুন্দর ফুলের মতো মুখ নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালেও মনে প্রণয় জাগে না। চারপাশ ঘিরে শুধু অন্ধকার — নৈরাশ্যের ছায়া — তাই,

অদূর গন্তব্য পানে, শূন্য নিরুদ্দেশে
স্রোতে ভেসে চলি;
শূন্যগর্ভ প্রত্যেক নিমেষ,
কবে শেষ, এ যাত্রার কবে হবে শেষ? (ওই)

'প্রথম গ্রীষ্ম' কবিতায় কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের এই নৈরাশ্যবোধ আরো সুতীব্র হয়েছে। এখানে,

দিগন্ত প্রসারী ক্ষেত তীব্র রৌদ্রালোকে ধূ-ধূ করে
ছায়া নেই, দগ্ধ মাটী, ভ্রূকুটি কুটিল নভোনীল।
স্তম্ভিত গরুর দল বজ্রাহত, শূন্যে ওড়ে চিল,
শুষ্কমাঠ থেকে ধূলি উড়ে উড়ে মিশেছে অম্বরে। (প্রথম গ্রীষ্ম)

এই কবিতায় পরিষ্কার ফুটে ওঠে সে সময়কার বাংলার রুক্ষ ধূসর নিসর্গ-প্রকৃতি। যেখানে 'সূর্য-জ্বলা তৃণদল কিশোরীর মতো অসহায়'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে বৈশাখের মেঘকে নিরুদ্দেশ হতে দেখেছিলেন — বহুকাল সে পলাতক। এখন সমস্ত মৃত্তিকা থেকে মানুষের মনের উত্তাপ বাষ্প হয়ে ওড়ে। কোনোখানে এতটুকু আশার আভাস নেই — শুধু নিরাশা —

চরাচরে স্তব্ধ বায়ু, পথে যেতে পথিক তাকায়
কোথায় আকাশে মেঘ, অগ্নি ঝরে শূন্য থেকে যত। (ওই)

এই ধারাবাহিকতা 'গলিত নখ' কবিতাটিতেও বর্তমান —

প্রখর রৌদ্রে উপলে ক্লান্তি, আকাশ ফাঁকা।
মরুচারী মন খুঁজে-ফিরে কোনো শান্তি কি?

Dhaka University Institutional Repository

বাতাসে অগ্নি, বন্ধ্যা করুণ অশথ-শাখা,
যাযাবর দলে নাম লেখাতেও নেই বাকী। (গলিত নখ)

নাগরিক কবি দীর্ঘদিন ধরে আশাবাদের যে স্বপ্ন লালন করছিলেন মনে সে স্বপ্ন দেখা বৃথা হয়েছে। নিজেকেই তাই প্রশ্ন করেন কবি —

এতোকাল ধরে' আশাবাদে বলো কী খুঁজে পাও
শূন্য ট্যাঁকেতে হয় যদি শেষ সিকিটা মেকি? (ওই)

'বাণিজ্যে বসতঃ লক্ষ্মী' প্রবাদটি দ্বিতীয় যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে আরো বেশি করে সত্যি বলে প্রমাণিত হয়। ফলে এ সময়ে পুঁজিবাদী প্রবণতা যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের হাতে নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির যাঁতাকলে সাধারণ দরিদ্র শ্রেণির মানুষের জীবনযাত্রার মান ক্রমশ নামতে থাকে — এবং এরাই হচ্ছে সমাজের প্রধান শ্রেণি। সমাজসচেতন কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত এইসব লক্ষ করে বলেন —

বাণিজ্যে মেলে লক্ষ্মী একথা সকলে মানি।
তাই কি চাকায় তেল জুগিয়েই শ্রমিক মরে!
ভ্রষ্টলগ্ন দিন বুঝে নাও হে সন্ধানী
হারায় কোথায়, কোন্ দিকে হাওয়া নিশানা করে। (ওই)

'ভ্রষ্টলগ্ন দিন'-এ নীতিচ্যুত রাজনীতিবিদদের ফায়দা লোটার কথাও কবি ভোলেন নি; তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন —

জন-গণ-মন লক্ষ্যই যদি আসল হয়
টাটকা বুলির ব্যবসা করেই লোক মাতাও!
লক্ষ্যভেদের সহজ উপায় শক্ত নয়,
বাক্যের স্রোতে চায়না কিংবা স্পেইনে যাও। (ওই)

কবি জানেন এইসব ভ্রষ্টাচারী নেতাদের দিয়ে সমাজের শ্রমিকশ্রেণির মানুষের ভাগ্য বদল হবে না। আর দেবতা বলে যিনি আড়ালে বসে মানুষের ভাগ্য নিয়ে পরিহাস করেন, তিনিও ধণিক শ্রেণির পক্ষে। গরিবের জীবনে বসন্ত কিংবা 'রাঙা সন্ধ্যা'র স্বপ্ন দিবাস্বপ্নেরই নামান্তর। জীবনে আশার প্রদীপ জ্বলার সম্ভাবনা নেই। কবির ভাষায় —

ঢের চাঁদা দাও, কংগ্রেস করো তবু মনোরথ
বিফলেই যায়, যে-তিমিরে আছো সে-তিমিরেই। (ওই)

সমাজের এই শোষিত, বঞ্চিত শ্রেণির মানুষের বাস্তব জীবন চিত্র আরো বিস্তৃত হয়েছে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের 'স্বরণী' কবিতায়।

এ যুগের রথচক্র তলে
আমরাও ইঁদুরের মতো। (স্বরণী)

এই ঘোষণায় কবিও তাদেরই দলে সামিল হন। তিনি লক্ষ করেন —

নিভেছে অন্তিম আশা ব্যর্থতার বিতৃষ্ণা-তিমিরে,
তাইতো হৃদয়-হ্রদ শ্মশানের স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। (ওই)

এখানে এখন হাওয়া ঘোরে না, শুধু অদ্ভুত স্তব্ধতায় 'বার-বার নেভে-জ্বলে ধূমাঙ্কিত জীবনের চিতা'। তাই 'নির্লিপ্ত বিষণ্ন মুখে জীবনের শূন্য বালুচরে' কল্পনার সব স্বপ্নসৌধ

Dhaka University Institutional Repository

ভেঙে যেতে দেখেন আর আগত দুর্দিনের উদ্‌ভ্রান্ত আহ্বান শোনেন। চারদিকে শুধু নৈরাশ্যের ছায়া — প্রণয়ে রক্তিম জোয়ার আনার শেষ চেষ্টাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কবি উপলব্ধি করেন জীবনের —

জীর্ণ চাকা ঘোরে না তো আর — (ওই)

দুই.

চরম নৈরাশের মধ্যেও 'স্বর ও অন্যান্য কবিতা' গ্রন্থের কিছু কবিতায় কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত আশাবাদের কথা ব্যক্ত করেছেন। আমরা 'স্বপ্ন-কামনা' ও 'নতুন আঁচড়' কাব্যগ্রন্থদ্বয়ে লক্ষ করেছি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের কবিতার প্রধান সুর আশাবাদ। তিনি কখনোই নৈরাশ্যবাদী নন। সমাজসচেতনতা ও সমকালীন পরিবেশ-পরিস্থিতির রূপায়ণে কখনো কখনো তাঁর কবিতায় নৈরাশ্যবাদ দেখা দিলেও তা ক্ষণস্থায়ী। 'স্বর ও অন্যান্য কবিতা'য়ও তার ব্যতিক্রম হয় নি। এ গ্রন্থের 'আজ বসন্তে', 'পুরণো পৃথিবীর প্রতি', 'নির্জন মুহূর্তের প্রার্থনা', 'তিমিরহননের গান' কবিতাগুলোই তার উজ্জ্বল সাক্ষ্য। এছাড়াও 'মুখোমুখি' এবং 'ব্ল্যাক আউট নেই' কবিতাদ্বয়ে আছে নৈরাশ্য থেকে আশাবাদে উত্তরণের ক্ষীণ প্রচেষ্টা।

'আজ বসন্তে' কবিতা শুরুই হয়েছে কবির আশাবাদ উচ্চারণে —

আবার উতলা বায়ু গতপত্র কৃষ্ণচূড়া শাখে। (আজ বসন্তে)

যদিও এখনো 'ঋতুচক্রে ঘোরে ফেরে ভ্রষ্টলগ্ন যাবাবর দিন', 'খনিতে খনিতে জাগে ইস্পাতের গাঢ় অন্ধকার' এবং 'কাস্তে হাতে কৃষকেরা শস্যহীন মাঠে ঘুরে মরে' — তবুও কবির বিশ্বাস বায়ু যখন আবার উতলা হয়েছে এবং গতপত্র কৃষ্ণচূড়ায় নতুন পত্র-পল্লবের আভাস দেখা দিয়েছে তখন এই সুকঠিন জাল ছিঁড়ে বসন্ত-বাতাসের সাক্ষাত মিলবেই।

'পুরণো পৃথিবীর প্রতি' কবিতায় পুরাতনকে ফেলে কবি নতুনের বন্দনার আহ্বান জানিয়েছেন।

বিদায়, বিদায় আজ, হে পৃথিবী, সমুদ্র-সন্তান!
স্থবির শতাব্দী শেষে লহো এই শেষ সম্ভাষণ। (পুরণো পৃথিবীর প্রতি)

একদিন আমাদের পিতা-পিতামহগণ সহস্র দীপে সমুদ্রকে সাজিয়েছেন, তখন ছিল তাঁর যৌবনকাল — তাই,

একদা তোমাকে ঘিরে রচেছিলো কীর্তি প্রতিভার। (ওই)

কিন্তু,

আজ তুমি নির্বাপিত মোর কাছে তুহিন অসাড়।
নতুন যুগের সূর্য সহ্য আর হয় না শরীরে —
বোধ করি অবলুপ্ত হবে তাই কালের তিমিরে, (ওই)

কবির আশা আবার এই পৃথিবীতে নতুন সমাজ গড়ে উঠবে। তিনি শুনতে পান —

বিধ্বস্ত মৃত্তিকা মাঝে যুগান্তের উদ্বেলিত গান
পরিণামে হবে জয়ী, জয়ী হবে পথের আহ্বান। (ওই)

Dhaka University Institutional Repository

এই আশাবাদ নিয়ে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত 'নির্জন মুহূর্তের প্রার্থনা' কবিতায় নিজ স্বদেশকে লাভ করেন নতুন রূপে। কবির ভাষায় :

নবরূপে লভিলাম।
সহরসীমান্ত ছেড়ে
হে আমার দেশ,
এখানে তোমাকে ফের নবরূপে আজ লভিলাম।

(নির্জন মুহূর্তের প্রার্থনা)

তিনি এ কবিতায় বাংলার নিসর্গ-প্রকৃতির যে বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন তা এক কথায় অতুলনীয়। তিনি দেখেছেন —

পত্রঝরা চৈত্র শেষ, গন্ধরেণুমাখা দেশ
জোনাকী যোনির মুখে হাসি। (ওই)

'জোনাকী যোনির মুখে হাসি' — এই অভিনবত্ব কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তকেও নতুন করে চিনিয়ে দেয়। ক্রমশ তিনি তৈরি করে নেন স্বতন্ত্র কাব্য ভাষা। কবি আপন সত্তার গভীরে চৈতন্যের মাঙ্গলিক দ্যুতি অনুভব করে লক্ষ করেন পূর্বের হতাশা-নৈরাশ্যকে ভুলে জনতা সম্মুখ পানে এগিয়ে চলেছে। সূর্য অস্তাচলে ঢলে পড়েছে নতুন দিনের আগমনের প্রত্যাশা নিয়ে; তাই —

নবসূর্য এক
মানুষের বুকে —
দুঃখদৈন্যে রুদ্ধশ্বাস তবু রাত্রিদিন
উদ্যত সে কালের বাহিনী
চলেছে সম্মুখে। (ওই)

আর পরিশেষে ঘোষিত হয়েছে আশাবাদ —

জীর্ণতার অবশেষ, উঠেছে আওয়াজ
নদী প্রবাহের, পূর্ণ নতুন প্রাণের। (ওই)

'তিমিরহননের গান' কবিতাটি মনে করিয়ে দেয় জীবনানন্দ দাশের 'তিমিরহননের গান'[৩০] শীর্ষক নৈরাশ্যবিদ্ধ কবিতার কথা। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত যেন সেই নৈরাশ্য থেকে আশাবাদে উত্তীর্ণ হবার চেষ্টায় এ কবিতাটি রচনা করেন। যদিও কবিতা দুটোর কোনো তুলনা চলে না — জীবনানন্দ লিখেছেন প্রবহমান গদ্যে আর কিরণশঙ্কর ব্যবহার করেছেন লঘু চালের ছন্দ। তবে এ কবিতায়ই কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের কবি প্রতিভার সম্যক বিকাশ লক্ষ করা যায় — কবির সহজ হৃদয়াবেগের স্বাভাবিক প্রকাশ ঘটেছে এখানেই। যুদ্ধ পরবর্তী বিধ্বস্ত স্বদেশ থেকে ক্রমে ক্রমে সমস্ত কঠিন ভয় অপসারিত হয়েছে, আকাশে সুনীল মেঘের উদয় ঘটেছে। ফলে —

ভয়ে ভারবাহী অনেক কাল
মাঠের কৃষাণ ধরেছে হাল।
জেলে নদীজলে ফেলেছে জাল। (তিমিরহননের গান)

এবং

সবাই আমরা দিনশেষে
আবার মেতেছি দেশে-দেশে। (ওই)

Dhaka University Institutional Repository

জীবনানন্দ দাশ যেখানে তিমিরবিলাসী না তিমিরবিনাশী ভাবনায় সংশয়িত ছিলেন কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত সেখানে নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করেন —

সবাই আমরা দেশবাসী
মারণ মন্ত্রে উপবাসী।
আড়ালে শঠের হাসাহাসি
মরিনি ত' তবু দেশবাসী।
যদিও এখানে চারিপাশে
ছড়ানো মরণ মাঠে ঘাসে।
সহসা জেগেছে মরাঘাসে
নবতৃণদল, স্মিত হাসে! (ওই)

এই কবিতার মধ্যে বাঙালির সংগ্রামী চরিত্রের দৃঢ়তা প্রকাশের যে অনুভব তা কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের সমকালীন আরো একজন কবির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়; তিনি সুকান্ত ভট্টাচার্য — লিখেছিলেন,

সাবাস, বাংলা দেশ, এ পৃথিবী
অবাক তাকিয়ে রয় :
জ্বলে-পুড়ে-মরে ছারখার
তবু মাথা নোয়াবার নয়।[৩১]

'তিমিরহননের গান'-এর শেষ দিকে দেখা যায় জনতা একজোট হয়ে নতুন ভাষায় নব-আশার উৎসবে মাতোয়ারা।

গান দিয়ে আজ প্রাণভরা
করেছি যে জয় জ্বর-জরা।
অপগত দিন ভাষাহরা।
মনের গহনে আছে আশা।
আছে নবপ্রেম, ভালোবাসা। (তিমিরহননের গান)

এই নবপ্রেম আর ভালবাসা বুকে ধারণ করে নবীন আশার পদমূলে মনপ্রাণ সঁপে দিয়ে জনতার উৎফুল্ল মনোভাবই কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের কবি-মানস-প্রবণতার অন্যতম লক্ষণ।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের বেশ কিছু কবিতা আছে যেখানে আশাবাদ উপস্থিত, কিন্তু পূর্বের মতো তা আর জোরালো নয়। এখানে কবি সংশয় ও সন্দেহে দোদুল্যমান। অথচ আশা একেবারে ছেড়ে দিতে পারেন না। এ পর্যায়ের কবিতাগুলো হচ্ছে 'মুখোমুখি' ও 'ব্ল্যাক আউট নেই'।

'মুখোমুখি কবিতায় প্রথমেই কবি আমাদের সামনে যুদ্ধবিধ্বস্ত দিনের ছবি তুলে ধরেন; যেখানে —

শস্যহীন মাঠ।
শূন্য পথ-ঘাট।
অবরুদ্ধ কাচের কবাট।

দিগন্তে সূর্যাস্তে জ্বলে সোনা।
কতো লোক যুদ্ধক্ষেত্রে মরে!
হিসেব থাকে না। (মুখোমুখি)

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষ করা যায় কবির মনে ভয় এবং সংশয়ের একটা দোলাচাল:

কখনো ঈশান কোণে মেঘ জড়ো হয়।
জেগে ওঠে বাহিরে প্রলয়।
চোখে ফোটে বিহ্বলতা, ভয়।
তোমার চোখের দিকে বারেক তাকাই।
সেখানেও স্তব্ধ কাতরতা।
সংসারের দীর্ণ শূন্যতাই। (ওই)

কিন্তু এই শূন্যতাই জীবনের সার কথা নয়। অদৃশ্য যে শয়তান জীবনের প্রান্তে আগুয়ান তাকে রুখতে হবে। দমকা হাওয়ায় জীবনের দীপশিখা এখনো নিভে যায় নি। তাকে রক্ষা করা দরকার। কবি হৃদয় দিয়ে অনুভব করেন এই সত্য — তাই,

জরাজীর্ণ নুব্জ পৃথিবীকে
রেখে আসি অধুনা পশ্চাতে।
সম্মুখে বিস্তীর্ণ পথরেখা
গেছে চলে' দিগন্তের দিকে। (ওই)

বিস্তীর্ণ পথরেখা ধরে সামনে দিগন্তের দিকে এগিয়ে গেলেই হয়তো মিলে যাবে এই হতাশা ও সংশয় থেকে মুক্তি। কবির এই ক্ষীণ আশাবাদের উচ্চারণ লক্ষ করা যায় 'ব্ল্যাক আউট নেই' কবিতায়ও। এ কবিতাটিতেও দেখা যায়, যুদ্ধবিধ্বস্ত দিনগুলোর ছবি —

দীর্ঘকাল অন্ধকারে হিংসামত্ত দীর্ণ পৃথিবীতে
কেটেছে অনেক রাত। বিমানের অশান্ত ঘর্ঘরে
দ্বিখণ্ডিত হয়েছে আকাশ। বন্ধ্যা, শীতল মাটিতে
কঠিন হাড়ের স্তূপ, মানুষ না খেয়ে পথে মরে! (ব্ল্যাক আউট নেই)

'মুখোমুখি' এবং 'ব্ল্যাক আউট নেই' কবিতা দুটোর বিষয়বস্তু এক — যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর নানা স্মৃতি ও ছবি। অবশ্য আধুনিকতা বলতে আমরা যুদ্ধোত্তর সময়ের দুঃখ, পীড়া, নৈরাজ্য আর যন্ত্রণাকেই বুঝে থাকি। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত জানেন কবিতা শুধু এই বিশেষ এক ধরনের ভাব নয়। আশা ছড়া জীবন অচল। তাই তিনি স্মৃতি-কল্পলোক থেকে অপগত দিনগুলো ভুলে ফিরে আসেন দীপালোকিত রাজধানী কলকাতার চৌরঙ্গীতে — দেখেন 'ঝলকিত আহত নগরী'কে। লক্ষ করেন —

সহরে সমস্ত ছায়া উন্মোচিত মুক্ত এত দিনে। (ওই)

তাই

আলোকের উৎস-মুখ দিকে দিকে যায় তবু খুলে। (ওই)

পুরাতন লুপ্ত আলো-কে অবিলম্বে খুঁজে নেন তিনি। জীবন সচেতন কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের এই আশাবাদী মনোভাবের কারণেই তাঁর কবিতায় খুঁজে পাওয়া যায় এক পূর্ণতার আস্বাদ।

তিন.

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত আধুনিক কালের মানুষ — তাই সমাজজীবন কালান্তর সম্পর্কে অতিসচেতন। তাঁর কিছু কবিতায় জীবনের গভীর-বোধের নানান প্রকাশ লক্ষ করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

কখনো জীবন সম্বন্ধে কবির সংশয়, ক্লান্তি ও একঘেঁয়েমিতার উপস্থিতি, আবার কখনো নিসর্গ-প্রকৃতির মধ্য দিয়ে জীবনের বিচিত্র অনুষঙ্গ কবিতায় তুলে ধরেছেন কবি। জীবন কেন্দ্রিক এ ধরনের কবিতাগুলো হচ্ছে : 'স্বর', 'রাত্রির সঙ্গীত', 'এখানে' ও 'একচক্ষু'।

১৯৪০-এর মধ্যে লেখা 'স্বর' কবিতাটি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের বহুল আলোচিত ও প্রশংসিত একটি কবিতা। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত ত্রৈমাসিক 'কবিতা' পত্রিকায়। এ কবিতাতেই কবির নতুন কাব্যাদর্শের লক্ষণগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এলিয়টের রীতি এবং ইমাজিস্ট কবিদের উপকরণের ব্যবহারে 'স্বর'-এর স্বাতন্ত্র্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

এলিয়টের 'ওয়েস্ট ল্যান্ড' (১৯২২) কাব্যের কবিতাগুলো যুদ্ধোত্তর কালের অর্থহীন জীবনের শূন্যতাকে প্রকাশ করেছে; তাই তাঁর কবিতায় বিষণ্ন-ক্লান্তি ও লক্ষহীন প্রতীক্ষার একঘেঁয়েমির সুর প্রধান। অবশ্য যুগজীবনের মর্মবেদনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগের জন্যেই এলিয়টের কবিতায় এই রূপ এবং বিশিষ্টতা। ভাঙাচোরা কবিতা পঙক্তিতে কবির কণ্ঠস্বর যেমন ভগ্ন, তেমনি তার ইমেজগুলোও সংক্ষিপ্ত এবং অর্থবহ। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত এলিয়টের কাব্যতত্ত্বকে সহজেই গ্রহণ করেছিলেন এবং নিজের কবিতা রচনায় তার যথার্থ প্রয়োগও করেছিলেন তিনি। এলিয়টের কবিতা-অনুসরণে তিনি লিখলেন 'স্বর' কবিতা। এ কবিতায় ইমেজিস্ট কবিদের প্রভাব যেমন আছে, তেমনি আছে জীবন সম্বন্ধে সংশয়। অনেক সমালোচকই 'স্বর' কবিতার স্তবকসজ্জায় এলিয়টের 'ওয়েস্ট ল্যান্ড' কবিতার প্রতিধ্বনি লক্ষ করেছেন। 'চল্লিশের দশকের ঢাকা' গ্রন্থে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত নিজেই স্বীকার করেছেন : '১৯৪০-এ এলিয়টের কোনো কোনো কবিতা সামনে রেখে লিখেছিলাম 'স্বর' নামের দীর্ঘ কবিতাটি'[৩২]। 'কবিতার রূপ-রূপান্তর' গ্রন্থে এলিয়টের 'ওয়েস্ট ল্যান্ড' এবং 'স্বর' কবিতা দুটি উদ্ধৃত করে কবি এর মিল ও স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন। 'কবিতার রূপ-রূপান্তর' প্রবন্ধ গ্রন্থ থেকে তুলে দেওয়া হল :

'ও শব্দ কিসের?
'বাতাসের।'
'বাতাসের শব্দ বুঝি এতো ভারী হয়!'
'নিশ্চয়!'
'বেঁচে আছো অথবা তুমিও আজ বাতাসের মতো মৃত ভারী?'

— "স্বর"

'What is that noise?'
The wind under the door.
What is that noise now? what is the wind doing?'
Nothing again nothing.

*   *   *   *

'Are you alive, or not? Is there nothing in your head?'

— "The waste land"[৩৩]

Dhaka University Institutional Repository

দুটো কবিতার মিল সম্পর্কে কবির ভাষ্য —

> কবিতায় ব্যবহৃত শব্দাবলীর ও পঙ্‌ক্তিবিন্যাসের এই নৈকট্য উপেক্ষণীয়, কেননা, দুটি কবিতার পরিবেশ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; একটি আধুনিক কালের সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত বাঙালি সমাজের, অপরটি ইংরেজ বা য়ুরোপীয় জগতের। এ ক্ষেত্রে শুধুই লক্ষণীয় ও বিচার্য বিষয়, বাঙালি কবি তাঁর নিজের মাতৃভাষায় শব্দাবলীর সাহায্যে যে অনুভব পাঠকমনে সঞ্চার করতে চেয়েছেন তাতে সফল হয়েছেন কি না। পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে তিনি এক বা একাধিক পূর্বসূরী কবির রচনাবলীর শরণাপন্ন হতে পারেন; তাদের টেকনিক বা আঙ্গিকের সাহায্যও নিতে পারেন, দেখা দরকার সে ক্ষেত্রে নতুন কবিতা স্বতন্ত্র নির্মাণ হয়ে উঠেছে কি না। যদি হয়ে থাকে সেখানেই উত্তরকালের কবির সিদ্ধি।[৩৪]

সে বিবেচনায় কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের 'স্বর' কবিতার ঐতিহাসিক মূল্য এবং কাব্যমূল্য যথেষ্ট। কেননা একদিকে এ কবিতার মধ্যদিয়ে আমরা অবহিত হচ্ছি বাংলা কবিতা কীভাবে আধুনিক কবিতায় রূপান্তরিত হচ্ছে; অপরদিকে কবিতার মধ্যে কাল্পনিক সংলাপ, সংস্কৃত বচনের প্রয়োগ প্রভৃতি বহিরঙ্গ প্রয়োগ এবং কবিতার অন্তরঙ্গ ভাবমণ্ডলের প্রতিবিম্বিত প্রকাশে কবির নিজস্ব অনুভবের যে ভাষারূপ ফুটে উঠেছে তা বাংলা কবিতায় একেবারেই নতুন। 'স্বর' কবিতার মধ্যে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে নিষ্প্রাণ যান্ত্রিক একটা জীবনের আবহাওয়াকে। এর মধ্যে মানুষের সব কাজকর্ম ঠিকঠাক চলছে — প্রেম, চাকরি, মৃত্যু, ড্রয়িংরুম বিলাস, বিবাহ, লটারিতে টাকা পাওয়া — কিন্তু সব মিলিয়ে অন্তহীন ক্লান্ত একঘেঁয়ে জীবনযাত্রা।

> 'কী ভাবচো : ভাবনার শেষ আছে নাকি!'
> চুপচাপ : টিক-টিক ঘড়ির আওয়াজ
> এ ঘরে গুমোট :
> তাস খেলে কাজ নেই আজ।
> 'ঐন্দ্রিলার কী খবর : সে চিঠির এসেছে উত্তর?'
> [...]
> ছোট-ছোট কথা : কিছু ফিসফাস : চুড়ির আওয়াজ।
> [...]
> কামনা-পীড়িত চোখ, ম্লান ঠোঁটে উপবাসী হাসি।
> আরো কাছে ঘেঁসে বসে মেদনম্র মেয়েটির কাছে;
> বলে হেসে : 'যাবে সিনেমায়?'
> সূর্য ঢলে অস্তাচলে অন্ধকার নামে চরাচরে
> আজ তো সপ্তাহ শেষ, আজ শনিবার! (স্বর)

মানুষ যা কিছু করে, যা ভাবে বা যে স্বপ্ন দেখে — তার কোনো কিছুর মধ্যেই যেন প্রাণ নেই, উদ্দীপনা নেই। তবে কেন এই অস্তিত্ব, প্রেম আর দৈনন্দিনতার অর্থহীন অভ্যাস?

> প্রশ্ন করে অনেকেই : কেউ নেই : মেলে না উত্তর।
> [...]
> ওরা কি জানে না
> তুমি জানো, আমি জনি, জানো তো সবাই
> এ জীবন কী ভীষণ ফাঁকা! (ওই)

Dhaka University Institutional Repository

কবিতার মাঝে মাঝে উপস্থিত হয় এক অশরীরী দুর্বোধ্য কণ্ঠস্বর। সেই স্বরেও যেন ফুটে ওঠে শূন্যতার প্রতিধ্বনি। শূন্যতার এই পরিমণ্ডল সৃষ্টি কবি কিরণশঙ্করের অসাধারণ কবি-প্রতিভার স্বাক্ষর। এ প্রসঙ্গে ভবতোষ দত্তের মন্তব্য স্মরণযোগ্য :

> এলিয়টের কবিতাও সভ্যতার শূন্যগর্ভতা নিয়ে বিশাল পরিপ্রেক্ষিকায় লেখা, কিরণশঙ্কর বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবনের যে শূন্যগর্ভতার অনুভূতি জাগিয়ে তোলেন, তার উৎসে সামাজিক ক্ষয়িষ্ণুতা থাকতে পারে কিন্তু এটা কবিতায় যেন একটা দার্শনিক তাৎপর্য নিয়ে এসেছে। একজিটেনসিয়ালিস্টের জীবন-ভাবনার সঙ্গে যেমন জড়িয়ে থাকে একটা শূন্যতাবোধ, 'স্বর' কবিতার মধ্যে তেমনি এক নৈর্ব্যক্তিক শূন্যতাবোধের ইঙ্গিত চলতি জীবন থেকে সংগৃহীত ইমেজের সাহায্যে ফুটে উঠেছে। এই শূন্যতা সমাজের বা সভ্যতার শুধু নয়, এটি যেন মানব-অস্তিত্বের। এই গভীরতা এই কবিতার মধ্যে এসেছে বলেই এর অসাধারণত্ব।[৩৫]

'স্বর' কবিতার শেষ পঙক্তিগুলোতে যখন 'নতনেত্রা বিম্ববতী'র নিরুত্তরে ঘরের পরিবেশ নিথর তখন 'কামদৃপ্ত পুরুষের স্বর' ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাওয়ার আবহে একটি গভীর প্রেম ও মৃত্যুবোধ আমাদের মনে জাগ্রত হয়। সব মিলিয়ে আমরা লক্ষ করি 'স্বর' কবিতাটিতে এলিয়ট-সুলভ ভাষা বিন্যাস অনুসরণ করা হলেও সমগ্র জীবন সম্পর্কে কবির গভীর নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গির চমৎকার প্রকাশ ঘটেছে।

'স্বর' কবিতার নগরচেতনা ও নৈঃসঙ্গ্যবোধ 'এখানে' কবিতার মধ্যেও বর্তমান। যে শহরে বেড়ে উঠেছেন কবি সে শহরের মানুষের জীবনযাত্রার প্রাত্যহিক ছবি এঁকেছেন এভাবে :

বর্ধিষ্ণু হ'য়েছি আমি শব্দক্ষর ধূসর সহরে
জনতার কোলাহলে, অজস্র যে ব্যস্ততার ভীড়ে।
যানবাহনের বেগে অঙ্গ থেকে ধূলি ঝরে' পড়ে।
সন্ধ্যাকালে ঘরে ফেরে কেরানিরা বিবশ শরীরে। (এখানে)

প্রতিদিনের অভ্যস্ত হয়ে ওঠা এই একঘেঁয়েমিপূর্ণ জীবন কবির কাছে অসহনীয় লাগে। তাঁর মনে হয় —

যান্ত্রিক জীবনে মন
কয়েদীর মত যেন। পরিণত মূঢ় ক্রীতদাসে। (ওই)

এই জীবন যন্ত্রণা থেকে তিনি মুক্তি চান। নাগরিক কবি তাই ছুটে যান শহরের সীমা ছেড়ে সবুজ শ্যামল পল্লীর নিভৃত অঙ্গনে। বুক ভরে টেনে নেন শুদ্ধ শাণিত বাতাস, মুগ্ধ চোখে দেখেন আকাশের নীল আর মন ভরে শোনেন পাখিদের গান। নিসর্গ-প্রকৃতির সান্নিধ্যে এসে কবি নাগরিক বন্দি জীবন থেকে মুক্তি লাভ করেন। উপলব্ধি করেন এখানেও কর্ম আছে — 'কৃষক উন্মুক্ত ক্ষেতে খাটে সারা বেলা' — কিন্তু শহরের ক্লান্ত বিবশ কেরানির মতো নিষ্প্রাণ কর্ম সে নয়। এখানে সব কিছুতে আছে অফুরন্ত প্রাণস্পন্দন। কবি জীবনের এই অভিনব উপলব্ধিকে প্রকাশ করে বলেন,

আজ এখানে পেয়েছি এসে সব। (ওই)

'রাত্রির সঙ্গীত' কবিতাটিতেও ফুটে উঠেছে জীবনের অন্যতর বোধ। কবি লক্ষ করেন গভীর রাতে যখন শহরের সমস্ত কোলাহল থেমে যায়, যখন গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

যান তিনি — তখন অদৃশ্য কার হাতের ছোঁয়ায় তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। 'স্বর' কবিতায়ও আমরা দেখেছি একটা অদৃশ্য কণ্ঠস্বরের উপস্থিতি। এই অদৃশ্য-অশরীরীকে আমরা ধরে নিতে পারি কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের অতৃপ্ত জীবনচেতনা। প্রাত্যহিক জীবন যাত্রায় যে অপূর্ণতা, যে নৈরাশ্যবোধ — অবচেতনায় তিনি সেই ভাবনাকে পরিপূর্ণ করে তোলেন।

জীবনের পথে-পথে দ্রুত চলে ভারবাহী রথ,
রন্ধ্রে-রন্ধ্রে খুঁজে মরে ভ্রষ্টনীড় অযুত মানুষ
দুর্বার, বিচিত্রগামী পথ। (রাত্রির সঙ্গীত)

তারপর রাত এলে দগ্ধমন নিদ্রাতুর গ্লানি জড়তাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তন্দ্রার ঘোরে কবি শোনেন বনান্তের পথের ডাক। রাত্রির নিস্তব্ধতা আরো ঘনীভূত হলে কবি রাত্রির সঙ্গীতধ্বনি শোনেন। তিনি জানেন সঙ্গীতের যেমন শেষ নেই; তেমনি প্রেম, প্রীতি, ভালবাসারও শেষ নেই। তবুও নিষ্ঠুর কালচক্রে কবি গভীরভাবে উপলব্ধি করেন —

রাত্রির সঙ্গীত শেষে রক্তস্নাত দিন এসে
দাঁড়াবে আবার কাল ভোরে : (ওই)

এই অমোঘ সত্য উপলব্ধির পরেই কবি গভীর জীবন-জিজ্ঞাসায় মানুষের চিরকালীন প্রশ্ন বাক্যটি উচ্চারণ করেন :

পরমায়ু নেই তবু বেঁচেই যে আছি
সেটা কোন্ জোরে? (ওই)

'একচক্ষু' কবিতায় কবি যারা জীবনের নিরাশার দিকেই কেবল দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখে তাদেরকে বলেছেন 'একচক্ষু'। কেননা তারা খবর রাখে না যে আমাদের অস্তিত্বের মধ্যে প্রাণ ও প্রকৃতির নিত্য বিকাশ মানুষের অচিরস্থায়ী সমস্যাকে ছাড়িয়ে যায়। কবি লক্ষ করেছেন —

পৃথিবীতে প্রকৃতিতে আয়োজন কম
হয়নি তো কোনোদিন, চৈত্রদিনে বসন্তবাতাস
প্রবাহিত হয়েছেই, ঘনঘোর শ্রাবণের রাতে
মেঘে-মেঘে ঝরেছে আকাশ;
স্বর্ণবর্ণ তপনের কিরণসম্পাতে
মসৃণ সবুজ মাঠে হেসেছে তো হেমন্তের সোনালি শিশির;
গ্রীষ্মের প্রখর দিনে তীব্র আম্রমুকুলের ঘ্রাণে
ডালে-ডালে অজানিত পাখীদের ভীড়। (একচক্ষু)

এই কবিতায় কবির গভীর অনুভব শাশ্বত সংবেদনায় এক ধ্রুব বিশ্বাসে গিয়ে পৌঁছেছে। তিনি অনুভব করেছেন প্রকৃতিতে আনন্দ-আয়োজনের অভাব কখনো ঘটে নি কিন্তু মানুষ তাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে নি; ফলে তারা পতিত হয়েছে গভীর হতাশ্বাসে —

প্রকৃতিতে আয়োজন বরাবরই ছিল আর এখনো তো আছে
কুমারীর মতো তার অনেক প্রত্যাশা
আগন্তুক মানুষের কাছে;
প্রখর বিবেক-বাণ প্রাণে অবিরত,
আমরাই একচক্ষু, আমরাই ঘূর্ণাবর্তে গিয়েছি তলিয়ে
ক্ষ'য়ে-যাওয়া দগ্ধ চূর্ণ প্রস্তরের মতো, (ওই)

Dhaka University Institutional Repository

আমার দুর্গম-পথে শুধুমাত্র সে-মুখ নির্ভর।
এ-মুখ মসৃণ নয়, এ-মুখ নয়তো রমণীর,
জনতার শ্রমদৃপ্ত এ মুখের প্রশান্তি গভীর। (মুখ)

'১৯৩৭-'৪৭' কবিতায় লক্ষ করা যায় যুদ্ধবিধ্বস্ত ভয়াবহ দিনগুলোতেও কবি তাঁর প্রেমাস্পদার কথা ভোলেন নি। আকাশে বোমারু বিমানের আনাগোনা, যেখানে সেখানে মানুষের মৃতদেহ। এর মাঝেও কবি বলেন,

এখনো তোমার মনের খবর রাখি। (১৯৩৭-'৪৭)

অথবা

সুচরিতা মোর! তোমাকে ভুলিনি আমি।
বাহিরে আকাশে প্রলয় গভীর হয়।
আসে দুর্যোগ, তার চেয়ে বেশী দামী
হয়তো বিগত পুরানো প্রণয় নয়! (ওই)

কবি সমাজসচেতন। তাই প্রণয়ের চেয়ে মূল্যবান মনে করেন এই চরম দুর্যোগে আর্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোকে। কবি এখানে প্রেমকে স্থাপন করেছেন যুদ্ধের পটভূমিতেই এবং সম্মিলিত সংঘশক্তিকে দান করেছেন নবতর প্রতিষ্ঠা। একই পঙক্তির বারবার ব্যবহারে কবিতাকে এক অন্যতম উচ্চতায় স্থান করে দিয়েছেন তিনি।

'এখনো' কবিতার মধ্যেও প্রেমভাবনা বর্তমান। সমাজ ও সময়সচেতন কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত লক্ষ করেছেন —

আজ দেশে দেশে
রৌদ্রালোকে, অন্ধকার নিভৃত প্রদেশে
অবারিত তীব্র দ্বেষ, হননের সুর,
যেখানেই যাও শুধু রুদ্ধশ্বাস অসীম বিদ্বেষ,
এ যুগের লক্ষ্মী মূর্চ্ছাতুর। (এখানে)

আধুনিক সমাজের বিকার ও ব্যর্থতা এ সময়ের কবিমাত্রেই প্রকাশ করেছেন। এ কবিতায় দেখা যায় কবি নিসর্গ-প্রকৃতির মাঝে জীবনের মিল খোঁজ করছেন।

ঝলমলে রোদ আর এক ঝাঁক পাখী
তবুও তো মনে রাখি।
দিগন্ত প্রসারী ক্ষেত, আকাশের নীল
সবুজ পাতার ভীড়,
সদ্যোজাত তৃণাঙ্কুরে বর্ণ সুনিবিড়,
এ-সবের মাঝে খুঁজি জীবনের মিল। (ওই)

জীবনের মিল খুঁজতে খুঁজতেই কবি উপলব্ধি করেন তাঁর প্রেমাস্পদাকে তিনি এখনো ভালবাসেন। এখনো তার প্রতি তিনি আকর্ষণবোধ করেন। এই বোধ থেকেই তিনি প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। শ্রাবণের বৃষ্টি ঝরা রাতের কথা স্মরণ করে বলেন :

এখনো যে হাত রাখি হাতে;
এখনো আকাশে বাজে নক্ষত্রনূপুর,
রাতের হাওয়ার কম্প্র রাগরক্ত সুর,
রাত জাগি অশোকের পলাশের সাথে। (ওই)

Dhaka University Institutional Repository

এবং শেষে এক গভীর জিজ্ঞাসায় নিজেকে জড়িয়ে নিয়ে ঘোষণা করেন :

এখনো যে ভালোবাসি, এখনো যে আকর্ষণ আছে,
— কী প্রত্যাশা পৃথিবীর কাছে?
উন্মোচিত হৃদয়কে মেলে দিতে চাই
তৃণদলে, মৃত্তিকার কাছে। (ওই)

পাঁচ.

'স্বর ও অন্যান্য কবিতা' কাব্যগ্রন্থে কয়েকটি কবিতা আছে যেগুলোর বিষয়বস্তু বিচিত্র। এ ধারার কবিতাগুলো হচ্ছে : 'প্রতীক্ষা', 'এই চাঁদ' ও 'শারদীয়'।
'প্রতীক্ষা' কবিতায় লক্ষ করি কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

মেরু থেকে অন্য মেরু, সুমেরু শিখরে
ঘরে-ঘরে হাটে ও প্রান্তরে
সর্বত্রই জীবনের স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার বাণী, (প্রতীক্ষা)

ঘোষণা করার জন্যে 'বজ্রপাণি' দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতীক্ষায় আছেন। মূলত 'বজ্রপাণি' প্রতীকের আড়ালে কবি এই দুর্মর সময়ে ভারতবর্ষ তথা সমস্ত পৃথিবীর নিপীড়িত, নির্যাতিত, অসহায় মানুষের সমমর্মী কোনো নেতার প্রতীক্ষাতেই আছেন। যিনি এসে এইসব অসহায় জনতাকে সুদিনের পথ দেখাবেন। কবিকে তিনি কথা দিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে আগে কবির দেখাও হয়েছিল — যদিও এখন তিনি মনে করতে পারছেন না কোথায় দেখা হয়েছিল —

সে কি পলাশীর মাঠে? পাণিপথে?
সিপাহী যুদ্ধের দিনে? বেয়াল্লিশ সালে?
বর্গী হানা দিয়েছিল কবে? ক্লাইভের পঙ্গপালে
ভরেছিল আম্রবন; কেঁপেছিল শান্ত ভাগীরথী; (ওই)

ইতিহাসের অবতারণায় কবিতাটি অন্যরকম ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কবি-চিত্তের দৃঢ়তা পাঠকের মনেও সঞ্চারিত হয়। তখন সমস্বরে ঘোষিত হয় —

আসমুদ্র হিমাচল সুপ্তোত্থিত কুম্ভের মতন
ধীরে-ধীরে জেগে ওঠে বিশাল বাহিনী,
এখনো কি হয়নি সময়?
নির্দেশের অপেক্ষায়
দিন চলে' যায়;
নিত্য নব ঘটনার রক্ত লাগে সময়ের
রথের চাকায়,
প্রতীক্ষায় আছি বজ্রপাণি। (ওই)

'এই চাঁদ' কবিতাটি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের একটি চন্দ্র-মুগ্ধ কবিতা। এই চাঁদ কবির শৈশবে তাঁর কপালে টিপ পরিয়েছে, তখন দেখেছেন পূর্ণচাঁদের আগমনে পৃথিবীটা কেমন হেসে ওঠে। মানুষের মনের যত বিষাদ-গ্লানি, সংসারের একঘেঁয়েমি থেকে মুক্তি দিতে এই চাঁদ তুলনাহীন। কবি দেখেছেন :

অনেক যুবতী
অনেক গভীর ক্ষতি

Dhaka University Institutional Repository

সয়েছে তো যুগে-যুগে ক্ষমাহীন প্রেমের সংসারে;
অনেক যুবক
মাঝপথে ফেলে গেছে প্রতিরুদ্ধ হ'য়ে
সদ্যোজাত ফুলের স্তবক;
মধ্যরাতে চাঁদ দেখে মিটে গেছে অন্য যত সখ। (এই চাঁদ)

পৃথিবীর সমান বয়সী এই গোল রূপালি হলুদ চাঁদ যুগ-যুগান্তের প্রতিনিধি; অনেক ইতিহাসের সাক্ষি। কবির ভাষ্য :

যে কার্থেজ ভেঙে গেছে যে রোমের স্বপ্ন আর নেই
যে মিশর ভগ্নস্তূপে ভরা,
লুপ্তপ্রাণ মানুষের প্রতিনিধিরূপে যুগে যুগে
এই চাঁদ ছিল সেখানেই। (ওই)

কতো লক্ষ-কোটি বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে — তবু এই চাঁদ তেমনি অমলিন, শুভ্র-অকলঙ্ক!

পিতৃপুরুষের এক অনির্বাণ আশীষের মতো
চিরজ্যোতিঃ এই চাঁদ; (ওই)

অসূয়াশূন্য এই চাঁদ সমগ্র পৃথিবীর পরে পরম মমতায় দান করে অজস্র রূপালি আলো। পাহাড়-অরণ্য-সমুদ্র-সমতল, ফসলের মাঠ, কৃষিপল্লী, বেণুমতী তীর, পদ্মদিঘির পারে নির্মল প্রশান্তি আর স্নিগ্ধদীপ্তি নিয়ে সারারাত ধরে জেগে থাকে —

হিতাকাঙ্ক্ষী সুহৃদের বেশে,
মুছে নিয়ে গেছে যতো দিনান্তের জরা অবসাদ :
দীর্ঘপথে শূন্যক্ষেতে
কন্টকিত সংসারের পথে যেতে যেতে
নির্বিকার বিধাতার মতো
এই সেই চাঁদ। (ওই)

'শারদীয়' কবিতাটিতে কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত 'সবুজে-মোড়া সোনালী নীলে সুবর্ণ আশ্বিনের' আগমনের মধ্য দিয়ে নিসর্গ-প্রকৃতির মতো মানুষের মনেও যে আনন্দ অনুরণিত হয়ে ওঠে সে চিত্র তুলে ধরেছেন। নাগরিক কবির ভাষ্য :

শহরে থাকি, করেছি বসবাস
লোকের ভীড়ে, জীবন রুদ্ধশ্বাস
রুটিন-বাধা; সারাটা দিন ভরে'
অনেক গ্লানি, পথের মোড়ে-মোড়ে
কেবল বাধা, কেবল বালুর তাপ;
জীবন ভরেই কেবল মনস্তাপ। (শারদীয়)

শহরের এই বিস্বাদময় জীবনে কবি প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করেন নানা রকম ভণ্ড মানুষের ভণ্ডামি। তিনি দেখেন —

অনেকে চলে, ঘোর স্বদেশী সেজে
আসর জমায়, মাঠেতে ঠোঁট নেড়ে
লোককে ভুলায়, ক্ষুধার অন্ন মেরে। (ওই)

Dhaka University Institutional Repository

কবি অবাক হয়ে দেখেন এই ভণ্ডামিতে দেশের রক্ষক হিসেবে যাদের পরিচিতি সেই সব দণ্ডমুণ্ডের কর্তাব্যক্তিও জড়িত —

দণ্ডমুণ্ডের কর্তাকেও দেখি
শাসনযন্ত্র বাগিয়ে নিয়ে, মেকী
সেপাই-মন্ত্রী নিয়েই আছেন বেশ,
অসন্তোষের মেলেনা অবশেষ। (ওই)

এখানে প্রকৃতিমুগ্ধ কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন তিনি দায়বদ্ধ কবি — তিনি সমাজসচেতন। সমাজের কুলিশ-কুটিল এই ভয়াবহরূপ কবিকে বিষাদিত করে। এখান থেকে তিনি পরিত্রাণ পেতে চান। তাঁর হৃদয় খোঁজ করে 'নিগূঢ় কোনো নতুন জীবনের' আহ্বান। আর তখনই তিনি উপলব্ধি করেন —

সহসা যেন পুরোনো হাওয়া বয়!
হৃদয়মনে করে সে আনাগোনা
গানের সুরের উদার স্বর্ণকণা! (ওই)

তখনি কবির মন খুশিতে ভরে ওঠে। তাড়িত মনে তিনি সেই গানের সুরের ঝংকার অনুভব করেন।

অনেক কাল আড়ালে জ্বলে'-পুড়ে'
হৃদয় ভরে, আবার গানের সুরে
দগ্ধ পথে দখিন হাওয়া আসে
দরজা ঠেলে, সবুজ সোনা ঘাসে। (ওই)

কবি আশ্বান্বিত হন এই ভেবে যে, এ সমাজের এইসব কলুষতার মধ্যেও সোনাঝরা আশ্বিনের আবির্ভাব কখনো রুদ্ধ হয় না —

তবুও আসে সবুজে মোড়া-দিন
ঝড়ের আগে শেষের আশ্বিন। (ওই)

এই আশাবাদী মনোভাবই কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের কবি-মানস প্রবণতার অন্যতম লক্ষণ। আর এ কারণেই তিনি তাঁর সমকালীন অন্যান্য কবিদের থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

কবি কিরণশঙ্কর জানেন, কবিতা শুধু বিশেষ এক ধরনের ভাব নয়। কবিতাকে কোনো ছকে ফেলা ঠিক নয়। বিশুদ্ধ কবিতার প্রতি তাঁর সহজাত আকর্ষণ, সেই সঙ্গে ভগ্ন জীবনের সচেতনতা তাঁর মধ্যে এনে দেয় কবি হিসেবে এক পূর্ণতার স্বাদ। 'স্বর ও অন্যান্য কবিতা' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো পাঠ করলে বোঝা যায় কবির এই অনুভব শাশ্বত সংবেদনায় এক ধ্রুব বিশ্বাসে গিয়ে পৌঁছেছে। তাই তাঁর ভাষাতেও লক্ষ করি একটি ধ্রুপদী চেতনার ছাপ। আর ধ্রুপদী ভাবনার যথার্থ রূপ ফুটে ওঠে ধ্রুপদী ভাষাতেই। যেমন —

প্রকৃতিতে আয়োজন বরাবরই ছিল আর এখনো তো আছে
জলে স্থলে শূন্যে নীলে চিরন্তন ছায়া-শরীরিণী
নব-নব রূপে হানা দেয় বন্ধ হৃদয়ের বিবেকের কাছে,
অনেক নিভৃত রাত্রে শোনা যায় বিচিত্র কিঙ্কিনী। (একচক্ষু)

এ কবিতার সংযত অনুপ্রাস ও পঙক্তির মিল বিন্যাস আশ্চর্যভাবেই কবিচেতনার আনন্দকেই ধ্বনিত করে। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতায়ই কবি কিরণশঙ্করের এই জীবন্ত ভাষা ভঙ্গিমা লক্ষ করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository
সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একজন কবির মনোলৌকিক চিন্তা ও কল্পনার যে পরিবর্তন ঘটে, সেই পরিবর্তনসূত্রেই তাঁর কল্পলোক-সৃজিত অলংকারের গঠন ও বৈশিষ্ট্যে আসে বিপুল বৈচিত্র্য। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের পূর্বের কাব্যগুলোর মতো 'স্বর ও অন্যান্য কবিতা' গ্রন্থেও অলংকারের বিচিত্র সমাবেশ লক্ষণীয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ :

শব্দালংকার

সরল অনুপ্রাস :

১. বসন্ত বাতাসে দ্যাখ বিজড়িত সুকঠিন জাল। (আজ বসন্তে)

২. আবার আসে সবুজে-মোড়া দিন,
সোনালী নীলে সুবর্ণ আশ্বিন, (শারদীয়)

অন্ত্যানুপ্রাস :

১. দগ্ধপথে দখিন হাওয়া আসে
দরজা ঠেলে, সবুজ সোনা ঘাসে। (শারদীয়)

২. আজকে সবাই প্রাণ খুলে / চলি ঠিক পথে, নয় ভুলে।
নবীন আশার পাদমূলে
সবি তো সঁপেছি প্রাণ খুলে। (তিমিরহননের গান)

ছেকানুপ্রাস : নিস্তরঙ্গ বনস্থলী ক্রমেই বেড়েছে স্তব্ধ-রাত (এই চাঁদ)

শ্রুত্যানুপ্রাস :

ক খ : হৃদয় তোমার এখনো উতলা পাখী।
সুচরিতা মোর; সময় আসিল নাকি? (১৯৩৭-'৪৭)

চ ছ : ছুটেছে তো বারংবার আলেয়ার পিছু,
হয়েছে যে মাথা নীচু (এই চাঁদ)

অর্থালংকার

উপমা :

১. কৃষ্ণচূড়া শাখার পিছনে
আজো হাসে ক্ষীণকটি তৃতীয়ার চাঁদ
যুবতীর মতো। (যাত্রা)

২. এ যুগের রথচক্রতলে
আমরাও ইঁদুরের মতো। (স্বরণী)

৩. পিতৃপুরুষের এক অনির্বাণ আশীষের মতো
চিরজ্যোতিঃ এই চাঁদ। (এই চাঁদ)

৪. কখনো ফুলের ঘ্রাণ আমাদের প্রাণ ছোঁয় চুম্বনের মতো; (একচক্ষু)

উৎপ্রেক্ষা :

১. উপলব্ধি হয়েছে তখন / এ পৃথিবী হ'তো যদি চাঁদের মতন; (এই চাঁদ)

২. যান্ত্রিক জীবনে মন / কয়েদীর মতো যেন। (এখানে)

সমাসোক্তি :

স্বর্ণবর্ণ তপনের কিরণসম্পাতে
মসৃণ সবুজ মাঠে হেসেছে তো হেমন্তের সোনালি শিশির; (একচক্ষু)

Dhaka University Institutional Repository

ছন্দ

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের 'স্বর ও অন্যান্য কবিতা'য় বিচিত্র ছন্দের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তিনি মাত্রাবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত, গদ্যছন্দ, মুক্তক ছন্দে কবিতা লিখেছেন। বস্তুত চল্লিশের দশকের আঙ্গিক সচেতন কবিদের মধ্যে তিনি অন্যতম।

মাত্রাবৃত্ত : ১. জন-গণ-মন লক্ষ্যই যদি আসল হয়
টাটকা বুলির ব্যবসা করেই লোক মাতাও।
লক্ষ্যভেদের সহজ উপায় শক্ত নয়,
বাক্যের স্রোতে চায়না কিম্বা স্পেইনে যাও। (গলিত নখ)

২. এখনো তোমার মনের খবর রাখি।
দেখা হলো ফের অনেক দিনের শেষে।
আজ দেখা দিলে সেই অভিনব বেশে।
হৃদয় তোমার এখনো উতলা পাখী। (১৯৩৭-'৪৭)

গদ্যছন্দ : কৃষ্ণচূড়া শাখার পিছনে
আজো হাসে ক্ষীণকোটি তৃতীয়ার চাঁদ
যুবতীর মতো;
আর নীচে অন্ধকারে গভীর ছায়ায়
ষ্টেশনের ম্লান আলো কাঁপে
শীতল বাতাস এসে চলে' যায় দিগন্তের দিকে
অজ্ঞাত বিলাপে। (যাত্রা)

মুক্তক অক্ষরবৃত্ত ছন্দ :
হে হৃদয়
তৃষ্ণাতুর অন্ধকার নয়;
সত্তার গভীরে আনো চৈতন্যের মাঙ্গলিক দ্যুতি,
আনো অনুভূতি
আহত ইন্দ্রিয় 'পরে পুষ্পগন্ধে লক্ষ্যহারা প্রদোষবায়ুর; (নির্জন মুহূর্তের প্রার্থনা)

সনেট

'স্বর ও অন্যান্য কবিতা' গ্রন্থে ৫টি সনেট আছে, প্রতিটিই ১৮ মাত্রার। সনেটগুলো কবি রচনা করেছেন শেক্সপিয়ারের অনুসরণে এদেশীয় মিশ্রণ ঘটিয়ে। এগুলোতেও তিনি নানা রকম মিল দিয়েছেন। যেমন :

১. মিশ্ররীতি : কখ খক ঃ গঘ গঘ ঃঃ ঙচ ঙচ ঃ ছছ
সহরে সমস্ত ছায়া উন্মোচিত মুক্ত এত দিনে।
চৌরঙ্গীতে দীপালোক, ঝলকিত আহত নগরী।
অপগত দিনগুলি আজ ফের আনমনে স্মরি।
পুরাতন লুপ্ত আলো অবিলম্বে নিতে হয় চিনে।
দীর্ঘকাল অন্ধকারে হিংসামত্ত দীর্ণ পৃথিবীতে
কেটেছে অনেক রাত। বিমানের অশান্ত ঘর্ঘরে

Dhaka University Institutional Repository

দিখণ্ডিত হয়েছে আকাশ। বন্ধ্যা, শীতল মাটিতে
কঠিন হাড়ের স্তূপ, মানুষ না খেয়ে পথে মরে!

আলোকের উৎস-মুখ দিকে দিকে যায় তবু খুলে।
স্থগিত হ'লো কি যাত্রা রক্তস্রাবী সন্ত্রাসের আঁধারে?
বন্ধুরা অনেকে দেখি নিরুদ্দেশ আজ পথ ভুলে।
রজনীর অন্ধকার নিয়ে গেছে সন্ধ্যা তারকারে।
অনেক রাতের শেষে অতর্কিত অজস্র আলোকে
সহসা বিমনা হই, ঝড় ওঠে স্মৃতি-কল্পলোকে। (ব্লাক-আউট নেই)

২. বিশুদ্ধ শেক্সপিয়রিয়ান রীতি : কখ কখ ঃ গঘ গঘ ঃঃ ঙচ ঙচ ঃ ছছ

এখনো কেবল আমি সেই মুখ সর্বত্রই খুঁজি,
দুঃখের দুর্গম দিনে যেই মুখ হৃদয়গহনে
এনে দেয় ভরাভয়, প্রাণে ঢেউ তোলে সোজাসুজি,
যেমন বসন্ত আনে ক্ষীপ্র বেগ নির্বাপিত বনে।
আকাশে যখন মেঘ, সারাক্ষণ গুরু-গুরু ধ্বনি,
পথে ঘন অন্ধকার, হিমসিক্ত বাতাস কঠিন;
দেখেছি তো সেইমুখ, কেঁপে ওঠে অশান্ত ধমনী,
নাকে টানি হিম বায়ু, দেহে নামে বৃষ্টি-ঝরা দিন!

যখন দুঃসহ দাহে মেঘহীন আকাশ আমার,
বাহিরের অবজ্ঞায় হৃদয়ের চেতনা পাথর;
যতোদূর চোখ যায় দগ্ধপ্রাণ বিষণ্ন খামার,
আমার দুর্গম-পথে শুধুমাত্র সে-মুখ নির্ভর।
এ-মুখ মসৃণ নয়, এ-মুখ নয়তো রমণীর,
জনতার শ্রমদৃপ্ত এ মুখের প্রশান্তি গভীর। (মুখ)

সনেটকল্প কবিতা রচনায়ও কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর 'আজ বসন্তে' কবিতাটি ১৬ পঙক্তিতে বিস্তৃত ১৮ মাত্রার একটি সনেটকল্প কবিতা। বস্তুত বলা যায় 'স্বর ও অন্যান্য কবিতা'য় ভাষা, ছন্দ, উপমা, অলংকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে কবি কিরণশঙ্কর আপন মহিমায় উজ্জ্বল।

Dhaka University Institutional Repository

৪. দিনযাপন

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ 'দিনযাপন' ১৩৬৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে কলকাতার *কবিতা পরিষদ* থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয় তিরিশের প্রধান দুই কবি জীবনানন্দ দাশ এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্ত'কে। 'দিনযাপন' গ্রন্থভুক্ত কবিতাগুলোর শেষে সংযোজিত ইংরেজি সাল উল্লেখ থাকায় আমরা জানতে পারি কবিতাগুলো ১৯৫২ থেকে ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে রচিত। এর মধ্যে ১৯৫২-তে ১টি, '৫৩-তে ১টি, '৫৪-তে ২টি, '৫৫-তে ২টি, '৫৬-তে ৬টি, '৫৭-তে ১টি, '৫৮-তে ৪টি, '৫৯-এ ২টি, '৬০-এ ৩টি, ১৯৬১-তে ১৩টি, তারিখ বিহীন ৪টি কবিতা নিয়ে মোট ৩৯টি নতুন কবিতা; এবং কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'স্বপ্ন-কামনা'র ২টি ও তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'স্বর ও অন্যান্য কবিতা'র ৫টি কবিতা ধরে এ কাব্যগ্রন্থে সংকলিত কবিতার মোট সংখ্যা ৪৬টি। একনজরে বোঝার জন্যে নিচে ছকের সাহায্যে কবিতার রচনাকাল, কবিতার শিরোনাম ও সংখ্যা উল্লেখ করা হল :

রচনাকাল	কবিতার শিরোনাম	সংখ্যা
১৯৫২	'ভিজে কলকাতা'	১টি
১৯৫৩	'রাজা'	১টি
১৯৫৪	'দিনযাপন', 'হ্রদের শান্তি'	২টি
১৯৫৫	'কর্মেই আনন্দ খুঁজি', 'কেন এই আলোড়ন'	২টি
১৯৫৬	'কথা', 'বৃষ্টির পূর্ব মুহূর্তে', 'অনুষঙ্গ', 'স্তব্ধতায়', 'বিপ্রলব্ধা', 'নদী'	৬টি
১৯৫৭	'সে চায় প্রাণের পাত্রে'	১টি
১৯৫৮	'প্রবাহিণী', 'এই হাওয়া ফাল্গুনের', 'পিপাসা', 'অমায় পূর্ণিমা'	৪টি
১৯৫৯	'কবিতা মেলায়', 'দৃশ্যপট'	২টি
১৯৬০	'ক্রুদ্ধরাত্রি : বুদ্ধিজীবী ও প্রেমিক', 'অন্তরচেতনা', 'মৌমাছি অদৃশ্য হলে'	৩টি
১৯৬১	'রবীন্দ্রনাথ', 'পাখী', 'আলো : অন্ধকার', 'সুরের নিবিড়ে', 'প্রার্থিত স্বজন', 'আদিচেতনা', 'রূপান্তর', 'বন্ধুর বিশ্বস্ত হাত', 'একবার ভেবে দ্যাখো', 'লোকটিকে দ্যাখো', 'বিনীত উপায়ে', 'ধ্বনি, বর্ণ, গভীরতা', 'শান্ত বটের ছায়ায়'	১৩টি
তারিখ বিহীন	'দ্যাখো কতো দৃশ্য আছে', 'অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাগুলো', 'ভালোবাসা', 'নির্জনচেতনা'	৪টি

রচনাকাল	কবিতার শিরোনাম	সংখ্যা
'স্বপ্ন-কামনা' গ্রন্থের কবিতা	'হে ললিতা, ফেরাও নয়ন', 'স্বপ্ন-কামনা'	২টি
'স্বর ও অন্যান্য কবিতা' গ্রন্থের কবিতা	'প্রথম গ্রীষ্ম', 'স্বর', '১৯৩৭-'৩৯'[৩৮], 'এই চাঁদ', 'প্রতীক্ষা'	৫টি

'দিনযাপন' সম্বন্ধে কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের ভাষ্য এখানে স্মরণযোগ্য। আলোচ্য গ্রন্থের 'পূর্বাভাষ'-এ তিনি লিখেছেন :

> কবিতাগুলো দীর্ঘকালের ব্যবধানে রচিত এবং নানা পত্র-পত্রিকায় ইতিপূর্বে প্রকাশিত। সবগুলো কবিতারই রচনাকাল নির্দেশ করা হলেও বিষয়-বস্তুর বৈচিত্র্যরক্ষার জন্যে কবিতাগুলো ঠিক তারিখ অনুযায়ী সন্নিবেশিত করা সম্ভবপর হয়নি। পুরাতন এবং ইতিমধ্যে নিঃশেষিত দু'টি কাব্যগ্রন্থ থেকেও কয়েকটি কবিতা সংযোজিত হ'লো।

গ্রন্থটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ৪৬টি কবিতার মধ্যে ১৮টি কবিতাই বিশুদ্ধ সনেট। অমিত চক্রবর্তীকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সনেট রচনা প্রসঙ্গে কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত বলেছেন :

> ছন্দমিলের কবিতা পঞ্চাশ ও ষাট দশকে অনেক লিখেছি, বেশ কিছু সনেট ও সনেটকল্প কবিতাও এই সময়েই লিখেছিলাম।[৩৯]

কবির আত্ম-জীবনী 'সময় অসময়'-এও এ সম্বন্ধে স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন :

> এই সময় [পঞ্চাশের দশকে], কেন জানি না, চতুর্দশপদী কবিতার প্রতি আমার পক্ষপাত প্রবল হয়ে ওঠে এবং এই সময়কার বড়ো ছোট সব পত্রিকায়ই আমার চতুর্দশপদীগুলি ছাপা হয়েছে।[৪০]

সনেটগুলোর একটি তালিকা দেওয়া যাক :

রচনাকাল	কবিতার শিরোনাম
১৯৫২	'ভিজে কলকাতা'
১৯৫৩	'রাজা'
১৯৫৪	'হ্রদের শান্তি'
১৯৫৫	'কেন এই আলোড়ন'
১৯৫৬	'কথা', 'অনুষঙ্গ', 'স্তব্ধতায়', 'নদী'
১৯৫৮	'এই হাওয়া ফাল্গুনের', 'পিপাসা', 'অমায় পূর্ণিমা'
১৯৬০	'মৌমাছি অদৃশ্য হলে'
১৯৬১	'পাখী', 'আলো : অন্ধকার'
তারিখ বিহীন	'অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাগুলো', 'ভালোবাসা', 'নির্জনচেতনা'
'স্বর ও অন্যান্য কবিতা' গ্রন্থের (১৯৪৫)	'প্রথম গ্রীষ্ম'

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে ১৯৬১ রচিত কবির সর্বাধিক ১৩টি কবিতা এ গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে মাত্র দুটিই সনেট, তবে সনেটকল্প কবিতা আছে কয়েকটি। ১৯৫৭ এবং ১৯৫৯ সালে একটিও সনেট নেই। তবুও এর আগের তিনটি কাব্যগ্রন্থের কোনোটিতে একত্রে এতগুলো সনেটের দেখা মেলে নি। সে হিসেবে 'দিনযাপন' স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। 'দিনযাপনে'র স্বাতন্ত্র্য এর নামকরণ এবং সংকলিত কবিতার বিষয়বৈশিষ্ট্যেও পরিলক্ষিত।

স্বাধীনতা-উত্তর পঞ্চাশের দশকে পশ্চিমবঙ্গে নতুন পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার উদ্ভবে সামাজিক অস্থিরতার সূত্রপাত ঘটে। ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক কাঠামোর যে-অসংগতি এতদিন বিরাজ করছিল, দেশবিভাগ সেই অসংগতিকে আরো প্রকট করে তুলল। 'সামাজিক জীবনে শাসনতন্ত্রের প্রভাব হাজারগুণ বৃদ্ধি পেল। সেই সঙ্গে, প্রদেশ ছাপিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার মানদণ্ড প্রধান হয়ে উঠলো। কেন্দ্রকে পাশে সরিয়ে রেখে, নিছক প্রদেশের প্রাক্তন স্বয়ংভরতায় নিরালম্ব থাকা অতঃপর অসম্ভব : রাজনীতিতে ভারতীয় চেতনা অন্য-সমস্ত আবেগকে ঢেকে-মুছে দিতে শুরু করলো। সাংস্কৃতিক-সামাজিক মূল্যবোধও সেই সঙ্গে আস্তে-আস্তে বদলে যেতে লাগলো। [...] [...] কেন্দ্রীভূত শাসনতন্ত্র, বাংলারও অতএব রেহাই পাবার কোনো পথ ছিল না। রাজনীতির ছাপ জীবনধারাকে গড়ে, সমাজের চেতনাকে দুমড়ে-মুচড়ে দেয়। তা ছাড়া, স্বাধীনতার ঠিক পরে পশ্চিম বাংলার মস্ত দুঃসময় গেছে। দেশভাগের ফলে ভারতবর্ষের রাজনীতির কাঠামোয় বাংলার উপযোগিতা খর্বিত, কংগ্রেস দলের মধ্যে বাংলার নেতাদের পরিসর সংকুচিত, শরণার্থী সমস্যায় প্রদেশটি বিব্রত-জর্জরিত, হীনমন্যতার গ্লানি এই অবস্থায় অচিরে বাঙালি-মানসে পরিব্যাপ্ত হলো'।[৪১] এ পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ যে অর্থনৈতিক-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা কাটিয়ে কতটা মুক্ত মানবিক আদর্শে পৌঁছতে পারবে তা নিয়ে বেশ সন্দেহ ও অবিশ্বাস দেখা দিল। তবে একথাও স্মরণযোগ্য যে, 'নেহেরু-উদ্ভাবিত দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সামাজিকীকরণ (Socialisation of the economic structure) দেশবাসীর মনে এক ধরনের প্রত্যাশা জাগিয়ে রেখেছে। নেহেরু-উদ্ভাবিত ওই তত্ত্বে একটা নতুন সমাজ বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন অক্ষুণ্ন ছিল। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নতুন চীনের অভ্যুদয় এবং ঔপনিবেশিকতার কবল থেকে আফ্রিকা ও এশিয়ার অধিকাংশ দেশের মুক্তি — এই সময়ে দেশের বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের মনে জাগিয়ে তুলেছিল নতুন এক পৃথিবীর স্বপ্ন। শুধু ভারত নয়, তৃতীয় বিশ্বের অনেক রাজনীতিকের মনেই জেগে উঠেছিল এই মুক্তির বোধ'[৪২]। সবমিলিয়ে পঞ্চাশের দশকে বাংলাদেশের কবি-সাহিত্যিকগণ একপ্রকার সদর্থক-চেতনা ও নেতিবোধের দ্বারা আন্দোলিত হয়েছেন। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে স্বাধীনতা সংগ্রামকে ঘিরে যে আকাঙ্ক্ষায় জেগে উঠেছিলেন তাঁরা, তাঁদের সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হল না। যে সকল একরৈখিক স্বচ্ছ আশাবাদ এতদিন তাঁদের চেতনায় বিরাজ করছিল তা সরে গিয়ে তাই এসময় থেকেই তাঁদের রচনায় জটিল দায়বদ্ধ কবিতার আবির্ভাব ঘটতে থাকে। তবে তা রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা নয়, সামাজিক বিষয়াবলিই হয়ে উঠল তাঁদের কবিতার প্রধান উপজীব্য বিষয়। সামাজিক

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়াবলির মধ্যে ঢুকে গেল একান্ত ব্যক্তিগত অনুষঙ্গ — করুণ-রঙিন প্রেম, স্নিগ্ধ-উজ্জ্বল নিসর্গ, স্পৃহাশূন্য জীবন, বিষাদ, নৈরাশ্য ইত্যাদি। কবি নিজেই হয়ে উঠলেন কবিতার কেন্দ্রবিন্দু। তাঁর কবিতায় প্রাধান্য পেল স্বগতাচার এবং ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ। পূর্ববর্তী দশকের সহজ-সরল একমুখী আশাবাদের পরিবর্তে সমাজ-সম্পৃক্ত অস্তিবাদী কবিতায় কবিচিত্তের সকরুণ বেদনার্দ্র ক্ষুব্ধ প্রতিধ্বনি শোনা গেল। কখনো বা ফুটে উঠল স্বেদ ও শোণিতের অবিরল ক্ষরণ, অন্তহীন সংগ্রামের ক্লিষ্ট প্রতিচ্ছবি।

কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের 'দিনযাপন' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলোতে উপর্যুক্ত সমস্ত লক্ষণেরই প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। আলোচনার সুবিধার্থে 'দিনযাপন'-এর কবিতাগুলোকে সুনির্দিষ্ট পাঁচটি ধারায় ভাগ করা হল। যেমন :

এক. আশাবাদ
দুই. জীবনভাবনা
তিন. প্রেম
চার. নিসর্গ-প্রকৃতি
পাঁচ. বিবিধ

এখানে উল্লেখ্য যে, 'দিনযাপন'-এ কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের প্রথম ও তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ থেকে চয়নকৃত 'হে ললিতা, ফেরাও নয়ন', 'স্বপ্ন-কামনা', 'প্রথম গ্রীষ্ম', 'স্বর' '১৯৩৭-'৩৯', 'এই চাঁদ' ও 'প্রতীক্ষা' কবিতাগুলো যেহেতু পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, সেহেতু এ পর্যায়ে পুনরালোচনা করা হয় নি।

এক.

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের কবিমানসের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আশাবাদ। তাঁর পূর্ববর্তী কাব্যগুলোর মধ্যে আমরা সেটা লক্ষ করেছি — 'দিনযাপন'-এও সে ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়েছে। এই কাব্যগ্রন্থের প্রায় সব কবিতার মধ্যেই কবির আশাবাদী মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। তবে উল্লেখযোগ্য আশাবাদী কবিতাগুলো হচ্ছে : 'রবীন্দ্রনাথ', 'দিনযাপন', 'কর্মেই আনন্দ খুঁজি', 'প্রবাহিণী', 'নদী', 'প্রার্থিত স্বজন', 'অমায় পূর্ণিমা', 'দ্যাখো কতো দৃশ্য আছে', 'হ্রদের শান্তি'।

'দিনযাপন' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা 'রবীন্দ্রনাথ'। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এটি রচনা করেছিলেন। একই উপলক্ষে কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে সম্পাদনা করেছিলেন 'শতাব্দী শতক' (১৯৬১) নামে একটি কাব্যসংকলনও।

'রবীন্দ্রনাথ' কবিতায় জীবনের নানান ভাবনার দোলাচালের মধ্যেও কবির আশাবাদ ধ্বনিত হয়েছে। 'যন্ত্রণায় নিত্যবিদ্ধ অহরহ' জীবন যখন 'মৃত্যুর সময় এলো ভেবে' 'ভেঙে ভেঙে পড়ে তীব্র মুহূর্ত-লীলায়' — তখন কবির আশাবাদী মন অনুভব করে অলক্ষে কারো অলৌকিক ছোঁয়ায় 'পূর্ণ করে গর্ভকোষ স্পর্শধন্যতায়'। আর তাই —

Dhaka University Institutional Repository

বিনষ্ট নায়ক ফের ঘরে ফেরে
সমুদ্র হাওয়ার চেতনায়
সঞ্জীবিত হয়ে। আশ্বাসের তীর
দেখতে পেয়েছে তাই আজকের চাওয়ায়
পূর্ণ হয়ে ফিরবেই, তার লক্ষ্য স্থির। (রবীন্দ্রনাথ)

ফলে বিষণ্ন অপ্রেম থেকে প্রেমের জগতে অনবদ্য অব্যক্ত গভীরে একটা সাড়া জেগে ওঠে এবং কবিতার শেষ স্তবকে ধ্বনিত হয় কবির আশাবাদ,

কোরকে কোরকে জাগে জীবনের স্তুতি,
বিচিত্র সৃষ্টির গুপ্ত অদৃশ্য গহ্বরে
জনমে মরণে আনে প্রণয়ের আশ্চর্য প্রস্তুতি;
অভ্রান্ত ইশারা। (ওই)

'দিনযাপন' শীর্ষক কবিতায় দেখি যুদ্ধ-বিধ্বস্ত পৃথিবীর সকরুণ চিত্র।

কোরিয়ায় তাইয়ানে ইন্দোচীনে মালয়-জঙ্গলে
ষড়যন্ত্র চলে রোজ; বর্বরের লালসার স্তূপে
রক্ত ঢালে নির্বিরোধ অজস্র শহীদ অবিরাম। (দিনযাপন)

এবং এর ফলশ্রুতিতে,

মাঠে-মাঠে বজ্রাহত লোক
বেকারির ঘূর্ণাবর্তে খাবিখেয়ে বিমর্ষ মিছিলে
বারংবার ভিড় করে, ঝলকিত করে বিশ্বলোক
সর্বস্বান্ত পণ্ডশ্রমে, কৃষ্ণছায়া অবরুদ্ধ নীলে। (ওই)

এ পরিস্থিতিতে কবি কিরণশঙ্কর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে শূন্যে প্রশ্ন করেন 'কী তবে আমার কাজ?' তাঁর সামনে শুধু অন্ধকার। তাই দীর্ণপ্রাণ কবির ভাষ্য :

অন্ধকারে যে দিকে তাকাই
নিষ্ফল জোনাকি ছাড়া অন্য কোনো আলোর মশাল
রিক্ত প্রাণে আনে না আশ্বাস; (ওই)

ব্যর্থকাম, রুদ্ধরতি কবি তাই বল্লাছাড়া দিনে দিগন্তে তাকিয়ে একটু আশ্বাসের খোঁজে রুদ্ধশ্বাস হয়ে ঘুরে ঘুরে পরিশ্রান্ত হন। শুনতে পান ইউরোপে এশিয়ায় 'ক্রান্তি'র ক্রুদ্ধ বর্শার আঘাতের আর্তনাদ। আশাবাদী বেদনাবিহ্বল কবি তবু আপন কর্তব্য খুঁজে ফেরেন নিজ আবদ্ধ নগরে। এই দুঃসময়ের অবসান কামনা করে নিদ্রাহীন রাত্রি যাপন করেন, লুপ্তপ্রায় স্বস্তির সন্ধানে কল্পনায় ছুটে বেড়ান পথে মাঠে তেপান্তরে। এবং অবশেষে,

বহুদূরে শোনা যায় যেন
গর্জন উচ্ছ্বাসে জাগে অন্ধকারে সমুদ্র সফেন
অন্বিষ্ট প্লাবনবেগ; (ওই)

কবির স্বপ্ন-কল্পনা, পরিশ্রম সার্থক হয়। তিনি শুনতে পান নব-অভিযাত্রীদের অন্ধকার ভেঙে এগিয়ে চলার আশাবাদী দৃঢ় পদক্ষেপ। কবির ভাষায় :

কারা দৃঢ় পদক্ষেপে বেগে
সম্মুখে এগোয় পথে রাত্রি শেষে মরীয়া আবেগে

Dhaka University Institutional Repository

দীর্ঘ দৃপ্ত অভিযানে; সেগতির উত্তাপ মননে
অকৃত্রিম অভিজ্ঞান সৃষ্টি করে যুগসন্ধিক্ষণে। (ওই)

কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত কাজ খুঁজে পান। এবং উপলব্ধি করেন 'কর্মেই আনন্দ শুধু'। কেননা কাজের মাধ্যমেই জঞ্জালের গর্ভকোষ হতে জন্মে বীজ, জন্মে আশা, জন্মে নতুন প্রাণের অঙ্কুর বিচিত্র স্পন্দনে ও ছন্দে। 'কর্মেই আনন্দ খুঁজি' কবিতায় কবি লক্ষ করেন কাজের আনন্দে মানুষের অজ্ঞাত বিবরে আশাদৃপ্ত চেতনা বিস্তারিত হয়। সৎ, সৃষ্টিশীল কাজের জন্যে

লক্ষ-লক্ষ দীর্ঘবাহু সাড়া দেয় পৌরুষ বিক্রমে
গ্রামে-গ্রামে দেশে-দেশে শহরে-শহরে। স্তূপজমে
পুরনো স্মৃতির গর্ভে নতুন সৃষ্টির। আর্ত মন
যে-সময়ে চমকায় বিচিত্র স্পন্দনধ্বনি শুনে
শুকনো মাটির বুকে; সে-সময়ে পাষাণের ভার
বুক থেকে সরে যায়; কর্মদীপ্ত পদক্ষেপ শুনে
তৃষ্ণাদীর্ণ মনে নামে উদ্যোগের প্লাবিত জোয়ার। (কর্মেই আনন্দ খুঁজি)

এ কবিতায় সম্মিলিত কর্মের সাফল্যগাথা রচনা করেন কবি। কবির মতে,

সর্বত্র সৃষ্টিকে ঘিরে সমষ্টির শ্রেষ্ঠ অঙ্গীকার।
একক বিভ্রান্তি নয় সহস্রের স্বপ্নেই স্পন্দিত
সুচেতন এ-চেতনা; (ওই)

কবি সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী কর্মের আনন্দ যজ্ঞের বিস্তৃতি দেখতে পান। তিনি লক্ষ করেন রাজপুতনায়, রাজস্থানে, বিদর্ভে, মালয়ে, গঙ্গা অববাহিকায়, ধ্যানশুভ্র স্তব্ধ হিমালয়ে, গুজরাটে, বিন্ধ্যাচলে — সর্বত্রই প্রাণের সঞ্চয়ে স্পন্দমান স্বপ্ন কাঁপে। সাধনায়, সদাহিতব্রতে ও নবমূল্যবোধে ত্রাণের ঘোষণা উচ্চারণ করে,

বৃদ্ধ, শিশু, তরুণ-তরুণী কিংবা যুবক-যুবতী
সচেতন অঙ্গীকারে জীবনের অবক্ষয় রোধে
একপ্রাণ, একমন, দিকে দিকে সহিষ্ণু পদ্ধতি
রোধ করে তীরে-তীরে সর্বগ্রাসী ভাঙনের ক্ষতি। (ওই)

শব্দের শৈল্পিক কারুকাজে কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত 'কর্মেই আনন্দ খুঁজি' কবিতায় তীব্র আশাবাদ ফুটিয়ে তোলাতে অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। আশাবাদের এই ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যায় 'প্রবাহিণী' কবিতায়। প্রবল আশাবাদী কবিকে এখানে বলতে শুনি :

কেবল হতাশা-স্তূপ জড়ো তুমি ক'রোনা প্রেমিক! (প্রবাহিণী)

কেননা জীবন তো হতাশাব্যঞ্জক নয়। এখানে 'যে সয় সে বেঁচে থাকে'। এখানে কর্মের মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত করে নিতে হয় নিজের স্বপ্ন সাধ। তাই কবি হতাশাগ্রস্ত প্রেমিককে আশ্বস্ত করে বলেন,

এখনো সময় আছে ফসলের:
রিক্তগাছে পাতা ফুলে ফলে
একদিন পূর্ণ হবে, একদিন প্রেমিকার চুলে

Dhaka University Institutional Repository

বন্যাঢেউ জাগবেই গভীর আর্তির অবসানে;
ভীরু চোখ আবার নির্ভীক
হবে স্নিগ্ধ দীপের উদ্ভাসে। (ওই)

কবির এই আশাবাদী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় 'নদী' কবিতার মধ্যেও। যখন 'সম্মুখপথে শীতাতপে প্রচ্ছন্ন দুর্গতি' 'তাপিত মোমের মতো গলে' আর 'সংরক্ত যৌবন মাথা কোটে অদৃশ্য দেয়ালে' — তখন কবি লক্ষ করেন কোনো এক গোপন সত্তা শেষ আয়োজনের মূর্তি গড়ে তুলছে। তবে কবির মতো যারা আশাবাদী তারা হতোদ্যম হয়ে বসে নেই। তারা আশা করে এই গুমোট নৈরাশ্যের অদূরে আছে 'প্রসারিত কল্লোলিত নদী', তাই তারা —

ঝলসানো মুখে হাঁটে কাঁটাবন সমুখে জেনেই! (নদী)

এবং

যন্ত্রণায় মন্ত্রণায় অব্যাহত সেই দিকে গতি। (ওই)

নৈরাশ্য থেকে, নিষ্ক্রিয়তা থেকে আশাবাদের দিকে এই অব্যাহত যাত্রা 'প্রার্থিত স্বজন' কবিতাটিতেও পরিলক্ষিত হয়। কবি নিজের হৃদয়কে বলেন :

শুধু প্রতিধ্বনি হয়ে থেকো না হৃদয়। চারপাশে
প্রচলিত শব্দ বর্ণ রঙের আড়ালে একবার
খুঁজে দ্যাখো কোন্‌খানে প্রার্থিত স্বজন। (প্রার্থিত স্বজন)

কবির ধারণা হয়তো তাঁর কোনো আপনজন (বিশেষ অর্থে বিপন্ন প্রত্যেক ভারতবাসীই কবির আপনজন) সুদিনের আকাঙ্ক্ষায় দিকভ্রান্ত হয়ে প্রত্যহ করাল আয়ুর গভীরে ডুবে যাচ্ছে। কেননা এখানে সব সুসজ্জিত সুন্দরের মধ্যেই নিষ্ঠুরতা লুকানো।

রম্যদৃশ্যে সাজানো বাগানে
কেউ কেউ সুখী ফুল, কিন্তু তুমি, আমার হৃদয়,
শুধুমাত্র প্রতিধ্বনি হয়ে আর থেকো না এখানে
অস্বস্তির দীর্ণলোকে। (ওই)

এ কবিতায় কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত কবিতার ঐতিহ্যে প্রাচীন এবং বহু ব্যবহৃত দুটো প্রতীকের ব্যবহারে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। একটি শান্ত, দৃঢ়তাময়, সজীব ও আস্থার প্রতীক বৃক্ষ — যার মধ্যে কবি ফুটিয়ে তুলেছেন প্রথাসিদ্ধ জীবনের পরিশুদ্ধ নির্লিপ্ততা; অপরটি শঠ, সুন্দর, প্রতারক কোকিল — যার স্বার্থপরতার চারিত্র্যে কবি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, বিষণ্ন। তাই বারবার তিনি নিজের মনকে সমুত্তীর্ণ করেন কলুষমুক্ত আশাবাদের দিকে। আপন হৃদয়কে বলেন অস্বস্তির দীর্ণলোক থেকে বেরিয়ে এসে :

থাকো মগ্ন স্বজন-সন্ধানে
আপন ধ্বনির সেই প্রার্থিত ও নির্ভীক রণনে
যা ঐশ্বর্য, যা আপন, তোমার সংবৃত ধমনীর। (ওই)

'অমায় পূর্ণিমা' কবিতায় দেখতে পাওয়া যায় পঞ্চাশের দশকের বেদনাক্লিষ্ট বিপর্যস্ত জীবনের একটুকরো ছবি। সামান্য একটি দুটি রেখায়, সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে সমস্যাসঙ্কুল জীবনের ক্ষুব্ধ মনোভাব কবি অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন এ কবিতায়।

Dhaka University Institutional Repository

মুখ তার ঝলসানো। বুকে ক্ষুব্ধ বোবা অন্ধকার।
চৈত্র বা ফাল্গুন এসে ছড়ায়নি অশোক পলাশ। (অমায় পূর্ণিমা)

অথবা

শেফালীরঞ্জিত হাতে এই পথে আসবে কি কেউ
জানে না সে। প্রিয়তম সম্ভাষণে নিরুচ্চার গানে
অন্ধকার নদীপথে কবে যে জাগবে নীল ঢেউ
জানে না সে। (ওই)

কবি জানেন এই হতাশ্বাসের উৎস কোনখানে। দেশের আর্থ-সামাজিক সমস্যাই এই নেতিবোধের প্রধান কারণ। তবু সমাজ ও সময়ের কাছে দায়বদ্ধ কবি অস্ফুট আর্তস্বরে কবিতায় পূরিত করে দেন সমসাময়িক জীবনের ক্লিষ্ট প্রতিচ্ছবি।

সে কেবল অবিরত মুগ্ধ আত্মদানে
স্বেদ ও রক্তের ছোপে পদচিহ্ন পথে রেখে যায়
প্রতিধ্বনি প্রহত প্রহরে। (ওই)

কিন্তু কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত আশাবাদ থেকে কখনো বিচ্যুত হন না। সে কারণেই লক্ষ করি পরিণামে 'অমায় পূর্ণিমা' সনেটটি উত্তীর্ণ হয়ে যায় আশাবাদী ব্যঞ্জনায়।

স্বপ্নভঙ্গের বিস্বাদে
বিবর্ণ, পাণ্ডুর, তবু ছড়াবে সে দুই হাতে ক্ষমা;
সর্বস্বান্ত আত্মদানে জাগায় সে অমায় পূর্ণিমা। (ওই)

বস্তুনিষ্ঠ জাগতিক ভাবনা থেকে কবি-চেতনা গভীর অন্ধকারে ঝলমলে আলোর সম্ভাবনা জাগিয়ে তোলেন।

'দ্যাখো কতো দৃশ্য আছে' কবিতায় কবি কিরণশঙ্কর বারবার সকলের দৃষ্টি পৃথিবীর নানান রম্য ও মনোরম দৃশ্যাবলির দিকে আকৃষ্ট করতে চেয়েছেন। যেখানে কবি নিজেই জানেন —

অথচ অসুখ
সহস্র পোকার মতো কিলবিল করে চেতনায়;
এবং উকুনগুলো সাড়া দেয় অস্থিতে, মজ্জায়
পাঁজরের হাড় ভাঙে, ভাঙে অর্গলিত বন্ধ্য বুক।
(দ্যাখো কতো দৃশ্য আছে)

এখানে অসুখী সংসার উপগতা কুমারীর মতো অন্ধ তৃষ্ণার্ত স্মৃতির বিষণ্ন আঁচলখানি বুকে জড়িয়ে সবার অন্তরালে লুকিয়ে থাকার চেষ্টায় রক্ত ঝরায়। আর,

কেবল জাগায় তৃষ্ণা প্রতিশ্রুত শিল্প-ভাবনার। (ওই)

আশাবাদী কবির মনে তাই প্রত্যহের সর্ব পরাভবের মাঝেও পরম স্নিগ্ধতায় জেগে ওঠে ম্লান আশা। তিনি লক্ষ করেন ফাল্গুনের তীব্র হাওয়াও সেই প্রত্যাশায় সাড়া দেয়। ফলে দেখা দেয় —

ঝরাপাতা স্তূপ ভেঙে গাছে গাছে সবুজের রেখা; (ওই)

'হ্রদের শান্তি' কবিতাটির প্রতিটি চরণেই ধ্বনিত হয়েছে কবির শান্ত, সুস্থিত আশ্বাস-বাণী। যারা সময়ের দুরন্ত আহ্বানে ছুটে ক্লান্ত, অবসন্ন অথবা কুলিশ-কুটিল এই সংসার যন্ত্রণায় যারা চরম হতাশাগ্রস্ত —হ্রদের কাছে আসার আহ্বান জানিয়ে তাদেরকে লক্ষ করেই কবি বলেন —

Dhaka University Institutional Repository

যদি বা কখনো আলো-ছায়াচ্ছন্ন নিভৃত বিকেলে
যখন ছড়ায় সূর্য শান্ত জলে মুঠি-মুঠি সোনা,
বিসর্পিল পথে যেতে বুকে বাজে রাগিণী অচেনা,
দেখবে এখানে এসে অন্ধকারে অবশেষে পেলে
দু'দণ্ডের কী সান্ত্বনা: (হ্রদের শান্তি)

হ্রদের দুই তীরে সুবাসিত ফুলের ঘ্রাণ, চারদিক গাছপালাময় আদিম ঐশ্বর্যে সুসজ্জিত; হ্রদের অদূরেই আছে পুরোনো মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত অবিচল বিষ্ণুমূর্তি — যিনি অভয় জোগান মানুষের নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রার। তাই কবির ভাষ্য :

কর্মহীন নির্জন প্রহরে
আশ্বাস-আনত চোখে শান্তি নামে; জলে স্নিগ্ধ স্নানে
পরিতৃপ্ত পরিপ্লুত, — মনে হবে নিয়ে যাই ঘরে
প্রশান্তির স্বর্ণকণা। (ওই)

কবির বাক্যমোহে আমরাও মুগ্ধ হয়ে যাই। মনে-প্রাণে ছুটে যাই সেই শান্ত, সুস্নিগ্ধ হ্রদের তীরে, স্তব্ধ বনতলে। বুক ভরে টেনে নিই সুভাসিত নির্মল বায়ু। এবং উপলব্ধি করি,

জলের হাওয়ার তীব্র টানে
প্রাণে জাগে কিশলয়ে: (ওই)

ফলে এখানে অর্জিত শান্তির আবর্তে উচ্ছল হয়ে ফিরে আসি পুনরায় কঠোর কঠিন সংগ্রাম মুখর প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায়। মনে থাকে হ্রদের কাছে পাওয়া দুদণ্ড শান্তির আশ্বাস।

দুই.

'দিনযাপন' কাব্যগ্রন্থের প্রায় সব কবিতারই উৎস পঞ্চাশের দশকের পরিপার্শ্ব-সচেতন জীবনের গভীরতাবোধের অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত। কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত দায়বদ্ধতার প্রতি সমর্পণ সত্ত্বেও অনেকটা যেন জীবনানন্দ দাশের অনুসরণে জীবনের শূন্যতা, অবসাদ, ক্লান্তি, বিচ্ছিন্নতাবোধের আশ্রয়ে এ সময়ের কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন মধ্যবিত্ত মানসচেতনার এক অনিবার্য পরিণাম। কবির ব্যক্তি জীবনের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা ছোট ছোট বাক্যে প্রতিদিনের মুখের ভাষার ব্যবহারে কবিতাগুলোতে এসেছে প্রকাশভঙ্গির নতুনত্ব। এ পর্বের কবিতাগুলো হচ্ছে : 'রবীন্দ্রনাথ', 'রাজা', 'দিনযাপন', 'কর্মেই আনন্দ খুঁজি', 'ভিজে কলকাতা', 'স্তব্ধতায়', 'পিপাসা', 'ক্রুদ্ধ রাত্রি : বুদ্ধিজীবী ও প্রেমিক', 'সুরের নিবিড়ে', 'আদি চেতনা', 'বন্ধুর বিশ্বস্ত হাত', 'লোকটিকে দ্যাখো', বিনীত উপায়ে', 'ধ্বনি-বর্ণ-গভীরতা', 'মৌমাছি অদৃশ্য হলে', 'দৃশ্যপট', 'শান্ত বটের ছায়ায়', 'নির্জন চেতনা।

'রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক কবিতার শুরুতেই দেখতে পাওয়া যায় কবির কৌশলী 'প্রয়োগে' আর জোড়া জোড়া শব্দের ব্যবহার চাতুর্যে এবং টুকরো টুকরো গল্পে জীবনবোধের সমগ্রতা প্রকাশ পেয়েছে।

কে ছড়ায় অবিরাম ঢেউ। তটে তটে আনে
বিচিত্রিত কুজ্ঝটিকা; ভেঙে ভেঙে রাতের তুষার

Dhaka University Institutional Repository

অল্পে অল্পে জাগায় জোয়ার
বিষণ্ন নদীর বাঁকে, বেদনার্দ্র-রাতের তিমিরে,
অনবদ্য অব্যক্ত গভীরে। (রবীন্দ্রনাথ)

এখানেই দেখতে পাই খেলাচ্ছলে অচিহ্নিত উদ্যোগের স্তরে স্তরে মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে অবিরাম বাসনার রক্তজবাগুলো বসন্তে–শরতে হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে নিত্যবিদ্ধ যন্ত্রণায় অহরহ আত্মাহুতির প্রস্তুতি নেয়। এবং

অতৃপ্তির কান্নাভেজা হেমন্ত বিকেলে
গনগনে আগুনের কাছে চোখ মেলে
মাঠের অশ্বত্থকোণে বিমর্ষ ভিখারী
কঠিন গভীর রাতে
অসহ্য হাওয়া বুকে নেবে ব'লে
বসে থাকে।
[...]
মনের গহনে তবু নানা অনুমানে
ভেঙে ভেঙে রাতের তুষার
কে এই কোকিল বারবার
বিস্মৃত বসন্ত-স্মৃতি জাগায় যে গানে
অন্ধকার মাঠে ঢেউ তুলে
সাড়া আনে
অচেতন নির্বাত গহ্বরে। (ওই)

আবার কখনো লক্ষ করি,

কী এক আবেগ
নিপুণ যন্ত্রীর মতো সচ্ছন্দ অভ্যাসে
অপ্রেমপীড়িত বুকে
বিদ্যুতের চিড়-খাওয়া গভীর গহনে
বাজায় সেতার।
[...]
বুকের গহন কোণে ছবি আঁকে নানা
অনবদ্য মহিমায়
ছড়ায় চামেলী-যুঁই নানা ভঙ্গিমায়
জাতিস্মর জীবন-চেতনা। (ওই)

এ কবিতায় স্বাধীনতা পরবর্তী দেশকালগত প্রেক্ষাপটযুক্ত জীবনচেতনা কবির ব্যক্তিচেতনার সঙ্গে জড়িত হয়ে দূর অতীত এবং বর্তমানের প্রতিভাস, অনুভূতি ও চিত্রকল্পের সাহায্যে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। জীবনের নানান ভাবনার দোলাচাল এ কবিতায় সদর্থক চেতনা ও নেতিবোধের দ্বারা সংক্রমিত হয়েও শেষ পর্যন্ত অস্তিবোধে পরিণতি লাভ করেছে। শেষ স্তবকে তাই ধ্বনিত হতে শুনি —

কে যেন ছড়ায় ঢেউ।
ভেঙে ভেঙে রাতের তুষার
বেদনার্দ্র তিমিরেও কেউ

Dhaka University Institutional Repository

জাগায় জোয়ার।
বিষণ্ণ অপ্রেম থেকে প্রেমের জগতে
অনবদ্য অব্যক্ত গভীরে
অহরহ জাগে সাড়া,
কোরকে কোরকে জাগে জীবনের স্তুতি,
বিচিত্র সৃষ্টির গুপ্ত অদৃশ্য গহ্বরে
জনমে-মরণে আনে প্রণয়ের আশ্চর্য প্রস্তুতি;
অভ্রান্ত ইশারা। (ওই)

'রাজা' কবিতায় স্বাধীনতা পূর্ববর্তী অর্থাৎ ঔপনিবেশিক শাসনামলে এ দেশীয় জমিদার বা সামন্ত রাজাদের বিলাস-ব্যসন-প্রতিপত্তি স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে কেমন করুণ অবস্থা ধারণ করেছে তার বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কবিতার শুরুতেই দেখতে পাই —

মদমত্ত রাজা আজ ম্রিয়মাণ। (রাজা)

কারণ স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশে জমিদারি উচ্ছেদ হয়েছে। সামন্ত রাজাদের রাজত্ব বিলুপ্ত হয়েছে। তাই,

সহসা উৎসব
স্তব্ধ হলো প্রেক্ষাগৃহ, শতাব্দীর যুগসন্ধ্যাকালে
রক্তহীন ঐশ্বর্যের শেষ চিতা নীলাকাশ জ্বালে,
রাজার মোতির মালা স্বর্ণহার ছিন্নভিন্ন সব। (ওই)

আজ রাজা একা। পারিষদ, চাটুকার ফেরার। নাচঘরে নর্তকীর ঘুঙুর বাজে না। পান পাত্র শূন্য পড়ে থাকে। জ্বলে না রাত্রে আর আলোর রোশনাই। শুধু,

মণিময় কক্ষদ্বার শূন্য ঘর স্তব্ধ নিরুচ্চার। (ওই)

অন্যদিকে

বাহিরের পৃথিবীতে পিপাসার তীব্র অন্তর্জ্বালা
অগ্নি ঢালে চোখে-চোখে, শিহরিয়া ওঠে শুষ্কমূল; (ওই)

কারণ প্রতিদিন ধরে যারা ছিল অত্যাচারিত, নিপীড়িত, শোষিত, বঞ্চিত সেই সব সাধারণ জনতা আজ জেগে উঠেছে। তাদের চোখে মুখে প্রচণ্ড আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায় — যাকে কবি কল্পনা করেছেন হাওয়ার রূপকে :

ঘুম নেই, শ্রান্ত দেহ, — রাজা এসে জানালায় বসে;
অতর্কিত হাওয়া এসে তাড়া করে প্রচণ্ড আক্রোশে। (ওই)

এই হাওয়া বাস্তবে নিষ্পেষিত জনগণের ক্রোধ। অত্যাচারী রাজার প্রতি যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত ক্ষোভ আর আত্ম-পরাভবের গ্লানি থেকে মুক্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষার প্রকাশে কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের 'রাজা' কবিতাটি একটি অনবদ্য আধুনিক কবিতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবার দাবি রাখে।

'দিনযাপন' শীর্ষক দীর্ঘ কবিতার মধ্যে পাওয়া যায় পঞ্চাশের দশকের সময়-সমাজ ও জীবনের এক অপূর্ব চিত্ররূপ। কবিতার নামকরণের মধ্যেই লুকিয়ে আছে তার আভাস। 'দিনযাপন' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কালযাপন, সময়কাটানো, সংসারযাত্রা

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাহ।[৪৩] কিন্তু যদি 'দিন' এবং 'যাপন' শব্দের আলাদা অর্থ লক্ষ করি তাহলে দেখতে পাই 'দিন' হচ্ছে 'তিমির-খণ্ডয়িতা', মৃত্যুকাল, জীবিতকাল, নিত্যকর্ম ইত্যাদি। অপরদিকে 'যাপন' শব্দের অর্থ হচ্ছে গমন, অতিবাহন, কালক্ষেপণ, পালন, রক্ষণ প্রভৃতি।[৪৪] 'দিনযাপন' কবিতায় সামগ্রিকভাবে কবি এই বৃহদর্থই ব্যবহার করেছেন। কবিতাটি বিশ্লেষণ করলেই আমরা তার প্রমাণ পাব। কবিতার শুরুতেই দেখতে পাই সমকালীন দ্বন্দ্ব-লাঞ্ছিত বিকৃত জীবনের ছবি —

কী তবে আমার কাজ : কী কর্তব্য বলো না যখন
প্রত্যহ দৈনিকে পড়ি পৃথিবীর আসন্ন বিলয়
যন্ত্রের বিকৃত দ্বন্দ্বে। রাজনীতিবিদ্ অনুক্ষণ
মাতায় বিমর্ষদেশ বক্তৃতায়; ক্লান্ত চোখে ভয়
রমণীর, দয়িতার, — শান্তি পারাবত খুঁজেখুঁজে
যদিও উধাও প্রাণ, অন্যদিকে যুদ্ধবাজদের
উন্মত্ত হুংকার শুধু, স্মিত শিশু মাঠের সবুজে
ছায়া দেখে চোখ বোঁজে। (দিনযাপন)

অন্যত্র শুনি জীবনের বিস্তৃত কর্মক্ষেত্রে স্থান খুঁজে নেওয়া কবির কণ্ঠস্বর —

কী তবে আমার কাজ : আমিও তো নিরীহ মানুষ
শান্তি খুঁজি জীবিকা অর্জনে:
[...] [...] [...]
অবিরাম উত্থান পতনে
বিদীর্ণ কল্পান্ত কাঁপে, মধ্যবিত্ত ছা-পোষা মানুষ
আরো অনেকের মতো আমিও ছুটেছি প্রাণপণে
নারী, স্বর্ণ, গান নয়, লুপ্তপ্রায় স্বস্তির সন্ধানে
পথে মাঠে তেপান্তরে; (ওই)

কবির এই জীবিকা ও স্বস্তির সন্ধান ক্রমান্বয়ে স্তরে স্তরে যেন সংকল্পের রূপ নেয় —

আপন কর্তব্য খুঁজে নিদ্রাহীন রাত্রি যাপি ঘরে
বেদনাবিহ্বল ক্ষণে; বহুদূরে শোনা যায় যেন
গর্জনে উচ্ছ্বাসে জাগে অন্ধকারে সমুদ্র সফেন
অন্বিষ্ট প্লাবনবেগ; কারা দৃঢ় পদক্ষেপে বেগে
সমুখে এগোয় পথে রাত্রিশেষে মরীয়া আবেগে
দীর্ঘ দৃপ্ত অভিযানে; সে-গতির উত্তাপ মননে
অকৃত্রিম অভিজ্ঞান সৃষ্টি করে যুগসন্ধিক্ষণে। (ওই)

'দিনযাপন' কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে সুমিতা চক্রবর্তীর মন্তব্যটি এখানে স্মরণযোগ্য :

> ১৯৫৪-তে লেখা এই কবিতটি যেন প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যাঁরা পথ চলেছেন তাঁদের মধ্য-পঞ্চাশের মানসিকতার প্রতিরূপ। তাঁরা তখন অনুভব করতে শুরু করেছেন ভারত পিছিয়ে পড়ছে বিশ্বমানবের অগ্রগতির মিছিল থেকে। কিন্তু হতাশায় কবি আর মুখ ঢাকেননি। ফেলে এসেছেন সমর সেনের প্রথম পর্বের কবিতার যাবতীয় অনুভাবনা।[৪৫]

এই দীর্ঘ কবিতায় আছে কবির সময় চেতনার ছাপ :

Dhaka University Institutional Repository

পশ্চিমেও ইউরোপে ঢের
জোট, দল, আন্দোলন: দ্রুততালে প্রচারের ফলে
মধ্যাহ্নে সন্ধ্যার ছায়া: পক্ষান্তরে সুদূর প্রাচ্যের
দুর্গম অরণ্যে দ্বীপে রজনীর অন্ধকারে চুপে
কোরিয়ায় তাইয়ানে ইন্দোচীনে মালয়-জঙ্গলে
ষড়যন্ত্র চলে রোজ: বর্বরের লালসার যূপে
রক্ত ঢালে নির্বিরোধ অজস্র শহীদ অবিরাম। (দিনযাপন)

এখানেই আছে জীবনের প্রতিষ্ঠা, আদর্শবোধের মৃত্যু, অবিশ্বাস ও প্রতারণার চিত্র :

কৈশরের বন্ধুজন
অনেকেই প্রতিষ্ঠিত, বিয়োগান্ত সংসারকে ছেঁকে
অন্ততঃ কিছুটা রসে রঙ্গময় ক'রেছে জীবন।
তোষামোদে আপ্তবাক্যে অভ্যস্তই, দিয়ে জলাঞ্জলি
সুমার্জিত রুচিবোধে সংসারের সাগর-সঙ্গমে
ডুব দিয়ে তোলে সোনা, দেখায় নিয়ত বৃদ্ধাঙ্গুলি
আজন্ম সঞ্চিত যতো আদর্শকে; এমন কি, প্রেমে
যদি পড়ে, সহজেই অবশেষে প্রেমাস্পদা ছেড়ে
পিতৃসত্য পালনার্থে পঞ্চদশীকেই পত্নী মেনে
ভাসায় সোনার তরী; (ওই)

মৃত্যুচেতনাও এ কবিতায় জীবন অতিবাহনের একটি অনিবার্য উপাদান হিসেবে উপস্থিত :

অন্ধকারে যেদিকে তাকাই
নিষ্ফল জোনাকি ছাড়া অন্য কোনো আলোর মশাল
রিক্তপ্রাণে আনে না আশ্বাস; সন্ধ্যাকালে বাড়ী ফিরে
বারান্দার কোণে ব'সে আকাশের নীল তারা গুনে
কিছুটা সময় কাটে। কখনো বা রোগীর শিয়রে
ব'সে-ব'সে নানা কথা ভাবি তার পরিচর্যাকালে
জন্ম-মৃত্যু-ভবিষ্যৎ নিয়ে। [...]
আর আমি
তন্দ্রাভাঙা শেষরাত্রে গলিপথে হরিধ্বনি শুনে
চমকে স্বরাজ্যে ফিরি, কল্পনার পালা ছিন্ন ক'রে
শ্মশানযাত্রীর ধ্বনি হেঁকে যায় দূরে থেকে দূরে। (ওই)

'দিনযাপনে'র এই জীবনবোধের সমগ্রতা 'কর্মেই আনন্দ খুঁজি' কবিতার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে। কবি অনুভব করেন কর্মের মধ্যেই জীবনের প্রকৃত আনন্দ লুকায়িত। তাই ঘোষণা করেন,

কর্মেই আনন্দ শুধু : আনন্দই দেখেছি যখন
লক্ষ-লক্ষ দীর্ঘবাহু সাড়া দেয় পৌরুষ বিক্রমে
গ্রামে-গ্রামে দেশে-দেশে শহরে-শহরে। স্তূপ জমে
পুরনো স্মৃতির গর্ভে নতুন সৃষ্টির। (কর্মেই আনন্দ খুঁজি)

একমাত্র কর্মই পারে জীবনের হতাশ্বাস দূর করে আশার বাণী শোনাতে।

Dhaka University Institutional Repository

কর্মদীপ্ত পদক্ষেপ শুনে
তৃষাদীর্ণ মনে নামে উদ্যোগের প্লাবিত জোয়ার।

কর্মেই আনন্দ শুধু : আশাদৃপ্ত চেতনা-বিস্তার
মনে-প্রাণে, নামহীন মানুষের অজ্ঞাত বিবরে;
সবল বাহুতে, যতো রাত্রিজাগা উদ্দীপিত স্বরে;
সর্বত্র সৃষ্টিকে ঘিরে সমষ্টির শ্রেষ্ঠ অঙ্গীকার। (ওই)

কর্মের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে মানুষ রোধ করতে পারে সামাজিক অবক্ষয়, জীবনের সর্বগ্রাসী সাংঘর্ষিক ভাঙনের ক্ষতি। সমাজ ও সাংসারিক জীবনবোধের চেতনায় উজ্জীবিত করে তুলতে কর্মের বিকল্প নেই। তাই,

কর্মেই আনন্দ শুধু। বন্যাবেগ চেতনাচেতনে
আনে সাড়া, আনে দীপ্তি; সে-আনন্দ প্রত্যাশায়, প্রেমে
ব্যাপ্ত প্রাণের গভীরে; কিশোরীর হৃদয়ের ফ্রেমে
সে-আনন্দ নিভৃত গুঞ্জন। কিশোরের স্বপ্নে ক্ষণে-ক্ষণে

সে-আনন্দ সাগরের ধ্বনি। যুবকের বাহুতেই
সে-আনন্দ বিচিত্র উদ্যোগে আনে অভাবিত সাড়া;
বৃদ্ধের প্রজ্ঞায় কিংবা যুবতীর গর্ভধারণেই
সে-আনন্দ সৃষ্টি করে নির্ভীক স্বীকৃতি। (ওই)

'ভিজে কলকাতা' কবিতাটিতে চিত্রিত হয়েছে বর্ষণসিক্ত নগর কলকাতার মানুষের বিস্রস্ত জীবনচিত্র। এখানে গ্রীষ্মশেষে যখন শ্রাবণধারা নামে অজস্র ধারায় তখন 'অসহ্য গুমোট ঘরে-ঘরে/ভেঙে গিয়ে নীলাঞ্জন শ্রান্তচোখে লাগে সবাকার'। শহরের দৃশ্যপট যায় পাল্টে।

ভিজে ট্রামে ভিজে বাসে অজস্র যাত্রীর আনাগোনা
আরো বাড়ে, লোক জমে মোড়ে মোড়ে পড়ন্ত বিকেলে
বাড়ীফেরা প্রতীক্ষায়: চৌরঙ্গীতে ইলেকট্রিক জ্বেলে
আড্ডা জমে রেস্তোঁরায়, সিনেমায় অতৃপ্ত কামনা
চরিতার্থ করে কেউ : (ভিজে কলকাতা)

নাগরিক জীবনচিত্র আরো করুণভাবে ফুটে ওঠে যখন দেখতে পাই স্তব্ধ অর্ধরাতে অতল কান্নার সুরে গুমরে ওঠে কলকাতা। কেননা তখন দিনের ব্যস্ততম শহরে নামে গভীর বিষণ্ণতা। বিপন্ন আর্তজনের নিঃশব্দ হাহাকার ধ্বনিত হয়,

উত্তরে হাওয়ার বেগে, কুষ্ঠরোগী জাগে ফুটপাথে
একক ভীতির রাত, শহরের পাষাণে শূন্যতা
মৃত্যুর মতোই ভারী, কুকুরের আর্ত কণ্ঠস্বরে
নির্জন দ্বীপের কান্না, লালা ঝরে আহত অধরে! (ওই)

শাহরিক এই চিত্রের অনুরূপ চিত্র দেখতে পাওয়া যায় 'স্তব্ধতায়' কবিতার মধ্যেও, তবে তা গ্রামীণ জীবনের সরল ক্যানভাসে আঁকা। নাগরিক শূন্যতা এখানে নেই, নেই মৃত্যুভীতিও; এখানে —

... স্তব্ধতা নামে দিনান্তের কর্মকাণ্ড শেষে
খোলা জানলার ফাঁকে, বাইরের নিবিড় ছায়ায়,

Dhaka University Institutional Repository

বাগানের অন্ধকারে, টবগাছে, উদ্যানলতায়,
রজনীগন্ধার স্তূপে, অমলিন গোলাপের দেশে — (স্তব্ধতায়)

এই গ্রামীণ অন্ধকার নানান বর্ণে ও গন্ধে সুবাসিত। বুকের প্রতিটি নিশ্বাস স্পর্শে তাই অদ্ভুত ভালো লাগা অনুভূত হয়। মনে হয়,

সমস্ত সন্তাপ যেন সুদূর নক্ষত্র হ'য়ে নীলে
বিশাল সত্তায় অন্তর্লীন; বহু ঊর্দ্ধলোক হ'তে
আলোর সমুদ্র কাঁপে সদ্যোজাত স্তব্ধতার স্রোতে
স্নিগ্ধ কপোতের মতো, (ওই)

মনে হয় দিনের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় যে রমণীর সময় হয় নি অবসর নেওয়ার, তারও সময় হল বিশ্রামের; ক্লান্ত তৃপ্ত দেহে স্মৃতিতে 'ফিরে এলো ব্যস্ত পায়ে অতীতের ঘুঙুরের ধ্বনি'। এবং জীবনানন্দীয় 'সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন'[৪৬] চরণের আশ্রয়ে কবি ফুটিয়ে তুললেন প্রাত্যহিক জীবনের মনোরম একটুকরো ছবি —

সমস্ত দিনের শেষে রজনীর স্পর্শ-ধন্যতায়
আদিম প্রশান্তি নামে ভগ্নবুকে উদ্যানলতায়। (স্তব্ধতায়)

'পিপাসা' কবিতায় কবির রুক্ষ কঠিন যন্ত্রণাবিদ্ধ জীবনে একটুখানি শান্তির পিপাসা কাতর ছবি মূর্ত হয়ে উঠেছে। যে কবি শুধু সর্বত্র ঘুরে জীবনের বিতৃষ্ণা দেখেছেন এবং কেবলি যন্ত্রণার উৎসের সন্ধানে পথ হেঁটেছেন — তিনি আজ 'অন্ধকারে হাওয়ার ছোঁয়ায় চায় পরিপূর্ণ হ'তে'। তাঁর ভেতরে তৃষ্ণা জেগেছে মাটিতে বুক পেতে খানিকটা ঠাণ্ডা মাটি মাখতে, গোলাপের নিভৃত ঘ্রাণে শিহরিত হতে, ঘন সুমসৃণ ঘাসের স্পন্দন অনুভব করে দিনের সমস্ত বিভ্রান্তি, শ্রান্তি ভুলে যেতে। আর তাই যাযাবর কবি পিপাসার্ত কণ্ঠে অবশেষে উচ্চারণ করেন,

অসংখ্য শহর আর বন্দরের শেষে অন্ধকারে
বুক পেতে খানিকটা ঠাণ্ডামাটি মাখবো এবারে। (পিপাসা)

পঞ্চাশ ও ষাট দশকের সন্ধিকালীন 'ক্রুদ্ধরাত্রি : বুদ্ধিজীবী ও প্রেমিক' কবিতায় সে সময়কার পারিপার্শ্বিক জীবন ও ঘটনার মনস্তাত্ত্বিক অভিঘাতে সৃষ্ট জটিল জীবনচিত্র এক ধরনের নেতিবোধের মাধ্যমে অঙ্কিত হয়েছে। মহাপয়ারের সাহায্যে কবি এক ভঙ্গুর সময়ের চিত্র উপস্থাপন করেন এভাবে :

যতোই চায় না তবু ক্রুদ্ধরাত্রি অর্গলিত দ্বারে,
আত্মরতি ছিন্ন করে দুঃস্বপ্ন মন্থিত অন্ধকার,
দাঁতে দাঁতে চেপে কেউ সজোরে কপাট ধরে নাড়ে,
বিচলিত বুদ্ধিজীবী, ছত্রভঙ্গ আত্ম-অহঙ্কার।
(ক্রুদ্ধরাত্রি : বুদ্ধিজীবী ও প্রেমিক)

এ সংসারে কে না চায় ঐশ্বর্য, সমাজে সম্মান, রমণী ও ভক্তদের বিগলিত স্তব! একজন সাধারণ মানুষও অনুভব করে এসবের অধিকার এ পৃথিবীতে তারও আছে। কিন্তু সময় তো প্রতিকূল। তাই,

... কোথা থেকে যেন বিক্ষুব্ধ ক্ষোভের আনাগোনা,
যে-সুধা অধরে ছিল মুহূর্তেই তিক্ত ও বিস্বাদ;

Dhaka University Institutional Repository

ঘুমে তৃপ্তি নেই জাগে আত্মতৃপ্ত সংরাগী চেতনা,
দ্যাখে তার চতুর্দিকে নষ্ট ফুল, লোক-পরিবাদ। (ওই)

আরো দেখে রক্তঝরা দিনে ইতিহাস কী নির্মমতায় সুকঠিন হাতে,
কণ্ঠনালী চেপে ধরে, বুদ্ধিজীবী প্রাণ রুদ্ধশ্বাস,
ফুল পাখী নীলাকাশ ক্ষয়ে যায় দুর্জয় আঘাতে। (ওই)

তবে মানুষের জীবনের বিচিত্র একটি দিকও কবির চোখে উন্মোচিত হয়। এই কঠিন দুঃসময়েও মানুষের মনে বেঁচে থাকে প্রণয়ের আশ্চর্য স্পন্দন। এই দুঃস্বপ্নের অন্ধকার গহ্বরেও প্রেমিক ফোটাতে চায় পারিজাত কলি। আমরা দেখি,

অবিরত আত্মদানে সে সাজায় স্খলিত যৌবন,
ফোটায় বিচিত্র ফুল রক্ত স্বেদ মিশ্রিত আধারে। (ওই)

কারণ কবির দৃষ্টিতে,

... যে প্রেমিক তার বিতৃষ্ণা কি ক্ষোভ কিংবা ভয়
অন্য এক যন্ত্রণায় একাকার, নিশ্চিহ্ন হয়ত;
ঘটনা নির্মম হলে সহ্যগুণে সেও জন্মেজয়
অবিরাম আত্মবলে ক্রন্দসীকে সাজায় নিয়ত। (ওই)

'সুরের নিবিড়ে' কবিতায় শুনি ঠিক এর উল্টো কথা। এখানে জীবন গভীর আবর্তে হাবুডুব খাচ্ছে; এ কবিতায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে হিংসা এবং স্বার্থপরতার নিখুঁত চিত্ররূপ। কবির ভাষায় :

উজ্জ্বল আলোকে দ্যাখো খ্যাতিমান আরো অনেকেই
আপন আনন্দে মগ্ন, যে-আনন্দ সঙ্কীর্ণ ছলনা;
প্রেমিক কোথাও নেই, নেই পরিশুদ্ধ সম্ভাবনা;
কোথাও বিচিত্র দৃশ্যে রম্যতার আশীর্বাদ নেই। (সুরের নিবিড়ে)

আবার অন্যত্র বলেছেন,

প্রেমিক কোথাও নেই আছে শুধু অকৃপণ ফাঁকি,
ভালোবাসা নষ্ট শব রক্তঘ্রাণ রজনীগন্ধায়। (ওই)

পূর্ববর্তী কবিতায় প্রেমিককে দেখেছি দুঃস্বপ্নের জাল ছিন্ন করে আপন আত্মবিশ্বাসে পৃথিবীকে নানান রঙে সাজিয়ে তোলার সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলতে — আর এখানে কবিকে শুনি ভালবাসার মৃত্যু ঘোষণা করতে; কারণ তাঁর মতে 'প্রেমিক কোথাও নেই'। এ কবিতায়ও লক্ষ করি দেশকালের জটিল পরিস্থিতিতে কবির বর্তমান জীবনভাবনা নেতিবোধে আক্রান্ত :

যেহেতু তুমিও এই আলোকিত নরকের দ্বারে
সঙ্কীর্ণ ইচ্ছার হাতে স্বেচ্ছাবন্দী কালের পুতুল,
ভাসাও শরীর আজও অলজ্জিত তৃষ্ণার জোয়ারে,
সৌখীন বাগানে তোলো নিরুত্তাপ নির্বাচিত ফুল। (ওই)

চারদিকে শুধু কপটতা, দম্ভ এবং হিংস্রতার প্রকাশ। কবির এ জীবন কাম্য নয়, তাই তিনি আশা ব্যক্ত করেন জীবনের শেষ লগ্নে সুরের নিবিড়ে লীন হয়ে যেতে।

Dhaka University Institutional Repository
'আদি চেতনা' কবিতাটিতে কবি বৃক্ষের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন জীবনের প্রতিচ্ছবি। কেননা —

বৃক্ষই আদিম পিতা, আদিপ্রাণ মৌনতার সেতু,
প্রোথিত অতীত থেকে মৃত্তিকায় দৃঢ়বদ্ধতায়
সম্মানিত, অধিষ্ঠিত, — (আদি চেতনা)

কবি তাই পিতা-পিতামহদের প্রতিবেশী এই সুপ্রাচীন বৃক্ষমূলের সুশীতল মৃত্তিকায় দুদণ্ড শুয়ে থাকার বাসনা প্রকাশ করেন। তিনি শপথ করেন প্রজ্ঞা মেধা ও মননের এই স্থির ঋষির আশ্রয়ে হৃদয়ের আবর্তিত দ্বার উদ্‌ঘাটন করবার। কেননা কবির,

তৃষাদীর্ণ বাসনারা অতঃপর ঘুমাবে নির্ভয়ে,
অন্ধকারে, অন্তরঙ্গ সন্নিধানে, নিহিত উদ্ধার। (ওই)

'বন্ধুর বিশ্বস্ত হাত' কবিতায় ফুটে উঠেছে কবি কিরণশঙ্করের দোদুল্যমান জীবনভাবনার ছবি। একবার তিনি বলছেন কোনো বন্ধুকে তাঁর প্রয়োজন নেই। কেননা বন্ধুরা আজ,

বিবর্ণ পুতুল মূর্তি; অথবা আড়ালে
প্রতিযোগী প্রেত। এমনও হয়েছে
কেউ কেউ হিংসাত্মক কল্পনার জালে
নিজেকেই বন্দী রাখে যেমন জন্তুরা
উচ্ছিষ্ট মাংসের লোভে পরস্পর মাতে।
[...] [...]
বন্ধুকে চাই না আর। ইদানীং মেকি
দুর্বৃত্ত স্বজন বাড়ে, অন্তত সংখ্যায়
নিতান্ত নগণ্য নয়। ছলা ও কলায়
সংসারে নখরচিহ্ন রেখে যায় দেখি
সুযোগসন্ধানী শ্বাপদেরা। (বন্ধুর বিশ্বস্ত হাত)

অথচ কবি জীবনের এই পরম সত্যি কথাটিও জানেন যে, জীবনে বন্ধুর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বন্ধুর বিশ্বস্ত হাতের ছোঁয়ায় শরীর-মন প্রীত হয়। কবির ভাষাতেই বলা যাক,

অথচ বন্ধুর সঙ্গ বাঁচায় জীবন!
এবং বন্ধুর প্রীতি না হলেই বিভ্রান্ত সংসারে
অতৃপ্তির তীব্র ক্ষোভ বাড়ে।
বন্ধুর বিশ্বস্ত হাত যদি ছোঁয় মন
মন প্রীত কল্লোলিত যমুনা জোয়ারে। (ওই)

সমাজবাস্তবতা এবং সময়বাস্তবতার দোদুল্যমানতায় কবি সংশয়িত। জীবনে বন্ধুর যেমন ভীষণ প্রয়োজন, তেমনি বিশ্বাস হন্তারক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মানুষকে কোনো ভাবেই কবি নিজের জীবনে জড়াতে চান না। পরিশেষে তাই কবির কণ্ঠে শুনি সেই ধ্বনি —

বন্ধুকে চাই না আর।
যেহেতু বন্ধুর হাতে নেই প্রীতিপূর্ণ অধিকার। (ওই)

'লোকটিকে দ্যাখো' কবিতায় লোকটি হচ্ছে একজন সাধারণ মালী। যে সারাক্ষণ ফুলের বাগানের পরিচর্যায় ব্যাপৃত থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

সজ্জিত শাখায়
কীটদুষ্ট পাতাগুলি — ছেঁটে দিয়ে তার সন্নিধানে
নতুন চারার গুচ্ছ হাতে নিয়ে মাটিতে লাগায়
এবং গোলাপ কিংবা কৃষ্ণচূড়া, চন্দ্রমল্লিকার
উদ্ভাসিত হাসি দেখে সংসারের কপটতা ভুলে
মগ্ন থাকে কিছুক্ষণ ... (লোকটিকে দ্যাখো)

এই শিল্পীত অভ্যস্ত জীবন লোকটির। নির্জন বাগানে সে রোজ খাটে আর কুসুমিত শিল্পমালা তৈরি করতে করতে তার শিরদাঁড়া বেঁকে যায়। অথচ যার জন্যে এই বাগান করা সেই গৃহস্থ কর্তৃপক্ষ কোনোদিন ফুলের নিটোল সৌন্দর্য অনুভব করতে সক্ষম নয় — সেটা তার লক্ষও নয়। তার অঢেল বিত্ত, তাই অহংকারী। তিনি

শুধুমাত্র মেয়ে বন্ধুদের
বাহবা কুড়াবে বলে লোকটাকে রেখেছে বাগানে
দু'মুঠো অন্নের বিনিময়ে। (ওই)

এই আত্মম্ভরী, সংসারী, বিষয়ী কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত লিখেছেন :

প্রভু তার
শিশ্নোদরপরায়ণ, বন্ধুপত্নী, বান্ধবী কি বন্ধুভগ্নী যদি
প্রকৃত একটিবার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়
এবং তারিফ করে মালিকের কিছুটা অন্তত
তাহলেই প্রভু খুসী, ফুল নয় নারীর শরীর
যেহেতু আকাঙ্ক্ষা তার; (ওই)

জীবনের রূঢ় বাস্তবতার একটি দিক কবি এখানে উন্মোচিত করবার প্রয়াস পেয়েছেন। যে বিত্তবানগণ বাগান করার ষোলআনা শখ পোষণ করেন শুধু নারীর শরীর আকাঙ্ক্ষা করে সেই হৃদয়হীন পাষণ্ডদের মুখোস খুলে দেন কবি। কবির চোখে তাই বড়লোক প্রভু নয় — মালীই প্রকৃত মানুষ। তিনি এ-প্রসঙ্গ কবিতায় এনেছেন শৈল্পিক রূপাবয়বে :

মমতা, সস্নেহ যত্ন ঢেলে ঢেলে প্রচ্ছন্ন মাটিতে
রসগর্ভ চেতনার ধারা আনে তার মতো আর
নিঃস্বার্থ প্রেমিক তুমি দেখবে না এখানে কোথাও।
বৃষ্টিতে ক্ষরায় কিংবা গ্রীষ্মে শীতে দ্যাখো সর্বদাই
বিরল আকাঙ্ক্ষা তার বুকে আনে সুন্দর সৃষ্টির
জ্যোৎস্নাসিক্ত পূর্ণিমা নির্ঝর। (ওই)

'বিনীত উপায়ে' কবিতায় কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত বৃক্ষের প্রতীকে জীবন ব্যাখ্যা করেছেন। উপমার সরল ব্যবহারে কবি বৃক্ষের মতোই তাঁর সুস্থির ও কোলাহলহীন অবস্থান ব্যাখ্যা করেন, যেখানে বিধৃত আছে তাঁর জীবন সংলগ্নতা,

বিনীত হয়েই আমি তোমাদের ভদ্র হিংস্রতাকে
প্রতিদানে ছেয়ে দেবো
যেমন বর্ষিত হলে তীক্ষ্ণ হিম মাথার উপরে
তমোঘ্ন প্রান্তরে সারারাত

Dhaka University Institutional Repository

প্রাজ্ঞ বৃক্ষ সহ্য করে, উত্তোলিত রাখে দীর্ঘশাখা।
বিনীত হয়েই আমি থেকে যাবো। (বিনীত উপায়ে)

কবি বলেন তিনি কোনো অন্ধ অভ্যাসের বশে হিংস্র শ্বাপদ কিংবা বিষধর প্রাণীতে পরিণত হবেন না। এবং কেউ যদি শ্বাপদের মতো ভয়াবহ হয় তবুও তিনি বৃক্ষের মতোই সুস্থিত থাকবেন নিজের শুভ বিশ্বাসবোধে। কবির ভাষায় :

বিনীত হয়েই একবার
দেখবো সে বাঁচে কিনা ভদ্রভাবে কঠিন উপায়ে। (ওই)

'ধ্বনি, বর্ণ, গভীরতা' কবিতায় দেখা যায় বিপর্যস্ত এক জীবনচিত্র। যেখানে এখনো ধুলো, স্মৃতির ঝাঁপিতে বিবেকী দ্বিধায় আত্মজন খোঁজ করে ধূসর পুতুল জীবন। সত্তার গোপন গহ্বরে আলো দিতে গিয়ে ক্রমশ মিলিয়ে যায় ক্ষয়িষ্ণু যৌবন। তারপরও কবি লক্ষ করেন,

ধ্বনি বর্ণ গভীরতা নিয়ে বেঁচে আছে
সংবর্তের ঝড়ো দিনে উদ্বায়ু জীবন। (ধ্বনি, বর্ণ, গভীরতা)

'মৌমাছি অদৃশ্য হলে' কবিতাটি রূপক কবিতা। এ কবিতায় মৌমাছিকে মানুষের প্রাণ হিসেবে কল্পনা করেছেন কবি। ফুলে-ফলে, সবুজে-শ্যামলে, গ্রীষ্মে-বসন্তে সজ্জিত এই মনোরম ধরণীতে মৌমাছির মতো গুঞ্জরণে, মধু আহরণে সময় অতিবাহিত করে মানুষ। কবির ভাষায় বলা যায়,

হৃদয়ের প্রতিনিধি হোক না এ বিমুগ্ধ মৌমাছি,
যে-ওড়ে তৃষ্ণার দেশে আকাঙ্ক্ষিত দৃশ্যের সন্ধানে;
চেতনার অন্ধকারে যেখানে স্তম্ভিত হয়ে আছি,
সেখানে ফুটুক ফুল গুনগুন তার পুঞ্জ গানে। (মৌমাছি অদৃশ্য হলে)

কিন্তু এই আনন্দ গুঞ্জনেই তো জীবনের পরিধি শেষ হয় না। এখানে কখনো না কখনো সম্মুখীন হতে হয় রূঢ় বাস্তবতার। তখন হালকা হাওয়ায় সাড়া আনে প্রাণে মৃত চেতনার। জীবনের এই কঠিন সত্যের মুখোমুখি হতে কবি ভয় পান। কখন তাঁর প্রাণ রূপ মৌমাছি কালের করাল গ্রাসে অদৃশ্য হয়ে যাবে সেই চিন্তায় বিষণ্ন থাকেন। এরই প্রতিফলন দেখি তাঁর কবিতার পঙ্‌ক্তিতে :

কেবল বিষণ্ন চিন্তা, ইচ্ছামৃত্যু, পতনের ভয়
মৌমাছি অদৃশ্য হলে ভরে থাকে বিষণ্ন সময়। (ওই)

'দৃশ্যপট' কবিতায় কবি নিস্পৃহ ভঙ্গিতে সংসারভাবিত মানুষের জীবনযাত্রার এক চরম সত্য প্রকাশ করেছেন। কবি দেখেন এই সংসারের বিষয়ী লোকগুলোকে বিষয়ের লোভে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হতে। অনেক খ্যাতিমান ব্যক্তিকেও সম্মান ও প্রতিপত্তির প্রতিযোগিতায় উন্মত্তপ্রায় আচরণ করতে দেখেন তিনি। এমনকি —

স্বদেশী নেতাও
স্বদেশের স্বার্থে নয় স্বজনের হিতার্থে হয়ত
জাগায় বিক্ষুব্ধ ঢেউ অন্তরালে। দেখেছে অন্তত
সামান্য পেলেই মুগ্ধ এমন কি হিংস্র জনতাও। (দৃশ্যপট)

Dhaka University Institutional Repository

বিচিত্র এই পৃথিবীতে কবি অবাক বিস্ময়ে দেখেন, এখানে অর্থের অভাবে শিল্পীর মন গুমরায়, সামান্য সম্মানটুকুও পায় না গুণীজন, শাশ্বত যে প্রেম সেটাও আজ পরিণত হয়েছে নিছক স্বভাবে। দীর্ঘশ্বাস বুকে চেপে কবি দেখতে পান —

... সঞ্চিত সোনা লুটে নেয় কৌশলী বাচাল,
দস্যুতা নিশীথে যার ঊষাগমে সে-ই দানবীর;
সজ্জন বিপন্ন সদা, অসতের দাপট ভয়াল, (ওই)

রাজনৈতিক আদর্শে সৎ এবং সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ কবি এই সব অনিয়ম, অসদাচার দেখে ভীষণ ব্যথিত হন। পথ খোঁজেন মুক্তির। আর তাই কবিতার শেষ দুটি চরণে দেখি —

এইসব দেখেই সে একটি মহৎ প্রেরণায়
দীপ্যমান হতে গিয়ে বর্তিকার মতো জ্বলে যায়। (ওই)

কিন্তু তাতে সমাজের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকা পাপাচার থেকে দুর্বৃত্তদের হাত থেকে মুক্তি মেলে না — শুধু একটি মহৎ প্রাণের মহতি বিলয় সাধিত হয়।

'শান্ত বটের ছায়ায়' কবিতাটি ১৯৬১তে 'উত্তরসূরি' পত্রিকায় প্রথম ছাপা হয়েছিল। কবিতাটি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত রচনা করেছিলেন তাঁর পিতৃদেবের মৃত্যুতে। এ কবিতায় তাঁর পিতৃদেবকে তিনি তুলনা করেছেন বিশাল মহীরূহ বটবৃক্ষের সঙ্গে — যার আশ্রয়ে মেলে পরম নিশ্চয়তা। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের একটি উদ্ধৃতি এখানে স্মরণযোগ্য :

> ১৯৬১-র চৈত্র সংক্রান্তির আগেরদিন আমার পূজনীয় পিতৃদেব প্রয়াত হলেন। আমার বয়স তখন চল্লিশ পেরিয়েছে। মনে হয়েছিল আমরা অনেকগুলো ভাই- বোনদের পশ্চাতে দাঁড়িয়ে যে বৃক্ষ এতোকাল ছায়া দান করে এসেছে সে বৃক্ষ সময়ের অন্ধকারে বিলীন হয়ে গেল।[৪৭]

কবিতার পঙ্ক্তিতেও কবির এই উক্তি ধ্বনিত হয়েছে :

চল্লিশ বছর আমি এই শান্ত বটের ছায়ায়
আদিম শিশুর মতো সমর্পিত।
তিমিরবিনাশী স্বচ্ছ বর্ণের ধারায়
মুগ্ধ চোখ কিছু অভিভূত।
আমার রক্তের ঢেউয়ে
সর্বদা করেছি অনুভব
শান্ত পত্র, প্রশাখার স্নেহ সঞ্চালন।
গ্রীষ্ম বর্ষা শীতে
নিশ্বাস নিয়েছি টেনে রক্তের ভিতরে
অকৃত্রিম চেতনার সূক্ষ্ম আশীর্বাদ
অলক্ষ্যে, সুচারু পদ্ধতিতে। (শান্ত বটের ছায়ায়)

বটবৃক্ষ যেমন তার আশ্রিতদের রৌদ্রঝড় দুর্যোগ থেকে পরম মমতায় বুকদিয়ে আগলে রাখে তেমনি এই সংসারে পিতারূপ সুবিশাল বৃক্ষছায়ায় আমরা বেড়ে উঠি, তাঁর শিকড়ের গোপন মমতা আমাদের রক্তের চেতনার মধ্যে সম্প্রসারিত হয়ে আমাদেরকে দান করে কর্মের প্রেরণা। তাঁর প্রজ্ঞায় আমরা প্রাজ্ঞ হই। কিন্তু এই নশ্বর পৃথিবীতে মৃত্যু

Dhaka University Institutional Repository

অমোঘ। তাই বিশাল মহীরুহরূপ পিতার সুশীতল ছায়াও একদিন আমাদের মাথার উপর থেকে সরে যায়। তখন কবি কিরণশঙ্করের কবিতার ব্যক্ত চরণ আমাদের অব্যক্ত মনের ভাষা রূপ হয়ে প্রকাশ পায় :

জানব না কোনোদিন সেই প্রাজ্ঞ বটের শরীর
কখনো আমাকে ছোঁবে কিনা,
যদিও অদৃশ্য বৃক্ষ, শিকড়ের গোপন মমতা
পড়ন্ত রোদের মতো মাঠের নিবিড়ে
আর্দ্র শান্ত করণাধারায়
সঞ্চারিত সারা অনুভবে,
আমার শরীরে। (ওই)

বৃক্ষকে মানুষের একান্ত সুহৃদের আসনে বসিয়ে কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত 'নির্জন চেতনা' কবিতায়ও ফুটিয়ে তোলেন এক গভীর অথচ সরল জীবনবোধের চিত্র। এখানেও লক্ষ করা যায়, বৃক্ষের শরীরে শিল্পাশ্রয়ী পত্র-পুষ্পে-শাখায় সবুজ স্নেহ-শান্তি মানুষের ক্লান্তকর জীবনকে বর্ণময় করে তোলার জন্যে সর্বদা প্রসারিত। মানুষের অলীক চিন্তা, স্তূপীকৃত যাতনায় আপন আরণ্যক ভাষার অনুভব দিয়ে জাগিয়ে তোলে গভীর ভালবাসা। বৃক্ষের মহানুভবতার প্রতি সমর্পিত কবি তাই উচ্চারণ করেন আপ্ত বাক্য :

নির্লিপ্ত বৃক্ষের দৃষ্টি আমার শরীরে সারারাত
জড়ায় প্রগাঢ় স্নেহ, সুহৃদের মতো তার হাত। (নির্জন চেতনা)

সুহৃদের মতো বৃক্ষের এই স্নেহময় হাতের স্পর্শ আমাদের নির্জন চেতনায়ও অনুভূত হয় এক গভীর অনুভবেদ্যতায়।

তিন.

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের কবিতায় প্রেম একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থের মতো 'দিনযাপন'-এও এ ধরাটি বর্তমান। এ কাব্যগ্রন্থের 'কেন এই আলোড়ন', 'কথা', 'বৃষ্টির পূর্ব মুহূর্ত', 'অনুষঙ্গ', 'বিপ্রলব্ধা', 'সে চায় প্রাণের পাত্রে', 'অন্তরচেতনা', 'রূপান্তর', 'ভালোবাসা' কবিতাগুলো প্রেমের কবিতা। তবে 'স্বপ্ন-কামনা'-পর্বের তৃপ্তিজাত প্রেম-অনুভবকে এখানে প্রশ্রয় দেন নি কবি; এখানে প্রেমাস্পদাকে তিনি নিয়ে এসেছেন তার 'রঞ্জিত রাজ্যের' বাইরে — যেখানে কবির সামাজিক দায়বোধ স্পর্শ করে থাকে প্রেমকে। 'নতুন আঁচড়' এবং 'স্বর ও অন্যান্য কবিতা' কাব্যগ্রন্থদ্বয়ের প্রেমের কবিতার সঙ্গেও 'দিনযাপনে'র প্রেমের কবিতার পার্থক্য প্রচুর। এ পার্থক্য মূলত প্রকরণগত; শব্দচয়নের আধুনিকতায় এবং বাক্যগঠনের দূরাভাষিতায় এসময় কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত আরো প্রাজ্ঞ।

'কেন এই আলোড়ন' কবিতাটিতে কবির অব্যক্ত প্রেমের যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে। কবি তাঁর প্রিয়তমাকে নিজের সমগ্র সত্তা দিয়ে ভালবেসেছেন, তাকে ঘিরেই অন্ধ আবেগে পরিক্রমণ করেছেন কিন্তু সবই মনে-মনে। কবির ভাষায় :

Dhaka University Institutional Repository

নিতান্তই নিজ আকর্ষণে
বসন্তে শরতে আমি মুখোমুখী তোমার সমীপে
গোপন নিশীথকালে : প্রতীক্ষাবিহ্বল গুপ্তদীপে
জ্বালাতে চেয়েছি স্নিগ্ধ অনিকাম শিখা মনে-মনে। (কেন এই আলোড়ন)

কতো গল্প, কথায় কথায় কতো সময় কাটানো দুজনের নির্জন মুহূর্তেও প্রিয়তমার কাছ থেকে কবি সামান্য ইশারা পান নি উদ্‌ভ্রান্ত হবার; তাই নিজেও ভদ্রতার মুখোস পরে ঘাড় গুজে ফিরে এসেছেন। মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। কবির মনের ক্ষোভ এবং অভিমান প্রকাশ পেয়েছে এ কবিতার শেষ দুই পঙ্‌ক্তিতে —

আমার যন্ত্রণা দিয়ে তোমাকে কি কখনো ছোঁব না,
দুর্বিসহ দায়ভাগ কোনকালে তুমি বইবে না? (ওই)

'কথা' কবিতায়ও ব্যর্থ প্রেমিক কবি অজস্র কথার ফাঁকে ভালবাসার কথাটি বলতে পারেন নি তাঁর প্রেমাস্পদাকে। প্রিয়তমার নিকট সান্নিধ্যে গেলেই তাঁর কণ্ঠস্বরে ভর করে আসন্ন মৃত্যুর মতো নিথরতা। তাই সারারাত সারাদিন শুধু ভাবেন এবং শেষ পর্যন্ত আমরা লক্ষ করি মনের কথা প্রকাশ করার 'সে ক্ষণিক চূড়ান্ত নিমেষ' এখনো কবির জীবনে আসে নি। কবির ভাষাতেও প্রকাশ পায় সে আক্ষেপ,

আজিও হয়নি বলা যে-কথায় মাতাবো তোমাকে —
কথা ছেড়ে কথা ধরি; শব্দগুলো প্রতীক্ষায় থাকে। (কথা)

'বৃষ্টির পূর্ব মুহূর্তে' কবিতায় কবি ব্যস্ততম শহরের ভীড়ে তার প্রেমিকাকে হারিয়ে ফেলেছেন এমন এক সময়ে যখন আকাশে ভারী মেঘ — যে কোনো সময়ে বৃষ্টি নামতে পারে; এবং রাত্রিও আগত প্রায়। তাই কবির ভীষণ চিন্তা কেমন করে ফিরে পাবেন তাঁর প্রিয়তমাকে ঠিকানাহীন বৃষ্টিস্নাত অন্ধকার শহরে! কবিতায় ফুটে ওঠে কবির আর্তকণ্ঠস্বর —

এ-সময়ে একা-একা, তোমাকে কোথায় ফিরে পাবো,
পরিত্যক্ত, নির্জন শহরে:
বৃষ্টি তো আসবে জোর, কোথায় দাঁড়াবো,
আয়োজন হবে কার ঘরে? (বৃষ্টির পূর্ব মুহূর্তে)

'অনুষঙ্গ' কবিতাটিতে প্রতিধ্বনিত হয়েছে 'কেন এই আলোড়ন' ও 'কথা' কবিতার সুর। সেই অব্যক্ত প্রেমের গভীর বেদনা। লজ্জাবনত, যন্ত্রণাবিদ্ধ কবিকে এখানেও বলতে শোনা যায় —

তোমার কাছেই আমি এ যাবৎ যেতে যে পারিনি
যন্ত্রণায় বেদনায় তুমি আজো রহস্যের খনি। (অনুষঙ্গ)

'বিপ্রলব্ধা' প্রেমের কবিতা। এর নামকরণের মধ্যেই লুকিয়ে আছে গোপন প্রেমের প্রত্যাশা, প্রতীক্ষা এবং আশাভঙ্গের বেদনা। কবিতার শুরুতেই কবি এরকমই একটি চিত্র তুলে ধরেছেন :

কী করবে তাহলে বলো। এতো দূর
যদিই বা এলে পথ ঘুরে
যদিই বা ক্ষিপ্রবেগ পদসঞ্চারণে
ঢেউ তুলে ঘাসে-ঘাসে, মাটিতে, অঙ্কুরে

Dhaka University Institutional Repository

এলে সন্ধিক্ষণে;
দেখলে আসেনি কেউ, শুধু অন্ধকার
গাঢ় হয়ে এলো বনে-বনে। (বিপ্রলব্ধা)

তবে কি ফিরেই যাবে? লীন হবে অন্তর্বেগবতী কোনো উন্মাদিনী নদীর কান্নায়? প্রেমিকার এ ধরনের মনোভাব কবিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। কবি প্রেমে ব্যর্থ রমণীকে বলেন —

তুমি একা, তুমি আজ একা;
যতিভঙ্গ জীবনের বিস্তারেই বুঝি
তোমার উদ্ধার আছে লেখা। (ওই)

কবি গতানুগতিক প্রথাবদ্ধ জীবনভাবনাকে মেনে নির্বিরোধ জীবনযাপন মেনে নিতে চান না। তাই ভগ্ন প্রেমীকে এই চিরায়ত ভ্রান্ত ধারণাকে ভেঙে বের হয়ে আসতে অনুপ্রাণিত করেন। তাকে ভেবে দেখতে বলেন —

এখানে পেলে না যাকে সান্ধ্য অন্ধকারে
একান্ত নির্জনে;
ভেসে-ভেসে সংবর্তের উত্তাল জোয়ারে
মিলবে কি দেখা তার দূর নির্বাসনে? (ওই)

'সে চায় প্রাণের পাত্রে' কবিতায় কবির ধারণা তাঁর,

... প্রেমাস্পদা একদা আষাঢ়ে
দেখা দেবে নবধারা জলে। কিংবা নির্জন ফাল্গুনে
বিকেলের রোদ মুখে আসবে সে পরিখার ধারে
যেখানে অজস্র ফুল ফোটে ... (সে চায় প্রাণের পাত্রে)

তবে ব্যর্থতা কবির ভাগ্য লিখন তিনি জানেন। তাই একেবারেই নিশ্চিন্ত তিনি কখনো হতে পারেন না। সন্দিগ্ধ মনে কবির প্রশ্ন জাগে —

যদি সে না আসে তবে? মেঘাচ্ছন্ন ঝড়ের হাওয়ায়
যদি সে মেয়ের নাম বিনিঃশেষে লুপ্ত হয়ে যায় —
তা হলে কি? (ওই)

জীবন সংগ্রামে পোড়খাওয়া কবি দৃঢ়তার সঙ্গে এই সব এলোমেলো ভাবনাকে দূরে ঠেলে ঘোষণা করেন —

তা হলে পৃথিবী যাবে সূর্যকেও ভুলে। (ওই)

প্রেমিকার প্রতি অবিচল বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে ওঠেন কবি। তাই শোনা যায় তাঁর দৃপ্ত কণ্ঠের উচ্চারণ —

আসবে সে অভয়ের
উত্তরাধিকার নিয়ে। সোনা হবে জ্বলন্ত অঙ্গার। (ওই)

'অন্তরচেতনা' কবিতায় তাঁর প্রণয়িণীকে আহ্বান করে কবি বলেন —

তুমি যদি প্রণয়িণী, এসো একবার
বহুকাল আগেকার বিস্মৃত মহলে,
যেখানে অন্তিম দৃশ্যে ম্লান চেতনার

Dhaka University Institutional Repository

দুর্মর বিস্ময়; আর, সারাক্ষণ জ্বলে
অন্ধকার মরুভূমি স্মৃতির ওপারে।

(অন্তরচেতনা)

কবির হৃদয় আশ্বাসচ্যুত; কারণ নিজের ললাট লিখন পড়ে নিয়েছেন তিনি। সেখানে শুধুই নিষ্ফলতার কথা লেখা। তাই তিনি তার প্রেয়সীকে অনুরোধ করে বলেন :

তুমি যদি প্রণয়িণী, শাখায় কুসুম
কেবল নগদমূল্যে ফোটাতে চেয়োনা:
রৌদ্রেঝড়ে ভিজে পুড়ে নামে যদি ঘুম
থেকো তার অপেক্ষায়, অন্তরচেতনা। (ওই)

'রূপান্তর' কবিতায় কবির প্রেমিক সত্তা যেন হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কারণ তাঁর প্রেমাস্পদাকে পেয়েছেন কাছে। বদলে গেছে পরিবেশ-প্রকৃতি সব। চারদিকেই তার আগমনের আনন্দে একটা সাড়া পড়ে গেছে। আর এই সন্ধিক্ষণের চকিত মুহূর্তটিকে স্মরণীয় করে রাখতে কবি আশ্রয় নেন স্বরবৃত্ত ছন্দের :

একটি নিমেষ, হলাম যেন আদিম প্রেমিক পাখী,
বেঁধে দিলাম সূর্যে চাঁদে প্রণয়ভরা রাখি।
তুমি যখন কাছে এলে উঠলো নদী জেগে,
পাথর যতো সোনা হ'লো যাদুস্পর্শ লেগে। (রূপান্তর)

'ভালোবাসা' কবিতায় কবি ভালবাসাকে ফুটিয়ে তুলেছেন নানান বর্ণে ও রেখায়। আর ভালবাসার এই বিচিত্র বর্ণিলতা প্রকাশে কবি ব্যবহার করেছেন মাত্র তিনটি বাক্য — ৬টি কমা, ১টি সেমিকোলন, ৩টি দাঁড়ি। ১৮ মাত্রার এই সনেট কবিতাটির প্রথম আট লাইনে (অষ্টক) কবি ভালবাসাকে সম্বোধন করে একনিঃশ্বাসে বলেন :

ভালোবাসা, তুমি এক আশ্চর্য দ্বীপের অন্ধকারে
মসৃণ নদীর মত প্রবাহিত; নিস্তরঙ্গ জলে
যেমন জোয়ার জাগে পূর্ণিমায় ঢেউ ছলছলে
তেমনি হৃদয়লোকে স্পর্শধন্যতায় বারে-বারে
দূরান্তের নীল হতে ফিরে-আসা পাখির আবেগে
একটি বিন্দুর দিকে স্থির লক্ষ্য রেখে স্বচ্ছতায়
বিকীর্ণ আপ্লুত হয়ে নিদ্রাহীন বহু রাত্রি জেগে
ফোটাও শাখায় ফুল অন্তরালে গাঢ়বদ্ধতায়। (ভালোবাসা)

কবি ভালবাসার এই অনুপম অনুভূতি আরো দৃঢ়-পিনবদ্ধ হয়ে কস্তুরীর মতো সৌরভ ছড়ায় সমস্ত সৃষ্টি ব্যাপী; আর তার প্রকাশ ঘটে কবিতার ষট্ক বা পরের ছয় চরণে :

প্রবল তৃষ্ণার দাহ নিভে আসে সূক্ষ্ম দৃশ্যলোকে,
প্রবাহিত অন্ধকার পার হয়ে দিগন্তের পাখি
ফিরে আসে, ধন্য করে বজ্রাহত নত প্রশাখাকে,
বিষণ্ন হরিৎক্ষেত্র জেগে ওঠে আড়ালে একাকী।

ভালোবাসা, তুমি থাকো সমস্ত সৃষ্টির অনুভবে
একটি রেখার মত, আন্দোলিত নিভৃত গৌরবে। (ওই)

Dhaka University Institutional Repository

চার.

নিসর্গ বা প্রকৃতি কবিমাত্রেরই হৃদয়ে আবেদনের সঞ্চার করে। কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের কাব্যেও আমরা সেটা লক্ষ করি। কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'স্বপ্ন-কামনা'য় প্রকৃতি ও নিসর্গচেতনা এসেছিল নানান অনুষঙ্গের আহ্বানে, 'দিনযাপন' কাব্যেও অনুরূপভাবে নিসর্গ-প্রকৃতির আবির্ভাব ঘটেছে। তবে এ কাব্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কিছু কিছু কবিতায় নিসর্গ প্রকৃতিই কবির মূল বিষয়ভাবনাকে সঞ্চালিত করেছে। এ ধারার কবিতাগুলো হচ্ছে 'রবীন্দ্রনাথ', 'এই হাওয়া ফাল্গুনের', 'প্রার্থিত স্বজন', 'আদি চেতনা', 'রূপান্তর', 'লোকটিকে দ্যাখো', 'মৌমাছি অদৃশ্য হলে' ও 'অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাগুলো'।

'রবীন্দ্রনাথ' কবিতার মূলভাবনা পঞ্চাশের দশকের দেশকালগত প্রেক্ষাপটে সামগ্রিক জীবনবোধ। এই দীর্ঘ কবিতা জুড়ে প্রকাশ পেয়েছে পারিপার্শ্বিক সমাজ ও সময় সম্পৃক্ত জীবনযাপনের নানান চিত্র। জীবন ভাবনার এই অনুষঙ্গে কবি তাঁর কবিতায় তুলে এনেছেন নিসর্গপ্রকৃতিকেও —

কে কেবল আজো এই রাতে
নিস্মৃত ফুলের ঘ্রাণ
গভীর সত্তায় ঢেউ তুলে
নিভৃতে বিলায়।
ক্ষীয়মাণ চাঁদ দূর নীলে,
কুয়াশায় মোড়া তার মুখে
অস্পষ্ট রেখায় আঁকা যন্ত্রণাবিন্যাস
এবং তা সঞ্চারিত মাঠে পথে খালবিলে
কৃষ্ণচূড়া স্তবকের বুকে,
সর্বত্র থমকে থাকে সহজ আশ্বাস। (রবীন্দ্রনাথ)

এ কবিতায় কোকিল জাগিয়ে তুলেছে বিস্মৃতি বসন্ত-স্মৃতি, জুঁই-চামেলির ঘ্রাণে জেগেছে জাতিস্মর জীবন-চেতনা। নক্ষত্র-আকাশ-বন-মাঠ-সমুদ্রের ঢেউ কখনো রাঙিয়ে দিয়েছে জীবনের ক্ষণিক মুহূর্ত, আবার গভীর আর্তিতে ব্যর্থতার যন্ত্রণায় কখনো আত্ম-আহুতির পথে উৎসাহ জুগিয়েছে। তবে নিসর্গপ্রকৃতির মধ্যে কবি সবসময়ই একটা আশ্বাসের ইঙ্গিত দেখতে পান। এখানেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। তাই দেখা যায় —

ভিখিরীর রৌদ্রদীর্ণ চোখে
মুহূর্তের তন্ময়তা রাতের আশ্বাসে;
সেও মাতে হিমে-ভেজা নক্ষত্রমিছিলে,
খোলা মাঠে ফুলের সুবাসে। (ওই)

'এই হাওয়া ফাল্গুনের' কবিতার মূল বিষয়বস্তুই নিসর্গপ্রকৃতি — যার মধ্য দিয়ে কবি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন প্রাণের আভাস। কবিতার শুরুতেই দেখি ফাল্গুনের হাওয়া শুকনো পাতার জঞ্জাল মুহূর্তে উড়িয়ে নিয়ে মুহ্যমান মাঠ-তেপান্তর সচকিত করে তোলে। তাই,

রক্তমুখ কৃষ্ণচূড়া, নিভৃত পিয়াল
চোখ তুলে আকাশে তাকায়। দূর দিগন্তের নীলে

Dhaka University Institutional Repository

চিকন সোণার মেঘ চিত্রময় বসন্তবিন্যাস
খোঁজে প্রকৃতিতে। (এই হাওয়া ফাল্গুনের)

আর আমরা দেখতে পাই তখন,

... সমস্ত নিখিলে
মাঠে তেপান্তরে বনে আবর্তিত প্রাণের আভাস। (ওই)

'প্রার্থিত স্বজন' কবিতায় নিসর্গপ্রকৃতিকে অনুষঙ্গ করে কবি ফুটিয়ে তোলেন আশাবাদ। জীবনের চারপাশে যখন কেবল নিষ্ঠুরতা, শুধুই বিষণ্ণতার প্রতিধ্বনি — তখন কবি আবিষ্কার করেন —

... বৃক্ষের স্বভাবে
পরিশুদ্ধ নির্লিপ্ততা। শাখানদী সমুদ্র-আহ্বানে
ক্ষিপ্রবেগ, আবর্ত-জটিল। অদৃশ্য অনন্য অনুভবে
প্রার্থিত স্বজন আজো কেউ আছে দিনের চিন্তায়
এবং নিসর্গ দৃশ্যে দিকভ্রান্ত আকাঙ্ক্ষার পাশে
প্রত্যহের আয়ুর গভীরে। (প্রার্থিত স্বজন)

'আদি চেতনা' কবিতাটিতে বৃক্ষকে অনুষঙ্গ হিসেবে ব্যবহার করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে গভীর জীবনবোধ। কবি বলেন,

দু'দণ্ড থাকবো আমি এইখানে মৃত্তিকায় শুয়ে
এই যে প্রাচীন বট দৃঢ়মূল এখানে দাঁড়িয়ে
পিতাপিতামহদের প্রতিবেশী। সমাহিত পূর্বসূরীদের
সমৃদ্ধির স্মৃতির সাক্ষ্য; (আদি চেতনা)

যে কিনা অস্তোন্মুখ সূর্যকে ধারণ করে কাণ্ডমূলে, পাতায় বাকলে; আর তাই,

বর্ষে বর্ষে গ্রীষ্ম বর্ষা অকৃত্রিম দৃশ্যরচনায়
একটি বিন্যস্ত ঐক্য নিত্যকাল রেখেছে বজায়
এই প্রৌঢ় বীতশোক সদানন্দ বৃক্ষের শরীরে। (ওই)

কবি প্রকৃতির এই প্রাচীন সদস্যকে মেনে নিয়েছেন আদিম পিতা বলে। তাই ক্ষতবিক্ষত শরীরে অস্থির কবি প্রজ্ঞা মেধা মননের এই স্থির ঋষির আশ্রয়েই থাকার বাসনা প্রকাশ করে আশ্বস্ত হন এই ভেবে যে,

তৃষাদীর্ণ বাসনারা অতঃপর ঘুমাবে নির্ভয়ে, (ওই)

'রূপান্তর' কবিতায় দেখা যায় কবির প্রেয়সী কবির কাছে এলেই নিসর্গপ্রকৃতি বদলে যায়। কবির ভাষায়,

তুমি যখন কাছে এলে উঠলো নদী জেগে।
হঠাৎ ঋতু বদলে গেল কিসের দোলা লেগে!
মেঘগুলো সব বেগে উধাও নিথর সুদূর নীলে,
সূর্য জ্বলে মাঠে মাঠে নীরব হ্রদে বিলে। (রূপান্তর)

কবি তখন এক নিমেষে হয়ে যান আদিম প্রেমিক পাখি, এবং সূর্য ও চাঁদের হাতে পরিয়ে দেন প্রণয়ের রাখি। আর বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

তুমি যখন কাছে এলে উঠলো নদী জেগে,
পাথর যতো সোনা হ'লো যাদুস্পর্শ লেগে। (ওই)

'লোকটিকে দ্যাখো' কবিতার লোকটি প্রকৃতি প্রেমিক। সারাক্ষণ ফুলের বাগানের পরিচর্যায় ব্যস্ত থাকে সে।

ঝাঁজরিতে জল দেয়, ধুলো ঝাড়ে, সজ্জিত শাখায়
কীটদুষ্ট পাতাগুলি ছেঁটে দিয়ে তার সন্নিধানে
নতুন চারার গুচ্ছ হাতে নিয়ে মাটিতে লাগায়
এবং গোলাপ কিংবা কৃষ্ণচূড়া, চন্দ্রমল্লিকার
উদ্ভাসিত হাসি দেখে সংসারের কপটতা ভুলে
মগ্ন থাকে ... (লোকটিকে দ্যাখো)

কবি এর চেয়ে স্নিগ্ধ সুখী লোক আর কোথাও দেখতে পান না। এ পৃথিবীতে টাকা দিয়ে হয়ত অনেক কিছু মেলে কিন্তু প্রকৃতির এই নিঃস্বার্থ প্রেমিক লোকটি যেভাবে কুসুমিত শিল্পমালা তৈরি করে ফুলের লাবণ্যে তা অত্যন্ত দুর্লভ। কবির ভাষায় :

... তার মতো আর
নিঃস্বার্থ প্রেমিক তুমি দেখবে না এখানে কোথাও।
বৃষ্টিতে ক্ষরায় কিংবা গ্রীষ্মে শীতে দ্যাখো সর্বদাই
বিরল আকাঙ্ক্ষা তার বুকে আনে সুন্দর সৃষ্টির
জ্যোৎস্নাসিক্ত পূর্ণিমা নির্ঝর। (ওই)

মৌমাছি এই নিসর্গপ্রকৃতিরই একটি অংশ, তাই 'মৌমাছি অদৃশ্য হলে' কবিতায়ও সাক্ষাৎ মেলে এক ঝলক নিসর্গপ্রকৃতির —

সবুজ শোভায় তার কী আনন্দ, গোপন সংবাদ
নিয়ে এলো গ্রীষ্মশীতে, দৃশ্যস্নিগ্ধ বসন্তে অন্তত;
নিবিড় ছোঁয়ায় তার গোলাপের পাপড়ি স্পন্দিত,
লাল নীল ফুলে ফলে অন্তর্লীন সমর্পিত সাধ। (মৌমাছি অদৃশ্য হলে)

নিসর্গ প্রকৃতির এই ক্ষুদে সদস্য এ কবিতার প্রধান চরিত্র — কবির হৃদয়ের প্রতিনিধি। তাই তাকে ঘিরেই একদিকে যেমন কবির মুগ্ধতা, অন্যদিকে পতনের ভয়। কারণ,

মৌমাছি অদৃশ্য হলে ভরে থাকে বিষণ্ন সময়। (ওই)

'অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাগুলো' কবিতাটিতে নিসর্গপ্রকৃতিকে ঘিরে কবি কিরণশঙ্করের না পাওয়ার অব্যক্ত বেদনা অনুরণিত হয়েছে। অনাড়ম্বর আর সরল ভাষায় কবি এখানে নিসর্গপ্রকৃতির রোজনামচা তুলে ধরেছেন এভাবে :

সকালে প্রথম রৌদ্রে প্রতিশ্রুত সম্মোহিত শোভা।
মাঠে পথে বনতলে স্তব্ধহ্রদে পাহাড়চূড়ায়
রৌদ্রের স্পন্দন শুভ্র আকাঙ্ক্ষার নৃত্যশীলতায় (অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাগুলো)

তারপর রৌদ্র আরো গাঢ় হলে সমস্ত সংসারময় অদ্ভুত প্রতিভা কাজ করে। দুহাতে প্রস্তর-নুড়ি কুড়াতে কুড়াতে মাঝে মাঝে কবি দুচোখ ভরে নৈসর্গিক দৃশ্য দেখে নেন। কখনো কখনো মনে হয় তাঁর সব পণ্ডশ্রম। তখন বুকের চাপা দীর্ঘশ্বাস অন্ধকার

Dhaka University Institutional Repository

পাহাড়ের গায়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়। সেই অনুভূতি অপূর্ব ব্যঞ্জনায় কবি ফুটিয়ে তোলেন তাঁর কবিতায় —

অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাগুলো গুঁড়ো গুঁড়ো জোনাকির মত
জ্বলে আর নেভে আর নিদারুণ আর্তিতে স্পন্দিত। (ওই)

পাঁচ.

আলোচিত কবিতাগুলো ছাড়াও কয়েকটি কবিতা আছে 'দিনযাপন' কাব্যগ্রন্থে। সেগুলো হচ্ছে 'কবিতা মেলায়', 'পাখী', 'আলো : অন্ধকার' ও 'একবার ভেবে দ্যাখো'।

'কবিতা মেলায়' কবিতাটিতে কবিতা মেলাকে ঘিরে কবির বিক্ষুব্ধ মনের যন্ত্রণা প্রকাশ পেয়েছে। আজ অনেকেরই প্রয়োজন নেই বলে এখানে আসে না। কারণ কবিতা হচ্ছে মনের নিভৃত দেশে সূর্য তেজে জড়তার পিণ্ডকে গলিয়ে তৈরি করা একমুঠো স্বর্ণকণা। কবির ধারণা,

তার ছোঁয়া না পেয়েই ক্ষোভতিক্ত গোধূলী সন্ধ্যায়
ফিরে গেছে বহুযাত্রী। (কবিতা মেলায়)

কেননা একখণ্ড কবিতা স্বর্ণকণা তৈরি করতে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে হয় কবিকে। রোগেশোকে হিমপাণ্ডু জীবনের মুমূর্ষু সময়েই হয়ত কোনো অলৌকিক ক্ষণে মিলে যায় তেমনি একমুঠো স্বর্ণরৌদ্র।

তার সাড়া না পেয়েই তারা ফিরে গেছে
নির্যাতক নিরক্ত নিমেষে
অন্য কোনো খ্যাতি সুখ কামনার লুব্ধ অঙ্গীকারে
অনিকেত নিকেতনে, ছায়ায় গোপনে। (ওই)

স্বার্থপরের মতো কবিতাকে ছেড়ে এই লুব্ধ পথে কবি যেতে পারেন নি। তাই সময়ের করাঘাত তাঁর স্বেদাক্ত শরীরে রেখে গেছে নিষ্ঠুর বিদ্রূপ কিংবা নির্মম যৌতুক। কবি যতবার এই যন্ত্রণার অবসান চেয়েছেন কিংবা যতবার কান্নার শেষে ময়ূরাক্ষী সৃজনের নদী খুঁজেছেন, ততবার এই যন্ত্রণাই কবিকে নিয়ে গেছে আবার সেখানে,

যেখানে এখনো শুধু শেষহীন উদ্যোগের শেষে
বিহ্বল জোয়ার জাগে জঙ্গমে দুর্বার। (ওই)

'পাখী' কবিতায় আমরা লক্ষ করি :

কে এক অবাক পাখী ইচ্ছাহীন অন্ধকারে চলে।
বিরল সাড়ায় তার অরণ্যের বুকে ব্যাকুলতা।
নদীর দু'তীরে তীব্র তরঙ্গের বিহ্বল ব্যস্ততা,
অন্ধ দিকচক্রবালে বিস্ময়ের তীক্ষ্ণরেখা জ্বলে। (পাখী)

তার গভীর ছোঁয়ায় যতো দগ্ধশাখা বৃক্ষে ফল ধরে, পাপড়ি মেলে স্তবকের নির্জীব মুকুল, পলাশ-বকুলের প্রান্তর বিস্তৃত সুবাসে মধু-মক্ষিকার দল আকর্ষিত হয় কিংবা তার ঘ্রাণ বুকে নিয়ে উৎসের দিকে হেঁটে যায় নির্ভিক প্রেমিক। মূলত এ কবিতায় 'কে' হচ্ছে কবির সদর্থক জীবনভাবনা। কবির সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ প্রেমিক সত্তা। তাই কবিতার শেষ চরণদ্বয় দেখতে পাওয়া যায় :

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমশ সঞ্চারমান নীলদ্যুতি ক্ষোভের বদলে;
প্রেমিক ইচ্ছায় নীল পাখী হয়ে অন্ধকারে চলে। (ওই)

এ কবিতায় 'যমুনা'র অবতারণায় পাওয়া যায় প্রেমের শ্রীক্ষেত্র বৃন্দাবনের রাধা-কৃষ্ণের শাশ্বত সুন্দর প্রেমের আভাস।

'আলো : অন্ধকার' কবিতায় কবি 'আলো'কে বিদায় জানিয়ে 'অন্ধকার'কে আহ্বান জানিয়েছেন। কবি এই বিরূপ মনোভাবের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে :

আমার আজন্ম ক্লান্তি চোখজ্বলা দৃশ্যময়তায়;
পরিশ্রুত অন্ধকারে যদি না বিকীর্ণ থাকে ঘর
তরঙ্গ নিষ্ফলতর দিনের ধবল স্বচ্ছতায়। (আলো : অন্ধকার)

প্রতিদিনের সংসারযাত্রার যে অন্তর্দাহ, আলোতে তা এত বেশি প্রকট যে কবির কাছে তা অসহ্য লাগে। এবং এই উদ্বেলতা থেকে মুক্তি পেতে অন্ধকারকেই বন্ধু ভেবে গ্রহণ করেন। অন্ধকারে সবকিছু একাকার হয়ে যায়, এমনকি মানুষের ভেতরকার ভেদাভেদও। সে কারণেই কবি বলেন :

যে জানে না অন্ধকার কিংবা তার রত্নসিংহাসন,
তাকে কে আলোক দেবে, স্নিগ্ধস্পর্শ গূঢ় সন্নিধানে! (ওই)

আলো'কে তিনি সসম্মানে ফিরে যেতে বলেন এই জীবন নাটকের নাট্যমঞ্চ থেকে। বস্তুত কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের অন্ধকারের প্রতি এই আকর্ষণ মৃত্যুচেতনারই বহিঃপ্রকাশ। তারই সাক্ষ্য পাই কবিতার শেষ দুই চরণে,

সমস্ত হৃদয় রেখে অন্ধকার আকাঙ্ক্ষার জলে
একদিন শান্ত হবো, লীন হবো দৃশ্যের অতলে। (ওই)

'এবার ভেবে দ্যাখো' একটি স্বদেশপ্রেম ভাবনামূলক কবিতা। এ কবিতার প্রতিটি চরণে ছড়িয়ে আছে স্বদেশের প্রতি ভালবাসায় কবির আবেগদীর্ণ অনুভব। কবির প্রিয় স্বদেশ বাংলাদেশ। তাঁকে জন্ম থেকে এই প্রিয় মাতৃভূমি মায়ের মমতায় বুক দিয়ে সস্নেহে 'দিন থেকে রাতে,/ রাত থেকে দিনে/ অবিরাম স্পর্শধন্যতায়' বড় করে তুলেছে।

প্রখর গ্রীষ্মের দিনে
মেঘ বৃষ্টি জলে
হেমন্তে শরতে শীতে
বসন্ত বন্যায় (একবার ভেবে দ্যাখো)

কবির চেতনা জড়িয়ে থাকে শুধু,

প্রচ্ছন্ন স্বদেশ
এই বাংলা, খণ্ডিত প্রদেশ। (ওই)

এখানে কবির শুধু নয় সমস্ত বাঙালির মনেরই গোপন একটি অব্যক্ত ব্যথা ভাষারূপ পেয়েছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে ব্যক্তিগত সুবিধাভোগী কিছু মানুষের কূট কৌশলে অখণ্ড বাংলার দ্বিখণ্ডিত হওয়া আপামর সাধারণ জনতার হৃদয়েই আঘাত করেছে। এক আত্মা দুই দেহে বিভক্তি মেনে না নিলেও মেনে নিতে হয়েছে শাসকের তীব্র ভ্রূকুটিতে।

Dhaka University Institutional Repository

কবি কিরণশঙ্করকেও এই বিভক্তি মেনে নিতে প্রিয় জন্মভূমি পূর্ব বাংলা ছেড়ে পশ্চিম বাংলায় চলে যেতে হয়েছিল বাধ্য হয়ে। কিন্তু কিছুতেই প্রিয় জন্মভূমিকে তিনি ভুলতে পারেন নি। কারণ সেতো জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধন। তাই কবির অমোঘ উচ্চারণ :

গঙ্গায় পদ্মায় একাকার
জনমে মরণে বাঁধে সেতু
অজেয় প্রাণের বাংলা,
এই বাংলা দেশ। (ওই)

আত্মসচেতন প্রত্যেক কবিরই নিজস্ব শিল্পরুচির কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকে। তাঁর কাব্যভাষা, শব্দগঠনে নিজস্ব নান্দনিকতার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ থাকে। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তও এর ব্যতিক্রম নন, তাঁর কাব্যভাষা ও কবিতার শব্দরূপ তাঁর চৈতন্যেরই অনুগামী। তবে কখনো কখনো জীবনানন্দীয় প্রভাব তাঁর কবিতায় চেতনার ভাবানুষঙ্গে নবায়িত হয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ —

১. শেফালী রঞ্জিত হাতে এই পথে আসবে কি কেউ
জানেনা সে। প্রিয়তম সম্ভাষণে নিরুচ্চার গানে
অন্ধকার নদীপথে কবে যে জাগবে নীল ঢেউ
জানেনা সে। সে কেবল অবিরত মুগ্ধ আত্মদানে
স্বেদ ও রক্তের ছোপে পদচিহ্ন পথে রেখে যায়
প্রতিধ্বনি প্রহত প্রহরে। (অমায় পূর্ণিমা)

২. সমস্ত দিনের শেষে রজনীর স্পর্শ-ধন্যতায়
আদিম প্রশান্তি নামে ভগ্নবুকে উদ্যানলতায়। (স্তব্ধতায়)

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের গদ্য কবিতার ভাষায় এ সময় বেশ নতুনত্ব লক্ষ করা যায়। যুগ্মশব্দের ব্যবহারে, অনুপ্রাসবহুল পঙক্তিতে তাঁর কবিতা নতুন অর্থে ও তাৎপর্যে ব্যঞ্জিত হয়েছে। যেমন —

কে ছড়ায় অবিরাম ঢেউ। তটে তটে আনে
বিচিত্রিত কুজ্ঝটিকা; ভেঙে ভেঙে রাতের তুষার
অল্পে অল্পে জাগায় জোয়ার
বিষণ্ন নদীর বাঁকে, বেদনার্দ্র রাতের তিমিরে,
অনবদ্য অব্যক্ত গভীরে। (রবীন্দ্রনাথ)

'দিনযাপন' কাব্যগ্রন্থে অলংকারের ব্যবহারেও কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের কৃতিত্ব লক্ষণীয়। অনুপ্রাস, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্পে তাঁর কবিতাকে তিনি শিল্পসমৃদ্ধ করে পাঠকচিত্তকে চমৎকৃত করেছেন। আমরা তাঁর কবিতা থেকে অলংকারের বিচিত্র সমাবেশ উদ্ধার করছি।

শব্দালংকার

সরল অনুপ্রাস :
১. মদমত্ত রাজা আজ ম্রিয়মাণ। (রাজা)
২. তোমার রঞ্জিত রাজ্যে লগ্ন কাটে কথায়-কথায়, (কেন এই আলোড়ন)
৩. বিহ্বল জোয়ার জাগে জঙ্গমে দুর্বার। (কবিতা মেলায়)

অন্ত্যানুপ্রাস :
১. ক্রমশ সঞ্চারমান নীলদ্যুতি ক্ষোভের বদলে:
প্রেমিক ইচ্ছায় নীল পাখি হয়ে অন্ধকারে চলে। (পাখী)

Dhaka University Institutional Repository

২. হৃদয়ের প্রতিনিধি হোক না এ বিমুগ্ধ মৌমাছি,
যে-ওড়ে তৃষ্ণার দেশে আকাঙ্ক্ষিত দৃশ্যের সন্ধানে;
চেতনার অন্ধকারে যেখানে স্তম্ভিত হয়ে আছি,
সেখানে ফুটুক ফুল গুনগুন তার পুঞ্জ গানে। (মৌমাছি অদৃশ্য হলে)

ছেকানুপ্রাস :

১. সর্বত্র সৃষ্টিকে ঘিরে সমষ্টির শ্রেষ্ঠ অঙ্গীকার। (কর্মেই আনন্দ খুঁজি)

২. যন্ত্রণায় মন্ত্রণায় অব্যাহত সেই দিকে গতি। (নদী)

৩. সঙ্কীর্ণ ইচ্ছার হাতে স্বেচ্ছাবন্দী কালের পুতুল, (সুরের নিবিড়ে)

শ্রুত্যানুপ্রাস :

ট ঠ : বাষ্পের উত্তাপ শুধু, শস্যহীন ফসলের মাঠে,
ধু-ধু জ্বলে খররৌদ্র, ম্লান ছায়া জনশূন্য হাটে। (দিনযাপন)

ত দ : অবশ্য বনের শেষে প্রসারিত কল্লোলিত নদী;
যন্ত্রণায় মন্ত্রণায় অব্যাহত সেই দিকে গতি। (নদী)

অর্থালংকার

উপমা :

১. অন্ধকার গুঁড়ো হয়ে জোনাকির মতো ওঠে জ্বলে'। (ধ্বনি, বর্ণ, গভীরতা)

২. তোমার দুপাশে ধারা তার
পাহাড়ে নদীর মতো দৃশ্যমান; (দ্যাখো কতো দৃশ্য আছে)

৩. ভালোবাসা, তুমি থাকো সমস্ত সৃষ্টির অনুভবে
একটি রেখার মতো, আন্দোলিত নিভৃত গৌরবে। (ভালোবাসা)

৪. এইসব দেখেই সে একটি মহৎ প্রেরণায়
দীপ্যমান হতে গিয়ে বর্তিকার মতো জ্বলে' যায়। (দৃশ্যপট)

৫. চল্লিশ বছর আমি এই শান্ত বটের ছায়ায়
আদিম শিশুর মতো সমর্পিত। (শান্ত বটের ছায়ায়)

উৎপ্রেক্ষা :

১. যদিও ফুলের / নিটোল সৌন্দর্য তার চোখে আনবে না কোনোদিন /
শিল্পীর জীবনবেদ। (লোকটিকে দ্যাখো)

২. কিন্তু যদি শ্বাপদের মতো ভয়াবহ / কেউ হয়! (বিনীত উপায়ে)

সমাসোক্তি :

১. ঘুম নেই, শান্ত দেহ, — রাজা এসে জানালায় বসে;
অতর্কিত হাওয়া এসে তাড়া করে প্রচণ্ড আক্রোশে। (রাজা)

২. এবং কোথাও হিংস্র অন্ধকার গাঢ়তর হ'লে
অন্ধকারে বুক রেখে মৌলিক আশ্বাসে
রক্তের বদলে শিল্প সাজায় যৌবন (ধ্বনি, বর্ণ, গভীরতা)

চিত্রকল্প :

অতৃপ্তির কান্নাভেজা হেমন্ত বিকেলে
গনগনে আগুনের কাছে চোখ মেলে
মাঠের অশ্বথকোণে বিমর্ষ ভিখারী
কঠিন গভীর রাতে
অসহ্য তুহিন হাওয়া বুকে নেবে ব'লে
বসে থাকে। (রবীন্দ্রনাথ)

Dhaka University Institutional Repository

প্রতীক

'দিনযাপন' কাব্যগ্রন্থে 'হাওয়া', 'নদী', 'রাত্রি', 'পাখি', 'মৌমাছি', 'আলো', 'অন্ধকার', 'কোকিল', 'জোনাকি', 'বৃক্ষ' প্রভৃতি কবির অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষেত্রে পালন করেছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

কবিতার কালোত্তীর্ণ অভিব্যঞ্জনার মাত্রা প্রকাশে প্রতীক রূপকের ব্যবহার শিল্পকীর্তিরই উচ্চাঙ্গ প্রয়াস। 'দিনযাপনে', 'রাজা', 'দিনযাপন', 'প্রবাহিণী', 'নদী', 'পিপাসা', 'পাখী', 'আলো : অন্ধকার', 'প্রার্থিত স্বজন', 'আদিচেতনা', 'বিনীত উপায়ে', 'মৌমাছি অদৃশ্য হলে', 'শান্ত বটের ছায়ায়' প্রভৃতি কবিতাগুলোতে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের প্রতীক ব্যবহারের প্রবণতা বা প্রতীক নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাঁর সচেতনতা লক্ষ করবার মতো। কবিতাগুলোর নামকরণেই জীবন ও সমাজ প্রসঙ্গে কবিচিন্তার এক ধরনের বোধ প্রকাশ পেয়েছে, যা কবিকে কখনো অতীতমুখী করেছে, আবার কখনো তাঁকে নিয়ে গেছে ভবিষ্যতের চলমানতায়; কখনো বা কবির মানসচৈতন্যের অীনবার্য প্রবাহসূত্রে একটি বিশেষ তাৎপর্যকে তুলে ধরেছে, যা সমকালীন সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিজীর্ণ সংরক্ত সময়কেও অঙ্গীকার করেছে। যেমন —

ঘুম নেই, শান্ত দেহ, — রাজা এসে জানালায় বসে;
অতর্কিত হাওয়া এসে তাড়া করে প্রচণ্ড আক্রোশে। (রাজা)

এখানে বিপন্ন, অত্যাচারিত সাধারণ জনতার 'রাজা' রূপ মুষ্টিমেয় লোকের স্বার্থে গড়ে ওঠা পুঁজিবাদী সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 'হাওয়া'র প্রতীকে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে।

কেবল বিষণ্ন চিন্তা, ইচ্ছামৃত্যু, পতনের ভয়
মৌমাছি অদৃশ্য হলে ভরে থাকে বিষণ্ন সময়। (মৌমাছি অদৃশ্য হলে)

এখানে 'মৌমাছি' কবির জীবনের আশা ও আশ্বাসের প্রতীক; কবির হৃদয়ের প্রতিনিধি, যে-ওড়ে তাঁর তৃষ্ণার দেশে আকাঙ্ক্ষিত দৃশ্যের সন্ধানে। তাই মৌমাছি অদৃশ্য হলে তিনি ভীত হন মৃত্যুভাবনায়।

চল্লিশ বছর আমি ওই শান্ত বটের ছায়ায়
আদিম শিশুর মতো সমর্পিত। (শান্ত বটের ছায়ায়)

'শান্ত বট' কবির পিতার প্রতীক; যাঁর স্নেহ ছায়ায় তিনি জীবনের চল্লিশটি বছর অতিবাহিত করেছেন, নিঃশ্বাসে নিয়েছেন টেনে সূক্ষ্ম আশীর্বাদ।

ছন্দ

পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থগুলোর মতো 'দিনযাপন'-এও কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত বিচিত্র ছন্দের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তবে এ কাব্যগ্রন্থে সমিল প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত বা ১৮ মাত্রার মহাপয়ারই প্রাধান্য পেয়েছে। স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দের কবিতা এ কাব্যে নেই। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ১৮টি সনেট এ গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে — যেগুলোর ৫টি শেক্সপিয়রিয় ও ১৩টি দেশীয় মিশ্রণ রীতিতে রচিত। ১টি কবিতা আছে স্বরাক্ষরবৃত্ত ছন্দের — যা কবির ছন্দ নিয়ে নতুন নতুন নিরীক্ষার স্বাক্ষর বহন করে। বিভিন্ন কবিতার ছন্দের নমুনা এখানে উল্লেখ করা হল :

Dhaka University Institutional Repository

অক্ষরবৃত্ত :

তুমি যদি প্রণয়িনী, এসো একবার
স্মৃতিচারণার এই অবাক জগতে।
যেখানে হৃদয় পায় শান্ত অধিকার
সমর্পণে, রাতে চাঁদ জনশূন্য হ্রদে
করুণার উৎসমুখ উন্মোচিত ক'রে
নিজেকে নাচায়। (অন্তরচেতনা)

সমিল প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত :

কী তবে আমার কাজ : আমি জানি বাঁচেনা মানুষ
স্মৃতিকে সম্বল ক'রে; কল্পনার অনিত্য ফানুস
উড়িয়ে শেষরক্ষা হয়নি কখনো কোনো কালে। (দিনযাপন)

স্বরাক্ষরবৃত্ত :

তুমি যখন কাছে এলে উঠলো নদী জেগে।
হঠাৎ ঋতু বদলে গেল কিসের দোলা লেগে!
মেঘগুলো সব বেগে উঠাও নিথর সুদূর নীলে,
সূর্য জ্বলে মাঠে মাঠে নীরব হ্রদে বিলে। (রূপান্তর)

সনেট :

১. তবে তুমি ফিরে যাও হে আলোক, হে সুধা নির্ঝর!
আমার আজন্ম ক্লান্তি চোখজ্বলা দৃশ্যময়তায়;
পরিশ্রুত অন্ধকারে যদি না বিকীর্ণ থাকে ঘর,
তরঙ্গ নিষ্ফলতর দিনের ধবল স্বচ্ছতায়।
এই যে অন্তরদাহ রুদ্ধদ্বার ম্লান চেতনার
অবাক শ্রাবণ ঢেউ, প্রতীক্ষার মৌন ঋতুগুলি;
মৌলিক বন্ধনে বাঁধে সবাইকে বন্ধু অন্ধকার,
উদ্বেল অধর ছোঁয় প্রতিবেশী শঙ্কার অঙ্গুলি।

যে জানে না অন্ধকার কিংবা তার রত্নসিংহাসন,
তাকে কে আলোক দেবে, স্নিগ্ধস্পর্শ গূঢ় সন্নিধানে!
ইচ্ছার নক্ষত্র তুমি ফিরে যাও যদি সমাপন
সম্মানিত নাটকের অভিনয় আলোর সোপানে।
সমস্ত হৃদয় রেখে অন্ধকার আকাঙ্ক্ষার জলে
একদিন শান্ত হবো, লীন হবো দৃশ্যের অতলে। (আলো : অন্ধকার)

২. কে এক অবাক পাখী ইচ্ছালীন অন্ধকারে চলে।
বিরল সাড়ায় তার অরণ্যের বুকে ব্যাকুলতা।
নদীর দু' তীরে তীব্র তরঙ্গের বিহ্বল ব্যস্ততা,
অন্ধ দিকচক্রবালে বিস্ময়ের তীক্ষ্ণরেখা জ্বলে।
গভীর ছোঁয়ায় যতো দগ্ধশাখা বৃক্ষে ফল ধরে,
ক্রমশ পাপড়ি মেলে স্তবকের নির্জীব মুকুল;
প্রান্তরে ছড়ায় ঘ্রাণ মমতায় পলাশ বকুল,
মক্ষিকা পাখীর দলে আকর্ষণে পাখাগুলি নড়ে।

অন্ধকার সেতুগুলি পার হয়ে ঘ্রাণ বয়ে বুকে
প্রেমিক উৎসের দিকে যেতে চায়। যেখানে নিবিড়

Dhaka University Institutional Repository

কুটিল সন্ত্রাসহীন অনুভবে যমুনার তীর
শান্ত-নীল, ঈষৎ উছল। আর, রক্তস্করা মুখে
ক্রমশ সঞ্চারমান নীলদ্যুতি ক্ষোভের বদলে;
প্রেমিক ইচ্ছায় নীল পাখী হয়ে অন্ধকারে চলে। (পাখী)

প্রথমটিতে শেক্সপিয়রিয়ান রীতির কখ কখ ঃ গঘ গঘ ঃঃ ঙচ ঙচ ঃ ছছ মিল বিন্যাস এবং দ্বিতীয়টিতে প্রচলিত রীতির মিশ্রণে অনিয়মিত ধাঁচের কখ খক ঃ গঘ ঘগ ঃঃ ঙচ ঙচ ঃ ছছ মিল বিন্যাস ঘটিয়ে কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত তাঁর ছন্দ নৈপুণ্যের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

৫. এই এক সময়

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ কোনটি তা নির্ণয় করা বেশ কষ্টকর। 'এই এক সময়' এবং 'বৃষ্টি এলে' কাব্যগ্রন্থদ্বয়ের প্রকাশকাল নিয়ে নানান বিভ্রান্তি ছড়িয়ে আছে। যেমন — প্রথম প্রকাশ নিঃশেষিত হওয়ায় ১৯৮২-র মার্চ মাসে 'বৃষ্টি এলে'র দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয় কলকাতার *সাহিত্যচিন্তা* থেকে; সে সময় বইটির প্রথম প্রকাশ উল্লেখ করা হয় জুলাই ১৯৭৩। আর 'সাহিত্যচিন্তা'র প্রকাশক কল্যাণ চন্দ গ্রন্থটির মুখবন্ধে লেখেন :

> ''বৃষ্টি এলে' কিরণশঙ্করের পঞ্চম ও সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ। ইতিপূর্বে প্রকাশিত 'স্বপ্ন-কামনা', 'স্বর ও অন্যান্য কবিতা', 'দিনযাপন' এবং 'এই এক সময়' প্রকাশিত হয়েছিল প্রায় তিরিশ বছরের ব্যবধানে'।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সম্ভবত কল্যাণ চন্দ তখনো কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'নতুন আঁচড়'-এর কথা জানতেন না, সেকারণে তিনি মাত্র চারটি কাব্যগ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। তবে এখানে 'এই এক সময়'কেই 'বৃষ্টি এলে'র পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থ বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

১৯৮৫-র জানুয়ারিতে 'উচ্চারণ' থেকে প্রকাশিত কিরণশঙ্করের 'মানুষ জানে' কবিতাগ্রন্থের ইনার পৃষ্ঠায় গ্রন্থকারের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের তালিকায় 'বৃষ্টি এলে'র প্রকাশকাল ১৯৭২ এবং 'এই এক সময়'-এর প্রকাশকাল ১৯৭৩ বলে উল্লেখ রয়েছে। কবির 'ছায়া হেঁটে যায়' কবিতাগ্রন্থের ইনার পৃষ্ঠায় 'বৃষ্টি এলে' ও 'এই এক সময়'-এর প্রকাশকাল ১৯৭২ লেখা আছে। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের 'আশি-নব্বুই-এর কবিতা' গ্রন্থের ইনার পৃষ্ঠায় দেওয়া তালিকায় 'বৃষ্টি এলে'র প্রথম প্রকাশ ১৯৭২ ও দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৭৩; আর 'এই এক সময়'-এর প্রথম প্রকাশ ১৯৭৫ বলে ছাপা হয়েছে।

এই গ্রন্থদ্বয়ের প্রকাশকাল নিয়ে স্বয়ং কবির বক্তব্যই বিভ্রান্তিকর। ১৯৮৭-তে তিনি 'সত্তর দশক' পত্রিকার ডিসেম্বর সংখ্যায় অমিত চক্রবর্তীকে প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে প্রথমে 'বৃষ্টি এলে' এবং পরে 'এই এক সময়'-এর নাম উল্লেখ করে দুটো সংকলনেরই প্রকাশকাল নির্দেশ করেছেন ১৯৭২ বলে। আবার ১৯৯৬-এ প্রকাশিত 'সাহিত্যচিন্তা'র মে সংখ্যার 'সময় অসময়'-এ তিনি 'এই এক সময়'কেই নিজের চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ এবং এটি ১৯৭২-এ প্রকাশিত বলে উল্লেখ করেছেন।

কবির মৃত্যুর পর কল্যাণ চন্দের সম্পাদনায় 'সাহিত্যচিন্তা'র ডিসেম্বর ১৯৯৮-র রণেশ দাশগুপ্ত ও কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত স্মরণ সংখ্যায় (এটিই 'সাহিত্যচিন্তা'র সর্বশেষ সংখ্যা) 'কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের প্রকাশিত বইয়ের তালিকায় 'বৃষ্টি এলে' ১৯৭২ এবং 'এই এক সময়' ১৯৭৩ বলেই লেখা হয়েছে।

সুমিতা চক্রবর্তী তাঁর 'আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়' গ্রন্থে 'এই এক সময়' ও 'বৃষ্টি এলে' গ্রন্থদ্বয়ের প্রকাশকাল উল্লেখ করেছেন ১৯৭৩। তবে তিনি গ্রন্থদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কবিতার রচনাকাল পর্যালোচনা করে 'এই এক সময়'কেই 'বৃষ্টি এলে'র পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থ বলে স্বীকার করে নিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান গবেষক এই বিভ্রান্তি এড়াতে বিলুপ্তপ্রায় আলোচ্য 'বৃষ্টি এলে'র দ্বিতীয় মুদ্রণ এবং 'এই এক সময়'-এর প্রথম প্রকাশ সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছেন। 'বৃষ্টি এলে'র দ্বিতীয় মুদ্রণ মার্চ ১৯৮২-তে প্রথম প্রকাশ উল্লিখিত হয়েছে জুলাই ১৯৭৩; এবং 'এই এক সময়'-এর প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৮০ — এর ইংরেজি প্রকাশকাল হয় আগস্ট ১৯৭৩। এ হিসেব অনুসারে 'বৃষ্টি এলে'র পরবর্তী প্রকাশিত গ্রন্থ হচ্ছে 'এই এক সময়'।

নানা বিভ্রান্তি সত্ত্বেও উপরে উল্লিখিত বেশিরভাগ তথ্যও 'বৃষ্টি এলে'কেই 'এই এক সময়'-এর পূর্ববর্তী গ্রন্থ বলে স্বীকৃতি দেয়। আমরাও 'বৃষ্টি এলে' কাব্যগ্রন্থকেই কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ বলে মেনে নেই। তবে সংকলন দুটো কবিতার বিষয় বিচারে 'বৃষ্টি এলে'র কবিতাগুলোকে 'এই এক সময়ে'র পরবর্তী রচনা বলেই অনুমিত হওয়ায় এবং আলোচনার সুবিধার্থে 'এই এক সময়'কেই অগ্রবর্তীর মর্যাদা দেওয়া হল।

'এই এক সময়'-এর প্রকাশক কলকাতার সারস্বত লাইব্রেরি এবং গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে চল্লিশের দুই প্রধান কবি, কবি-সুহৃদ সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে। গ্রন্থভুক্ত কবিতার সংখ্যা ৫৭। ১৯৫৪ থেকে ১৯৭৩ পর্যন্ত বিস্তৃত সময়ের মধ্যে রচিত '৫৪-র ১টি '৬২-র ১টি, '৬৩-র ৩টি, '৬৪-র ২টি, '৬৫-র ২টি, '৬৬-র ১টি, '৬৭-র ২টি, '৬৮-র ১টি, '৬৯-এর ৯টি, '৭০-এর ১১টি, '৭১-এর ১১টি, '৭২-এর ১২টি এবং '৭৩-এর ১টি কবিতা এখানে স্থান পেয়েছে। এক নজরে বোঝার জন্যে নিচে ছকের মধ্যে রচনাকাল, কবিতার শিরোনাম ও সংখ্যা বিস্তারিতভাবে তুলে দেওয়া হল।

রচনাকাল	কবিতার শিরোনাম	সংখ্যা
১৯৫৪	'স্বদেশ'	১টি
১৯৬২	'ফুলের সন্ধানে'	১টি
১৯৬৩	'গৃহ আছে কিনা', 'উত্তরার জন্য', 'ঘরের হৃদয়'	৩টি
১৯৬৪	'বিচ্ছিন্ন গোপন', 'শেকস্পীয়রের নাটক মনে রেখে'	২টি
১৯৬৫	'মনুষ্যত্বহীনতায়', 'পতনের শব্দের আড়ালে'	২টি
১৯৬৬	'গোপাল মুখার্জি'	১টি
১৯৬৭	'যে-ভূমিকায় প্রতিদিন', 'কেমন আছেন'	২টি
১৯৬৮	'বৃক্ষের হৃদয়'	১টি
১৯৬৯	'হাওয়ার ভেতরে', 'রাত্রি তুমি', 'লোকটা', 'এই সময়', 'ঝড়ো হাওয়া কালো হাওয়া', 'শরৎ এলেই', 'তোমাকে জানি বলেই', 'শতবার্ষিকীর গান্ধীজীকে নিবেদিত', 'বুকে বুকে বারুদ'	৯টি

Dhaka University Institutional Repository

রচনাকাল	কবিতার শিরোনাম	সংখ্যা
১৯৭০	'একটি ঘোড়ার পা', 'মন্ত্র', 'খাড়া পাহাড় বেয়ে', 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়', 'দেড়শো বছর বাদে', 'প্রতিবিম্ব', 'ভীষণ সময়', 'ঘেরাও', 'ভয়ের আবহাওয়ায়', 'একজন মানুষের রক্তে', 'নষ্ট শতাব্দী'	১১টি
১৯৭১	'ছায়া সরে যায়', 'ছোট রাস্তা বড়ো রাস্তা', 'রাত গভীর হ'লে', 'বাংলার বাতাস গর্জে উঠেছে', 'এক এক সময়', 'এখন কিছুক্ষণ', 'এই এক সময়', 'আমি যাবো না', 'হে সময়, হে পৃথিবী', 'আনন্দ, বেদনা', 'বয়স্কমন্যতায়'	১১টি
১৯৭২	'একটি জীবনে', 'তুমি রুদ্ধবাক বলেই', 'তোমার ছবি আমার ছবি', 'প্রাসাদ গড়ার চেষ্টায়', 'প্রতিদিন সারাক্ষণ', 'শুধুই যাবার চেষ্টা', 'সন্ধিক্ষণের মুহূর্তে', 'জ্বালা', 'দেখেছিলাম', 'হাওয়া দিলেই', 'স্বপ্ন', 'আমি আসব'	১২টি
১৯৭৩	'টান বাড়ছে'	১টি

উপর্যুক্ত তালিকা থেকে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় যে, ১৯৫৪ থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত রচিত কয়েকটি কবিতা থাকলেও ১৯৬৯ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত লেখা কবিতাই এ কাব্যগ্রন্থে বেশি। ঠিক যে সময়টি পূর্ববাংলায় স্বাধিকার দাবিতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং পশ্চিম বাংলায় সুবিধাবঞ্চিত সাধারণ মানুষের মুক্তির দাবিতে নকশালবাড়ি আন্দোলনে ছিল বিক্ষুব্ধ। ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধকে কেন্দ্র করে দুদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ক্রমশ জটিল হয়ে উঠতে থাকে। বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে দুদেশের অর্থনৈতিক কাঠামো, অবর্ণনীয় দুরবস্থার শিকার হয় সাধারণ জনগণ। এ সময় পূর্ববাংলা পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে এবং পশ্চিমবাংলা ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে নানান গোলযোগে জড়িয়ে যায়। তার মধ্যে ভাষা-সমস্যা, অর্থনৈতিক সংকট, উদ্দেশ্য প্রণোদিত যুক্তিহীন কয়েকটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত এ বিরোধকে তীব্রতর করে তোলে। পূর্ববাংলার আপামর জনসাধারণের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণে এই বিরোধের অবসান ঘটে পশ্চিম পাকিস্তানিদের হটিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের মাধ্যমে ১৯৭১-এ। বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের অভূতপূর্ব এ ঘটনায় পশ্চিমবাংলাও সচকিত হয়ে ওঠে। এ দেশের হাজার হাজার শরণার্থীদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় ভ্রাতৃপ্রতিম পশ্চিমবাংলার জনসাধারণ। এমনকি ফেলে আসা মাতৃভূমির সঙ্গে নতুন করে এক ধরনের যোগাযোগ সৃষ্টি হতে পারে এরকম আশাবাদও জেগে ওঠে অনেকের মনে। জনৈক প্রাবন্ধিক লিখেছেন :

Dhaka University Institutional Repository

> ১৯৭১-এ পূর্ব পাকিস্তানে প্রবল গণ-আন্দোলন শুরু হলো স্বায়ত্বশাসনের দাবিতে এবং পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী পূর্ববঙ্গের বাংলা ভাষাভাষী জনগণের ওপর ফ্যাসিস্ট আক্রমণ শুরু করায় ২৬শে মার্চ-এ পূর্ব পাকিস্তান থেকে স্বাধীন সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের লেখক কবি বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ মানুষ অভিজ্ঞান ও অভিপ্রায়ের দিক থেকে এই মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেছিল।[৪৮]

অপরদিকে ১৯৭০-এ পশ্চিমবাংলায় নকশালবাড়ি আন্দোলন তুঙ্গে। এ আন্দোলনের ব্যাপকতার সঙ্গে সঙ্গে জোতদার খতম, মূর্তি ভাঙা ও শিক্ষা বয়কটের আহ্বান শুরু হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের অনেক লেখক বুদ্ধিজীবী কবি ও শিক্ষাবিদ কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাব কাটিয়ে উঠতে না পারলেও আন্দোলনের তত্ত্ব, যাথার্থ্য বা কার্যকারিতা সম্বন্ধে ধীরে ধীরে শ্রেণিসচেতন হয়ে উঠতে থাকে এক শ্রেণির জনগোষ্ঠী। তারা সুবিধাভোগী শ্রেণির বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে রুখে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের দমননীতির ফলে ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসতে থাকে এর যাবতীয় রাজনৈতিক তৎপরতা। তবে ভারত, বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার রাজনীতিতে নকশালবাড়ি আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা, এই আন্দোলনের ফলে দীর্ঘদিন ধরে গড়ে ওঠা এলিট শ্রেণির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা, তার আর্থ-সামাজিক কাঠামো, মোট কথা যা কিছু কৃত্রিম, ফাঁপা ও সুবিধাবাদের ওপর দাঁড়ানো — তার সবকিছু নকশালপন্থীরা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। তাই সামগ্রিকভাবে সবার সমর্থন না পেলেও বাংলার অগ্রজ কবিরা এই অবর্ণনীয় অভিঘাত থেকে একেবারে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারেন নি। সেই ১৯৩৮-৩৯ থেকে সাম্যবাদে যাঁরা বিশ্বাস করেছিলেন — তাঁদের অনেকেই দেশের কেন্দ্রীয় প্রশাসনের চেহারায় হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন; আস্থা হারিয়েছিলেন প্রতিষ্ঠিত সমাজতন্ত্রবাদী দলগুলোর ভূমিকাতে। সেই মনোভাব থেকেই তাঁরা কিছুটা সহমর্মী দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন নকশালবাড়ি আন্দোলনের দিকে।

কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত পূর্ব ও পশ্চিম দুই বাংলার ঘটনাতেই ভীষণ উদ্বেলিত হয়ে ওঠেন। তাঁর নিজের জন্ম থেকে বিবাহ পর্যন্ত তিনি পূর্ববাংলার লোক এবং পরবর্তী জীবন তিনি কাটিয়েছেন পশ্চিমবাংলার অধিবাসী হয়ে। তাই দুই বাংলার ঘটনাতেই তিনি উত্তেজনাবোধ করেছেন। তাঁর নিজের ভাষাতেই বলা যাক :

> পশ্চিমবঙ্গে ও বাংলাদেশের দৈনন্দিন পরিবেশ দারুণ উত্তেজনাপূর্ণ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন অজস্র দেশপ্রেমিকের রক্তে রঞ্জিত হয়ে একদিকে নতুন অভ্যুদয়ের সূচনা করেছে। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে নকশাল আন্দোলন দারুণ কাঁপিয়ে তুলেছিল সাধারণ মানুষের প্রচলিত ও গতানুগতিক ভিত্তিমূলকে।
>
> বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও পশ্চিমবঙ্গের নকশাল আন্দোলন অত্যন্ত প্রবীণ বয়সেও আমার মানসিকতায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করায় এই সময় কী করা যেতে পারে সে বিষয়ে একজন কবি ও সামাজিক মানুষ হিসেবে সচেতন হয়েছিলাম।
>
> [...] [...]
>
> আমার চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ 'এই এক সময়' [এ] ... এই সময়ের স্বাক্ষর কয়েকটি কবিতায় লক্ষ করা যায়।[৪৯]

Dhaka University Institutional Repository

'এই এক সময়' কাব্যগ্রন্থে চল্লিশের দশকে সাম্যবাদে বিশ্বাসী ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ কবি কিরণশঙ্করের সময়চেতনা পরিণত বয়স ও মননের চিন্তাগর্ভ প্রতিবাদী বাণীতে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। এ গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতার ভেতরেই সেই সময়ের মাটি কেঁপে ওঠার উত্তাপময় স্পন্দন অনুভব করা যায়। তবে আলোচনার সুবিধার্থে 'এই এক সময়'-এর কবিতাগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হল :

এক. সময় অনুভবজাত কবিতা
দুই. জীবন অনুভবজাত কবিতা
তিন. প্রেম অনুভবজাত কবিতা
চার. আশাবাদী কবিতা
পাঁচ. স্মৃতিচারণমূলক কবিতা
ছয়. মনীষীদের প্রতি নিবেদিত কবিতা
সাত. স্বদেশ ভাবনামূলক কবিতা
আট. বিবিধ বিষয়ক কবিতা

এক.

ষাটের দশকে দুই বাংলার শ্বাসরোধকারী আবহাওয়ায় কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের সামাজিক চেতনাবোধ থেকে উৎসারিত কবিতাগুলোকে বলা হয়েছে সময় অনুভবজাত কবিতা। মূলত ১৯৬৮ থেকে ১৯৭২-এর পশ্চিমবাংলা ও বাংলাদেশের আহত, রক্তাক্ত সময়ের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে এ পর্যায়ের কবিতায়। 'এই এক সময়'-এর এ ধরনের কবিতাগুলোর মধ্যে 'ফুলের সন্ধানে', 'গৃহ আছে কিনা', 'যে-ভূমিকায় প্রতিদিন', 'হাওয়ার ভেতরে', 'লোকটা', 'এই সময়', 'একটি ঘোড়ার পা', 'ভীষণ সময়', 'ছায়া সরে যায়', 'ঘেরাও', 'ছোট রাস্তা বড়ো রাস্তা', 'তোমার ছবি আমার ছবি', 'ভয়ের আবহাওয়ায়', 'এখন কিছুক্ষণ', 'এই এক সময়', 'জ্বালা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

'এই এক সময়' কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় কবিতা 'ফুলের সন্ধানে'। এ কবিতায় ষাটের দশকের শুরুতেই ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক জীবনে যে অধোগতির সূচনা হয়েছিল সেই ক্ষুব্ধ বিপর্যস্ত অস্থিতিশীল সময়ের চিত্র ধারণ করা হয়েছে। কবিতার প্রথম চরণেই কবি প্রশ্ন তুলেছেন,

এখন কোথায় যাবে ফুলের সন্ধানে? (ফুলের সন্ধানে)

কারণ এখন তো ফুলের সন্ধানে যাবার উপযুক্ত সময় নয়। এখন দুঃসময়, তাই —

নিবিড় মহুয়া বনে দুরন্ত আঘ্রাণ
আর নেই : ডালগুলি ছিন্নভিন্ন, ঝরাপাতা সব
পড়ে আছে ইতস্তত,
উৎসব শেষের যতো ছত্রভঙ্গ ম্লান
বাসনার মতো। এখন কোথাও আর
কুসুমের সম্ভাষণ নেই। (ওই)

Dhaka University Institutional Repository

যেখানে প্রতিদিনকার সমস্ত দৃশ্যেই থাকে স্বস্তিহীন ছায়া। আর্তের শিবিরে ফিরে ফিরে আসে দুঃস্বপ্নের বার্তা নিয়ে ভগ্নজানু দূত বারবার — ফিরে যায় বিষতিক্ত মুখে কর্মীষ্ঠ দেহাতী যুবক মহুয়া বনের পথে ক্ষণিকের আলোড়ন তুলে — সেখানে ফুলের সন্ধানে যাওয়া বৃথা। প্রতিকূল এই সময়কে গভীরভাবে উপলব্ধি করে তাই কবিতার শেষ চরণেও কবির সংশয়দীর্ণ উচ্চারণ :

এখন কোথায় যাবে ফুলের সন্ধানে? (ওই)

'গৃহ আছে কিনা' কবিতায় কবির পূর্বের সংশয় যেন কিছুটা দূর হয়েছে। হয়তো কোথাও কবি লক্ষ করেছেন, অনুকূল সময়ের আভাস — তাই বলেন,

এসো দেখি কোথাও তোমার
গৃহ আছে কি না। (গৃহ আছে কিনা)

কবি অনুভব করেন চারপাশের দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ নৈরাশ্যের মেঘ সরিয়ে প্রশান্ত উজ্জ্বল সময়ের আবির্ভাব; সে কারণেই তিনি দেখতে পান আজ —

আকাশ নির্মল,
বড়ো শান্ত, গাছও সাজায় অর্ঘ্য তার
পল্লবে, শাখায়। মাঠ
কোমল সবুজ। (ওই)

কিন্তু পুরোপুরি দুঃসময় কেটে না যাওয়ায় কবি ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েন। গৃহসন্ধানী কবিকে তাই দেখতে পাওয়া যায় —

... মিশ্রিত স্বপ্নে সমুজ্জ্বল, সাবধানী (ওই)

এবং তাঁর হৃদয়লোকে অবিশ্বাসী ঢেউ' কারণ তিনি জানেন,

প্রখর চৈত্রেও আনে অন্ধকার ছায়া। (ওই)

'যে-ভূমিকায় প্রতিদিন' কবি কিরণশঙ্করের ষাটের দশকের বৈরী সময়ের প্রতিনিধিত্বকারী উল্লেখযোগ্য একটি কবিতা। কবিতাটির রচনাকাল ১৯৬৭ — যখন কেন্দ্রীয় সরকারের নানান স্বেচ্ছাচারে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অতিষ্ঠ, সুবিধাবঞ্চিত সাধারণ মানুষের প্রাণের দাবি নিয়ে উত্থান ঘটে নকশালবাড়ি আন্দোলনের। সেই সময়ের অত্যাচারিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত আম-জনতার বিক্ষুব্ধ মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায় এ কবিতার প্রথম স্তবকে —

ইচ্ছা হয় চীৎকার করে বলি 'সাট আপ স্টুপিড'!
ইচ্ছা হয় ঘাড় ধরে ল্যাম্পপোষ্টের কাছে নিয়ে যাই,
দড়ি দিয়ে শক্ত ক'রে বাঁধি। তারপর
চাবুক এনে কষে মারতে থাকি যতোক্ষণ না
জ্ঞান হারায়। কিংবা ধাক্কা দিয়েই
মাটিতে ফেলে দিয়ে
জুতো দিয়ে মুখ থেতলে দিই
যতোক্ষণ না অজ্ঞান হয়ে পড়ে।
তারপর সবাইকে এনে দেখাই
নরকের কীটদের শাস্তি
কী রকম শক্ত হ'তে পারে। (যে-ভূমিকায় প্রতিদিন)

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু ইচ্ছে হলেই অত্যাচারী-নিপীড়কের শাস্তি দিতে আম-জনতার সাহসে কুলায় না। তারা মনের অসন্তোষ চাপা রেখে আপোষ করেই সংসার যাত্রা নির্বাহ করে। তবে কখনো কোথাও যদি এমন বিপরীত ঘটনা ঘটে তারা খুশি হয়। কবি নিজেও এ দলেরই একজন। তাই উপরে বর্ণিত স্তবকে শাস্তিদাতাদের মধ্যে নিজেকে কল্পনা করে যে আত্মতুষ্টি তিনি অর্জন করেন — তা এক মুহূর্তে মলিন হয়ে যায় পরের স্তবকে বর্ণিত মধ্যবিত্ত মানসিকতার তীব্র আত্মদহনে —

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে
না-দেখি না-দেখি ক'রে
পালিয়ে এলাম। যা ঘটছে ঘটুক না,
আমার নাক গলাবার
কী দরকার। বাড়িতে ফিরে এসে
বারান্দায় অন্ধকারে
পায়চারি করতে থাকি। (ওই)

এটাই আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণির সমাজ বাস্তবতা। আমরা ভেতরে ভেতরে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠি, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে স্বার্থপরের মতো নিজের গা বাঁচিয়ে পালিয়ে আসি। এবং মনে মনে আত্মদহনে জ্বলি। এই ভূমিকাই আমাদের প্রতিদিনের — সকল সময়ে।

১৯৬৯-এর দু বাংলারই উত্তাল ভয়ার্ত দিনের ছবি পাওয়া যায় 'হাওয়ার ভেতরে' কবিতায়। সেই সময় ছিল এমনই ভয়াবহ যে কবি হাওয়ার ভেতরেও আর আর্দ্রতা খুঁজে পান নি। শুধু,

সারাক্ষণ
জ্বলন্ত অঙ্গারে পোড়ে ভয়ার্ত দিনের ছবি। ...
দুর্বাদলে
দস্যুর পায়ের ছাপ, স্তব্ধ বৃক্ষমূলে
সাপের খোলস। (হাওয়ার ভেতরে)

কবি ভুলে যান তাঁরও একদিন কৈশোর যৌবন ছিল — যখন তিনি আনন্দে ভরিয়ে তুলেছিলেন সেই দিনগুলো। এখন সময় অনুকূল নয়, কোনো কিছু আর ঠিকঠাক চলে না। তাই,

আজ শুধুই
তিক্ততার তেজ আর জ্বালা। (ওই)

একই সময়ের আরেকটি কবিতা 'লোকটা'। এ কবিতার লোকটি বিরুদ্ধ সময়ের সঙ্গে তাল মেলাতে না পেরে হতাশায় বেছে নিতে চেয়েছে আত্মহত্যার পথ। কিন্তু যখন তার সেই সংকল্প বাস্তবায়নের সময় নিকটবর্তী, উঁচু ইমারতের ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে ভাবছে —

একবার লাফিয়ে পড়লেই তারপর
চিরকালের শান্তি ... বিস্মরণ। (লোকটা)

ঠিক তখন,

হঠাৎ হৈ হৈ শোনা গেল একেবারে নীচের দিকে,
রাস্তায় কারা মশাল জ্বালিয়ে নিশান হাতে

Dhaka University Institutional Repository

দলে দলে আসছে; দ্রুত পায়ে চলছে বাহিনী
মুখে ধ্বনি, গলায় বজ্রকণ্ঠের আওয়াজ। (ওই)

লোকটির চৈতন্য নাড়া খেল। নৈরাশ্যের হর্ম্য-শিখর থেকে বাস্তবের কঠিন জগতে ফিরে এল তার সাড়া। অনুভব করল সে আর একা নয় — তার হাজার সহযাত্রী আছে যারা এই অন্ধকার সময়ের অপসারণ চেয়ে আলোর দিকে যাবার আয়োজন করছে। আর তাই —

লোকটা ওপর থেকে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলো
নীচের দিকে, ওই মিছিলটাকে ধরা চাই:
দারোয়ানের ঘর পেরিয়ে নামলো রাস্তায়
তারপর মিলিয়ে গেল মিছিলের ভীড়ে। (ওই)

ঊনসত্তরের সময়চেতনাজাত আরেকটি কবিতা 'এই সময়'; যেখানে কবি সময়কে তুলনা করেছেন ভীষণ গর্জন করা ট্রেনের সঙ্গে — যে ট্রেন,

... বড়ো দ্রুত ছুটে যায়
বড়ো বেশী ছিন্ন করে নির্জনতা
চলন্ত চাকায়। (এই সময়)

এবং সুতীক্ষ্ণ ছুরির আঘাতে সব অতীত ঐতিহ্য আর মধুর স্বপ্নগুলো ভেঙে ফেলে

এঁকে দিয়ে যায়
সুতীক্ষ্ণ গতির রেখা পুরাতন প্রাকারে প্রাচীরে। (ওই)

'একটি ঘোড়ার পা' কবিতায় সময়কে কল্পনা করা হয়েছে ঘোড়ার সঙ্গে। যে ঘোড়া তার পা দিয়ে কবির হৃদয়ে লালিত পুরোনো ধ্যান-ধারণা, সংস্কার আর আপোষকামী মানসিকতাকে লাথি মারে। কবি লক্ষ করেন তাঁর চারপাশের —

সমস্ত দৃশ্যের রঙ বদলে যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে,
শব্দ প্রতিশব্দগুলো সব
দেয়াল লেখনে শোভা পায়
নতুন ভঙ্গীতে। (একটি ঘোড়ার পা)

কবি ধীরে ধীরে সেই দেয়ালের লেখাতে খুঁজে পান নতুন দিনের 'দারুণ আলোর অগ্নিগর্ভ উন্মাদ সঙ্কেত'।

১৯৭০-এ বাংলাদেশের জটিল ও সংকটময় সময়ের ভাবনাজাত কবিতা 'ভীষণ সময়'। সমাজ কাঠামোতে আধা-সামন্তবাদী চরিত্র অক্ষুণ্ন রেখে একটি আধা-উপনিবেশ হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তানিদের শোষণে এদেশের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে যে বিপর্যস্ত অবস্থার সৃষ্টি হয় তার প্রভাব সাংস্কৃতিক জগতকেও বিচলিত করে তোলে। অন্যদেশের নাগরিকত্ব নেয়া কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তকেও তাঁর জন্মভূমির এই অসহায়ত্ব ব্যাকুল করে, তিনি লেখেন —

জন্মদুঃখী বাংলাদেশে এখন একটা ভীষণ সময়। (ভীষণ সময়)

যে বাংলাদেশের বুকে শিশিরের মতো টলমলে পবিত্র জলের স্পর্শে মনের সমস্ত গ্লানির হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় এক সময় বঙ্গ সন্তানেরা সব রকমের বাধা বিঘ্নকে উপেক্ষা করে এগিয়ে আসত; সে দেশেই —

Dhaka University Institutional Repository

এখন যেন সব কিছুই অভ্যাসে পরিণত হতে চলেছে,
কবিতালেখা, হাতবোমার ব্যবহার, প্রেম। (ওই)

এ প্রসঙ্গে সৈয়দ আকরম হোসেনের একটি মন্তব্য স্মরণযোগ্য :

প্রাক-৪৮ পর্বের অধিকাংশ সাহিত্যিক এবং বুদ্ধিজীবী পূর্ব-প্রতিশ্রুতিভ্রষ্ট। পাক-শাসকগোষ্ঠী সচেতন-বুদ্ধিজীবী এবং সাহিত্যিকদেরকেও রেডিও, টেলিভিশন, প্রেসট্রাস্ট, বি.এন.আর এবং লেখক সংঘের মাধ্যমে শৃঙ্খলিত ও বেতনদাসে পরিণত করতে সচেষ্ট হলো।[৫০]

এরই প্রতিধ্বনি শুনি 'ভীষণ সময়' কবিতার পঙ্ক্তিতে —

আমরা কোথায় যাচ্ছি জিজ্ঞাসা করি না,
কেবল ব্যবহৃত হয়ে যাচ্ছি। (ওই)

এই অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়াতে চান কবি, আর তার প্রকাশ ঘটান 'ঘেরাও' কবিতায়।

আমি নিজেকেই নিজে ঘেরাও করে রাখছি।
তীব্র ধিক্কার, কখনো শাসানি, সাবধানবাণী। (ঘেরাও)

কবি বুঝতে পেরেছেন ব্যক্তি সচেতনতা না এলে এই অপশাসনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না। তাই তিনি নিজেকে নিজেই দায়বদ্ধ করেন সমাজের প্রতি — সুশাসনের দাবিতে এবং তিনি লক্ষ করেন দিকে দিকে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছে — তার তাপ ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র। কবিতার শেষে তাই ব্যক্ত হয় কবির আশাবাদ —

ইতিহাসের আঁকাবাঁকা রাস্তায় দলে দলে
সবাই মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে
এইবার সঠিক বাঁক ঘুরতে হবে। (ওই)

'ছায়া সরে যায়' কবিতায় বিক্ষুব্ধ ও রক্তাক্ত '৭১-এর ছবি প্রকটিত।

যেখানেই দাঁড়াই
ওপরের ছাদ সরে যায়
ছায়া সরে যায়;
যেখানেই যাই
মনে হয় নীলিমার বুক চিরে
এখনই ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরবে। (ছায়া সরে যায়)

সমকালীন বৈরী পরিস্থিতি কবির পর্যবেক্ষণ-নৈপুণ্যে আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে —

মাঠের গরুগুলো জোয়ালের ভার বইতে
না পেরে হাঁপাচ্ছে;
ক্ষুধার্ত শিশু বাটি হাতে ভিক্ষে চাইছে;
রেল লাইনে মাথা পেতে দেবার পণ করেছে
কে এক উন্মাদ। (ওই)

'ছোট রাস্তা বড়ো রাস্তা' কবিতাটিতে প্রকাশ পেয়েছে কবির দুঃসময়ের নাগপাশে বন্দি জীবনের আর্তি। কবিতায় দেখা যায়, কবি যে সরু রাস্তায় দাঁড়িয়ে, সে পথে চলতে

Dhaka University Institutional Repository

সামান্য অসতর্ক হলেই কাঁটার আঘাতে রক্তাক্ত হতে হয় — সেই সংকীর্ণ গলিপথ থেকে তিনি মুক্তি চান। তিনি যেতে চান বনের পাশ দিয়ে যে অতিকায় রাস্তা উজ্জ্বল রৌদ্রে অজগরের মতো শুয়ে,

নাকে তার
জ্যৈষ্ঠের আগুনের হলকা;
সারু-মাঠের কপালে ছায়া, কালো মেঘের আনাগোনা,
মেঘ উধাও হলে একটানা রৌদ্রের উচ্ছলতা। (ছোট রাস্তা বড়ো রাস্তা)

সেখানে। কেননা সে রাস্তা অনেক খোলা, মুক্ত কিন্তু দুঃসময় কবিকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। তাই কবির আক্ষেপ,

আমি বার বার সরু রাস্তা থেকে বড়ো রাস্তায়
যেতে চাই
বড়ো রাস্তা কখন সরু হয়ে যায়। (ওই)

এ কবিতায় মূলত কবি '৭১-এর আলোড়িত সময়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানসিক দোলাচালের স্বরূপ ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন।

'তোমার ছবি আমার ছবি' একটি রূপক কবিতা। এখানে 'তোমার ছবি' বলতে কবির আদর্শের কথা বুঝানো হয়েছে — যে আদর্শকে তিনি ভালবেসে গ্রহণ করেছিলেন ১৯৩৮-'৩৯ সাল থেকে। 'তাঁবু' হচ্ছে সেই আদর্শিক বর্ম — যা কবিকে রক্ষা করেছে এতদিন সমস্ত প্রলোভন থেকে, অন্যায়-অসৎ প্রবণতা থেকে। এখন সময় এতটাই বিপর্যস্ত যে কবি মাঝে মাঝে অনুভব করেন তাঁর আদর্শ, আদর্শিক বর্ম সব ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। কবির ভাষাতেই বলা যায় :

আমার ছবি আমার নিজের কাছেই
এক এক সময় অস্পষ্ট;
চারদিকে যেন ধুলোর ঝড় উঠেছে,
[...]
এখনই প্রচণ্ড ঝড়ে তাঁবু উড়িয়ে নিয়ে যাবে,
আমি কোনদিকে দৌড়াবো? (তোমার ছবি আমার ছবি)

দিশেহারা কবির কাছে সব যেন কেমন অচেনা হয়ে যাচ্ছে। বড্ড উল্টেপাল্টে যাচ্ছে ছবিগুলো। এক এক সময় কবির মনে হয় অনুভবের জগত থেকে তাঁর 'আদর্শিক ছবি'ও হারিয়ে যেতে বসেছে। কেননা, এখন —

দারুণ অবিশ্বাসী ঘাতক দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে; (ওই)

'ভয়ের আবহাওয়ায়' কবিতায় ফুটে উঠেছে সত্তরের যুদ্ধ-বিধ্বস্ত সময়ের করুণ চিত্র। যে শিশুটির ফুলের মতো কোমলতায় উজ্জ্বল হবার কথা ছিল, যার সৌন্দর্যে ও সুবাসে পৃথিবীতে বসন্তের সজীবতার সন্ধান পাওয়া যেত — সেই অবুঝ-পবিত্র শিশুটিও ঘাতক সময়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় নি, ভয়াবহ অন্ধকারেই তাকে টেনে নিয়ে গেছে। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের সময় সচেতন অনুভবের সাবলীল প্রকাশে সেই চিত্র আমাদের সামনেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমরা প্রত্যক্ষ করি —

Dhaka University Institutional Repository

হাতবোমার ছোড়াছুড়ি, ট্রামেবাসে সংঘর্ষ,
মোড়ে মোড়ে দু'দলের খণ্ডযুদ্ধ।
পুলিশের হাঁক ডাক, দৌড়াদৌড়ি;
শিশুটি হঠাৎ ঢিল ছোঁড়ে, কাদা থেকে
না-ফোটা হাতবোমাটা তুলে নেয়,
দৌড়ে যেতে যেতে বোমা ফাটতেই
নালার কাছে মুখ থুবড়ে পড়ে। (ভয়ের আবহাওয়ায়)

'এখন কিছুক্ষণ' কবিতাটিতে প্রকাশ পেয়েছে ষাটের দশকের শেষভাগের উত্তাল উত্তেজনাপূর্ণ সময়ের প্রচণ্ড স্নায়ুবিক চাপ থেকে মুক্তির আকুলতা। চারদিকের পরিবেশ বড়ো উত্তপ্ত —

বড়ো তেজি রৌদ্র, পিচের রাস্তায় গাছপালা
আগুনের হাওয়ায় হো হো ক'রে উঠছে;
মাঠের দিকে ঘোড়ার গাড়ির অশক্ত ঘোড়াটা
মুখ থুবড়ে পড়লো। এখন সারা শরীরে
গ্রীষ্মের নখর। (এখন কিছুক্ষণ)

কবিতার সাদাসিধে এই বর্ণনার পিছনে লুকিয়ে আছে সেই বিধ্বস্ত-বিপর্যস্থ সময়ের ছবি। কবি এই শ্বাসরুদ্ধকর সময়ের কাছ থেকে কিছুক্ষণের জন্যে শান্তি চান, বৃষ্টির শব্দ শুনতে চান। কবির ভাষায় —

আমি বৃষ্টির শব্দ শুনতে চাই কিছুক্ষণ।
টালার ট্যাঙ্ক উপচে সব জল ঝরে যাচ্ছে,
হাইড্রান্ট খুলে দিয়েছে কেউ,
এক একটা রাস্তা জলে ডুবে যাচ্ছে,
এরকম দৃশ্য দেখতে চাই। (ওই)

কেননা,

এখন অন্তত কিছুক্ষণ
জলের নির্ঝরে গা ভাসিয়ে দেবার জন্যে
সমস্ত জগৎ আমার মতোই কাঁপছে। (ওই)

গ্রন্থের শিরোনামা 'এই এক সময়' কবিতাটিতে একাত্তরের চরম উত্তেজনাপূর্ণ সময়ে কবির মনের দ্বিধান্বিত ভাব প্রকাশ পেয়েছে। কবির কখনো মনে হয় —

কে আমার টুঁটি চেপে ধরবে বলে পেছন থেকে আসছে, (এই এক সময়)

আবার কখনো কখনো মনে হয় —

কে আমাকে বুকের মধ্যে নেবার জন্যে
সামনেই হাত বাড়িয়েছে, (ওই)

কবি বুঝে উঠতে পারেন না তাঁর এ সময় কী করা কর্তব্য। কেননা,

এই এক সময় যখন
আলো স্পষ্ট নয়, দিন আর রাত এক রকম,
আলো ঝাপসা হতে হতে ক্রমশই
গভীরতর অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। (ওই)

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু কবি এটা জানেন যে সময় যতো খারাপই হোক না কেন 'অন্ধকারেই সব চিনে নিতে হবে'।

'জ্বালা' কবিতাটি '৭২-এ লেখা হলেও এ কবিতার মধ্যে ফুটে উঠেছে '৭০-'৭১-এর বাংলাদেশ ও পশ্চিমবাংলার দারুণ উত্তেজনাপূর্ণ গণআন্দোলনে কবির শরিক হবার গভীর আকাঙ্ক্ষা। কবির ভাষায় —

সমুদ্র গর্জন করছে অবিরাম,
আমি সমুদ্রের ভেতর যাব।
মেঘ গর্জে উঠেছে অট্টহাসিতে
বাঁকা বিদ্যুতের রেখায়;
আমি মেঘের ভেতর যাব।
আগুন ঝলকিয়ে উঠছে চারদিকে,
চতুর্দিক তেতে উঠেছে উত্তাপে
আমি আগুনের মধ্যে যাব। (জ্বালা)

ত্রাসের শাসনের অতিষ্ঠ দুই বাংলার জনগণের মুক্তির দাবিকে কবি আন্তরিকভাবে সমর্থন করেন। আম-জনতার সঙ্গে অনুভব করেন একাত্মতা। আর তাই সাধারণ জনতার মতো বিদ্রোহী ভাষাতে তিনিও বলেন —

আমার সমস্ত জ্বালা জুড়াতে
আমি যে-কোনো দিকেই যেতে প্রস্তুত;
সমুদ্র
মেঘ
আগুন
আমার বুকের মধ্যে একাকার হয়ে আছে। (ওই)

দুই.

ষাটের দশকের শেষ দিকের কয়েক বছরের উত্তাপময় উত্তাল ঘটনাবলি দুই বাংলার সাধারণ মানুষসহ লেখক, বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীদের ব্যাপক প্রভাবিত করেছিল। সমাজসচেতন কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত বাস্তবতার নিরীখে সেই সময়কার নানান জটিলতা আক্রান্ত মানুষের বিচিত্র জীবনভাবনা তুলে ধরেছেন তাঁর এ পর্বের কবিতায়। এ পর্যায়ের কবিতাগুলোর মধ্যে 'মনুষ্যত্বহীনতায়', 'একজন মানুষের রক্তে', 'এক এক সময়', 'নষ্ট শতাব্দী', 'আনন্দ, বেদনা', 'প্রতিদিন সারাক্ষণ' উল্লেখযোগ্য।

'মনুষ্যত্বহীনতায়' কবিতাটিতে প্রকাশ পেয়েছে ষাটের দশকের রূঢ় কঠিন সময়ের জীবন ভাবনাজাত কবির গভীর অনুভব। কবিতায় ফুটে উঠেছে সেই সময়কার দগ্ধ-করুণ চিত্র। যখন,

তরীগুলো চলছে না মজে গেছে নদী,
মাছের সন্ধান ব্যর্থ গ্রামের পুকুরে,
জমি বন্ধ্যা, দিকে দিকে দগ্ধক্ষত মাটি,
প্রেমহীন বঞ্চনায় পাংশুল আকাশ

Dhaka University Institutional Repository

শুয়ে থাকে, মৃত শব কাঁধে দিনগুলি
কেমন গম্ভীর মুখে হেঁটে চলে, (মনুষ্যত্বহীনতায়)

তখন মানুষের সমস্ত শুভ প্রত্যাশা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। বিষে নীল হয়ে যায় তার ভেতরকার যাবতীয় আকাঙ্ক্ষা। ভালবাসার সুন্দর স্বপ্নগুলো যায় মরে। ফলে দয়া ধর্ম প্রেম ইত্যাদি মানবোচিত গুণগুলো আর মানুষের মাঝে থাকে না। মানুষ হয় মনুষ্যত্বহীন। আশাহীন, প্রেমহীন, স্বপ্নহীন এই 'হীন' জীবন কবির কাম্য নয়। তাই কবির কণ্ঠে শোনা যায় রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭—১৮৮৭) রচিত 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮)-এর 'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়' উজ্জীবন মন্ত্রের প্রতিধ্বনি—

মনুষ্যত্বহীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে
কে বাঁচিতে চায়। (ওই)

স্বাধীনচেতা বাঙালি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লিখিত কবিতায় যেমন একদিন খুঁজে পেয়েছিল পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙার সংগ্রামী উৎসাহব্যঞ্জনা—তেমনি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের আলোচ্য কবিতায় খুঁজে পাওয়া যায় মানুষের মানবীয় গুণাবলি ফিরে পাওয়ার তীব্র বাসনা।

'একজন মানুষের রক্তে' কবিতায় কবির জীবনভাবনা এক ধরনের নৈরাশ্যবোধে আক্রান্ত। তিনি ভালবাসাকে নিটোল করে, সংসারের সমস্ত সন্তাপকে জয় করে পরম উষ্ণতায় জীবনকে সাজিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সময় তাঁর অনুকূল ছিল না। তাই কবিতায় শোনা যায় আশাহত কবির বিক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর—

উষ্ণ হতে চেয়েছিলাম
অভিমানকে প্রকৃতিস্থ করবার জন্যে:
[...]
অথচ একজন মানুষের রক্তে
কত উষ্ণতাই বা থাকতে পারে। (একজন মানুষের রক্তে)

'এক এক সময়' কবিতায় কবি ফুটিয়ে তুলেছেন কলকাতার নগর জীবনের ক্লান্তি, নির্জনতা আর নিঃসঙ্গতার চিত্র।

এক এক সময় কলকাতা নিঃসীম নিঃসঙ্গতার মধ্যে চলে যায়।
রাত্রি গভীরতর হ'লে চৌরঙ্গী জনহীন,
গির্জার ঘড়িতে মধ্যরাত্রির ঘণ্টা;
সিনেমার শেষ প্রদর্শনী
ভেঙেছে অনেকক্ষণ,
সারাদিনের কাজের ক্লান্তির শেষে
দরোয়ান খানসামা ভিক্ষুক এমন কি বারবনিতারা,
ক্লান্ত পা'য়ে কখন অন্তর্হিত। (এক এক সময়)

তখন অনন্ত নির্জনতার মধ্যে কার্জন পার্কের বেঞ্চিগুলো আর সারি সারি গাছ এ ওর গায়ে জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকে। অন্ধকারকে গাঢ়তর করে তোলে পিচঢালা পথের লাইটপোস্টগুলো। এবং সেই,

Dhaka University Institutional Repository

'প্রতিদিন সারাক্ষণ' কবিতাটি পঞ্চাশ উত্তীর্ণ কবির সংগ্রামমুখর জীবনের কথা বলে। কবি প্রতিদিন, সারাক্ষণ নিজের সঙ্গেই নিজে লড়াই করেন সুন্দর সৎ সহজ জীবনযাপনের চেষ্টায়। অথচ তাঁর কেবলই মনে হয় এই নিষ্ঠুর সময় — সমাজের কলুষতার মধ্যে থাকতে থাকতে তাঁর চেহারাও যেন ভয়ংকর হয়ে উঠছে। তাঁর চোখের দৃষ্টিতে দারুণ বিতৃষ্ণা, দু'হাতের মুঠো ভরা শুধুই কঠিনতা। কিন্তু এই জীবন কবির কাম্য নয়। কবি চান শান্ত ভদ্র গার্হস্থ্য জীবন। কবির ভাষায় —

> আমি শান্ত হতে ভদ্র থাকতে চেয়েছি সারাজীবন,
> অথচ আড়াল থেকে কারা বারবার ধক্কা দিচ্ছে,
> অমানুষিক প্ররোচনায়
> আমাকে ভীষণ ক্রোধের কুণ্ডে ঠেলে দিতে চাইছে। (প্রতিদিন সারাক্ষণ)

আর সে কারণেই কবি বলেন,

> আমি আমার নিজের সঙ্গেই লড়াই করে যাচ্ছি
> প্রতিদিন, সারাক্ষণ; (ওই)

তিন.

পূর্ববর্তী কাব্যগুলোর মতো 'এই এক সময়' গ্রন্থেও কয়েকটি প্রেমের কবিতা আছে। তবে এ সময়ের প্রেমের কবিতাগুলোতে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে ষাটের দশকের প্রতিকূল সময়ের ছাপ। এ পর্যায়ের কবিতাগুলোর মধ্যে 'উত্তরার জন্য', 'বিচ্ছিন্ন গোপন', 'মন্ত্র' উল্লেখযোগ্য।

'উত্তরার জন্য' কবিতাটিতে লক্ষ করি — মোহনীয় জ্যোৎস্নায় যখন প্রেমিকের বাসনা প্রেমিকার শরীরের আকর্ষণে কাঁপে, তখন বিরুদ্ধ সময়ের চিন্তায় তার কণ্ঠস্বরে জড়ো হয় ভয়। তাই চারপাশের নির্জনতায় ঘেরা অন্ধকার ঘরে গৃহস্থালি শুরু করতে চেয়ে প্রেমিকার প্রতি প্রেমিকের আহ্বানকে মনে হয় নিষ্প্রাণ — বিষাদময়।

> উত্তরা, সমস্ত বাড়ি একেবারে খালি।
> রাতের নক্ষত্র চুপ, একেশিয়া গাছে
> কী যেন ক্লান্তির ঢেউ স্তব্ধ হয়ে আছে —
> শুধুই তৃষ্ণায় জ্বলে যায় কণ্ঠনালী। (উত্তরার জন্য)

'বিচ্ছিন্ন গোপন' কবিতাটিতে কবি প্রথমেই তাঁর প্রেমাস্পদাকে জানিয়ে রাখেন,

> চতুর্দিকে অস্পষ্ট কুয়াশা থমথমে
> সমস্ত আকাশে ব্যাপ্ত মেঘের পাহাড়। (বিচ্ছিন্ন গোপন)

এই অস্পষ্টতা কেটে গিয়ে যখন সুসময় ফিরে আসবে শুধু তখনই তিনি তাঁর প্রেমাস্পদার কাছে যাবেন। কেননা এখন চতুর্দিকে কেবল অস্থির যন্ত্রণা, কেবলই গভীর অন্ধকার — বৃষ্টি নেই, নেই জ্যোৎস্নাও। এই রক্তাক্ত সময়কে উপেক্ষা করে কবি প্রিয়তমার কাছে যেতে চান না। আর সে জন্যেই তিনি বলেন —

> চাঁদ যদি ওঠে যাবো সান্নিধ্যে তোমার
> একদিন, ততদিন রক্ত-আকাঙ্ক্ষার

Dhaka University Institutional Repository

তীব্র বেদনাগুলিকে
আড়ালে ঢাকতে চায় ব্যর্থ উদ্যোগের
বিচ্ছিন্ন গোপন দুষ্টক্ষত। (ওই)

'মন্ত্র' কবিতায় কবি উপলব্ধি করেন তাঁর চারপাশে সংশয়ের অন্ধকার কালো পর্দার মতো চোখের সামনে ঝুলে থাকে সারাক্ষণ। অথচ তিনি জানেন, কোনোভাবে এই পর্দা সরিয়ে দিতে পারলেই তিনি দেখতে পাবেন প্রিয়তমার উজ্জ্বল মুখ। সে কারণেই কবি এই প্রতিকূল সময়ের বিরুদ্ধে জয়ী হবার জন্যে তাঁর প্রেমাস্পদার কাছে ভালবাসা দাবি করেন। কবির ভাষায় :

কী ভয়ঙ্কর এই অন্ধকার!
আমাকে একবার দাও জয় করার মন্ত্র,
তোমার ভালোবাসা। (মন্ত্র)

চার.

ষাটের দশকের প্রতিকূল সময়কে বুকে ধারণ করেও কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের আশাবাদী চারিত্র্য 'এই এক সময়' কাব্যগ্রন্থের কিছু সংখ্যক কবিতায় পরিলক্ষিত হয়। যেমন — 'ঘরের হৃদয়', 'ঝড়ো হাওয়া কালো হাওয়া', 'বুকে বুকে বারুদ', 'প্রতিবিম্ব', 'প্রাসাদ গড়ার চেষ্টায়', 'আমি যাবো না', 'স্বপ্ন', 'আমি আসব' প্রভৃতি। এসব কবিতার পঙ্‌ক্তিতে যেমন সময়ের সচেতন স্বাক্ষর বর্তমান, তেমনি কোনো না কোনোভাবে ধ্বনিত হয়েছে কবির আশাবাদ।

'ঘরের হৃদয়' কবিতায় লক্ষ করি কবি একটি পরিত্যক্ত ঘরের রূপকে ষাটের দশকের বিপর্যস্ত সময়ের চিত্র অঙ্কন করেছেন। আমরা দেখতে পাই সেই সময় রূপ ঘরের দেয়ালের আঁকাবাঁকা গভীর ফাটলে আজ —

সর্পিল বিবর্ণ চিত্রলিপি
বুকভাঙা মুখ-চাপা অরণ্যরোদনে
ম্রিয়মাণ, হতবাক; (ঘরের হৃদয়)

এবং

অন্ধকার নিশ্বাস পতনে
সমস্ত শতাব্দী যেন এক হাজার মৃত প্রজাপতি
মাকড়সার জালে, আর ঘরের ধুলোয়
নষ্ট ফুল স্মৃতির কঙ্কাল। (ওই)

কবি এই নষ্ট সময়ের অন্ধকার ঘরে থাকতে আসেন নি। কিন্তু তাঁর আশাবাদী হৃদয় এই দুঃসময়কে অতিক্রম করতে চায় — এই পরিত্যক্ত ঘর — যে ঘরের সঙ্গে তাঁর অনেক স্মৃতি জড়িত — তাকে আবার সাজিয়ে তুলতে চায়। আর তাই কবিতার শেষ স্তবকে শুনি সেই আশ্বাসেরই ধ্বনি —

থাকবো বলে' এ ঘরে আসিনি।
তবু থেকে যাবো। জানলা দরজা খুলে

Dhaka University Institutional Repository

ভাবছি এ হতশ্রী ঘরের হৃদয়
আবার সাজাবো। (ওই)

'ঝড়ো হাওয়া কালো হাওয়া' কবিতাটি একটি সনেট। সনেটের প্রথম স্তবকে কবি ঊনসত্তরের উত্তপ্ত দিনের ছবি এঁকেছেন এভাবে —

ঝড়ো হাওয়া কালো হাওয়া ইতস্তত ফোঁসে গরজায়
বজ্রপতনের শব্দে, ভূলুণ্ঠিত জরাজীর্ণ বট:
ধুলো ওড়ে বালি ওড়ে শতভগ্ন স্মৃতিচিত্রপট;
[...] [...] [...]
সমস্ত পৃথিবী কাঁপে সময়ের চোখের পাতায়,
ভেসে যায় রক্তস্রোতে শীর্ণতম আদিম ধমনী।
(ঝড়ো হাওয়া কালো হাওয়া)

বজ্রপতনের শব্দ শুনে কিংবা রক্তস্রোত দেখে কবি ভীত নন। বরং তিনি এই পতনের শব্দে এবং স্রোতের মধ্যে শুনতে পান নতুন অধ্যায়ের সূচনা সঙ্গীত। তাই সনেটের শেষ স্তবকে ঘোষিত হয় কবির আশাবাদ —

কাঁপে সমস্ত ভুবন
শেকল ভাঙার শব্দে; দিকে দিকে দারুণ মূর্চ্ছনা।
কে যেন করাত দিয়ে বর্বর লোভের জিভ কাটে,
বিস্ফারিত দুষ্টক্ষত ধুয়ে দেয় অঝোর বর্ষণ। (ওই)

ঊনসত্তরের রক্তাক্ত, বিক্ষুব্ধ সময়ের আরেকটি উল্লেখযোগ্য কবিতা 'বুকে বুকে বারুদ'। এ কবিতা যখন লেখা হয় তখন পশ্চিমবাংলায় ক্ষমতাসীন সরকারের সঙ্গে নকশালপন্থীদের বিরোধ চরমে। সৎ ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত সঠিক বিবেচনায় নকশালপন্থীদের পক্ষে। আর তাই এ কবিতায় লক্ষ করি, তিনি অ্যালসেশিয়ান কুকুরকে ক্ষমতাসীন অত্যাচারী সরকার এবং দেশলাইকে বিক্ষুব্ধ-সঙ্ঘবদ্ধ জনতার প্রতীকে উপস্থাপন করেছেন। কবি উপলব্ধি করেন তাঁর চতুর্দিকে ভীষণ অন্ধকার। আর সেই ভয়ঙ্কর অন্ধকারের মধ্যে —

কুকুরের মতো কী যেন তাড়া ক'রে আসছে (বুকে বুকে বারুদ)

কবির হাতে কোনো অস্ত্র নেই তাকে প্রতিরোধ করার। সেজন্যে তিনি মনে মনে দেশলাইয়ের কাঠি গুনতে থাকেন, আর দেখতে পান —

অ্যালসেশিয়ানের দাঁতগুলো
জ্বলতে থাকে চোখের সামনে। (ওই)

কবির বুকে ক্রমশই বাড়তে থাকে ক্রোধ। উপায় খুঁজতে থাকেন এই পাষাণের মতো ভারি অন্ধকার থেকে, আতঙ্ক থেকে মুক্তির। আর তাই কবিতার শেষে শুনতে পাই কবির আশাবাদী উচ্চারণ —

বুকে বুকে বারুদ ক্রমশই স্তূপ হয়ে উঠছে।
আমি সিগারেট খাই না কিন্তু আগুন জ্বেলে
অন্ধকার তাড়াবো,

Dhaka University Institutional Repository

আর তখনই হিংস্র কুকুরের বিষদাঁতগুলো
নিজের রক্তে ভাসতে থাকবে ...

রাত ভোর হবে। (ওই)

'প্রতিবিম্ব' কবিতায় দেখি কবি একদিন যে স্বদেশকে সমস্ত তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন, সেই স্বদেশ ভূমিতেই —

এখন সমস্ত দৃশ্যে
মৃত মুখের প্রতিবিম্ব। (প্রতিবিম্ব)

অস্তিবাদী কবি এই মৃত্যু কাহিনী শুনতে চান না। তিনি শুনতে চান জীবনের জয়গান। তাই বলেন —

আমি জীবনের কথা শুনতে চেয়েছিলাম, (ওই)

আর সেজন্যেই —

ঝরা বকুলের মধ্য থেকে সজীবতাটুকু
খুঁজতে গিয়েছিলাম একদিন। (ওই)

'প্রাসাদ গড়ার চেষ্টায়' কবিতাটিতে দেখতে পাই অক্ষরের পর অক্ষর সাজিয়ে বিরাট প্রাসাদ তৈরি করার জন্যে কবি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিন্তু সময় অনুকূল না হওয়ায় কবির চেষ্টা বার বার ব্যর্থ হয়। কেননা,

... অক্ষরগুলোকে সাজাতে গেলেই কোথা থেকে হাওয়ায়
ধুলো উড়তে থাকে, গর্জন ক'রে ওঠে কেউ বুকের ভেতর,
(প্রাসাদ গড়ার চেষ্টায়)

অধ্যবসায়ী এবং আশাবাদী কবি নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে বদ্ধ পরিকর। তাই তীব্র ঝড়ের মধ্যেও তিনি অক্ষরগুলোকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে থাকেন — কারো ধমকানিতেও তিনি ভয় পান না। ফলে কবির চেষ্টা সার্থক হয় — তবে তার জন্যে তাঁকে সহ্য করতে হয় অনেক কষ্ট; কবির ভাষায় —

প্রাসাদ গড়বার শেষ চেষ্টায় আমার হৃদয় থেকে বারবার
রক্ত স্বেদ চুঁইয়ে পড়ে। (ওই)

'আমি যাবো না' কবিতার রচনাকাল ১৯৭১। যখন দুই বাংলাই উদ্দীপ্ত শাসকগোষ্ঠীর শোষণ নিপীড়ন থেকে মুক্ত হবার দুরন্ত চেতনায়। সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিভূ কবি লক্ষ করেন এই উত্তাল সময়ে কে যেন তাঁকে মৃত্যুর মতো শীতল অন্ধকারের দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে চায় বারবার, তাই কবির মনে প্রশ্ন জাগে —

কে আমাকে অন্ধকারের দিকে
ঠেলে দিতে চায়?
আমার ক্লান্ত দুই চোখে
আড়াল থেকে
মড়ার খুলির দুঃস্বপ্ন মাখিয়ে দিতে চায়। (আমি যাবো না)

কবি দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারণ করেন,

আমি যাবো না। (ওই)

Dhaka University Institutional Repository

কেনই-বা তিনি অন্ধকারের দিকে পতনের দিকে যাবেন। তিনি তো নৈরাশ্যবাদী নন। তিনি আশাবাদী — তাই স্বপ্ন দেখেন মুক্ত স্বদেশে নির্বিঘ্ন জীবনযাপনের —

যেখানে
ভোর হলেই মাথার ওপরে প্রতিদিন
ঝলমল করে রৌদ্র,
আলোয় ক্রমশ ভরে যায় মাঠ
সবুজ পাতায়
শাখা প্রশাখায়
সারি সারি গাছের উন্মুখতা।
নদী
রাতের নক্ষত্রের হাতছানিতে উজ্জ্বল,
হাওয়া
মাঝ দরিয়ার মাঝির মতো অতন্দ্র,
আর জ্যোৎস্না
রূপসী যুবতীর সৌন্দর্যের মতো নির্মল। (ওই)

'স্বপ্ন' একটি আশাবাদী কবিতা। এ কবিতায় প্রথম থেকেই দেখা যায় অন্ধকার সময় পার হয়ে সুখ-স্বপ্নে কবি বিভোর। তাঁর চোখে হাঁসের পালকের মতো কোমল চাঁদের আলো এসে ঠিকরে পড়েছে — আর তিনি সেই আলোতে দেখতে পাচ্ছেন —

সামনে মাঠ, সরু নদী,
রাস্তা, তুলসী মঞ্চ;
প্রতিবেশীদের ঘরবাড়ি ...
এসবই এখন ছবির মতো স্পষ্ট। (স্বপ্ন)

কবি বুঝতে পারেন নৈরাশ্যের দিন অতিক্রান্ত হয়েছে। অপসারিত হয়েছে অন্ধকারের প্রেতচ্ছায়ারা। দুঃসময়ের জমাট মেঘ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। আর তাই —

মেঘ সরে যেতেই কিছুক্ষণের জন্যে
মনের নীলিমায়
অন্ধকার পার হয়ে আলোর ভেতর হেঁটে যাওয়ার স্বপ্ন ... (ওই)

সব সংশয় আর সন্দেহের কুয়াশা সরিয়ে একদিন মানুষ মাথা তুলে দাঁড়াবে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের এ কবিতায় শোনা যায় তারই প্রতিধ্বনি।

'আমি আসব' কবিতাটিতেও কবির আশাবাদ ব্যপ্ত হয়ে আছে। কবিতার শুরুতে কবি যখন বলেন,

দুঃখ ক'রো না আমি আবার আসব। (আমি আসব)

কেননা,

আমি ব্যর্থ নই শূন্য নই (ওই)

তখনই আমরা বুঝতে পারি দুঃসময়ের ধূম্রজাল ছিন্ন করে আশাবাদী কবি সুসময়ের বার্তা নিয়ে খুব শীঘ্রই আসছেন। কবিতার শেষ স্তবকে দেখতে পাই তারই ইঙ্গিত —

Dhaka University Institutional Repository

... একদিন ঝরনার জলের শব্দ শোনা যাবে,
বাঁশি বাজবার শব্দ;
সেদিন সব বিষাদ সরিয়ে আমি আসব। (ওই)

পাঁচ.

স্মৃতি মানুষের এমন এক চেতনা যা তাকে কখনো অস্থির, কখনো বিমর্ষ, কখনো বা প্রফুল্লিত করে। স্মৃতিচারণ আমাদের জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সাধারণত যৌবনোত্তর মানুষেরাই বেশি স্মৃতিকাতর হয়। কেননা, 'যৌবনোত্তর মানুষের কোন স্বপ্ন নেই; কৈশোরের যাদুকরী প্রত্যয় তিনি অনেকটাই হারিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু, যদি তিনি কবি হন, অপূর্ব কুশলতায় স্মৃতিকে চেতনার রঙে রাঙান, চৈতন্যকে কবিতায়'।[৫১] পঞ্চাশ উত্তীর্ণ কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তকেও 'এই এক সময়' কবিতাগ্রন্থে দেখা যায় শৈশব-কৈশোরের নানান স্মৃতিচারণায় মশগুল হয়ে যেতে। যে জীবন তিনি ফেলে গিয়েছেন পূর্ব বাংলায়, যে জীবনের অনেক রঙিন ছবি তিনি হারিয়ে ফেলেছেন পশ্চিমবাংলায় গিয়ে, সেই অস্পষ্ট কুয়াশাময় জীবনের অনেক কথাই তিনি বাঙ্ময় করে তুলেছেন 'এই এক সময়ে'র কিছু সংখ্যক কবিতায়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলো হচ্ছে 'গোপাল মুখার্জি', 'কেমন আছেন', 'শরৎ এলেই', 'রাত গভীর হলে'।

'গোপাল মুখার্জি' কবিতাটি কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের যৌবনোত্তরকালে রচিত একটি অসাধারণ রচনা। এ কবিতায় কবির ভাষ্য থেকেই আমরা অনুধাবন করে নেই, গোপাল মুখার্জি কবির বাল্য-বন্ধু, কৈশোরের খেলার সাথি — যার সঙ্গে কবির তিরিশ বছর কোনো সাক্ষাত হয় নি।

তিরিশ বছর দেখিনি, কবেকার সেই ফুটবল-মাঠে
শেষ দেখা, দুজন দুদিকে কোথায় ভেসে ভেসে
স্মৃতি বুদ্বুদ হয়ে তলিয়ে গিয়েছিলাম। (গোপাল মুখার্জি)

আজ তিনি গোপাল মুখার্জিকে দেখতে পেয়েছেন বাসের অবর্ণনীয় ভিড় আর বহু মানুষের কর্কশ কণ্ঠস্বরের মাঝখানে — কবির কাছ থেকে একটু দূরে।

বাসের হাতলে গোপাল মুখার্জির হাত,
এই হাত কতোবার ছুঁয়েছি কৈশোরে,
আজ যদি একবার ভিড় ঠেলে পৌছাতে পারি,
অবাক করে দেবো মুখার্জিকে। (ওই)

কবির মনে পড়ে শৈশব-কৈশোরের মধুময় নানান স্মৃতি —

চোখের সামনে আমার কৈশোর, মুখার্জির
উজ্জ্বল মুখ, খেলাধুলার স্মৃতি;
এক নিমেষেই যেন অনেক আকাশ, নদী, ফুল, পাখি,
অনেক পবিত্র নিরাময় অনুভবময়তায়
প্রাণ হুহু-করা স্মৃতিচিত্রণের পটে
আকাশ-গঙ্গা লিপি। (ওই)

Dhaka University Institutional Repository

কবির মনে নানা দোলাচাল। বাসের ভিড় ঠেলে তিনি ছেলেবেলাকার বন্ধু, পরিহাসরসিক গোপাল মুখার্জির কাছে যেতে পারছেন না — তাই তাকে আবার হারিয়ে ফেলবার একটা আশঙ্কা মনে যেমন উঁকি মারছে, তেমনি আবার একটু সংশয়ও তাঁর আছে,

আমাকে দেখলে চিনতে পারবে কি হঠাৎ! (ওই)

যদি চিনতে না পারে তবে তো মুখার্জি জানতেও পারবে না,

... তিরিশ বছর বাদে কেউ
আবার তাকে টেনে আনতে চাচ্ছে
অন্তরঙ্গ হৃদ্যতায়। (ওই)

যৌবনোত্তরকালে লেখা 'গোপাল মুখার্জি' কবিতা কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের কৈশোরের সমস্ত কবিতাকে অতিক্রম করে তাঁর কাব্যিক পরিণতিকে মহত্ত্ব দিয়েছে উল্লেখ করে কবিবন্ধু বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন :

> গোপাল মুখার্জি, বাসের অবর্ণনীয় ভিড়, বহু মানুষের কর্কশ কণ্ঠস্বর, এ সকলই এই কবিতার মুখোস। আসল মুখশ্রী কিরণশঙ্করের নয়, আমাদের ব্যক্তিগত স্মৃতির মধ্যে। 'গোপাল মুখার্জি' আমাদের বাল্যজীবনের, ছাত্রজীবনের — মুক্ত নিষ্পাপ, স্বপ্ন দেখার জন্য যে কয়েক মুহূর্তের হিরন্ময় জীবন একদা এসেছিল, আজ আর নেই — তার মহাকাব্য।[৫২]

আমাদের কাছে এ কবিতা মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসার উজ্জ্বল উদাহরণ স্বরূপ। আর তাই কবি যখন দেখেন গোপাল মুখার্জি বাস থেকে নামছে — তখন তিনিও বাসের অসংখ্য যাত্রীর কটূক্তি উপেক্ষা করে লাফিয়ে নামেন বাস থেকে।

অনেক লোক নামছে, চারদিকে আমার সতর্ক দৃষ্টি,
কিন্তু কোথায় ভিড়ের ঢেউয়ে
বুদ্বুদের মতো তলিয়ে গেল সেই মুখ
গোপাল মুখার্জি, নিশ্চয়ই গোপাল মুখার্জি,
আওড়াতে লাগলাম মনেমনে। (ওই)

মনের মধ্যে আমাদের যে একটা ভীষণ উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল কবি এবং গোপাল মুখার্জির মিলনাকাঙ্ক্ষায় — পরিণতি পর্যবেক্ষণ করে যেন খানিকটা বিমর্ষ হয়ে পড়ি। আর ক্রমশ উপলব্ধি করতে পারি অতি সাধারণ এই বিবৃতি কবির অতুলনীয় রচনাগুণে কী রকম অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে। অতি সাধারণ সম্পূর্ণ অপরিচিত গোপাল মুখার্জি আমাদের অত্যন্ত কাছের মানুষে পরিণত হয়। আমরাও অনুভব করি স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা অথবা হয়ে পড়ি স্মৃতিকাতর। এখানেই এ কবিতার চমৎকারিত্ব আর কবি হিসেবে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের সার্থকতা।

'কেমন আছেন' কবিতায়ও কবির অতীত স্মৃতি এবং বর্তমান সময়ের মধ্যে সেতু বন্ধন হিসেবে বাসের উপস্থিতি লক্ষণীয়। 'গোপাল মুখার্জি' কবিতায় কবি তাঁর শৈশবের বন্ধুকে বাসের মধ্যে যাত্রীদের ভিড়ে আবিষ্কার করে স্মৃতিকাতর হয়ে পড়েছিলেন। 'কেমন আছেন' কবিতায় বাস স্টপেজে দেখা দু বন্ধুর। দেখা হতেই কুশল বিনিময় এবং তারপরই স্মৃতিচারণ।

Dhaka University Institutional Repository

কবির বন্ধু একদিন কবিকে তাঁদের গ্রামে বেড়াতে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেছিলেন,

আপনি আসুন না একদিন আমাদের দিকে।
বেশ খোলামেলা, সমুদ্র খুব দূরে নয়,
একটু এগিয়ে গেলেই বঙ্গোপসাগর,
কলকাতার ধোঁয়াকাদা যন্ত্রের ঘর্ঘরের হাত থেকে
অন্তত ক'দিনের জন্যে বাঁচবেন। (কেমন আছেন)

কবি সেবার যাবার প্রতিশ্রুতি দেবার পরও কথা রাখতে পারেন নি। ভুলে গেছেন ব্যস্ত শহরের জীবনযাত্রায়। কোম্পানির কাজ, খাটুনি, ওভারটাইম, অসুস্থ পরিবার আর কলকাতার ঠেলাঠেলি ভিড়ে সময় হয়ে ওঠে নি তাঁর বন্ধুকে দুলাইনের একটা পোস্টকার্ড লেখার। সময় পার হয়ে গেছে দশ-বার-পনের বছর — পরিণত বয়সের ছাপ পড়েছে শরীরে। তবুও আবার যখন বাস স্টপেজে সেই পুরনো বন্ধুর কণ্ঠস্বর শোনেন কবি — চমকে ওঠেন। কবির ভাষায় —

কেমন আছেন ভালো তো সব।
চমকে উঠেছিলাম কণ্ঠস্বরে।
শুকনো রোগা রুক্ষ কঙ্কালসার মূর্তি,
কথার ভঙ্গিতে কিন্তু চিনতে পারা যায়।
আপনি গেলেন না তো আর। (ওই)

কেন যান নি বা যেতে পারেন নি সে কথা কবি বন্ধুকে বলতে পারেন না। ঝাপসা ঝাপসা মনে পড়ে সব পুরনো স্মৃতি।

সেই কতোকাল আগে দেখা,
আপনাকে দেখেই অনেক পুরনো কথা
মনে হ'চ্ছে। চোখের সামনে নানা দৃশ্য। (ওই)

কবির মতো যারা নগর জীবনের নাগপাশে বন্দি হয়ে আছে, এ কবিতায় কবির স্মৃতিকাতর উক্তি যেন তাদের প্রত্যেকের হৃদয়ের বেদনার্ত বাণীমূর্তি লাভ করেছে।

'শরৎ এলেই' কবিতাটিও কবির পরিণত বয়সে শৈশবের স্মৃতিচারণমূলক রচনা। এখনো শরৎ এলেই কবির বুকের মধ্যে জেগে ওঠে কাশবনের ছবি, চোখের তারায় ভেসে ওঠে আকাশের নীল রং। কবির ভাষায় :

শরৎ এলেই রৌদ্রের টানটান আলোয়
সবুজ মাঠ, নদী, নৌকাগুলো
ছবির মতো ... (শরৎ এলেই)

এ সবই কবি শৈশব, কৈশোর বয়সে দেখেছেন — যা এখনকার রুক্ষ সময়েও কবির প্রাণে জাগিয়ে তোলে নতুন অনুপ্রেরণা।

'রাত গভীর হ'লে' কবিতাটিতে পাওয়া যায় কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের খুব ছেলেবেলাকার ছবি। পঞ্চাশ উত্তীর্ণ কবি সাংসারিক জীবনে কখনো কখনো খুব একাকিত্ব বোধ করতেন। কেননা সরকারি চাকরি সূত্রে কলকাতায় স্ত্রী পুত্র কন্যাকে রেখে মাঝে মধ্যেই থাকতে হত দূর মফস্বলে। আর তখন রাত গভীর হলেই কবির স্মৃতিতে ভেসে উঠত তাঁর শৈশবের দিনগুলোর টুকরো টুকরো ছবি —

Dhaka University Institutional Repository

ঠাকুর্দা ইজিচেয়ারে শুয়ে কাগজ পড়তেন।
ভোর হলেই বাবাকে দেখতাম
ফুল গাছগুলোতে জল দিচ্ছেন।
ঠাকুমা কখন স্নান সেরে ঠাকুর ঘরে,
আর আমার মা উনুন ধরিয়ে দিয়েছেন ততক্ষণে,
একটু বাদেই ছেলেমেয়েরা উঠবে। (রাত গভীর হ'লে)

অথবা,

যেন নৌকো ভাসিয়ে চলেছি সবাই
বুড়িগঙ্গায়, দু'ধারে তীরভূমি,
একঝাঁক বক উড়ছে মাথার ওপর,
জলে বৈঠার ছলাৎ ছলাৎ ধ্বনি; (ওই)

আবার কখনো কখনো কবি অনুভব করেন,

ঠাকুর্দা ঠাকুমা আমার বাবা আর মা
যেন আমার খুব কাছাকাছি,
হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারি। (ওই)

একাকিত্ব কিংবা নিঃসঙ্গতাই মানুষকে স্মৃতিকাতর করে তোলে। কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের বেলাতেও সেটাই ঘটেছে। আমাদের প্রত্যেকের জীবনেও অহরহ এরকমটাই ঘটে। তাই এ কবিতার শেষ স্তবকের কথাগুলো শুধু কবির কথা নয় — আমাদের অন্তরের অব্যক্ত ভাষারূপও বলা যায় —

রাত গভীর হ'লে শৈশব স্মৃতির ঝাঁপি
খুলে যায়।
ছেলেবেলার পোষা কবেকার সেই পায়রাগুলো
বেরিয়ে এসে পাখা ঝাপটায়। (ওই)

ছয়.

'এই এক সময়' কাব্য সংকলনে কিছু সংখ্যক কবিতায় কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত মানবতার কল্যাণ কামনায় নিবেদিত কয়েকজন মনীষীকে তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। এ তালিকায় আছেন উইলিয়ম শেক্সপিয়র, ম্যাক্সিম গোর্কি, মহাত্মা গান্ধী, ভ. ই. লেনিন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বার্ট্রান্ড রাসেল এবং কাজী নজরুল ইসলাম। আর এঁদের নিয়ে রচিত কবিতাগুলো হচ্ছে : 'শেকস্‌পীয়রের নাটক মনে রেখে', 'তোমাকে জানি বলেই', 'শতবার্ষিকীর গান্ধীজীকে নিবেদিত', 'খাড়া পাহাড় বেয়ে', 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়', 'দেড়শো বছর বাদে', 'একটি জীবন' ও 'তুমি রুদ্ধবাক বলেই'।

পৃথিবীবিখ্যাত কবি ও নাট্যকার উইলিয়ম শেক্সপিয়রকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত রচনা করেছেন 'শেকস্‌পীয়রের নাটক মনে রেখে' কবিতাটি। এ কবিতায় কবির বক্তব্য হচ্ছে, মানুষের জীবন যেমন বহুরৈখিক — কখনো সাদামাটা

Dhaka University Institutional Repository

হাসি-খুশি, কখনো দুর্বোধ্য, দুঃখ-যন্ত্রণাময় — তেমনি নাট্যকারের হাতে সে জীবন কাহিনীও বিচিত্র বর্ণরেখায় আমাদের সামনে প্রকাশ পায়। কবির ভাষায় :

... মানুষের একান্ত হৃদয়,
কেবল দুর্বোধ্য নয় পদক্ষেপে নিয়ত নতুন,
কখনো বিলায় শৌর্য আর্তি কিংবা অপ্রেমের ভয়,
কখনো টানটান শিল্পী ছোঁড়ে তার অমোঘ হরপুন।
কখনো ঢেউয়ের মতো আছড়ায় কখনো আবার
সূর্যের রশ্মির মতো প্রভাময় তার মূর্তিগুলি।
(শেকস্‌পীয়রের নাটক মনে রেখে)

এ কবিতায় কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত নাট্যকারকে স্রষ্টার সঙ্গে তুলনা করেছেন। কেননা স্রষ্টা যেমন জীবজগত সৃষ্টি করে এ জগতের সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করেন — তেমনি নাট্যকারও মানুষের জীবনকাহিনী রচনা করে তার পাত্র-পাত্রীদেরকে তাঁর হাতের পুতুল বানিয়ে যেমন খুশি নাচান, তাঁর ভাবনাকেই নাটকের চরিত্ররা দর্শকের সামনে ফুটিয়ে তোলে। বিশেষ অর্থে নাট্যকার তাই স্রষ্টা — সে কারণে তাঁকেও দায়িত্ব নিতে হয় মানুষের যাবতীয় শুভ-অশুভের ভাবনায় উত্থিত প্রশ্নের। কবির ভাষায় তাই বলা যায় —

যতোই পুতুল ভেবে নাচায় তাদের নাট্যকার,
স্রষ্টার দিকেই তারা মেলে ধরে প্রশ্নের অঙ্গুলি। (ওই)

'তোমাকে জানি বলেই' কবিতাটি নিবেদিত হয়েছে বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কথা সাহিত্যিকদের অন্যতম ম্যাক্সিম গোর্কির উদ্দেশে। ম্যাক্সিম গোর্কির প্রকৃত নাম হচ্ছে আলেক্সেই ম্যাকিমভিচ পেশকভ। তিনি প্রথম জীবনে নিজের পরিবেশ ও সমকালের প্রতি এতই বীতশ্রদ্ধ ছিলেন যে পরবর্তীকালে যখন তিনি লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন তখন ছদ্মনাম গ্রহণ করেন 'গোর্কি' — যার বাংলা অর্থ হচ্ছে তপ্ত বা ক্ষুব্ধ।

জীবনের নিম্নতম ধাপ থেকে কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পথ চলতে হয়েছে গোর্কিকে। জীবনের শুরু থেকেই তাঁকে সইতে হয়েছে চরম লাঞ্ছনা, পীড়ন ও অপমান। সামান্য পারিশ্রমিকের জন্যে তাঁকে উদয়াস্ত করতে হয়েছে কঠোর পরিশ্রম। সরাসরি অংশ নিয়েছেন তিনি রাশিয়ার বিপ্লবে। জীবনের বিভিন্ন সময়ে বিচিত্র কাজের মধ্য দিয়ে গোর্কির পরিচয় ঘটেছিল নানাশ্রেণির নানান পেশার মানুষের সঙ্গে। তাই তাঁর সাহিত্যে সমাজের সবরকম মানুষের চরিত্র স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্থান করে নিয়েছে এবং সেসব চরিত্রে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন মানবচেতনা। গোর্কির এই অভিজ্ঞতার কাছে, মানবকল্যাণ চিন্তার কাছে কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত লাভ করেন মানবতার উজ্জীবন মন্ত্র। তাই বলেন :

তোমাকে জানি বলেই আমি
মানুষের মহৎ অনুভবে
হীরে মানিক জ্বলতে দেখি;
তোমাকে জানি বলেই আমি
শিল্প মহিমায়
বিপ্লবেরই অবাক প্রকাশ
মহিমান্বিত দেখি
ঘরে ঘরে আমার দেশে দেশে (তোমাকে জানি বলেই)

Dhaka University Institutional Repository

পৃথিবীবিখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী বা মহাত্মা গান্ধীর জন্মের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত রচনা করেন 'শতবার্ষিকীর গান্ধীজীকে নিবেদিত' কবিতাটি। অহিংসনীতিতে বিশ্বাসী গান্ধীজি সারাজীবন মানুষকে বুঝিয়েছেন —

ক্ষমা সহিষ্ণুতা প্রতিবেশী প্রেম
বুকে বুকে সঞ্চারিত হ'লে
মানুষ মানুষ হবে (শতবার্ষিকীর গান্ধীজীকে নিবেদিত)

তাই লক্ষ লক্ষ ম্রিয়মাণ মুখ এই সঞ্জীবনী মন্ত্রে উদ্ভাসিত হতে ভিড় করেছিল তাঁর চারপাশে। আর তার ফলশ্রুতিতে তারা পেয়েছিল মুক্তি — স্বাধীনতা — মানুষের প্রতি ভালবাসার শিক্ষা।

আজ গান্ধীজি নেই। বর্তমান সময়ও মানবতার বিরুদ্ধ। ক্ষমা সহিষ্ণুতা প্রেম — মানবীয় যাবতীয় গুণাবলি আজ ভূলুণ্ঠিত। সমস্ত পৃথিবীব্যাপি ভয়াবহ লোভ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। তাই গান্ধীজির জন্ম শতবার্ষিকীতে কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত তাঁর প্রচণ্ড শূন্যতা অনুভব করেন এবং আক্ষেপ ও হতাশায় বিষণ্ন চিত্তে লক্ষ করেন :

আজ এই পুণ্য জন্মশতবার্ষিকীর দিনে
অন্ধকার গাঢ় হয়, চতুর্দিকে লুব্ধতার লালা,
মূল্যবান রত্নরাজি ক্ষয়ে যায় বুকের ভিতর। (ওই)

'খাড়া পাহাড় বেয়ে' কবিতাটি নিবেদিত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার প্রতিষ্ঠাতা ভ. ই. লেনিনকে। কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ছিলেন সমাজতন্ত্রে গভীরভাবে বিশ্বাসী — জানতেন লেনিনের জীবন সংগ্রামের ইতিহাস। স্বপ্ন দেখতেন ভারতবর্ষেও একদিন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠি হবে এবং ঘুচে যাবে ধনী গরিব ভেদাভেদ। সেই প্রত্যাশা নিয়ে তিনি এগিয়ে যেতে চান সামনের দিকে — অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। লেনিন যেমন করে প্রচণ্ড প্রতিকূলতার মধ্যে হতোদ্যম না হয়ে নতুন আশায় — নতুন ভাবনায় এগিয়ে গিয়ে জয় করেছেন সমস্ত বাঁধা — ফিরিয়ে দিয়েছেন কৃষকের হাতে জমি, নিরন্নের মুখে অন্ন আর জনগণের মনে সুখশান্তি। কবির কামনাও সে রকমই — তাই আশাদীপ্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করেন,

আমি এগিয়ে যাব
পাহাড় বেয়ে উপরের দিকে,
সূর্যোদয়ের পথে। (খাড়া পাহাড় বেয়ে)

যদিও তিনি জানেন, যে-পথে তিনি এগিয়ে যেতে চান সেটা খুবই কঠিন পথ। কেননা সে পথে —

পা ফসকালে বড়ো বড়ো গহ্বর, হাঁ-করা পাথর
ক্ষুধার্ত ভঙ্গীতে অপেক্ষা করছে, ক্রোধান্ধ চিৎকারে (ওই)

তাঁকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে চায় সে পথ। কবি লেনিনের বিপ্লবীমন্ত্রে উজ্জীবিত — তাই নিরুৎসাহিত হন না। তাঁর উদ্যম অব্যাহত। তাই দৃঢ় কণ্ঠে কবি বলেন :

Dhaka University Institutional Repository

খাড়া পাহাড় বেয়ে ওপরের দিকে উঠতে যাচ্ছি
সূর্যোদয় দেখবার আশায়,
আমি সেই কখন থেকে রাতদিন
এই কনকনে ঠাণ্ডা হিমের রাজ্যে
বুকের মধ্যে আলো জ্বেলে রেখেছি।

(ওই)

এই আলোই একদিন কবিকে লক্ষে পৌছে দেবে এ বিশ্বাস কবির মতো আমাদেরও।

'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়' কবিতাটি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের এক ব্যতিক্রম রচনা। এ কবিতায় কবি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনটি গল্প ও তিনটি উপন্যাসের নাম ব্যবহার করে তাঁর ভাবনা প্রকাশের অভিনবত্ব তুলে ধরেছেন। বাংলাদেশের সমাজ জীবনের নানা ভাঙাগড়া, যেমন যুদ্ধ, দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, দেশভাগ, আশাভঙ্গের বেদনায় জনতার ক্রমবিক্ষোভ ইত্যাদি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কথাসাহিত্যে যে অপূর্ব দরদ দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত সেই ব্যঞ্জনাকে ধারণ করতে চেয়েছেন আলোচ্য কবিতায়। উদাহরণ —

সরীসৃপ চলে
অন্ধকারে বুকে ভর দিয়ে,
আর মানুষ সুতোয় বাঁধা পুতুলের মতো নাচে
কিংবা আরো অসহায়, প্রাগৈতিহাসিক কোনো জন্তু যেন।

(মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)

সংগ্রামী জীবনের সার্থক রূপকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোনো ভাবেই হতাশাকে মেনে নিতে পারেন না। নানা ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জরিত মানুষের শোষণ মুক্তির দৃঢ় প্রত্যয়ে তিনি দেন নতুন পথনির্দেশ। কবির ভাষায় :

কী এক দুর্বহ ভার কাঁধে নিয়ে
তবু চলেছিলে
বিরল শস্যের খোঁজে; পূর্ণতার মাঠ,
হলদে নদীর রেখা, বনের সবুজ
মনে রেখে। ... তুমি হৃদয় পুড়িয়ে একবার
খাঁটি সোনা হতে চেয়েছিলে। (ওই)

মানিকের গল্প-উপন্যাসের উল্লেখে সমকালীন জীবন সত্যকেই এখানে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত।

'দেড়শো বছর বাদে' কবিতাটি নিবেদিত হয়েছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উদ্দেশে। কবিতাটি রচিত হয়েছে বিদ্যাসাগরের জন্মের দেড়শো বছর পূর্তিতে। যখন এই বাংলার চরম দুর্দিন চলছে। কবির উক্তিতে :

আমরা এখন
বুকভাঙা রক্তমাখা এক দুঃখী বাংলায়
ঝড়ের নৌকায় বাস করছি। (দেড়শো বছর বাদে)

Dhaka University Institutional Repository

অথচ আজ থেকে দেড়শো বছর আগে মনস্বী বিদ্যাসাগর মানুষকে শিখিয়েছিলেন মাথা উঁচু করে বাঁচতে, অন্যায়ের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে বুক টান করে হাঁটতে। তিনি বলেছিলেন—

মানুষ গাছ থেকে বনস্পতি হয়ে ওঠে
যদি থাকে মনুষ্যত্ব;
নালা থেকে ক্রমশ নদী হতে পারে
যদি রক্তের ভিতরে
জেগে ওঠে করুণানির্ঝর। (ওই)

মনীষীর সদ্বাণী আজ খারাপ সময়ের চাপে বিস্মৃত প্রায়। সুবিধাবাদী বেঁটে বামনের দল কুরে কুরে খেয়ে ফেলেছে মানুষের শুভ বোধ। সে কারণেই কবি কণ্ঠ আজ ম্রিয়মাণ, লজ্জাজড়িত; জন্মের দেড়শো বছর পূর্তি উপলক্ষে বিদ্যাসাগরকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে তাই কবি বলেন,

দেড়শো বছর বাদে তোমার ছবির সামনে
নতজানু হবো
এমন যোগ্যতা নেই। (ওই)

'একটি জীবনে' সনেটটি নিবেদন করা হয়েছে বিখ্যাত দার্শনিক ও মানবকল্যাণব্রতী মনীষী বার্ট্রান্ড রাসেলকে উদ্দেশ করে। এটিও কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত রচনা করেছিলেন মনীষী রাসেলের জন্ম শতবর্ষে। এ কবিতার প্রথম স্তবকে কবি রচনা করেছেন বার্ট্রান্ড রাসেলের সংগ্রামমুখর জীবনের চিত্র।

একটি জীবনে তুমি সারাক্ষণ গাণ্ডীব টঙ্কার!
অসহায় কে কোথায় ছিন্নভিন্ন কিংবা ভূলুণ্ঠিত,
কোথায় অন্যায় দম্ভ শোষিতের রক্তে স্বেদে স্ফীত,
তুমি প্রতিরোধে আছো তুচ্ছ ক'রে দর্পীর হুঙ্কার। (একটি জীবনে)

মানবজাতি যখনই কোনো সংকটে পড়েছে বার্ট্রান্ড রাসেল ঝাঁপিয়ে পড়েছেন সেখানে। তিনি যুদ্ধের বিরুদ্ধে—শান্তির পক্ষে অক্লান্তভাবে সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন আমৃত্যু। পৃথিবীর স্বাধিকারবোধে উদ্দীপিত মানুষের তিনি ছিলেন অন্যতম আশা-দীপ। তাই কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত সনেটের ষটকের শেষ দুলাইনে লেখেন—

শোষকের প্রতিপক্ষ, শোষিতের একান্ত সুহৃদ;
তোমার ধিক্কারে নড়ে রক্ত চক্ষু শোষণের ভিৎ। (ওই)

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে নিবেদিত কবিতার নাম 'তুমি রুদ্ধবাক বলেই'। ১৯৪২-এ কবি নজরুল পক্ষাঘাতে বোধশক্তি হারিয়ে নির্বাক হয়ে যান। যখন নির্বাক হয়ে যান তখন তাঁর যৌবনের বেড়া তিনি পার হয়ে গেছেন।

তুমি রুদ্ধবাক বলেই
ছদ্মবেশী সুযোগসন্ধানীর দল
বিগ্রহের আশেপাশে
কপট শুদ্ধাচারীর মতো
তোমার ভাবমূর্তির চারদিকে
আসর জাঁকায়। (তুমি রুদ্ধবাক বলেই)

Dhaka University Institutional Repository

অথচ ১৯৪২-এ পক্ষাঘাতে নজরুল ইসলাম বোধশক্তি হারিয়ে নির্বাক হয়ে যাওয়ার আগে তাঁর বজ্র গর্জনে এইসব ভণ্ড, সুযোগসন্ধানীরা পালাবার পথ খুঁজে পেত না। তাই কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত প্রচণ্ড আশায় বুক বেঁধে এই দুরন্ত দুঃসময়ে আবার নজরুলের স্বতঃস্ফূর্ত আবির্ভাব কামনা করেন। কবি বলেন —

যদি একবার গর্জে উঠতে পারতে এ সময়,
যদি তোমার কবিতার অক্ষরগুলো একবার
তোমার হৃদয়ের বিদ্যুৎ-স্ফুরণে
আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে
ঝলসে উঠতে পারতো! (ওই)

সাত.

সব রকমের ভাগ-বাটোয়ারার পরেও একই জন্মভূমির স্তনে লালিত দুটি খণ্ডিত দেশের মানুষের মধ্যে যে একটা স্বাভাবিক নাড়ির টান থেকে যায় — সেটা কোনো সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ থেকে উদ্ভূত নয়; মানব সমাজের আরো গভীরে এর তাৎপর্য নিহিত। তাই বাংলাদেশের ঘটনাবলিকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যেমন নিজেদের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে নি, তেমনি বাংলাদেশের মানুষও তাদের আন্তরিকতাকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছে। দুই বাংলার লাঞ্ছিত, রক্তস্নাত, পরিশুদ্ধ মানবসমাজের প্রতিমুহূর্তের সংগ্রাম, প্রত্যাশা ও শুভকামনা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। এই বোধ থেকেই উৎসারিত হয়েছে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের স্বদেশভাবনামূলক কবিতা — আর এ পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলো হচ্ছে : 'স্বদেশ', 'বাংলার বাতাস গর্জে উঠেছে', 'হে সময়, হে পৃথিবী', 'শুধুই যাবার চেষ্টা', 'টান বাড়ছে' প্রভৃতি।

'স্বদেশ' একটি সনেট; এর প্রথম স্তবকে ফুটে উঠেছে গ্রাম-বাংলার সহজ সরল গার্হস্থ্য জীবন চিত্র।

এই ভালো, এই ঘর; অমল প্রলেপে পরিপাটি
নিকোনো উঠোনটুকু, শাদা ফুল, শান্ত তরুবীথি
আনন্দে নোয়ায় মাথা, কচিবৃন্তে জীবনের গীতি
আনে হাওয়া, আনে রৌদ্র; অদূরেই সোনামাঠে খাঁটি
প্রাণ জাগে থরে থরে; (স্বদেশ)

পল্লীর অতি সাধারণ গৃহস্থ বাড়ির ছবি আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে কবির বর্ণনায়। যে গৃহস্থের গোলাভরা ধান, পুকুরভরা মাছ, গোয়ালভরা গরু আর প্রাণভরা আছে শান্তি। যে বাড়িতে সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বলে, গোষ্ঠ থেকে ঘরে ফেরে রাখাল গরুর পাল নিয়ে, আর মেঠো গন্ধে ভরে ওঠে আঙিনা। ভালবাসায়, মমতায় যে বাড়ির প্রতিটি মানুষ থাকে জড়িয়ে।

শেষ স্তবকে কবি পল্লীর প্রেম-প্রীতিপূর্ণ গার্হস্থ্য বাড়ির মতোই কল্পনা করেছেন প্রিয় স্বদেশকে। কেননা এ আমাদের জন্মভূমি — এখানেও জড়িয়ে আছে,

Dhaka University Institutional Repository

মা'য়ের শিশুর স্মিত হাসি,
প্রৌঢ়ের বিগত স্মৃতি, যুবকের নিভৃত উদ্যম
মাটি ও মাঠের কাজে, (ওই)

তাই,

এখানে প্রশান্তি নিরুপম
সামান্য সংসার ঘিরে, — (ওই)

শান্তির নিকেতন এই বাংলাদেশের প্রতি কবির গভীর মমতা প্রকাশ পেয়েছে এ কবিতার প্রতিটি চরণে।

'বাংলার বাতাস গর্জে উঠেছে' কবিতাটির রচনাকাল ১৯৭১। বাংলাদেশে অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে তখন স্বাধীনতার আন্দোলন তুঙ্গে। অসংখ্য দেশপ্রেমিকের রক্তে রঞ্জিত হয়ে একটি নতুন অভ্যুদয়ের অপেক্ষায় কাঁপছে সারা দেশ। কবি তখন পশ্চিমবাংলায় বসে তীব্র অস্থিরতায় কাতর হচ্ছেন। তিনি বাংলাদেশেরই সন্তান — অবস্থাচক্রে পশ্চিমবঙ্গবাসী; তাঁর বাল্য-কৈশোর ও যৌবনের বন্ধুরা স্বাধিকারের লড়াইয়ে কে কোথায় আছে, কেমন আছে জানতে পারছেন না — তাঁদের খবরের জন্যে উদগ্রীব হয়েছেন। নিজে তাঁর জন্মভূমির জন্যে কিছু করতে পারছেন বলেই বন্ধুদের বীরত্ব কল্পনায় এক ধরনের আত্মতৃপ্তি লাভ করতে চেয়েছেন।

সানাউল মুনীর আতোয়ার আহ্সান
এখন কে কোথায় ছড়িয়ে আছে জানি না।
এখন ওদের পেছনে কয়েক হাজার নরখাদক
মারণাস্ত্র নিয়ে তাড়া করেছে,
জ্বলছে জনপদ গ্রাম শস্যক্ষেত গঞ্জের বাজার।

চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি
সানাউল মুনীর রুখে দাঁড়িয়েছে,
ঝড়ের হাওয়ায় উড়ছে উস্কোখুস্কো চুল,
বিদ্যুতের দীপ্তি দুই চোখে:
আতোয়ার আহ্সান মাটিতে বুক রেখে
হাতের কব্জায় ফিরে পেয়েছে নিশানা,
তাক করছে দুশমনকে। (বাংলার বাতাস গর্জে উঠেছে)

বন্ধুদের তথা দেশবাসীর বীরত্বে কবি গর্ব অনুভব করলেও তাদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে বেশ উদ্বিগ্ন। কবির এ মনোভাবের প্রকাশ দেখি কবিতার শেষ দুই চরণে —

বাংলাদেশের আকাশ বাতাস গর্জে উঠেছে,
কে কে বেঁচে আছে জানি না। (ওই)

১৯৭১-এর গভীর সংকটময় ও রক্তাক্ত সময়ের আরেকটি কবিতা হচ্ছে 'হে সময়, হে পৃথিবী'। যখন সমাজ সভ্যতা ভেঙে পড়ার দরুণ আশ্রয়হীন মানুষ নতুন আশ্রয়ের অপেক্ষায়। ক্লান্তিতে অবসাদে মানুষ মৃতপ্রায় এবং ভীতিতে তার চেতনা আচ্ছন্ন তখন সেই মৃত্যুমুখি মানুষের দৃঢ় উচ্চারণ আমাদের অন্তর ছুঁয়ে যায় —

Dhaka University Institutional Repository

আমাকে হত্যা করার আগে
একবার ভেবে দেখো
আমি কোন দেশে জন্মেছিলাম।
আমাকে ছিন্নভিন্ন করবার আগে
একবার মনে রেখো
আমি কোন স্বপ্ন বুকে রেখেছিলাম। (হে সময়, হে পৃথিবী)

আমাদের ভেতরকার বোধ জাগৃত হয়। আমাদের মনেও প্রশ্ন জাগে আমার স্বপ্ন, আমার যন্ত্রণা, আমার ক্ষয় — আমার সব কিছুকে কেন মূল্য দেয়া হবে না? কেন আমাকে এবং আমার ভাবনাকে বিনষ্ট করা হবে? আর তখন কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমাদেরও বলতে হচ্ছে হয় —

আমাকে হত্যা করার আগে,
ছিন্নভিন্ন করবার আগে
হে সময়, হে পৃথিবী
এসব জিজ্ঞাসার সদুত্তর দিও। (ওই)

'শুধুই যাবার চেষ্টা' কবিতাটিতে বাংলাদেশের প্রতি কবির গভীর ভালবাসার প্রকাশ ঘটেছে।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের জন্ম হয়েছিল অবিভক্ত ভারতের পূর্ববাংলায়। যৌবনে পৌঁছে তিনি পেয়েছেন বিভক্ত ভারতের পূর্ব পাকিস্তান। উত্তীর্ণ যৌবন থেকে কবি বসবাস করেছেন ভারতের পশ্চিমবাংলায় এবং এই প্রৌঢ় বয়সে এসে জন্মভূমি পূর্ববাংলাকে দেখেছেন স্বাধীন সার্বভৌমত্ব অর্জন করতে। মাতৃভূমির এই পরিবর্তনকে কবি কিরণশঙ্কর প্রকাশ করেছেন এভাবে —

কৈশোরে যে-মুখের ছায়ায় সম্মোহিত ছিলাম,
যৌবনে তার রূপ ভিন্ন,
প্রৌঢ়তা আমাকে অবাক ক'রে দিয়ে তাকে ক'রেছে
আরো স্বতন্ত্র। (শুধুই যাবার চেষ্টা)

যৌবনে কবি বাধ্য হয়েছিলেন তাঁর মাতৃভূমি ছাড়তে। কিন্তু মায়ের প্রতি সন্তানের যে টান তা তিনি অনুভব করেছেন সারাক্ষণ। তাই জন্মভূমিতে ফিরে যাবার যে প্রতিজ্ঞা তিনি করেছিলেন যৌবনে — এই প্রৌঢ় বয়সে পৌঁছেও সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে না পারার আক্ষেপ থেকেই এ কবিতায় ধ্বনিত হয়েছে কবির অনিকেত বাণী —

একদিন আমি তোমার কাছে পৌঁছাব বলে আজও
বেঁচে আছি। (ওই)

'টান বাড়ছে' কবিতার বিষয়ও এক। জন্মভূমি বাংলাদেশকে একটিবার মন-প্রাণভরে দেখা। কবির ভাষায়,

> 'বয়স হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে এখন ভারতীয় হিসেবে স্ত্রীপুত্র পরিবার নিয়ে বাসস্থানের স্থায়ী ব্যবস্থা করে কিছুটা গুছিয়ে বসেছি। তবু মনে হ'লো এক ছুট দিয়ে ঢাকায় যাই। সেখানে গিয়ে দেখি আমার পুরনো ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা কে কেমনভাবে দিনযাপন করছেন।'[৫৩]

Dhaka University Institutional Repository

বাল্য কৈশোরের স্মৃতি বিজড়িত পিতৃভূমির প্রতি এই অনুভবকে কবি প্রকাশ করে লিখেছেন :

ক্রমশই দূরে সরে যাচ্ছি দৃশ্যপুঞ্জ থেকে।
অথচ টান বাড়ছে।
ক্রমশই ঢিলেঢালা অশক্ত নিয়তি নির্দিষ্ট,
অথচ ভেতরে ভেতরে কোথাও
মাঝে মাঝেই
অদৃশ্য পাখির পাখার ঝাপটানি। (টান বাড়ছে)

বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে — কবিও বয়সের ভারে ক্রমশ ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন,

যেন এক পরিচিত পৃথিবী থেকে
অন্য এক দুর্জ্ঞেয় পৃথিবীর দিকে
আমার সমস্ত অস্তিত্ব ছড়িয়ে পড়ছে... (ওই)

তবুও হৃদয়ের গভীর থেকে গভীরতর স্থানে তিনি অনুভব করছেন জন্মভূমির প্রতি এক অবর্ণনীয় আকর্ষণ। কবির ভাষায়,

এক আকাশ থেকে অন্য এক আকাশের ব্যাপ্তির দিকে
ক্রমশই সরে সরে যাচ্ছে।
অথচ টান বাড়ছে। (ওই)

আট.

এ পর্যায়ের কবিতাগুলোর মধ্যে পড়ে বিচিত্র ভাবের কবির। এর কোনোটিতে প্রকাশ পেয়েছে মৃত্যুভাবনা, কোনোটিতে ফুটে উঠেছে পরিবেশ ও প্রকৃতিচেতনা, আবার কোনো কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে কবির অন্য কোনো ভাবনা। এ ধারার কবিতাগুলো হচ্ছে — 'পতনের শব্দের আড়ালে', 'বৃক্ষের হৃদয়', 'রাত্রি তুমি'।

'পতনের শব্দের আড়ালে' কবিতায় ফুটে উঠেছে ষাটের দশকের ভীষণ নৈরাশ্যময় সময়ের কঠিন বাস্তবতার চিত্র। এ কবিতার মূল ভাবনা মৃত্যুচেতনা। কবির ভাষায় :

সহসা ভীষণ শব্দে ছিন্নভিন্ন ঘুমের মুহূর্ত।
মধ্যরাতে তেতলার ছাদ থেকে কোথাও রাস্তায়
একটি মহিলামূর্তি এইমাত্র অন্তিম পতনে
চীৎকারে কাঁপিয়ে দিল নিদ্রাবাহী শহরের বুক। (পতনের শব্দের আড়ালে)

এরকম পতনের শব্দ অহরহই শোনা যায় এখন,

পতনে পতনে ভাঙে রাত্রিদিন বিমর্ষ সংসার (ওই)

চারদিকে ঘোর অন্ধকার, বিষাদের ঢেউ সবার চোখেমুখে; তাই যেন মনে হয়,

... ইচ্ছামৃত্যু এখন নিয়তি: (ওই)

'বৃক্ষের হৃদয়' কবিতায় বৃক্ষের প্রতি কবির গভীর মমতা প্রকাশ পেয়েছে। বৃক্ষ হচ্ছে প্রকৃতির অমূল্য সম্পদ। মানুষের সবচেয়ে বড় বন্ধু। কিন্তু কবি লক্ষ করেন প্রকৃতির এই

Dhaka University Institutional Repository

সম্পদকে মানুষই কতখানি নির্দয়ভাবে ধ্বংস করে গড়ে তুলছে তার নগর-জনপদ। প্রিয় বন্ধুকে এরকম নিমর্মভাবে হত্যা করতে মানুষের হাত একটুও কাঁপছে না। বরং

গূঢ় অন্তরালে লোভ
বাড়ে দিনে দিনে। (বৃক্ষের হৃদয়)

এবং বৃক্ষগুলো মানুষের —

লোভের কুঠারে
ছিন্নভিন্ন, কণ্ঠস্বর কালো অন্ধকারে
'না, না' ব'লে লীন হয়ে যায়
মাটিতে, ধুলোয়। (ওই)

কবি তাই ব্যথাদীর্ণ অন্তরে অনুভব করেন,

পৃথিবীতে সারাক্ষণ ছিন্নভিন্ন বৃক্ষের হৃদয়। (ওই)

'রাত্রি তুমি' কবিতাটিতে কবি রাত্রিকে কল্পনা করেছেন মোহনীয় রমণীরূপে।

তুমি মোহময়ী
রমণীর স্খলিত চুলের বিশালতা
চুপিসাড়ে দেখাও, ছড়াও
নিবিড় স্নিগ্ধতা! (রাত্রি তুমি)

রাত্রি একবিতায় কবির প্রেমিকাও বটে। কবি রাত্রিকে আহ্বান করে বলেন উন্মোচিত হতে — কেননা পঞ্চাশোর্ধ্ব কবির দিনের কর্মক্লান্ত শরীর, যন্ত্রণাবিদ্ধ হৃদয় রাত্রির সান্নিধ্যে লাভ করতে চায় অবারিত শান্তি। কবির ভাষায় :

রাত্রি তুমি
দিনের সমস্ত শব্দ আর্তনাদ যন্ত্রণার ঢেউ
কোথায় হটিয়ে দিয়ে
একটি চুম্বনে, আত্মদানে
প্রৌঢ়ের অশক্ত হাহাকার, সমস্ত যৌবনজ্বালা
মুছে নেবে। (ওই)

কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের 'এই এক সময়' কাব্যগ্রন্থের কবিতাসমূহের রচনাকাল সম্পর্কে আমরা পূর্বেই জেনেছি, সময়টা অত্যন্ত রুক্ষ, উত্তাল ও রক্তাক্ত। কবিমাত্রেই তাঁর স্বকালের প্রতিনিধি। সমাজে বা রাজনৈতিক জগতে এক এক সময় আসে যখন বাইরের ঘটনার প্রভাবে কবিচিত্ত দারুণভাবে আলোড়িত হয়। কবি তখন একজন সামাজিক জীব হিসেবে সে-সব ঘটনাবলিতে অংশগ্রহণ করেন, কোনো কোনো বিষয়ের প্রতিবাদ কিংবা সমর্থনের ক্ষেত্রে খুব নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে নিজের সাক্ষর দিয়ে থাকেন। সেই সাক্ষরের ভাষা তিনি তৈরি করে নেন সময়োপযোগী করে। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত তার ব্যতিক্রম নন। তাই 'এই এক সময়ে' কবির কাব্যভাষা ও কবিতার আঙ্গিকে পরিবর্তন হয়েছে। কবিতার শরীর থেকে ঝরে গেছে পদ্যের লালিত্য ও অলংকারের বাহুল্য। এ কাব্যগ্রন্থের ৫৭টি কবিতার মধ্যে মাত্র ৬টি পদ্য আর বাকি ৫১টিই গদ্যের কড়া হাতুড়িতে শাণিত। অবশ্য পদ্যগুলোতেও কোমলতা নয়, সময়ের কাঠিন্যের ছাপ বর্তমান। যেমন —

Dhaka University Institutional Repository

১. দাঁতে দাঁতে ঘসা লেগে অন্ধকারে গুরু গুরু ধ্বনি,
জরার বাঁধন যেন ভাঙে ঢেউ : শব্দ শোনা যায়,
সমস্ত পৃথিবী কাঁপে সময়ের চোখের পাতায়,
ভেসে যায় রক্তস্রোতে শীর্ণতম আদিম ধমনী। (ঝড়ো হাওয়া কালো হাওয়া)

২. সারাক্ষণ
জ্বলন্ত অঙ্গারে পোড়ে ভয়ার্ত দিনের ছবি। শ্যাওলায়
পুকুরের চোখ ঢেকে আছে। দুর্বাদলে
দস্যুর পায়ের ছাপ, স্তব্ধ বৃক্ষমূলে
সাপের খোলস। আমি আনন্দিত বাক্যালাপে
একদিন ভরিয়েছিলাম
কৈশোর যৌবন। আজ শুধুই
তিক্ততার তেজ আর জ্বালা। (হাওয়ার ভেতরে)

প্রকৃতপক্ষে 'এই এক সময়' কাব্যগ্রন্থ কবির মানসচৈতন্যের অনিবার্য প্রবাহসূত্রে একটি বিশেষ তাৎপর্যকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে, যা সমকালীন আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিজীর্ণ সংরক্ত সময়কে অস্বীকার করতে পারে নি। পূর্বেই বলা হয়েছে অলংকারের আধিক্য এ কাব্যগ্রন্থে নেই। তবুও সমকালীন সমাজবাস্তবতাকে গভীরভাবে অনুধাবন করার জন্যে কিছু উপমা, উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প সৃষ্টির পাশাপাশি রূপক প্রতীকের সাহায্যে কবি কবিতার অন্তর্ময় দ্যোতনা চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। উদাহরণ —

শব্দালংকার

সরল অনুপ্রাস :
১. জমি বন্ধ্যা, দিকে দিকে দগ্ধক্ষত মাটি, (মনুষ্যত্বহীনতায়)
২. কে তবু পৃথকভাবে পেতে চায় পতনের সুখ! (পতনের শব্দের আড়ালে)
৩. ভীষণ এক ভাঙা বাংলায় বাস করছি, (দেড়শো বছর বাদে)
৪. গাছে গাছে পাতার সবুজ, ফুলের সজীবতা। (ভয়ের আবহাওয়ায়)

অন্ত্যানুপ্রাস :
সামান্য সংসার ঘিরে, — অগ্নিহোত্রী মানুষেরা খাঁটি
স্বদেশকে খুঁজে খুঁজে এইখানে পেয়েছিল মাটি। (স্বদেশ)

শ্রুত্যানুপ্রাস :
ত দ : শোষকের প্রতিপক্ষ, শোষিতের একান্ত সুহৃদ:
তোমার ধিক্কারে নড়ে রক্তচক্ষু শোষণের ভিৎ। (একটি জীবনে)

অর্থালংকার

উপমা :
১. ঝরাপাতা সব / পড়ে আছে ইতস্তত,
উৎসব শেষের যতো ছত্রভঙ্গ ম্লান / বাসনার মতো। (ফুলের সন্ধানে)
২. এবং প্রহরগুলো প্রত্যাখ্যাত নায়কের মতো
অপমান-ক্ষুব্ধ ক্লান্ত ঈষৎ করুণ। (ঘরের হৃদয়)
৩. সংশয়ের অন্ধকারগুলো / চোখের সামনে কালো পর্দার মতো; (মন্ত্র)
৪. এক একটি দিন পতঙ্গের মতো সবেগে
অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে পুড়ে মরছে; (ঘেরাও)

Dhaka University Institutional Repository

উৎপ্রেক্ষা : যেন দ্রুততম বেগ ছাড়া
কোথাও নিশ্চিন্ত কিছু নেই! যেন শিশুর হাতের
দুধের বোতল ভেঙে খান খান হয়ে যাবে,
যেন ঘুম পাড়ানীর গান এখন নিষেধ... (এই সময়)

সমাসোক্তি : ১. আকাশ এখন কোনো অস্থির যন্ত্রণা
বুকে করে গুম হয়ে আছে। (বিচ্ছিন্ন গোপন)

২. ক্রুদ্ধ অহঙ্কার আর হিংস্র অট্টহাসি তখন
আকাশের বাতাসের পা বেয়ে সরীসৃপের মতো
নেমে আসতে থাকে। (সন্ধিক্ষণের মুহূর্তে)

৩. গাছগুলো এখন আর আবছা অন্ধকারের / প্রেতচ্ছায়া নয়,
মানুষের মতোই যেন তারা
জ্যোৎস্নার ঝর্ণাধারায় অবগাহন করছে। (স্বপ্ন)

প্রতীক

আমরা এখন
বুকভাঙা রক্তমাখা এক দুঃখী বাংলায়
ঝড়ের নৌকায় বাস করছি। (দেড়শো বছর বাদে)

এখানে 'ঝড়ের নৌকা' প্রতিকূল সময়ের প্রতীক; যে সময়ে এই বাংলার আকাশ বাতাস লক্ষ কোটি সাধারণ মানুষের বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাসে রক্তাক্ত।

অথচ ভীষণ অন্ধকার দেখছি চতুর্দিকে :
কুকুরের মতো কী যেন তাড়া করে আসছে, (বুকে বুকে বারুদ)

এখানে 'কুকুর' দুঃসময়ের প্রতীক; যে দুঃসময় কবিকে কেবলি তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে ভয়ংকর অন্ধকার আবর্তের দিকে।

কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত 'এই এক সময়' কাব্যগ্রন্থে এই দুঃসময়ের প্রকাশ ঘটাতে বিভিন্ন কবিতায় 'ঝরা পাতা', 'বন্ধ্যা জমি', 'পাংশুল আকাশ', 'অন্ধকার ছায়া', 'অজগর', প্রভৃতি শব্দকে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। আবার সময়ের এই প্রতিকূলতা সৃষ্টিকারী সাম্রাজ্যলোলুপ, ফ্যাসিস্ট, স্বদেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকদের তিনি প্রতীকায়িত করেছেন 'নরকের কীট', 'নরপশু' ইত্যাদি ঘৃণ্য শব্দে।

ছন্দ

'এই এক সময়' কাব্যগ্রন্থে ৪টি অক্ষরবৃত্ত ও ২টি সনেট ছাড়া বাকি সব কবিতাগুলোই গদ্য। অক্ষরবৃত্ত কবিতাগুলো ১৪ ও ১৮ মাত্রার প্রবহমান রীতি এবং সনেটগুলো মিশ্রণ রীতির অনিয়মিত ধাঁচের রচনা। গদ্যকবিতাগুলোতে ছন্দের দোলা আবিষ্কার করা গেলেও সেগুলো নির্দিষ্ট কোনো ছন্দে ফেলা যায় না। উদাহরণ—

অক্ষরবৃত্ত : ১. প্রণয় এখন লগ্ন যৌনতার স্বরে,
যে-কোনো আহ্বানে তীব্র লালসাই ঝরে,
প্রেমের ব্যর্থতা বুকে দিনগুলো ঝরে,
চিকনিয়া গাঁথে মালা কেউ কি গোপনে? (মনুষ্যত্বহীনতায়)

Dhaka University Institutional Repository

২. সারাক্ষণ মনে হবে পড়ে গেল কেউ পড়ে গেল,
অধুনা পতন ভিন্ন নির্বিরোধ অন্য দৃশ্য নেই;
অহরহ বিষাদের ঢেউগুলো লাগে চোখেমুখে
ক্ষিপ্রতর প্রতিঘাতে সময়ের মুহূর্তেরা ঝরে। (পতনের শব্দের আড়ালে)

গদ্যকবিতা : ১. ইচ্ছা হয় চীৎকার করে বলি 'সাট অপ ষ্টুপিড'!
ইচ্ছা হয় ঘাড় ধরে ল্যাম্পপোষ্টের কাছে নিয়ে যাই,
দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধি। (যে-ভূমিকায় প্রতিদিন)

২. কেমন আছেন। ভালো তো সব খবর।
ভালো। আপনাদের কুশল তো? (কেমন আছেন)

৩, আরো ক'টি বৃক্ষ কাটা গেল।
একগলা অন্ধকারে অন্তিম চীৎকারে
'না, না' ব'লে মিশে গেল
মাটিতে, ধুলোয়। (বৃক্ষের হৃদয়)

৪. একজন প্রশ্ন করলো : দেশলাইতে মোট ক'টা কাঠি থাকে?
একজনের জিজ্ঞাসা : অ্যালসেশিয়ানের বিষদাঁত ক'টি?
উত্তর না দিয়ে চুপ ক'রে থাকি।
আমি সিগারেট খাই না,
কুকুর পুষি না। (বুকে বুকে বারুদ)

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের গদ্যকবিতায় সংলাপ ও নাট্যভঙ্গি আছে। তিনি অনেক সময় তাঁর গদ্যকবিতার পঙক্তিতে ছোট শব্দে বা বাক্যাংশে ফুটিয়ে তোলেন মনের সমস্ত অনুভূতি। এখানেই তিনি অর্জন করেন তাঁর সমসাময়িক কবিদের থেকে স্বাতন্ত্র্য।

Dhaka University Institutional Repository

৬. বৃষ্টি এলে

'এই এক সময়'-এর মতো 'বৃষ্টি এলে' কাব্যগ্রন্থটিও প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৩-এ এবং এর দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয় ফাল্গুন ১৩৮৮, মার্চ ১৯৮২-তে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের প্রকাশিত কবিতাগ্রন্থগুলোর মধ্যে একমাত্র 'বৃষ্টি এলে'রই দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশ পায়। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে কবিসুহৃদ শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্যকে। এ বইটিতে কোনো পৃষ্ঠাসংখ্যা উল্লেখ নেই; এর কবিতাসংখ্যা ২৩। কোনো কবিতার শেষে সাল বা তারিখ লেখা না থাকায় নির্দিষ্ট করে বলা যায় না কবিতাগুলো কবি কখন রচনা করেছিলেন। তবে কবিতাগুলো পাঠ করলে বোঝা যায় 'এই এক সময়' কাব্যগ্রন্থের রক্তাক্ত সময়ের ক্রোধের আগুন কিংবা বারুদের উত্তাপ এখন অনেকটা শান্ত-সমাহিত। এ পর্যায়ের কবিতায় কোথাও ফুটে উঠেছে হতাশা, কোথাও বিরূপ সময়কে জয় করবার কঠিন ও প্রশান্ত সংকল্প; আবার কখনো কখনো প্রকাশ পেয়েছে কবির প্রবীণ বয়সের স্মৃতিকাতরতা। এ কাব্যগ্রন্থেই প্রথম লক্ষ করা যায় কবি সত্যিকার অর্থে মৃত্যুভাবনা দ্বারা তাড়িত হয়ে বিচলিত হয়েছেন; আবার জীবনকে ভালবেসে আশাবাদী কবি কখনো কখনো মৃত্যুকে অস্বীকার করার চেষ্টাও করেছেন। মোটকথা কবিমনের এক একটা ইচ্ছে, এক একটা অনুভূতি অত্যন্ত আন্তরিক ও ভেতরস্পর্শী হয়ে ছোট ছোট কবিতা-আকারে উপস্থাপিত হয়েছে 'বৃষ্টি এলে'তে। এইসব বিবেচনায় 'বৃষ্টি এলে'র কবিতাগুলোকে পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ করে আলোচনা করা যায়। বিভাগগুলো হচ্ছে :

এক. আশাবাদী কবিতা
দুই. সময়চেতনাজাত কবিতা
তিন. স্মৃতিকাতর কবিতা
চার. মৃত্যুভাবনাজনিত কবিতা
পাঁচ. বিবিধ বিষয়ক কবিতা

এক.

আশাবাদ কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থগুলোর মতো 'বৃষ্টি এলে'তেও আশাবাদের ধারাটি বর্তমান। তবে তা পূর্বের মতো জোরালো নয়, কিন্তু কবির আন্তরিকতার ছোঁয়ায় এবং দৃঢ় উচ্চারণে কবিতাগুলো উজ্জ্বল। এ ধারার কবিতাগুলো হচ্ছে, 'কোমলতার জন্যে', 'পলিমাটি', 'ভালোবাসার মন্ত্র' ও 'কখন সময় হবে'।

জীবনের প্রতি কবির গভীর আগ্রহের ভাষারূপ পেয়েছে 'কোমলতার জন্যে' কবিতায়। কবি জানেন আজকের এই রুক্ষ-নীরস সময়ে একটুখানি কোমলতা, একটুখানি ভালবাসা পাওয়া কতটা দুরূহ। মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাস এখন নিঃশেষ প্রায়। আপনজনেরাই এখন নিষ্ঠুর হন্তারক। কবির ভাষাতে বলা যায় :

Dhaka University Institutional Repository

কে যেন ডাকছে অহরহ : কাছে এসো,
কাছে এলেই প্রস্তর তুলে মাথার খুলি
গুঁড়িয়ে দিতে চায়। (কোমলতার জন্যে)

প্রতারক, বিশ্বাসঘাতক এই বিরুদ্ধ সময়েও কবি কিরণশঙ্করের আশাবাদী মন সুদিনের স্বপ্নে বিভোর হয়। শোনা যায় তাঁর স্বপ্নিল উচ্চারণ :

অথচ আমরা একটুকরো কোমলতার জন্যে বেঁচে আছি;
একটুকরো ভালোবাসার জন্যে। (ওই)

'পলিমাটি'ও কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের একটি আশাবাদী কবিতা। এ কবিতায় কবি দেখেছেন বৃষ্টি যেমন ধ্বংসের প্রতীক, তেমনি সৃষ্টিরও সে উৎস।

বৃষ্টি এলেই তলিয়ে যাবে সব।
জলের তোড়ে হারিয়ে যাবে
রাস্তা ঘর-বাড়ি,
কাঁপতে থাকবে প্রাসাদ, অট্টালিকা;
বৃষ্টি এলেই ঝড়ের হাওয়া
হানবে তরবারি। (পলিমাটি)

বৃষ্টির এই বিধ্বংসী চরিত্র যেমন সত্যি, তেমনি এটাও সত্যি যে বৃষ্টির এই বিনাশী ক্ষমতার কাছে পরাজিত হয় মানুষের লোভ এবং দম্ভ। ধনী-দরিদ্র সবাইকে এক সারিতে দাঁড় করিয়ে দেয় বৃষ্টি। পৃথিবীকে দান করে উর্বরতা। কবির কণ্ঠেও শুনি সেই ধ্বনি —

বৃষ্টি এলেই নতুন পলিমাটি। (ওই)

'ভালোবাসার মন্ত্র' কবিতায়ও প্রতিফলিত হয়েছে কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের আশাবাদ। কবি সমস্ত রাত অন্ধকারে ছুটোছুটি করে বড়ো ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন; কেননা বুঝতে পারছেন না কে তাঁর শত্রু আর কেই-বা তাঁর মিত্র। এখানে সময়ও শিকারী বেড়ালের মতো ওৎ পেতে আছে পাখির পালকের মতো নরম স্বপ্নগুলোকে ছিন্নভিন্ন করে দেবার আশায়। কিন্তু কবিও এখন আর বোকা নন; সর্বস্ব খুইয়ে বোকার মতো তিনি বসে থাকতে চান না। তিনি ভালবাসার মন্ত্র চান। কেননা তিনি বিশ্বাস করেন —

ভালোবাসার মন্ত্র পেলে আমি অনেক কিছু করতে পারি। (ভালোবাসার মন্ত্র)

'কখন সময় হবে' কবিতাটিও কবি কিরণশঙ্করের সরল অথচ দৃঢ় বিশ্বাসী কবিতা। এ কবিতায় কবি উচ্চারণ করেছেন সেই প্রত্যয়ী সংকল্প যেখানে জীবনকে এক সরল-সুন্দর, মানবিক আশ্রয় বলে বিশ্বাস করা হয়েছে।

ইচ্ছে হলেই সব হয় না অপেক্ষা করতে হয়।
অঙ্কুর থেকে আস্তে আস্তে ফুল
সময় লাগে;
বীজ থেকে আস্তে আস্তে ধান
সময় লাগে;
বাষ্প থেকে আস্তে আস্তে বৃষ্টি
সময় লাগে;
অনুভব থেকে আস্তে আস্তে প্রেম
সময় লাগে। (কখন সময় হবে)

Dhaka University Institutional Repository

এই বিশ্বাসের আলোয় কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের কবিসত্তা উজ্জ্বল। তিনি কোনো ভণ্ডামিকে কখনো প্রশ্রয় দেন নি। না জীবনে, না তাঁর কবিতায়। এ কবিতায়ও তাঁর সেই দৃঢ়তার পরিচয় অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে।

দুই.

দ্বিতীয় পর্যায়ের কবিতা, যেগুলোর মধ্যে সময়চেতনা বর্তমান সেগুলো হচ্ছে, 'অন্ধকারের মধ্যে', 'কেউ আমাকে দুঃখ দেয়নি', 'হাওয়া লাফিয়ে উঠেছিলো', 'ঝড়ের সময়' ও 'ফিরে এলাম'।

'অন্ধকারের মধ্যে' কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে ১৯৭১-'৭২ পরবর্তী বিরূপ সময়কে জয় করবার প্রশান্ত সংকল্প। জানোয়ারের তাড়া খাওয়া মানুষের মতো অন্ধকারের মধ্যে চলতে চলতে যারা ক্লান্ত-বিধ্বস্ত-হতাশ — কবি তাদেরকে চোখ রাখতে বলেন অনন্ত নীলিমার দিকে, যেখানে নক্ষত্রমালা স্পষ্টতর করে তুলছে নবীন আশার বাণী; তাকাতে বলেন বৃক্ষের দিকে — কেননা,

[...] সারি সারি বৃক্ষ
প্রগাঢ় মমতায়
আমাদের ধৈর্য আর সংকল্পকে
জানিয়ে দিচ্ছে কী ক'রে প্রতীক্ষা করতে হয়। (অন্ধকারের মধ্যে)

কবির বিশ্বাস ধৈর্য ধারণ করে সংকল্পে অটল থেকে প্রতীক্ষা করতে পারলে এই বিরূপ সময়কে অতিক্রম করা সম্ভব।

'কেউ আমাকে দুঃখ দেয়নি' কবিতায় লক্ষ করা যায় সত্তরের দশকের দুঃসময়ের ছাপ। ষাটের দশকের শেষ থেকে সত্তরের প্রথম দিকের রক্তাক্ত উত্তাল সময় পার হয়ে এলেও কবি লক্ষ করেন চারপাশের প্রতিকূলতা এখনো কাটে নি। এখনো শান্তির দরজা রুদ্ধ, সহজ সৌন্দর্যে ফুল ফোটে না, সঙ্গীতের আসরে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে বীণা ঝঙ্কৃত হয় না। মানুষের সহজ-সরল জীবনযাপনে আশা পোষণকারী কবি তাই অন্তরে বেদনাবোধ করেন। কিন্তু সরবে প্রকাশ করতে পারেন না। তাই কবিতার শেষ স্তবকে উচ্চারিত হয় —

কেউ আমাকে দুঃখ দেয়নি।
তবু বুকের মধ্যে থেকে থেকে
মেঘের মতো ছড়িয়ে পড়ছে
একি বিষাদ! (কেউ আমাকে দুঃখ দেয়নি)

'হাওয়া লাফিয়ে উঠেছিলো' কবিতাটিতে অঙ্কিত হয়েছে রুদ্ধ সময়ের চিত্র। কিছুক্ষণ আগেও যে হাওয়া লাফিয়ে উঠেছিল, গাছের ডালপালার সঙ্গে নেচে নেচে খেলা করছিল চারদিক আলোড়িত করে — সে হাওয়ায়ই হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। কেননা সময় বদলে গেছে। চারপাশে ঘিরে এসেছে অন্ধকার। আর তাই,

গাছের শাখাপ্রশাখা স্থির,
যেন একতাল কালি কেউ

Dhaka University Institutional Repository

সমস্ত আকাশে মাখিয়ে দিয়ে
দৈত্যের মতো বুক টান করে মিলিয়ে গেলো। (হাওয়া লাফিয়ে উঠেছিলো)

এখানে 'কেউ'ই হচ্ছে রুদ্ধশ্বাস সময়; যার চেহারা দৈত্যের মতো — আর যার ভয়ে সহজ-সরল মানুষের সাবলীল জীবনযাত্রা ব্যাহত — যন্ত্রণাবিদ্ধ।

'ঝড়ের সময়' কবিতায়ও লক্ষ করি কবি এই প্রতিকূল সময়ের গণ্ডি অতিক্রম করে সুসময়ের পথে যাত্রা করতে চান। যদিও তিনি জানেন এখন ঝড়ের সময়; এবং কেবলই পথে ধুলোবালি উড়ছে। তবুও আশাবাদী কবি বলেন —

ঝড়ে অন্ধ পাখির মতো
দিগন্তের শূন্যতার দিকে মুখ রেখে
এখন যাত্রা! (ঝড়ের সময়)

পথের দুধারে কালো ঢেউয়ের মতো অন্ধকারের ফাঁদ এড়িয়ে কবি আশা করেন একদিন তিনি সত্যিকার অর্থেই সুদিনের সাক্ষাৎ পাবেন। তার জন্যেই তিনি এখন ঝড়ের সময় জেনেও বলতে পারেন —

আমি স্মৃতির ফুলগুলো বুকের মধ্যে
সযত্নে তুলে রাখছি,
যেন কোনোদিন সময় পেলে
করতলে নিতে পারি। (ওই)

'ফিরে এলাম' কবিতায় সময় এবং কবি একত্রে এসে মিলেছেন। কবিতার প্রথমেই লক্ষ করি কবি এই উত্তাল-উত্তপ্ত সময়ের কাছ থেকে অন্য কোথাও সরে গিয়ে শান্তিতে বাঁচতে চেয়েছিলেন। প্রতিজ্ঞা করেছিলেন আর এখানে ফিরে আসবেন না — কোনো শর্তেই আপোষ করবেন না। কিন্তু কিছুকাল পরেই কবি বুঝতে পারলেন এই সময়টাও তাঁরই মতো রক্তাক্ত — সন্ত্রস্ত। তাই তাঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হল — তিনি ফিরে এলেন, সন্ধি করলেন বিধ্বস্ত সময়ের সঙ্গে। কেননা এখন যন্ত্রণার জগতে কবি এবং সময় আর আলাদা নন। কবির ভাষায় :

কেননা এখন
আমাদের দু'জনের শরীরেই
সেই একই ঘাতকের রক্তনখর। (ফিরে এলাম)

তিন.

স্মৃতিকাতর পর্যায়ে যে কবিতাগুলো আলোচিত হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে, 'বাড়ি', 'যখন ঘুম পায়' ও 'জলের ধারে এক মুহূর্ত'।

'বৃষ্টি এলে'র দ্বিতীয় কবিতা 'বাড়ি'তে প্রকাশ পেয়েছে স্মৃতিকাতর কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের আশাভঙ্গের বেদনাময় চিত্র। অনেককাল পরে কবি ফিরে এসেছেন তাঁর শৈশব-কৈশোর-যৌবনের স্মৃতিঘেরা পুরনো বাড়িতে। প্রথম জীবনের অনেক সুখ-দুঃখের স্মৃতি তিনি এখানে ফেলে গিয়েছিলেন। সেই সব স্মৃতি কবির মনে আজো

Dhaka University Institutional Repository

উজ্জ্বল। কিন্তু স্মৃতি আর বাস্তবে কখনো মেলে না। তাই এতকাল পরে ফিরে এসে কবিও কিছু মেলাতে পারেন না। কবির ভাষায় :

পুরনো বাড়িতে ফিরে এসে
সব ক'টি অপরিচিত মুখ
আমার সামনে:
যেন রক্ত মাংসের মানুষ নয়
আমি তাদের দিকে তাকিয়ে আছি। (বাড়ি)

বিস্মিত, ব্যথিত কবি ভগ্ন চিত্তে অবশেষে তাই উপলব্ধি করেন 'ভয়াবহ নিস্তব্ধতা'।

'যখন ঘুম পায়' এবং 'জলের ধারে এক মুহূর্ত' কবিতা দুটিতে কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের স্মৃতিকাতরতা প্রকট। কবির যখন ঘুম পায় তখনো যেমন তিনি তলিয়ে যান তাঁর অতীতের নানান রঙিন স্মৃতির জগতে; তেমনি জলের ধারে —

এক ঝাঁক পাখির কাকলিতে
জলের মধ্যে মাছের আনাগোনায়
হঠাৎ যেন বহুকালের হারানো দৃশ্য
ফিরে আসে। (জলের ধারে এক মুহূর্ত)

এই স্মৃতিতে অবগাহন করে তিনি বাস্তবতাকে ভুলে থাকতে চান না বা সেখান থেকে আত্মপলায়নের পথ খোঁজেন না। এটা তাঁর বেঁচে থাকার অনাবিল বায়ুর মতোই স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করে।

চার.

পরবর্তী ধারাটি হচ্ছে মৃত্যুভাবনামূলক কবিতার ধারা। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'স্বপ্ন-কামনা'য় মৃত্যুভাবনাজাত কবিতা থাকলেও সেগুলো ছিল কবির প্রথম যৌবনের আরোপিত কবিতা। এছাড়া 'স্বর ও অন্যান্য কবিতা', 'দিনযাপন' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে মৃত্যুর প্রসঙ্গ কোথাও কখনো এলেও তা উল্লেখযোগ্য নয়। 'বৃষ্টি এলে'তে প্রবীণ কবির মনে সত্যিকার অর্থেই মৃত্যুভাবনা আলোড়ন তুলেছে। কেননা এ সময় কবির বয়স ৫৩। বার্ধক্যের স্বভাবধর্ম অনুসারেই কবির মনে মৃত্যুভাবনা এসে দোলা দিয়েছে। তবে খাঁটি কমিউনিস্ট ছিলেন বলেই হয়তো পুরোপুরি মৃত্যুচেতনা দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে যান নি তিনি। কখনো কখনো তাই মৃত্যুভাবনা দ্বারা তাড়িত কবিতায় লক্ষ করা যায় মৃত্যু-অতিক্রমী জীবনাগ্রহের ছাপ। এ পর্যায়ের কবিতাগুলো হচ্ছে, 'সময় নেই', 'একা', 'পরমায়ু', 'কথা ছিল না', 'এখন দরজাগুলো বন্ধ', 'আততায়ী' ও 'রাত্রি থেকে আরও রাত্রি'।

'সময় নেই' কবিতায় পলায়নপর কিংবা ছুটে চলা মুহূর্তের মধ্যে কবি খুঁজে পান মৃত্যুর ইঙ্গিত। তিনি লক্ষ করেন এই দ্রুত ধাবমান সময়ের আড়ালে তাঁর বুকের সবচেয়ে নিভৃত দরজায় কে যেন দুহাতে ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছে নিরন্তর — এবং বলছে —

ওঠো খোলো চেয়ে দ্যাখো একবার
বড়ো দ্রুত সরে যাচ্ছে দৃশ্যগুলো,
তোমাকে শেষবারের মতো সবগুছিয়ে নিতে হবে। (সময় নেই)

Dhaka University Institutional Repository

কবির মনে হয় এই অনুচ্চারিত কণ্ঠস্বর কোনো মৃত্যুদূতের — যে কিনা কবিকে শেষবারের মতো সব গুছিয়ে নেওয়ার জন্যে তাগাদা দিচ্ছে।

'একা' কবিতায় দেখা যায় কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত মৃত্যুভাবনা দ্বারা তাড়িত হয়ে বিচলিত হয়ে পড়েছেন। কবি নদীর জলের ঢেউয়ের ছলছল শব্দে, চলমান পাখির ডানার স্পন্দনে অনুভব করেন গভীর শূন্যতা। নিঃসঙ্গ আর বিষণ্ণ কবির কেবলি মনে হয় —

কারা যেন আমাকে একলা ফেলে
চলে যাচ্ছে ... (একা)

এই একলা হয়ে পড়ার চিন্তা থেকেই কবি মৃত্যুভাবনায় ভীত হয়ে পড়েন।

'পরমায়ু' কবিতায়ও দেখা যায় কবিকে মৃত্যুভাবনায় ভাবিত হতে। কবির বয়স হয়েছে; তিনি উপলব্ধি করতে পারছেন তাঁর পরমায়ু থেকে এক একটি দিন ক্রমশ খসে পড়ছে। আর তিনি আলো থেকে অন্ধকারের ভেতরে তলিয়ে যাচ্ছেন। এই বাস্তব সত্যিটা বোঝার পর থেকেই তিনি সুস্থির হতে পারছেন না। কেননা তিনি তাঁর বুকের মধ্যে অনুভব করছেন মৃত্যুর মতো একটা ভয়ঙ্কর শূন্যতা। আর তাই তিনি বলেন,

আমি স্থির হয়ে বসতে পারছি না
এখন স্থির হওয়ার বয়স
আমি পারছি না। (পরমায়ু)

'কথা ছিল না' কবিতাটিতে একদিকে যেমন কবির মৃত্যুভাবনা প্রকটিত অন্যদিকে তেমনি মৃত্যুকে অস্বীকার করার আগ্রহও সমানভাবে কাব্যরূপ পেয়েছে। কবিতার শুরু থেকেই কবি সত্তরের দশকের বিরুদ্ধ সময়ের চিত্র অঙ্কন করে দেখিয়েছেন, এখন —

এক পা বাড়ালেই ধুলো আরেক পা বাড়ালে রক্ত,
পায়ের নীচে ধুলো আর রক্ত একাকার। (কথা ছিল না)

'ধুলো', 'রক্ত' ইত্যাদি শব্দের ব্যবহারে মৃত্যু-প্রসঙ্গের যে অবতারণা তিনি করেছেন তার পরিণতি লক্ষ করি এভাবে —

তুমি বলে যাচ্ছ আমি শুনছি
বুকের মধ্য থেকে শেষ নিশ্বাস
যে-কোনো সময়
ফুস ক'রে বেরিয়ে যেতে পারে;
হিমঘরের মতো ঠাণ্ডা
তখন এই শরীরটা কাঁধে তুলতে
চারটে জোয়ান লোকের দরকার! (ওই)

জীবনের এই নিশ্চিত পরিণতি আশাবাদী কবি কিরণশঙ্কর সহজে মেনে তিনি নিতে পারেন না। তাই তিনি বলেন —

যখন জন্মেছিলাম, কেবলই বিধ্বস্ত হতে হবে
এরকম তো কথা ছিল না। (ওই)

এই একই সুর এ কবিতার শেষ পঙ্‌ক্তিতেও ব্যবহার করে তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে মৃত্যুকে অস্বীকার করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

'এখন দরজাগুলো বন্ধ' কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে কবির সময়চেতনার ছাপ। 'বন্দুক', 'বুটজুতো', 'অন্ধকার' আর 'চিড়খাওয়া মানুষের বজ্রাহত মূর্তি' মনে করিয়ে দেয় ষাট-সত্তরের দশকের রক্তাক্ত সময়ের কথা। সে সময় এখনো প্রভাব বিস্তার করে আছে। বন্ধ দরজা খোলার সময় এখনো হয় নি। আর তাই একটি ভীষণ অকথিত যন্ত্রণায় কবি মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে পড়েন। তাঁর কেবলি —

বুকের ভেতর অন্ধকারে
হাতুড়ির শব্দ, সংক্রামক বিভীষিকার জগতে
কলাগাছগুলোকেও
গুপ্তঘাতকের মতো সাংঘাতিক মনে হয়। (এখন দরজাগুলো বন্ধ)

মনে হয় —

যেন কেউ এখনই
বুটজুতো দিয়ে বুক থেঁতলে দিতে পারে। (ওই)

জীবনের প্রতি গভীর অনুরক্ত কবি এই শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি থেকে মুক্তি চান। মৃত্যুকে অস্বীকার করে বেঁচে থাকতে চান সহজ স্বাভাবিক পরিবেশে। কিন্তু তা কবে সম্ভব হবে তিনি জানেন না। সেজন্যেই একবিতার শেষে নিজের কাছে নিজেই যেন প্রশ্ন করেন —

অন্ধকার তাড়িয়ে
আমি আবার কবে মাঠের রৌদ্রে হেঁটে যাবো? (ওই)

'আততায়ী' কবিতাটিও কবির মৃত্যুভাবনা দ্বারা তাড়িত রচনা। কবিতার শুরুতেই কবি লিখেছেন —

অন্ধকারে যে লোকটা আমার পেছনে আসছে
সে কি আমার আততায়ী?
এই মুহূর্তে আমি সন্দেহ আর অবিশ্বাসের দোলায় দুলছি,
আমার চারধারে অন্ধকার
আরো ঘন হয়ে আসছে। (আততায়ী)

আমরা আগেও লক্ষ করেছি এ কাব্যগ্রন্থে 'অন্ধকার' শব্দটি দিয়ে প্রতিকূল সময় এবং কবির মৃত্যুভাবনাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এখানেও সে ধারাবাহিকতা বর্তমান। আগে পথ চলতে কবি কাউকে সঙ্গী হিসেবে পেলে খুব খুশি হতেন; কেননা অন্তরঙ্গ আলাপে নিঃসঙ্গতা দূর হত। কিন্তু এখন এই বিরূপ সময়ে কবি কাউকে বিশ্বাস করতে পারেন না। মৃত্যুভয়ে আতঙ্কিত কবির,

এখন বুকের মধ্যে সন্দেহ আর অবিশ্বাস
শ্বাপদের মতো লড়াই ক'রে চলেছে; (ওই)

আর এই যন্ত্রণায় কাতর কবি কিছুতেই সুস্থির হতে পারছেন না।

'রাত্রি থেকে আরও রাত্রি' কবিতায় দেখি —

রাত্রি থেকে আরো রাত্রি গাঢ়তর হলে
কে যেন হাটের পথে আরো নিঃসঙ্গতা
ঢেলে দেয় অন্ধকার ছেনে;
কে যেন আকাশ থেকে নক্ষত্রকে কেড়ে নিয়ে যায়। (রাত্রি থেকে আরও রাত্রি)

Dhaka University Institutional Repository

'অন্ধকার' অর্থাৎ মৃত্যু, 'কে' অর্থাৎ 'মৃত্যুদূত' কবির বেঁচে থাকার ক্ষীণ আশার আলোটুকু কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে, অসহায় কবি ভয়ে কিছুই করতে পারছেন না। হতবিহ্বল কবি শুধু দেখেন সুকেশ নারীর মতো এই পৃথিবী সেই অন্ধকারকে ভালবেসে সুসজ্জিতা হয়।

পাঁচ.

বিবিধ বিষয়ক কবিতা পর্যায়ের কবিতা ধারার মধ্যে পড়ে বিচিত্র ভাবের কবিতা। এর একটিতে কবির রোমান্টিক মনের ভাব প্রকাশ পেয়েছে, অন্যগুলোর বিষয়বস্তু ভিন্ন। কবিতাগুলো হচ্ছে, 'বৃষ্টি এলে', 'স্মৃতিতরঙ্গ' ও 'তাঁর মুখে আলো নেই'।

'বৃষ্টি এলে' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা 'ভাষা বুঝলে' একটি রোমান্টিক কবিতা। এ কাব্যগ্রন্থের এই একটিমাত্র কবিতায়ই কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের পঞ্চাশ উত্তীর্ণ কবি মনের রোমান্টিকতা এক ঝলক নজরে পড়ে এবং এ কবিতার অসাধারণ কাব্যভাষা আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে।

ভাষা বুঝলে কাছাকাছি আসা যায়
তখন
জল পড়ার শব্দে
জানলার হাওয়ায় কম্পনে
অনুভবের প্রজাপতিগুলো
বুকের মধ্যে ফিরে আসে।

তখন গাছের ছায়ায়
বটফলগুলোর দিকে তাকিয়ে
নির্জনতায়
একসঙ্গে বসতে পারা যায়। (ভাষা বুঝলে)

দুই দাঁড়িতে সীমাবদ্ধ দুটি বাক্য — না কমা, না সেমিকোলন, ড্যাস, হাইফেন কিংবা কোনো বিরাম চিহ্ন! এই নিরাভরণ কাব্যভাষাই কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তকে দান করেছে গদ্যকবিতার স্বাতন্ত্র্য।

'স্মৃতিতরঙ্গ' কবিতাটিতে ফুটে উঠেছে কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের বয়সীমনের বিভ্রমতার চিত্র। নানা কারণে নিঃসঙ্গ কবির মনে তৈরি হয় স্মৃতিবিভ্রম। ফলে তিনি ঘুমের মধ্যেও শুনতে পান বাইরের অন্ধকারে তাঁর নাম ধরে কে যেন বারবার ডাকছে 'কিরণশঙ্কর! কিরণশঙ্কর' বলে। সেই ডাকের আকর্ষণ এতটাই তীব্র যে তিনি স্থির থাকতে পারেন না; ছুটে বের হয়ে আসেন বাইরে — কিন্তু কোথাও কাউকে দেখতে পান না তিনি। তখন তাঁর বিভ্রান্তি ভাঙে — আর কেবলি মনে হয়,

সঙ্কীর্ণ গলির মোড়ে ল্যাম্পপোস্টের আলো
একচক্ষু জগদ্দল মোষের মতো
তাকিয়ে আছে। (স্মৃতিতরঙ্গ)

কমরেড লেনিনকে নিয়ে লেখা 'তাঁর মুখে আলো নেই' কবিতাটিতে কবির সংগ্রামী বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়েছে অত্যন্ত সরলভাবে। কবি লক্ষ করেন কলকাতার চৌরঙ্গিতে

Dhaka University Institutional Repository

যেখানে কমরেড লেনিনের স্ট্যাচু তার আশেপাশে সমস্ত বিপণীবিতান, রেঁস্তোরা, সিনেমা হলে বিদ্যুতের ঝলমলে আলো। নিয়নের সেই ঝলমলে আলোতে উপচে পড়ছে জনস্রোত। অথচ একদিন পৃথিবীর সমস্ত সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্যে যিনি আলো নিয়ে এসেছিলেন সংগ্রাম করে তিনি অন্ধকারে নিঃসঙ্গ — একা। ক্ষোভে, দুঃখে তাই কবি এই ঝলমলে আলোকমালায় সজ্জিত কলকাতানগরীকে তুলনা করেছেন 'নটী'র সঙ্গে। বিক্ষুব্ধ কবি বলেন —

চৌরঙ্গির সেই লেনিন স্ট্যাচুর পাশে এসে দাঁড়ালাম।
এদিকটা বড়ো অন্ধকার,
[...]
অথচ আশে-পাশে অল্প দূরে
চতুর্দিকে আলো;
[...] [...]
ঝলমল করছে নটীর মতো
রাতের চৌরঙ্গি;
শুধু যিনি অন্ধকার তাড়িয়ে
আলো জ্বেলেছিলেন এক মাঘের শীতে,
তাঁর মুখে আলো নেই! (তাঁর মুখে আলো নেই)

এ কবিতার এই শেষ স্তবক উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায় কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত চল্লিশের দশকে লেখা সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'প্রিয়তমাসু' কবিতার চিরস্মরণীয় সেই পঙ্ক্তিমালা দ্বারা অনেকটা প্রভাবিত হয়েছেন — যেখানে এমনই এক অব্যক্ত বেদনা আর হতাশা ধ্বনিত হয়েছিল।

আমি যেন সেই বাতিওয়ালা,
যে সন্ধ্যায় রাজপথে-পথে বাতি জ্বালিয়ে ফেরে
অথচ নিজের ঘরে নেই যার বাতি জ্বালার সামর্থ্য,
নিজের ঘরেই জমে থাকে দুঃসহ অন্ধকার।[৫৪]

পূর্ববর্তী 'এই এক সময়' কাব্যগ্রন্থের মতো 'বৃষ্টি এলে'তেও কবি কিরণশঙ্করের কাব্যভাষা, কবিতার আঙ্গিক ও অলংকারের পরিবর্তন লক্ষণীয়। 'বৃষ্টি এলে' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো যেমন ছোট, তেমনি তার বক্তব্য বিষয় স্পষ্ট ও ঋজু। এ গ্রন্থের প্রথম কবিতা 'ভাষা বুঝলে'তেই কবির কাব্যভাষার চমৎকারিত্ব লক্ষযোগ্য :

জল পড়ার শব্দে
জানলার হাওয়ার কম্পনে
অনুভবের প্রজাপতিগুলো
বুকের মধ্যে ফিরে আসে।

'বৃষ্টি এলে'র সবগুলো কবিতাই গদ্য। শুধু 'পলিমাটি' কবিতাটিতে অন্ত্যমিল রয়েছে এবং এর শেষ স্তবকে স্বরবৃত্ত ছন্দের চাল বর্তমান :

হারিয়ে যাবে লোভের সোনা
গোপন পুঁজির স্তম্ভ;
পালিয়ে যেতে তলিয়ে যাবে

Dhaka University Institutional Repository

অট্টালিকার দম্ভ।
বৃষ্টি এলেই নতুন পলিমাটি।

কিন্তু এ কবিতার প্রথম স্তবকে কবি ছন্দপতন এড়াতে পারেন নি। গদ্যঢঙের ভাষাবিন্যাস ও উপমা-অলংকারের গুণে এ কাব্যগ্রন্থটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। অন্যান্য অলংকারও কিছু কিছু আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ :

শব্দালংকার

সরল অনুপ্রাস :
১. বুক ক্ষয়ে যায় একটু কোমলতার জন্যে, (কোমলতার জন্যে)
২. বুটজুতো দিয়ে বুক থেঁতলে দিতে পারে। (এখন দরজাগুলো বন্ধ)
৩. পাখির পালকের মতো নরম স্বপ্নগুলির পিছনে (ভালোবাসার মন্ত্র)
৪. বাষ্প থেকে আস্তে আস্তে বৃষ্টি (কখন সময় হবে)

অর্থালংকার

উপমা :

'বৃষ্টি এলে'র প্রায় প্রত্যেকটি কবিতার মধ্যেই একটি দুটি উপমা আবিষ্কার করা যায়। উদাহরণ —

১. এই তো এই মুহূর্তগুলো
আমার আদরের পোষা বেড়ালটার মতো নিঃশব্দে
বারান্দার ওধার দিয়ে চলে যাচ্ছে, (সময় নেই)

২. জানোয়ারের তাড়া খাওয়া মানুষের মতো
চলতে চলতে অন্ধকারের মধ্যে
ওরা পরস্পরের কাঁধে / হাত রাখলো; (অন্ধকারের মধ্যে)

৩. সঙ্কীর্ণ-গলির মোড়ে ল্যাম্পপোষ্টের আলো
একচক্ষু জগদ্দল মোষের মতো / তাকিয়ে আছে। (স্মৃতিতরঙ্গ)

৪. ঝড়ে অন্ধ পাখির মতো / দিগন্তের শূন্যতার দিকে মুখ রেখে
এখন যাত্রা! (ঝড়ের সময়)

৫. ঝলমল করছে নটীর মতো / রাতের চৌরঙ্গি: (তাঁর মুখে আলো নেই)

৬. সংক্রামক বিভীষিকার জগতে / কলাগাছগুলোকেও
গুপ্তঘাতকের মতো সাংঘাতিক মনে হয়। (এখন দরজাগুলো বন্ধ)

৭. সারাদিন পাতাঝরার শব্দ, / দীর্ঘশ্বাসের মতো হাওয়া। (ক্লান্তি)

৮. শিকারী বেড়ালের চোখের মতো জ্বলজ্বল করছে
এক একটি নিমেষ,
পাখির পালকের মতো নরম স্বপ্নগুলির পিছনে
এখনই ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে (ভালোবাসার মন্ত্র)

উৎপ্রেক্ষা :
১. কে যেন বুকের সবচেয়ে নিভৃত দরজায়
দু'হাতে ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছে নিরন্তর... (সময় নেই)

২. তবু বুকের মধ্যে থেকে-থেকে
মেঘের মতো ছড়িয়ে পড়ছে / এ কি বিপদ! (কেউ আমাকে দুঃখ দেয়নি)

Dhaka University Institutional Repository

৭. রুক্ষদিনের কবিতা

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'রুক্ষদিনের কবিতা' প্রথম প্রকাশিত হয় কলকাতার *সাহিত্যচিন্তা* থেকে ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে। পূর্ববর্তী 'এই এক সময়' ও 'বৃষ্টি এলে'তে যেমন লক্ষ করা গেছে অলঙ্কার বাহুল্যের পরিবর্তে কবির গদ্যকবিতার স্বাতন্ত্র্য, সেই স্বাতন্ত্র্যকে কবি আরো প্রসারিত করেছেন 'রুক্ষদিনের কবিতা'য়। এই কাব্যগ্রন্থটি কবি কিরণশঙ্করের শিল্পমনস্ক গভীরতাসন্ধানী মানবিক উচ্চারণে নিবিষ্ট। এ কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো পাঠে বোঝা যায়, আশাবাদী কবি তাঁর সমাজ ও সময়ের দায়বদ্ধতা যেমন মিটিয়েছেন, তেমনি সরে আসেন নি কখনো মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে। আলোচনার সুবিধার্থে এ গ্রন্থের কবিতাগুলোকে নিম্নোক্ত কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়।

১. রাজনৈতিক কবিতা
২. মৃত্যুভাবনাজাত কবিতা
৩. আশাবাদী কবিতা

এক.

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত বরাবরই স্বকাল ও সমাজসচেতন কবি। তিনি ছিলেন কমিউনিস্ট; তাঁর আদর্শের প্রতি, মানবতার প্রতি তিনি ছিলেন গভীরভাবে অনুগত। সত্তরের দশকে এসে তিনি যখন দেখেন কতিপয় ভণ্ড রাজনীতিক দলের আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে সহজ-সরল সাধারণ জনতাকে ধোঁকা দিচ্ছে—নিজের সার্থসিদ্ধির সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করছে—তখন তিনি ভীষণ মর্মাহত ও ক্ষুব্ধ হন। কেননা কোনো রকম ভণ্ডামি তিনি সহ্য করতে পারতেন না। আর তাই কবিতায় এই ভণ্ড রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে নিক্ষিপ্ত হল তাঁর ব্যঙ্গ ও বক্রোক্তি। এ ধারার কবিতাগুলোর মধ্যে 'রুক্ষদিনের কবিতা' গ্রন্থের 'উনি বলেছিলেন' ও 'হত্যাকারী কেউ নেই' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

'উনি বলেছিলেন' কবিতাটির রচনাকাল ১৯৭৩, যখন সারা ভারতের কৃষক-সমাজ ফসলের বীজের জন্যে, সারের জন্যে, কৃষিজাত পণ্যের জন্যে আন্দোলনে রত। এর আগে ১৯৭২-এ শেষ হয়েছে সাধরণ নির্বাচন। নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক নেতারা ভোট পাওয়ার জন্যে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন নির্বাচনে জিতে তাঁরা সেগুলো বেমালুম ভুলে গেছেন। ভুলে গেছেন গ্রামের সরল, সাদাসিধে মানুষগুলোর দুরবস্থার কথা। জনগণের অর্থে ক্রমে তারা ফুলেফেঁপে উঠেছেন; আর মত্ত হয়েছেন নিজের বিকৃত রুচির চরিতার্থে। কবি কিরণশঙ্কর তাই চুপ থাকতে পারেন নি। এই সব ভণ্ড নেতাদের ভোটের রাজনীতির এই নোংরা খেলাকে তিনি ব্যঙ্গ করে লিখেছেন—

> উনি বলেছিলেন সব করে দেব, সব পাবেন।
> ফসলের জন্যে বীজ,
> বীজের জন্যে সার—
> জলের জন্যে কল।

Dhaka University Institutional Repository

[...]
শুনতে পাই উনি কলকাতায় থাকেন সরকারী হোস্টেলে,
শুনেছি উনি বাড়ী করেছেন বনেদী পাড়ায়।
মাঝে মাঝেই সন্ধ্যা হলেই চলে যান নাকি বেপাড়ায়
আছেন দিব্যি মজা করেই শহরে।

উনি বলেছিলেন সব করে দেব, সব পাবেন।
[...]
শহর থেকে ফিরলেই উনি এসব দেবেন। (উনি বলেছিলেন)

'শহর থেকে ফিরলেই উনি এসব দেবেন'—এই বাক্যটিতে কবির গভীর ক্ষেদোক্তি প্রকাশ পেয়েছে। কেননা আবার নির্বাচনের আগে এসব নেতারাই ফিরবেন গ্রামে—বঞ্চিত, প্রতারিত এইসব সহজ সরল মানুষকে আবার শোনাবেন গালভরা আশ্বাসের বাণী, মূর্খ-জনতা আবার ভুলবে—এবং এভাবেই চলতে থাকবে বঞ্চিত এবং বঞ্চনাকারীর শাশ্বত খেলা।

'হত্যাকারী কেউ নেই' কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে মুখোশধারী নেতাদের ধূর্ত চরিত্রের ছবি। দূরদর্শী কবি এ কবিতায় তাঁর সময়ের সত্যের মধ্যদিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন এক দীর্ঘমেয়াদি বাস্তবের কথা। কবি স্বপ্নের মধ্যে দেখতে পান,

নদীর জল গাঢ় লাল, স্রোতের টানে
হাজার হাজার কিশোরের লাশ জলে ভেসে যাচ্ছে।
(হত্যাকারী কেউ নেই)

অথচ হত্যাকারী কেউ নেই। সবাই সাধু বনে গেছে। কবি দেখেন—

হাজার হাজার গেরুয়া সাধুর মিছিল
পার্বত্য পথের বাঁকে
কুম্ভমেলার দিকে যাত্রা করেছে। (ওই)

এবং

নদীর জলে হাত ধুয়ে গেরুয়া পরে
এখন সবাই মহতী সভায় প্রবক্তা। (ওই)

কিন্তু কবি চিনতে পারেন ঘাতককে। আর তাই বর্তমান ও ভবিষ্যতের সবাইকে সতর্ক করে দেন।

'শয়তানকে বড়ো পিঁড়ি' কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে কবির ক্ষোভ-মিশ্রিত দীর্ঘশ্বাস। 'ঈশ্বর' ও 'শয়তানের' দ্বন্দ্বে শয়তান যে কখনো ক্ষণিকের জন্য জয়ী হয়, যে কথা পাশ্চাত্য থেকে ভারতীয় সব মিথেই নানাভাবে ব্যক্ত। শয়তানের এই আপাত জয়ের কথা কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের কবিতায় উঠে আসে। কিন্তু এটাই শেষ বা অন্তিম কথা নয়। শয়তানের আপাত জয় বা বাধ্য হয়ে মানুষের তার কাছে নতিস্বীকার জগৎ-সত্য বলে স্বীকৃত হয় নি। কবি এখানে 'যেন' শব্দ ব্যবহার করে (যেন বহুকাল ধরে এরকমভাবেই চলবে) তাঁর সংক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাস এবং শয়তানের প্রতি ঘৃণা নীরবে প্রকাশ করেছেন :

শয়তানকে মাঝে মধ্যে বড়ো পিঁড়ি দিতে হয়—
মুখে তখন খুসীর ঝলক,

Dhaka University Institutional Repository

যেন বহুকাল ধরে এরকম ভাবেই চলবে;
তাকে খোস মেজাজে রাখতে
স্নানের ঘর থেকে রান্নাঘর অবধি সর্বত্র ব্যস্ততা।
(শয়তানকে বড়ো পিঁড়ি)

এই শয়তান আসলে সমাজের অপশাসক বা শোষক-কুচক্রীরা। গণমানুষকে শোষণ করে যারা প্রতিনিয়ত নিজেরা স্ফীতমেদ জলহস্তীতে পরিণত হয় তাদের লক্ষ করেই কবি এ ধরনের সংক্ষুব্ধতা প্রকাশ করেছেন। তবে এখানে প্রতিবাদ নেই, বিক্ষোভ প্রকাশের ভাষাও স্রোতহারা। সাধারণ মানুষের 'মানতে বাধ্য হওয়া' অবস্থাই এ কবিতায় উঠে আসে এভাবে :

যেন কিছুই হয়নি এরকম ভাবেই
ফুলদানিতে ফুল, জানালায় রঙীন পর্দা,
বিছানায় ধবধবে চাদর ... (ওই)

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত তাঁর পরবর্তী কবিতাগুলোতে এই ক্ষোভ ও ম্রিয়মাণতাকে বিক্ষোভ ও বিদ্রোহে রূপ দিয়েছেন। মানুষের মধ্যে শক্তি ও সাহসকে ঘণীভূত করে তুলে এনেছেন কবিতায়। সেখানে এই 'শয়তান' আর জয়ী নয়, সে পরাজিত চিরতরে।

দুই.

পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থের মতো 'রুক্ষদিনের কবিতা' কাব্যগ্রন্থেও বেশ কিছু মৃত্যুভাবনাজাত কবিতা আছে। এ সমস্ত কবিতার মধ্যে 'আত্মগত', 'অন্ধকারের ভিতর' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

'আত্মগত' কবিতাটির রচনাকাল ১৯৭৩ এবং এ কবিতায় সত্তরের দশকের শ্বাসরুদ্ধকর সময়ের ভীতিকর অবস্থার প্রেক্ষাপটে কবির মৃত্যুভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। কবি মাঝে মাঝেই অনুভব করেন তাঁর বুকের মধ্যে কিসের তোলপাড়, কপালে ঘাম আর নিঃশ্বাস পতনের শব্দ। অন্ধকারের ভেতর থেকে একটা অদ্ভুত হা হা ধ্বনি ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো কবিকে মাঝে মাঝেই গ্রাস করতে ছুটে আসে। তখন তিনি মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে পড়েন। আর শোনেন মৃত্যুদূতের রথচক্রের ঘর্ঘর আওয়াজ। কবির ভাষায় :

মাঝে মাঝে রাতের গভীর অন্ধকারের ভেতর থেকে
অদ্ভুত হা হা শব্দ —
যখন ঘুম আসছে না, শোনা যায় সেই হা হা ধ্বনি
লাফিয়ে লাফিয়ে কাছে আসছে,
ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো
আছড়ে পড়ছে পুরনো বাড়ির বন্ধ দরজায়।
[...] [...]
আমি যেন মধ্যরাতে হাজার বছর আগেকার
ক্রীতদাসবাহিত রথচক্র ঘর্ঘরের
শব্দ শুনছি। (আত্মগত)

Dhaka University Institutional Repository

'অন্ধকারের ভিতর' কবিতায় দেখি প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার মাঝখানেও কবির মৃত্যুভাবনা কার্যকর। বাইরের দিকে তাকিয়ে যখন কবির চোখে পড়ে —

ছেলেরা খেলছে পার্কে,
মেয়েরা হাসছে, পরনে লাল নীল জামা;
মাঠের এক-এক কোণে বসে আছে দু'টি-তিনটি
দম্পতি,
হাতের লাঠিতে ভর ক'রে খোলা হাওয়ায়
বৈকালিক ভ্রমণে বেরিয়েছে
একসঙ্গে দু'তিনজন বৃদ্ধ। (অন্ধকারের ভিতর)

তখনো তিনি ভুলতে পারেন না মৃত্যুকে। কেননা তিনি জানেন এসবই ক্ষণস্থায়ী — যেকোনো সময়েই মৃত্যুর গভীর অন্ধকারে হারিয়ে যাবে। কবিভাষার হুবহু উল্লেখে বিষয়টি স্পষ্টতর হয় :

সমস্ত দৃশ্যটাই একটি ছবির মতো
সময়ের দেয়ালে ঝুলতে থাকে
কিছুক্ষণের জন্যে;
তারপর একসময় মিলিয়ে যায়
অসীম শূন্যতার অন্ধকারের ভিতর। (ওই)

কেননা অন্ধকারই একমাত্র সত্য — আর সবই মায়া।

তিন.

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের পূর্বোক্ত কাব্যগ্রন্থগুলোতে কবির আশাবাদী মনের যে পরিচয় পাওয়া গেছে আলোচ্য কাব্যগ্রন্থেও তা অনুপস্থিত নয়। এ প্রসঙ্গে 'রাতগভীর হ'লেই' ও 'ভোরের এই মুহূর্তে' কবিতা দুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

'রাত গভীর হ'লেই' কবিতায় দেখতে পাই রাত্রি যত গভীর হয় কবি কিরণশঙ্করের ভাবনায় ততই চেপে বসে একটা হতাশাবোধ। তাঁর কেবলই মনে হয় এখনো সম্পূর্ণ করার মতো অনেক কাজ বাকি রয়ে গেছে। সেগুলো সম্পূর্ণ করে যেতে পারবেন কিনা তা নিয়েও কবি সন্দিহান। এই সব নৈরাশ্যজনক ভাবনা কবিকে আচ্ছন্ন করে শুধু রাত্রির গাঢ় অন্ধকারে। অথচ দিনের তাজা আলোয় দৃঢ় আত্মবিশ্বাসে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন তিনি। কবিতায় আশাবাদী কবি তাঁর এই অনুভব বর্ণনা করে লেখেন :

রাত গভীর হ'লেই
আমার মনে পড়ে
এখনো সম্পূর্ণ করবার মতো বহু কাজ
বাকি র'য়ে গেছে।
[...] [...]
অথচ রাত পোহালেই
দিনের বেলা মাঠে-মাঠে
তাজা যৌবনের অঙ্গীকারের মতো
অবারিত রৌদ্র। (রাত গভীর হ'লেই)

Dhaka University Institutional Repository

'ভোরের এই মুহূর্তে' কবিতাটি কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের একটি সরল আশাবাদী কবিতা। এ কবিতার প্রতিটি ছত্রেই অনুভব করা যায় একটা নতুন সুরের স্পন্দন। এমনকি অন্ধকারের ভেতর দিয়ে প্রথম যে ট্রেনটি অতি-পরিচিত শব্দ তরঙ্গ তুলে বেরিয়ে গেল — তার এই যাত্রাও আলোর পথের সন্ধান বলে দেয়। ভোরের পবিত্র মুহূর্তে মসজিদে আজান, মন্দিরে ঘণ্টাধ্বনি কিংবা গির্জার ঘড়ির প্রহরমন্থিত শব্দ — এ কবিতায় সবই একটা পরিপূর্ণ জীবনের আশ্বাসে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আশাবাদে সমর্পিত কবি তাই গভীরভাবে অনুভব করেন —

এরকম মুহূর্তে
স্নায়ুতে স্নায়ুতে যেন সজীবতা ফিরে আসে,
এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়ায়
ভিজে ঠোঁট আর চিবুক,
আবার নতুন ক'রে শুরু করবার জন্যে
ভোরের এই মুহূর্তটি
সবাইকে যেন জাগিয়ে দিয়ে যায়। (ভোরের এই মুহূর্তে)

এই জেগে থাকাই কবির আকাঙ্ক্ষা; কবির প্রত্যয় রুক্ষদিনে নানা অসম্ভবতা আসা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সব কিছু তুচ্ছ করে শেষাবধি সংসপ্তকের মতো অগ্রবর্তী হওয়ার বাণীই এ কাব্যগ্রন্থের মূলে।

'রুক্ষদিনের কবিতা' কাব্যগ্রন্থে কোনো কবিতার অবয়ব দীর্ঘ নয় এবং এর বক্তব্য-বিষয়ও মানুষ ও সমাজ বিচ্ছিন্ন নয়। সমাজ-অভ্যন্তরের অসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থা, এখনকার ক্ষত-যন্ত্রণা, বিষাদের নিত্য-অন্ধকার কবিকে আলোড়িত করেছে এবং কবি সেই যন্ত্রণার রূপায়ণ ঘটিয়েছেন প্রতীকী ব্যঞ্জনায়। 'আত্মগত', 'শয়তানকে বড়ো পিঁড়ি' ইত্যাদি কবিতায় এই ব্যঞ্জনাই মুখ্য। কবিতায় চিত্রকল্প, উপমা অলংকার সৃষ্টিতেও কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান। দৃষ্টান্তস্বরূপ —

চিত্রকল্প :

বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলেই চোখে পড়ে।
ছেলেরা খেলছে পার্কে,
মেয়েরা হাসছে, পরনে লাল নীল জামা:
মাঠের এক এক কোণে বসে আছে দু'টি-তিনটি
দম্পতি,
হাতের লাঠিতে ভর ক'রে খোলা হাওয়ায়
বৈকালিক ভ্রমণে রেরিয়েছে
একসঙ্গে দু'তিনজন বৃদ্ধ। (অন্ধকারের ভিতর)

উপমা :

১. দিনের বেলা মাঠে-মাঠে
তাজা যৌবনের অঙ্গীকারের মতো
অবারিত রৌদ্র। (রাত গভীর হ'লেই)

২. এক হাজার গাছের ঝরা পাতার মতো
আমার নিশ্বাস। (আত্মগত)

Dhaka University Institutional Repository

৮. মানুষ জানে

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের 'মানুষ জানে' কাব্যগ্রন্থটি কলকাতার *উচ্চারণ* থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় মাঘ ১৩৯১, জানুয়ারি ১৯৮৫-তে। বইটি উৎসর্গ করা হয় 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যশস্বী রূপকার শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র ও শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়'কে। 'মানুষ জানে'র অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলোর শেষে সংযোজিত ইংরেজি সাল দেখে আমরা জানতে পারি কবিতাগুলো ১৯৬৯ থেকে ১৯৮৪-র মধ্যে রচিত। এর মধ্যে ১৯৬৯-এ ১টি, '৭১-এ ১টি, '৭২-এ ৩টি, '৭৩-এ ৫টি, '৭৪-এ ২টি, '৭৫-এ ৭টি, '৭৬-এ ৭টি, '৭৭-এ ৫টি, '৭৮-এ ৮টি, '৭৯-তে ১১টি, '৮০-তে ৮টি, '৮১-তে ২টি, '৮২-তে ৩টি, '৮৩-তে ১টি, ১৯৮৪-তে ১টি এবং তারিখ বিহীন ২টি কবিতা নিয়ে এ কাব্যগ্রন্থের মোট কবিতাসংখ্যা ৬৭টি। ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে রচিত কোনো কবিতা এ গ্রন্থে সংকলিত হয় নি। এক নজরে বোঝার জন্যে নিচে ছকের সাহায্যে কবিতার রচনাকাল, কবিতার শিরোনাম ও সংখ্যা উল্লেখ করা হল :

রচনাকাল	কবিতার শিরোনাম	সংখ্যা
১৯৬৯	'শব্দ হচ্ছে অবিরাম'	১টি
১৯৭১	'বুকের মধ্যে'	১টি
১৯৭২	'এই হাওয়া', 'সমস্তরাত', 'একদিন'	৩টি
১৯৭৩	'চোখ ফেরালেই', 'ভুল মন্ত্রের জন্যে', 'মনে রেখো', 'যতো দিন যায়', 'এরকম জ্যোৎস্নায়'	৫টি
১৯৭৪	'আলো অন্ধকার', 'এই সন্ধ্যা'	২টি
১৯৭৫	'মধ্যরাত্রি, ভোর', 'দম্ভ', 'যন্ত্রণা', 'কথাগুলো', 'এক লাফে আকাশ', 'কণ্ঠস্বর', 'একমাত্র তখনই'	৭টি
১৯৭৬	'কী চাই', 'এই ফাল্গুনের হাওয়া', 'উত্তরসূরীদের জন্যে', 'একবার দেখে নিও', 'চতুর্দিকে ভালোবাসা', 'রাস্তা, মাঠ, নদী', 'সভায়'	৭টি
১৯৭৭	'আর এক আরম্ভের জন্যে', 'মনে পড়ে যায়', 'এরকম সময়', 'তুমি', 'প্রতিরোধ'	৫টি
১৯৭৮	'ইতিহাস', 'এখন তুমি', 'মানুষ জানে', 'রাজেশ্বরী', 'কবিতা : সত্তর দশক', 'লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেই', 'দরজার কাছে', 'স্বপ্ন'	৮টি
১৯৭৯	'প্রতীক্ষা', 'মূর্খদের সম্মেলন', 'যাওয়া যায় না', 'ছায়া', 'বৃষ্টির পর', 'শেষবারের মতো', 'সন্ধিক্ষণ', 'ভোরের এই মুহূর্তটি', 'আগে উৎসকে জানো', 'গভীর ঘুমের জন্য', 'কবিতা চাইলে'	১১টি

Dhaka University Institutional Repository

রচনাকাল	কবিতার শিরোনাম	সংখ্যা
১৯৮০	‘মেয়েটি গর্জে উঠেছে’, ‘একদিন’, ‘সন্ধ্যার হাওয়ায়’, ‘ঘুমের মধ্যে’, ‘স্বপ্নচ্যুত’, ‘ভোরবেলা’, ‘পরস্পরের জন্যে’, ‘দৃশ্যান্তর’	৮টি
১৯৮১	‘পোস্টার’, ‘এরকম ভাবেই’	২টি
১৯৮২	‘ছায়া’, ‘আলোর দূত’, ‘সড়কে এখন রক্ত’	৩টি
১৯৮৩	‘বৃষ্টির শব্দে’,	১টি
১৯৮৪	‘এই মুহূর্তের অস্তিত্ব’,	১টি
তারিখবিহীন	‘যখনই’, ‘ওদের জানতে দাও’	২টি

‘মানুষ জানে’ কাব্যগ্রন্থে সংকলিত কবিতাগুলোর রচনাকাল পুরো সত্তরের দশক এবং আশির দশকের প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত। সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দিক থেকে বাংলা কবিতায় সত্তরের দশকের মতো — যা আশির দশক পর্যন্ত বিস্তৃত; এত ঘটনাবহুল দশক চল্লিশের পরে আর আসে নি। নকশালবাড়ি আন্দোলন, বাংলাদেশের অভ্যুদয়, জরুরি অবস্থার মতো স্মরণীয় ঘটনার পাশাপাশি মানবাত্মার অবমাননাকর টুকরো টুকরো ঘটনাও ঘটেছে এ সময়ে। আবার এরই পাশাপাশি গড়ে উঠেছে প্রতিবাদ প্রতিরোধ। বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আত্মকলহ, অতি-বামপন্থী প্ররোচনায় হত্যা ও জিঘাংসার প্রসার, বাংলাদেশের ঘটনা নিয়ে মোহ এবং মোহভঙ্গ — ইত্যাদি ঘটনার অভিঘাতে বাংলা কবিতায় একদিকে যেমন চল্লিশের সমাজসচেতন কবিতার ধারার প্রসার বিস্তৃত হয়, তেমনি কারো কারো রচনায় সেই সময়ের রাজনৈতিক উত্তাপকেও অনুভব করা যায়। বস্তুত সত্তরের কবিতার মূলস্রোত ছিল চল্লিশের সমাজসচেতন ধারার দায়বদ্ধ কবিতাকে ঘিরে। মিহির চক্রবর্তী তাই তাঁর একটি রচনায় লিখেছেন :

> বাংলা কবিতার ধারাবাহিকতার পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে দেখা যাবে সত্তর দশকের কবিতা, চল্লিশের সমাজসচেতন, পরিবর্তনপ্রয়াসী প্রথম ধারার অন্তর্গত। পঞ্চাশের চূড়ান্ত ব্যক্তিমুখিনতার ঠিক পরেই রাজনৈতিক আলোড়নের সাথে সাথে বাংলা কবিতা দোলকের মতো আবার বিপরীত প্রান্তের দিকে যাত্রা শুরু করেছে। কবিরা নিজেকে সমাজবিচ্ছিন্ন নয় বরং পারিপার্শ্বিকের মধ্যে থেকে বিচার করেছেন, প্রেমকে নিয়ে এসেছেন সমগ্রতায়, পরিবেশের অসহনীয়তার পিছনের রাজনীতি-অর্থনীতি তাঁদের চেতনায় কমবেশি স্পষ্টতা নিয়ে স্থান দখল করেছে। চারদিকের কলুষতা থেকে শুধু সঙ্কুচিত হয়ে থাকা নয়, তাঁরা এর মধ্যেকার রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের রূপটি কিছু কিছু দেখতে পেয়েছেন। এবং এই আমাদের অপরিহার্য জীবনধারণ জেনে একে পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেছেন।[৫৫]

মিহির চক্রবর্তীর এই কথাগুলো কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের ‘মানুষ জানে’ কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো সম্পর্কেই যেন বলা।

আমরা লক্ষ করি কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তও এই সময়ের উত্তাপকে শিল্পের উত্তরীয় দিয়ে আবৃত করে সৃষ্টি করলেন নতুন কবিতা, লিখে রাখলেন এই দশকের কান্না ঘাম আর রক্তের স্বরলিপি আঁকা সময়ের ইতিহাস, নীতিহীন আদর্শহীন সমাজের অরণ্যে জীবনের

Dhaka University Institutional Repository

ভবিষ্যৎ শূন্য ভরসাশূন্য তরুণদের লাঞ্ছনা-বঞ্চনা-নিগ্রহের বিবৃতি। ফলে তাঁর এ সময়ে রচিত প্রতিটি কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে চাপা বিক্ষোভ, অসন্তোষ আর হতাশা। তবে আশাবাদী কবি হতাশায় কখনো আচ্ছন্ন হয়ে যান নি। অসন্তোষ ও হতাশার পাশাপাশি একটা আশ্বাসের আভাসও তাঁর কবিতায় লক্ষযোগ্য। কবির বিক্ষোভের পেছনে কাজ করেছে ভণ্ড রাজনীতিকদের ভণ্ডামি এবং তাঁর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মনোভাব। 'মানুষ জানে' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলোতে এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যই বর্তমান। তবুও আলোচনার সুবিধার্থে এর কবিতাগুলোকে নিম্নোক্ত কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হল :

এক. সময়চেতনাজাত কবিতা
দুই. রাজনৈতিক কবিতা
তিন. প্রতিবাদী কবিতা
চার. নিরাশার মধ্যে আশাবাদজনিত কবিতা
পাঁচ. প্রেমভাবনাজাত কবিতা
ছয়. মৃত্যুভাবনাজনিত কবিতা
সাত. বিবিধ বিষয়ক কবিতা

এক.

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের 'এই এক সময়' ও 'বৃষ্টি এলে'র মতো সময়-সচেতনতার দেখা মেলে 'মানুষ জানে' কাব্যগ্রন্থের বেশ কিছু কবিতায়। এ জীবনের সচলতা, ধাবমান মানুষের ব্যস্ততা, সমস্যাকীর্ণ মানুষের উদ্বেগ — তারই মধ্যে একটু নিভৃত বিশ্রাম প্রভৃতির মধ্যে কবি অনুভব করেন সময়কে। কবি কিরণশঙ্করের কবিতায় কোনো নতুন মুহূর্তে বা দৃশ্যে পাঠকের মনে আসে পরিবর্তনের একটা অনুভূতি। ফলে সময় সম্পর্কে জেগে ওঠে চেতনা। তাঁর কবিতা পড়ে গেলে মনে হয় সময়ের সঙ্গে অসংশ্লিষ্ট এক মন যেন সব দেখে যাচ্ছে, শুনে যাচ্ছে, নির্বিকারভাবে মন্তব্য করে যাচ্ছে। এ ধারার কবিতাগুলো হচ্ছে : 'শব্দ হচ্ছে অবিরাম', 'বুকের মধ্যে', 'ভুল মন্ত্রের জন্যে', 'এরকম জ্যোৎস্নায়', 'এই সন্ধ্যা', 'যন্ত্রণা', 'মেয়েটি গর্জে উঠেছে', 'সন্ধিক্ষণ' ও 'সড়কে এখন রক্ত'।

'মানুষ জানে' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা 'শব্দ হচ্ছে অবিরাম'। ঊনসত্তরের প্রতিকূল সময়ের একটা অনুপম চিত্রকল্প এ কবিতার প্রথম স্তবকে অত্যন্ত নৈর্ব্যক্তিকভাবে আমাদের চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলেন কবি।

বিশাল পৃথিবী স্তব্ধ, সমস্ত সংসার
নিশ্চিত নিদ্রায় মোড়া, চারদিক
থমথমে, অন্ধকার বিবর্ণ গলিতে
জল ঝরে কান্নার ধারায় : (শব্দ হচ্ছে অবিরাম)

অন্ধকার বিবর্ণ গলিতে অবিরল জল ঝরে পড়ার শব্দ কান্নার সুর হয়ে যেন আমাদের কানে বাজে; তাই কবির মতো আমরাও ঘুমোতে পারি না। আমাদেরও মনে হয় এই অন্ধকারে প্রচণ্ড তৃষ্ণায় শীতল জলে সিক্ত হতে কেউ একাকী গোপনে কলে যাবার

Dhaka University Institutional Repository

প্রাণপণ চেষ্টা করছে — কিন্তু কিছুতেই পৌছতে পারছে না; কেননা চারপাশের পরিবেশ রুদ্ধ — সময় বিরুদ্ধ। তখন —

সময়ের উৎস হতে
কেবল আকাঙ্ক্ষা ঝরে, অথচ ঠোঁটের
তৃষ্ণা বুঝি কখনো যাবে না; শুধু
ঝরে যায় আকাঙ্ক্ষা, সময়। (ওই)

একাত্তরের পটভূমিতে লেখা 'বুকের মধ্যে' কবিতায় লক্ষ করি, কবির বুকের মধ্যে সারাক্ষণ দুঃখের উৎস থেকে বেজে উঠছে বিষাদের একতারা। ভেতরে-বাইরে সমস্ত কাজের মধ্যে এমনকি ঘুমের মধ্যেও তিনি শুনতে পাচ্ছেন তার আর্ত সুর। ফলে কবির অনুভূতির শান্ত নীল আকাশ শ্যামল মেঘচ্ছায়ায় আর্দ্র হয়ে উঠেছে। কেননা তিনি দেখতে পাচ্ছেন তাঁর চারপাশের যা কিছু সুস্থির, সুন্দর, অনড় এবং ঐতিহ্যবাহী সবই ভেঙে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। কবির ভাষায় :

পৃথিবীর সমস্ত দৃশ্যের ভেতরে গিয়ে আমি দেখছি
পুরনো সুন্দর ছবিগুলো ভেঙ্গে চৌচির,
সারি সারি স্থিতিশীল বৃক্ষের শিকড়ের চারদিকে
ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে সাংঘাতিক ফাটল। (বুকের মধ্যে)

সে কারণেই তিনি ভবিষ্যতের দুঃসময়ের ভাবনায় চিন্তিত হন — বিষণ্ন হন, বুকের মধ্যে অনুভব করেন গভীর গোপন যন্ত্রণা।

'ভুল মন্ত্রের জন্যে' কবিতায় দেখা যায়, সত্তরের দশকের রক্তাক্ত সময়ের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রত্যাশায় সাধারণ জনতার প্রবল আগ্রহের প্রকাশ —

বন্ধ কপাট খুলবার জন্যে চতুর্দিকে চীৎকার;
একবার ভেতরে ঢুকতে পারলেই
বাইরের ভয়াবহ অন্ধকারের হাত থেকে,
হিংস্র শ্বাপদের আক্রমণ থেকে
নির্বিঘ্ন মুক্তি; (ভুল মন্ত্রের জন্যে)

আর একবার মুক্ত হতে পারলেই ভয়ে-ভাবনায় জমে থাকা রক্ত চলাচলের জন্যে ফিরে পাবে স্বাভাবিক উত্তাপ। কিন্তু সময়ের রুদ্ধ দরজা কিছুতেই খুলছে না। বরং ভুল নেতৃত্বের ভুল সিদ্ধান্তে ক্রমশ সময় আরো ভয়ংকর হয়ে উঠছে। দরজার ওপাশে সুস্থ, মুক্ত বাতাসের সামান্য যে আভাস দেখতে পেয়েছিল আমজনতা — এখন সেটাও বন্ধ। কবিতার ভাষায় :

অথচ ভুল উচ্চারণের জন্যে
দরজা খুলছে না;
এমন কি যা ছিল ঘরের জানালা,
সেখানেও আজ বাতাসের
কোনো অধিকার নেই। (ওই)

নকশালবাড়ি আন্দোলনের সেই সময়কার রাজনৈতিক উত্তাপকে অনুভব করা যায় কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের 'এরকম জ্যোৎস্না' কবিতায়। সেই আন্দোলনের সময়কার এক

Dhaka University Institutional Repository

জ্যোৎস্না রাতে কবি প্রথম দেখেছিলেন এক বিপ্লবীকে পুলিশের চোখ এড়িয়ে ক্লান্ত বিধ্বস্ত শরীরে অন্ধকারের দিকে এগিয়ে যেতে। কবির বন্ধুদের মধ্যেও অনেকেই শরিক হয়েছিলেন এই নতুন ধারার আন্দোলনে। তাঁদের কেউ কেউ আর ফিরে আসেন নি — প্রশাসনযন্ত্রের নির্মম খড়্গে আরো অনেকের মতো শিকার হয়েছেন বলীর। শুধু আন্দোলনে শরিক বিপ্লবীরাই পুলিশের নির্যাতন-অত্যাচারের শিকার হন নি — পুলিশের হাত থেকে রক্ষা পায় নি এসব বিপ্লবীদের পরিবার-পরিজনও। তেমনি এক নির্মমতার সাক্ষ্য পাই এ কবিতার শেষ স্তবকে — যেখানে কবি কোনো এক বিপ্লবীকে জানাচ্ছেন —

রাত একটায় বাড়ির দরজায়
দুমদাম শব্দ,
ওরা তোমার একুশ বছরের ভাইকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল,
সে আর ফিরে আসেনি। (এ রকম জ্যোৎস্নায়)

এই নিষ্ঠুরতায় কবি স্তব্ধ — বীতশ্রদ্ধ এই রক্তাক্ত সময়ের প্রতি। তাই 'এই সন্ধ্যা' কবিতায় লক্ষ করি কবি সান্ধ্য নির্জনতায় মাঝে মাঝে পবিত্র উপবীতের সন্ধান করছেন, ফিরে পেতে চাইছেন বিগত পূর্বপুরুষের সান্নিধ্য। কিন্তু কিছুতেই এই অন্ধকার সময়ের খাঁচা ছেড়ে বের হতে পারছেন না। এই দুঃসহ অবস্থাকে কবি বর্ণনা করে লিখেছেন —

এরকম সান্ধ্য নির্জনতায় আমি মাঝে-মাঝে
পবিত্র উপবীতের সন্ধান করি;
পূর্বপুরুষের সান্নিধ্যকে ফিরে পেতে চাই একবার,
পরমুহূর্তেই কয়েকটি বাদুড়ের তীক্ষ্ণ আর্তনাদে
সমস্ত পরিবেশ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। (এই সন্ধ্যা)

এমনকি চিরপরিচিত সৌন্দর্যের আধার চাঁদকেও আজ ভীষণ ক্লান্ত মনে হয় তাঁর।

এরই ধারাবাহিকতায় 'যন্ত্রণা' কবিতায় কবি তাঁর চারপাশের সুন্দর নিসর্গের দৃশ্যগুলোকে দেখতে পান ক্রমান্বয়ে ঝাপসা হয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে। মাথার ভেতর অনুভব করেন সুতীব্র যন্ত্রণা। কেননা সময়ের চাকায় যেখানে প্রতিদিন নতুন নতুন ঘটনায় রক্তের দাগ লাগছে — সেখানে তিনি নিশ্চল নিশ্চুপ জড় পদার্থের মতো শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন — কিছুই করতে পারছেন না। নিজের এই কাপুরুষতাকে কবি মেনেও নিতে পারছেন না। আর তাই সারা শরীরে তিনি অনুভব করেন দুর্বিষহ যন্ত্রণা। কবিতায় কবির যন্ত্রণাকাতর এই অনুভবের প্রকাশ দেখি এভাবে :

আমার শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্নায়ুগুলোও
মোটামুটি সুস্থ;
আসলে আমার শরীরের রক্ত চলাচলে
এখন ছড়িয়ে আছে দারুণ কাপুরুষতা,
সময়ের চাকায় লাগছে নিত্য নতুন ঘটনার
রক্তের দাগ,
আমি নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছি ...
আর ছড়িয়ে পড়ছে সারা দেহে দুর্বিষহ যন্ত্রণা। (যন্ত্রণা)

Dhaka University Institutional Repository

'মেয়েটি গর্জে উঠেছে' কবিতাটিতে দেখতে পাই কবিকে এই অক্ষমতার জ্বালা ও গ্লানি থেকে মুক্তি দিয়েছে একটি মেয়ে। যে মেয়ে হাজার পীড়নের যন্ত্রণার পর ভীতির সমস্ত পরিবেশকে দুহাতে নাড়িয়ে দিয়ে উত্থিত হয়েছে। যার উত্থানে —

শত্রুরা পলাতক ...
শুধু একটি অসুরের শব পড়ে আছে
দুর্গতিনাশিনীর পায়ের কাছে;
মেয়েটি আজ দেখা দিয়েছে বিজয়িনীর ভঙ্গিমায়।
(মেয়েটি গর্জে উঠেছে)

আর তার কপালে ও চিবুকে এখনো লেগে রয়েছে রক্তের দাগ। হাওয়ায় উড়ছে অনেককালের রুক্ষ এলোচুল, ঠোঁটে তীক্ষ্ণ স্তিমিত হাসি। এই মেয়েকে কবি পৌরাণিক দেবী দুর্গার সঙ্গে তুলনা করেছেন — যিনি অসুরদের বিনাশ করে পৃথিবীকে অত্যাচার-নিপীড়ন আর কলুষতার হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। দেবী দুর্গার মতো মেয়েটিও গর্জে উঠেছিল এক লহমায় এবং বধ করেছিল অত্যাচারী-নিপীড়ককে। আর তাই সে,

এখন হাসছে ...
চোখ দুটোতে হিরকের দ্যুতি,
পায়ের কাছে পড়ে রয়েছে শব:
অপূর্ব তার উত্থান। (ওই)

স্বদেশ-স্বকালের এমন সহজ কাব্যভাষা এবং সংযমী বিন্যাস কবিতাকে দিয়েছে অন্য এক মাত্রা। প্রকৃতপ্রস্তাবে পুরাণকে আশ্রয় করে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত এখানে মিথের পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে যে আত্মপ্রতিবাদী ভাষ্য রচনা করলেন তা সত্যিই তুলনারহিত।

'সন্ধিক্ষণ' কবিতায় কবির সারাক্ষণ,

মনে হয়
একটি ভীষণ ধারালো খড়গ ঝুলে রয়েছে
মাথার ওপর;
একটু অসতর্ক হলেই মৃত্যু। (সন্ধিক্ষণ)

কেননা এই প্রতিকূল সময়ে কবি কাউকে দেওয়া কোনো প্রতিশ্রুতিই রাখতে পারছেন না। ফলে একটা নিষ্ফল ক্ষোভ তাঁর বুকের মধ্যে একঝাঁক পায়রার মতো শুধু ছটফট করতে থাকে। শুধু মনে হয় এখনই একটা কিছু করা দরকার — নয়তো অনেক দেরি হয়ে যাবে। তখন,

আকাশ অন্ধকার হয়ে আসবে,
স্তব্ধ হয়ে যাবে হাওয়া;
আর ওই খড়গটা
একটু বাদেই নেমে আসবে মাথার ওপর। (ওই)

কিন্তু অসহায় কবি জানেন না কী করবেন।

'সড়কে এখন রক্ত' কবিতায় ফুটে উঠেছে আশির দশকের রক্তাক্ত সময়ের চিত্র। সত্তরের মতো এ সময়েও প্রতিদিন,

[...] ঘটনা ও দুর্ঘটনা মিলে
সমস্ত স্বদেশ যেন মিলেছে মিছিলে।

Dhaka University Institutional Repository

এখনো আড়াল থেকে জীবনকে কারা
লোভের আঙ্গুলে নিত্য তছনছ করে। (সড়কে এখন রক্ত)

আশাবাদী কবি এরই মধ্যে যেন খুঁজে পান 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি'র মতো একটুকরো আশা। তিনি দেখতে পান শুষ্ক মাটি ভেদ করে বেড়ে উঠছে বৃক্ষের শিকড়। দারুণ খরার পরে নীলিমায় দেখা দিয়েছে মেঘের আভাস, ঝড়ের হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে শুষ্ক পাতা, মেঘের ভ্রূকুটিতে কাঁপছে স্বৈরাচারের আত্মা, আর সমস্ত জনপদ চমকে চমকে উঠছে হঠাৎ নির্ঝরে। তাই কবি উচ্চারণ করেন —

সড়কে এখন রক্ত, কিন্তু কিছু ফুল
তাও পড়ে আছে এক পাশে,
অদম্য সৃষ্টির বীজ গুপ্ত থাকে সর্বত্র নির্ভয়
টের পাওয়া যায় তাকে নতুন হাওয়ার
সজীব নিশ্বাসে। (ওই)

দুই.

সত্তরের দশকের নানান বিপ্লবী ঘটনাক্রমে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত চারদিকের রাজনৈতিক কলুষতা ও ষড়যন্ত্রের রূপটি আবিষ্কার করে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। সামাজিক রাজনৈতিক এই প্রেক্ষাপটে তিনি যেসব কবিতা রচনা করেন সেগুলো হচ্ছে : 'একমাত্র তখনই', 'কী চাই', 'একবার দেখে নিও', 'সভায়', 'ইতিহাস', 'মূর্খদের সম্মেলন'।

'একমাত্র তখনই' কবিতায় বামপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী এবং সমাজ-সময় ও মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত অবতীর্ণ হয়েছেন দিক-নির্দেশকের ভূমিকায়। তিনি লক্ষ করেছেন যারা এ সময়ে সাধারণ মানুষের অধিকার নিয়ে আন্দোলন করছেন তারা ভুল পথে চলছেন। আর নেতৃত্বের ভুলে প্রশাসনযন্ত্রের হাতে নির্মম বলী হচ্ছে সাধারণ মানুষ। কবি এইসব ভুল নেতাদের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে উচ্চারণ করেন নির্দেশনামূলক তাঁর বাণী —

অনেকগুলো লোককে জড়ো করলেই মিছিল হয় না,
ওদের সচেতন করো।
যখন ঝড় আসে গাছপালাগুলো নুয়ে পড়ে
ঝড় থামতেই
আবার মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়ায় আকাশের নীচে,
ওদের জানতে দাও গাছের স্বভাব। (একমাত্র তখনই)

আমজনতার স্বাভাবিক বুদ্ধির প্রতি কবি গভীর শ্রদ্ধাশীল। কবি জানেন, দুঃসময়ে কীভাবে নিজেদের বাঁচাতে হয় সেটা তারা ভালোভাবেই জানে। মিথ্যে আশ্বাস কিংবা উস্কানি দিয়ে তাদের মৃত্যুমুখে ঠেলে দিতে এইসব আনাড়ি নেতাদের নিষেধ করেন কবি। বরং তাদেরকে উপদেশ দিয়ে বলেন —

তুমি খুঁজে বের করো, কোথায় ওদের আশ্রয়।
কতকগুলো লোককে আগুনের কুণ্ডে ঠেলা দেয়া নয়,

Dhaka University Institutional Repository

আগুনের তাপে
এখন নিজেদের সেঁকে নেবার সময়। (ওই)

কবির ধারণা জনতা এবং নেতার মধ্যে সহমর্মিতা যদি প্রতিষ্ঠিত হয় এই দুঃশাসনের হাত থেকে একমাত্র তখনই মিলবে মুক্তি।

'কী চাই' কবিতায় কবির সঙ্গে সুবিধাবাদী রাজনৈতিক নেতার নীতিগত বিরোধের কথা বলা হয়েছে। কবি দেখেছেন আজকাল নেতারা পথের মাঝে সাধারণ লোকজনকে যখনই তাদের দাবি-দাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করেন, তখন জনতা —

'কিছু চাই না, বেশ ভালো আছি,
বলতে বলতে
নির্জন পথের বাঁকে মিলিয়ে যায়। (কী চাই)

কেননা জনতা এইসব নেতাদের প্রতি আর বিশ্বাস রাখতে পারছে না — তারা বুঝতে পেরেছে নেতাদের বুলির সঙ্গে মূলত তাদের চাহিদার বিস্তর ফারাক। কিন্তু অসহায় জনতা মুখ ফুটে নেতাদেরকে সে কথা বলতে সাহস পায় না। আম-জনতার হয়ে তাই কবিই উচ্চারণ করেন সেই সত্যবাণী — যা তারা বলতে পারে না।

কী চাই খুলে বলতে গেলে
তোমার সঙ্গে বিরোধ অনিবার্য,
কেননা তোমার পাওনাকেই তুমি
সকলের পাওনা বলে
বিজ্ঞাপিত করেছ। (ওই)

'একবার দেখে নিও' কবিতাটিতে কবির সাবধান বাণী উচ্চারিত হয়েছে জনতাকে উদ্দেশ্য করে। কবি ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ করছেন রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি নেতাদের তীব্র অশ্রদ্ধা; কথার সম্মোহিনী মায়ায় ভুলিয়ে ক্ষমতার লোভে স্বার্থপরের মতো জনতাকে কীভাবে তারা সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করছে। কবি তাই এইসব সরলপ্রাণ সাধারণ জনতা — যারা কিনা আদর্শহীন নেতাদের সুমিষ্ট বাগাড়ম্বরে ভুলে অনিশ্চিতের পথে পা বাড়াতে প্রস্তুত, তাদেরকে সাবধান করে দিয়ে বলেন —

যাত্রা শুরু হবার আগে
একবার দেখে নিও
যারা তোমাকে সামনে রেখে কথাগুলো বলছে
তারা সামনে থাকবে কি না। (একবার দেখে নিও)

কেননা,

গাছে তুলে দিয়ে মই সরিয়ে রেখে
এখন অনেকেই
যার যার ঘর সামলাতে ব্যস্ত; (ওই)

'সভায়' কবিতাটিতে ফুটে উঠেছে বর্তমান রাজনীতি ও রাজনীতিকদের দুরবস্থার চিত্র। এই দুটোই এখন বিপন্ন। কবির যৌবনে দেখেছেন যাঁরা রাজনীতি করতেন তাঁদের পার্টির আদর্শের প্রতি, সাধারণ মানুষের প্রতি কী গভীর মমতা ও দায়বদ্ধতা ছিল। সমাজ ও মানব কল্যাণে বিশ্বাসী সেই সময়কার নেতা ও কর্মীরা নতুন বিশ্বাসে সবসময়

Dhaka University Institutional Repository

থাকতেন উদ্দীপ্ত। সভাকক্ষগুলো গমগম করতো হাজার হাজার তরুণের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে। আর আজ নেতারা আদর্শচ্যুত—আত্মোন্নয়নেই সর্বদা ব্যস্ত। কর্মীরা হতাশ—আদর্শের টানে যদিওবা মিটিং মিছিলে উপস্থিত হয়—কিন্তু ভ্রষ্ট নেতার গলাভরা মিথ্যাচার কেউ মন দিয়ে শোনে না; তারা হাই তোলে, ঘুমোয়। কবির ভাষায় :

অথচ আজকের সভায় শুনতে শুনতে
হাই পায়, চোখ বুঝে আসে;
পেছনে ফিরে একবার তাকালেই দেখা যায়
যে ক'টি তরুণ দাঁড়িয়েছিল এখন আর নেই।

বড় হলঘর দেখতে দেখতে ফাঁকা হয়ে যায়। (সভায়)

'ইতিহাস' কবিতায় কবির বক্তব্য হচ্ছে দ্বাররুদ্ধ ঘরে কে কে ষড়যন্ত্র করে, কে বিপ্লবের মন্ত্র পড়ে জানা যায় না; বুঝতে সময় লাগে কে কার বিরুদ্ধে অন্ধকারের ভেতর ছুরি শাণিয়ে চলেছে। কিন্তু বিপ্লব যখন জেগে ওঠে তখন দেখা যায় হাজার হাজার মানুষ সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে, প্রত্যেকে এমন একজনকে খুঁজছে যে তার নিজের চিন্তার শরিক। আর তখনই ইতিহাস লেখা হয়ে যায়। কেননা তখন ঘটনাস্রোত দ্রুত এগিয়ে চলে নদীর ঢলের মতো;

ঘুম ভেঙে চমকে ওঠে ফুটপাতের
মূক ও বধির,
মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ। (ইতিহাস)

ফলে এই উত্তাল ঘটনার ঢেউগুলো,

লক্ষ মানুষকে ঠেলে নিয়ে যায়
সেই একই পরিণতির দিকে,
স্বাধিকারের লড়াই কিংবা
আত্মনিমজ্জন।

আর তখনই ঘটনার বিষয়গুলো,
লাল অক্ষরে
ইতিহাসের পাতায় লেখা হ'য়ে যায়। (ওই)

'মূর্খদের সম্মেলন' কবিতাটি রাজনৈতিক নেতাদের ব্যঙ্গ করে রচিত। কবিতার শুরু হয়েছে ব্যঙ্গ দিয়ে :

মূর্খদেরও মাঝে মাঝে মহাসম্মেলন জমে ওঠে।
মাইক আর আলোর বাহার
পুষ্প আর পুষ্পস্তবকের ছড়াছড়ি,
মাননীয় সভাপতি প্রধান অতিথির জন্যে
পায়ের নিচে
রঙবেরঙের বিস্তৃত কার্পেট। (মূর্খদের সম্মেলন)

বর্তমান বাস্তবতার নিরিখে এ কবিতাটিতে কবি তুলে ধরেছেন ভণ্ড রাজনীতিকদের পরিচিতি। এ প্রসঙ্গে অশোক মিত্রের একটি মন্তব্য স্মরণযোগ্য :

নেতাদের বক্তৃতা শুনুন, বাষ্প; হলোই বা বাষ্পের বিষয়বস্তু বিপ্লব, বাষ্প বাষ্পই, স্থানভেদে-কালভেদে-পাত্রভেদে তার রাসায়নিক উপাদান একই থেকে যায়। মিছিলের

Dhaka University Institutional Repository

শেষে ময়দানে জমায়েত হয়ে ভালো ক'রে কান পেতে শুনুন পাটাতন থেকে বিস্ফোটিত শব্দকল্পদ্রুম। নিছক কথা বলার জন্য কথা বলা, প্রতিবাক্যে তিনবার ক'রে বিপ্লবের নামে শপথ, বিপ্লব যে হুড়মুড় ক'রে এক্ষুনি এখানে এসে পড়বে এরকম এক অভ্যস্ত ভাব।[৫৬]

আসলে ভড়ংবাজির বাহারিপনায় নিজের পরিচয় খুব বেশিক্ষণ ভাঁড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের কবিতায়ও পাওয়া যায় তার সাক্ষ্য :

অথচ কথাবার্তা ভাষণ শুনলে খটকা লাগে,
সভাপতি নিজেই ভুলে যান তিনি এসেছেন মূর্খদের সম্মেলনে
প্রধান অতিথি ভুলে যান তার সিদ্ধি শুধুমাত্র শূন্যগর্ভ ভাষণে।

আর তখনই
মাড়ি থেকে তাদের আলগা দাঁতগুলো খুলে পড়ে যায়। (ওই)

তিন.

তৃতীয় পর্যায়ের কবিতাগুলো হচ্ছে প্রতিবাদী কবিতা। সমাজের প্রতি কবির দায়বদ্ধতা এবং ভণ্ড রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষারূপ প্রকাশ পেয়েছে এ ধারার কবিতাগুলোতে। এ পর্যায়ের কবিতাগুলো হচ্ছে : 'মনে রেখো', 'কথাগুলো', 'একলাফে আকাশে', 'কণ্ঠস্বর', 'প্রতিরোধ' ও 'কবিতা : সত্তর দশক'।

সুবিধাবাদীদের প্রতি সুবিধাবঞ্চিতদের প্রতিবাদী কবিতা 'মনে রেখো'। এ সমাজের যারাই ক্ষমতাবান, রাষ্ট্রযন্ত্রের পরিচালক তারাই সমাজের নিতান্ত সাধারণ মানুষকে নানান প্রলোভনে আপন পদানত রাখায় সচেষ্ট থাকে। এ কবিতায় তার প্রত্যয় ঘটে নি। তাই কপটাচারী নেতা যখন বলেন —

সেচের বন্দোবস্ত করেছি,
সার আর বীজের যোগান দিচ্ছি,
তুমি মাঠে নামো। (মনে রেখো)

তখন কৃষক সহাস্যে রাজি হয়। কারখানার মজুর যখন শোনে —

কারখানার চাকা এবার ঘোরানো দরকার,
সেরা সেরা যন্ত্রপাতি
চকমকে ঝকমকে ইস্পাতের কারুকার্য:
বোতাম টিপলেই ভূমিকম্পের মতো শব্দ। (ওই)

তখন শ্রমিক সানন্দে রাজি হয় কারখানায় কাজ করতে। এর আগেও তারা এভাবে নেতাদের কথায় বহুবার কাজে যোগ দিয়েছে এবং ঠকেছে। তাই এবার জনতা প্রবাদের আশ্রয়ে উচ্চারণ করেছে দৃঢ় সাবধান বাণী —

শুধু মনে রেখো সময় কারুর কথার জন্যে
বসে থাকে না,
মানুষের ধৈর্যও সীমাহীন নয়। (ওই)

'কথাগুলো' কবিতায় কথাসর্বস্ব নেতাদের ভড়ংবাজির হাত থেকে মুক্তি চেয়েছেন কবি। শুধু কথায় আজকাল আর চিড়ে ভেজে না। বছরের পর বছর একই কথা শুনতে শুনতে কান

Dhaka University Institutional Repository

ঝালাপালা হয়ে গেছে। জনগণ সচেতন হয়ে উঠেছে। নেতাদের গতানুগতিক কথাবার্তা শুনলে এখন চোখ জ্বালা করে। ঘৃণায় শরীর জ্বলতে থাকে। কেননা বানানো কথা এত কুৎসিৎ হয় তা আমজনতার আগে জানা ছিল না। জনতা এখন নেতাদের দেখে ঘৃণ্য পোকার মতো জীব হিসেবে। এই পোকাদের হাত থেকে পরিত্রাণ চায় তারা। কবির ভাষায় :

বানানো কথা এত কুৎসিৎ হয়!
একবার আগুন জ্বেলে দিতে পারলেই
অবাধ্য পোকাগুলোর হাত থেকে
রক্ষা পাওয়া যায়। (কথাগুলো)

'এক লাফে আকাশে' কবিতায় সমাজসচেতন কবি লক্ষ করেন, রেললাইনের দুধারের খোলা জায়গায়, প্লাটফর্মে-ফুটপাতে-বস্তিতে, চোদ্দতলা বাড়ির কোণে শয়ে শয়ে বাড়ছে উদ্বাস্তু মানুষের সংখ্যা। সবাই শহরে ছুটে এসেছে একটা কাজের জন্যে — একটুকরো রুটির জন্যে, শুধু বেঁচে থাকার জন্যে। আর তাই,

এখান থেকে ওখান থেকে হাত বাড়িয়ে
ওরা কুড়িয়ে আনছে উচ্ছিষ্ট, খরকুটো... (এক লাফে আকাশে)

কবির ভাষায়, ওরা একেবারেই মূর্খ। কেননা ওরা ওদের ভবিষ্যৎ জানে না। জানবেই বা কেমন করে — ওদের তো বেতারযন্ত্রও নেই, যেখানে —

সন্ধ্যার পর বেতরের ঘোষণায়,
শোনা যায় সেই দারুণ খবর :
ওদের জন্যে এক হাজার প্রকল্প তৈরী;
ওরা অল্পকালের মধ্যে, কত অনায়াসে,
স্বর্গের সিঁড়ি ধরে একলাফে আকাশে
পৌঁছে যাবে। (ওই)

এই শ্লেষ বাক্য সরকারি ঘোষণার প্রহসনের বিরুদ্ধে কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের মৃদু প্রতিবাদ।

'কণ্ঠস্বর' কবিতায় দেখা যায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত এই সময় ও সমাজের নেতৃত্বদানকারী প্রত্যেকের নীতি-বিবর্জিত কর্মকাণ্ডে মহাবিরক্ত। তাদের কোনো কথাই কবি শুনতে চান না। তাঁর কাছে এইসব নেতাদের গলাবাজি বড্ড বেসুরো লাগে। এদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা খোঁজেন কবি। এবং শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এখন থেকে তিনিই শেষ কথা বলবেন আর তাঁর ভাষ্য প্রকাশের আধার হবে অন্ধকার। কবির ভাষায় :

আমি স্থির করেছি আমি শেষ কথা বলব,
সমস্ত দৃশ্য অভিনয়ের পর
আমিই ফেলে দেব কালো পর্দার ড্রপসিন;
ওই অন্ধকারই আমার ভাষ্য। (কণ্ঠস্বর)

'প্রতিরোধ' কবিতাটিতে প্রকাশ পেয়েছে সত্তরের নয়াফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে কবি কিরণশঙ্করের প্রতিবাদী উচ্চারণ। কবিতার শুরুতেই কবি বলে নেন —

মাথা নত ক'রে থাকতে রাজী আছি,
তোমার কাছে নয়। (প্রতিরোধ)

Dhaka University Institutional Repository

কবি মাথা নত করে থাকতে রাজি আছেন এই বাংলার মৃত্তিকার কাছে আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জ, চিরহরিৎ বৃক্ষের কাছে — যাদের স্নেহস্পর্শে তিনি লালিত হয়েছেন। মাথা নত করে থাকতে রাজি আছেন লবণাক্ত সমুদ্রের কাছে, কেননা সমুদ্র কবির কাছে স্বাধীনতার প্রতীক। কবি আরো বলেন,

নতজানু হতে পারি
সেইসব মহামহিম মানুষের কাছে
যাঁরা দেশকে করেছেন শৃঙ্খলমুক্ত;
প্রতিটি পীড়িত মানুষকে শিখিয়েছেন
কিভাবে মানুষের মতো বেঁচে থাকতে হয়। (ওই)

কিন্তু কিছুতেই এই নতুন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছে কবি মাথা নত করবেন না। বরং দেশপ্রেমিক সাধারণ জনতাকে সঙ্গে নিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে তিনি প্রতিরোধ করবেন। সুকান্তের অনুপ্রেরণায় তাই কবি উচ্চারণ করেন সেই প্রতিবাদী বাণী —

তোমার হিংস্র থাবা উদ্যত সারাক্ষণ
স্পেন থেকে চিলি, চিলি থেকে অ্যাঙ্গোলায়।
মানুষের স্বাধীনতা, তার মনুষ্যত্ব
তুমি নানা কৌশলে কেড়ে নিতে চাও!
মাথা উঁচু রেখে

ভিয়েতনামের বীর দেশপ্রেমিকদের মতো
আমরা সর্বত্র প্রতিরোধ করে যাব। (ওই)

'কবিতা : সত্তর দশক' কবিতাটি সত্তর দশকে সারা পশ্চিমবাংলায় যে রাজনৈতিক অরাজকতা, বেপরোয়া যৌবনের উন্মত্ততা, উগ্র সন্ত্রাসবাদ এবং সার্বভৌম সাংস্কৃতিক সংকট দেখা দিয়েছিল, সেই অন্ধকার পটভূমিতে রচিত। সময়সচেতন কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত এ কবিতার শুরুতেই একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন কবিতাপ্রেমিক জনতার কাছে—

তাহলে কবিতা কি শুধু ফোটাবে গোলাপ;
এক মুহূর্তে জাগিয়ে তুলবে
হৃদয়ের গভীরতায়
ঝর্নার কল্লোলধ্বনি?

নাকি মাঝরাতে চাঁদের মতোই
এসে দাঁড়াবে নীলিমায়, মুখে হাসি
ছড়িয়ে দেবে অমল জ্যোৎস্না
প্রান্তরে, পাহাড় চূড়ায়। (কবিতা : সত্তর দশক)

কবিতার এই চিরপুরাতন ধারণার বিরুদ্ধাচরণ করেন কবি নিজে। কেননা, তিনি সমকালীন জীবন ভাবনার কবি। আজীবন সংগ্রামী মানুষের সহমর্মী কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত তাই বলেন, তাঁর কবিতা এরকম হবে না। কারণ, সময় যখন দুঃসময় হয়ে যায় তখন কবিতাকেও পরিবর্তিত হতে হয় — সুললিত সুডৌল, সুকোমল স্বভাব পরিত্যাগ করে কবিতাকেও হতে হয় রুক্ষ-রুদ্র-কঠোর। বসন্তের হাওয়ার চঞ্চলতা, প্রেমিকের গোপন ফিসফিসানি, অভিসারিতার গুঞ্জনকে দূরে রেখে কবিতাকে হাঁটতে হয় কণ্টকময় পথে — ক্ষতবিক্ষত হয়ে অনিশ্চিতের দিকে।

Dhaka University Institutional Repository

'কবিতা : সত্তর দশক' কবিতার শেষ স্তবেক তাই দেখতে পাই,

কবিতা এখন পুরনো পোষাক একেবারেই খুলে ফেলতে চায়;
মাথায় কাঁটার মুকুট পরে স্বেদ আর শ্রমের ভেতর
পরিব্যাপ্ত হয়ে যায়।
ঠোঁটে নোনতা স্বাদ, চিবুকে ক্ষতচিহ্ন ... (ওই)

জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই কবি কিরণশঙ্কর তৈরি করেন তাঁর কবিভাষা। এ কবিতাই তার দুর্লভ সাক্ষ্য।

চার.

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের কবিতার মুখ্য ভাবনা আশাবাদ। 'মানুষ জানে' কাব্যগ্রন্থেও সে ধারাটি সচল। তবে এ কাব্যগ্রন্থের এ ধারার কবিতাগুলোর প্রধান সুর নিরাশা। সত্তর-আশির দশক ছিল বিপর্যস্ত, অন্ধকার সময়। তবু কবি কিরণশঙ্কর এই দুঃসময়ের মধ্যে থেকেও এমন একটা মানসিকতাকে আয়ত্ত করেছেন যার দ্বারা তিনি সামনের দিকে চলার একটি নিরন্তর যাত্রাকে অনুভব করতে পেরেছেন। আর সে কারণেই তাঁর চরম নৈরাশ্যমূলক কবিতায়ও আশাবাদের ধ্বনি শোনা যায়। নিরাশার মধ্যে আশাবাদ পর্যায়ের কবিতাগুলো হচ্ছে : 'এই হাওয়া', 'চোখ ফেরালেই', 'মধ্যরাত্রি, ভোর', 'উত্তরসূরীদের জন্যে', 'রাস্তা, মাঠ, নদী', 'আর এক আরম্ভের জন্যে', 'মনে পড়ে যায়', 'মানুষ জানে', 'লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেই', 'স্বপ্ন', 'প্রতীক্ষা', 'পোস্টার', 'শেষবারের মতো', 'ভোরের এই মুহূর্তটি', 'আগে উৎসকে জানো', 'আলোর দূত', 'স্বপ্নচ্যুত' ও 'ভোরবেলা'।

'এই হাওয়া' কবিতায় কবির মনে হয়েছে দুঃসময় এখনো পুরোপুরি সবকিছুকে গ্রাস করে নিতে পারে নি — এখনো আশা আছে — কেননা,

এখানে এখনো বৃষ্টি নামেনি, শুধু হাওয়া,
দারুণ হাওয়ায় পর্দা উড়ছে, (এই হাওয়া)

'চোখ ফেরালেই' কবিতায় দেখতে পাই,

সময়ের দিকে চোখ ফেরালেই দৃষ্টি ঝাপসা
হ'য়ে আসে!
এখন যৌবনস্মৃতি অস্পষ্ট। যেন বহুকাল আগের
ভোরের কুয়াশায়
পাখির ডাক — বুকের মধ্যে কোথাও মিশে আছে। (চোখ ফেরালেই)

এই অতীত স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে কবি অনুভব করছেন গভীর হতাশা। কেননা, তিনি খুব শৈশবে ঠাকুর্দা-ঠাকুমা-মা-বাবা সবাইকে ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন বড়ো একটা কিছু করার প্রত্যাশা নিয়ে। আজ তিনি অনেক বড়ো হয়েছেন — শরীরে ও বয়সে — কিন্তু নিজের ঘরে ফিরে যেতে হয়েছেন ব্যর্থ। কবির ভাষায় :

নিজের ঘরে ফিরতে পারিনি, সামনের কোনো ঠিকানায়ও
পৌছাতে পারছি না; (ওই)

Dhaka University Institutional Repository

তবে 'পৌঁছাতে পারছি না' বলেই কবি বুঝিয়েছেন তিনি এখনো আশা ছাড়েন নি। একদিন হয়তো তিনি তাঁর লক্ষে পৌঁছে যাবেনই।

'মধ্যরাত্রি, ভোর' কবিতাটিতে 'রাত্রি' হচ্ছে কবির নৈরাশ্যব্যঞ্জক সময়, যখন তাঁর সারা শরীরে থাকে ক্লান্তি; আর কেবলি মনে হয় — যেন শরতের আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে শীতের কুয়াশায়, আর স্মৃতির ভেতরে ধীরে ধীরে নেমে আসছে ক্লান্তির অন্ধকার। অথচ 'ভোর' মানেই নতুন দিনের আবির্ভাব, — কুয়াশা কেটে গিয়ে নতুন সূর্যোদয়। তাই আশাবাদী কবি মনে করেন,

প্রতিটি সূর্যোদয়ে এক একবার
নতুন করে আশা আর ভালোবাসা হৃদয়কে
ছুঁয়ে যায়,
আবার নতুন উদ্যোগে জয়ী হবার জন্যে। (মধ্যরাত্রি, ভোর)

'উত্তরসূরীদের জন্যে' কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে কবির পড়ন্ত বেলার উৎকণ্ঠা। বয়সী কবি যে দারুণ সময় পার করছেন এখন — সেই সময় অতিক্রান্ত হলে তাঁর উত্তরসূরিদের জীবনযাপন কেমন হবে তাই নিয়েই তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। যদিও তিনি জানেন,

বন্যা সরে গেলে রেখে যায় পলিমাটি,
ফোটে ফসলের মুখ,
রাতের বজ্র আর বিদ্যুৎ বিদায় নিলেই
আকাশে ফোটে নক্ষত্রের মালা। (উত্তরসূরীদের জন্যে)

আশাবাদী কবি জীবন থেকে কখনো সরে আসেন নি, যদিও বন্যার মতো দুরন্ত কিংবা বজ্র আর বিদ্যুতের মতো প্রচণ্ড তিনি নন, তবু জীবনের মধ্যে থেকেই তিনি দুঃসময়কে মোকাবেলা করেছেন। কিন্তু এই অপরাহ্ন বেলায় এসে তাঁর উত্তরসূরিদের ভবিষ্যত ভাবনায় আশা-নিরাশার দোটানায় পড়েছেন তিনি — কবিতার শেষ স্তবকে পাই তার সাক্ষ্য :

[...] জীবন থেকে আমি সরে আসি নি,
জীবনের জন্যে জীবনের মধ্যে দাঁড়িয়ে
এই কাল বেলায়
তাই আমার এত ভয়, এতো প্রত্যাশা। (ওই)

'রাস্তা, মাঠ, নদী' কবিতায় লক্ষ করি কবি হতাশা কাটিয়ে উঠে আশাবাদের কথা বলছেন।

খোলা মাঠের মধ্যে এলেই
মনে হয়
এখন বীজবপনের কাল:
নদীর দিকে তাকালেই
মনে হয়
শুকনো খেতের প্রচণ্ড ক্ষতটাকে
এইবার ধুইয়ে দেবার সময়। (রাস্তা, মাঠ, নদী)

কবির মন তাঁর পূর্বপুরুষদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে। কেননা এই মুক্ত মাঠ, স্নেহপ্রদায়িণী নদী আর সুশীতল বৃক্ষকে ভালবাসতে শিখিয়েছিলেন তাঁরাই।

Dhaka University Institutional Repository

'আর এক আরম্ভের জন্যে' কবিতায়ও কবির আশাবাদ উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। কবির মনে হয়েছে ক্রমশ প্রতিকূল সময় কেটে যাচ্ছে, আর তার বদলে —

ঘাসে-ঘাসে নতুন রৌদ্রের সোনার ঝালর,
দূরের দিগন্তরেখা এখন বড়ো বেশী স্পষ্ট,
পাখির ডাকে, গাছের পাতার আড়ালে
এখন সময় যেন বড়ো বেশী প্রত্যাশাকে
ছড়িয়ে দিচ্ছে।
(আর এক আরম্ভের জন্যে)

ফলে মনের মধ্যে জমাট বেধে থাকা যন্ত্রণাগুলো আস্তে আস্তে সরে যেতে থাকে, চারপাশে ছড়িয়ে থাকে অন্যরকম এক লাবণ্য। জীবনের প্রতি গভীর আশাবাদী কবির তাই,

এ সময় শত্রুকেও ক্ষমা করার ইচ্ছা জাগে, (ওই)

এবং হৃদয়ের গভীরে অনুভব করেন সময়ের নিরন্তর যাত্রাকে। তাই —

হঠাৎ মনে পড়ে কোথাও যাবার কথা ছিল,
এখনই যাত্রা শুরু করতে হবে। (ওই)

'মনে পড়ে যায়' কবিতাটিতে সময়ের কাছে কবির অসহায়ত্ব প্রকাশ পেয়েছে। একজন মানুষের জীবনে আয়ু যেমন অফুরন্ত নয়, তেমনি তার প্রত্যেকটি মুহূর্তও এদিক ওদিক লুকোচুরি খেলতে খেলতে কোথায় হারিয়ে যায়। রক্ষিত হয় না প্রিয়জনদের দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলো। তখনই মনের কোণে জেগে ওঠে নিরাশার দীর্ঘশ্বাস। এ কবিতায়ও তাই দেখা যায়, প্রিয়জনের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ কবির বেদনাদীর্ণ উচ্চারণ :

তোমার চোখের দিকে তাকালেই
মনে পড়ে যায়
সময়ের কাছে জীবন বড়ো অসহায়। (মনে পড়ে যায়)

'মানুষ জানে' কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতা 'মানুষ জানে'। সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে যে মানুষ শ্রম ও ভালবাসা দিয়ে তৈরি করেছে এই জীবন, এ কবিতায় সেই মানুষেরই জয়গান রচনা করেছেন কবি। ভালবাসার কথাও তিনি ভোলেন নি। তাই তাঁর কবিতায় দেখা যায়, মানুষ যেমন জানে দ্রাক্ষা থেকে সুরা, কয়লা থেকে আগুন তৈরি করতে; কিংবা জানে দুর্ভিক্ষ আর মন্বন্তরের কালো হাওয়ায় কীভাবে গড়ে তুলতে হয় ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ, তেমনি সে চুম্বন থেকে রচনা করে নেয় ভালবাসার জগত। এ কবিতা আশাবাদী কবি কিরণশঙ্করের স্বপ্ন ও সংগ্রামের দলিল। মানুষের সমাজসত্তার বিকাশের কাব্যরসে সিঞ্চিত :

মানুষ জানে
কীভাবে জলকে রূপান্তরিত করা যায় বিদ্যুতে
স্বপ্নকে নিয়ে আসা যায় বাস্তবের কাছাকাছি
কুয়াশার তোরণের মধ্য দিয়ে।
কোন যাদুতে এক সময়
অন্ধকারে তলিয়ে যেতে যেতে
আবার ফিরে আসা যায় আলোর দিকে,
জীবনের দিকে। (মানুষ জানে)

Dhaka University Institutional Repository

মানব মুক্তির স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্যে কবির যে সংগ্রাম — জল থেকে বিদ্যুৎ ছিনিয়ে আনার মধ্যে মেলে তারই আভাস। একদিন সমস্ত সংশয়-সন্দেহের কুয়াশা সরিয়ে মানুষ মাথা তুলে দাঁড়াবে, সেই আশায় কবি এ কবিতায় রচনা করেন বিজয় তোরণ।

'লক্ষভ্রষ্ট হলেই' কবিতায় দেখতে পাই, বহুদিন আগে যখন কবির তরুণ বয়স তখন সূর্যের দিকে তাকিয়ে, নদীর দিকে মুখ রেখে সংগ্রামী জনতাকে তিনি শুনিয়েছিলেন অন্ধকার থেকে নতুন আলোর পথে যাত্রার কথা। জনতার কাছে প্রতিশ্রুত সেই লক্ষে পঞ্চাশ উত্তীর্ণ কবি এখনো পৌছতে পারেন নি। তবে লক্ষচ্যুতও তিনি হন নি। কেননা কবি জানেন,

> লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেই
> আবার কবন্ধ অন্ধকার
> ভিড় করে আসবে। (লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেই)

আশাবাদী কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের সেটা কাম্যও নয়। তাই সেই প্রতিশ্রুতির কথা সব সময়ই মনে রাখেন।

মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে বুকের মধ্যে আশা পূরে রাখা, স্বপ্ন দেখা। যতো নৈরাশ্যই তাকে ঘিরে ধরুক না কেন আশা ছেড়ে স্বপ্ন ছেড়ে সে কিছুতেই মুক্ত হতে পারে না। মানুষের বৈশিষ্ট্যের এই চিরন্তন রূপটিই প্রকাশ পেয়েছে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের 'স্বপ্ন' কবিতায়। কবিতার ভাষায় :

> দু'চোখের স্বপ্ন, একদিন যা লালিত ছিল
> গোপন অস্তিত্বের গভীরে,
> আজ কতো সহজেই না
> দেখা যাচ্ছে তার ভূলুণ্ঠিত রূপ।
> অথচ স্বপ্নকে ছেড়ে কেউ কোথাও
> যেতে পারছে না। (স্বপ্ন)

'প্রতীক্ষা' কবিতাটিতে দেখা যায় আশাবাদের যে পথে কবি একদিন নিঃসংশয় চিত্তে যাত্রা করেছিলেনন সে পথের চতুর্দিকে আজ ঘনিয়ে উঠেছে ভ্রুকুঞ্চিত সংশয়ের মেঘ। এখন প্রায়ই যেন কবির পথ ভুল হয়ে যায়। ক্রমাগতই যেন জড়িয়ে যাচ্ছেন গোলক ধাঁধার ভেতরে। আশাবাদী কবি এ পরিস্থিতিতেও জীবনের প্রতি আস্থা হারান না। একটি প্রজাপতির ওড়াউড়ি দেখার জন্যে চেয়ে থাকেন সদ্যফোটা গোলাপের দিকে। এবং তাঁর সঙ্গীকে আশ্বস্ত করে বলেন :

> তোমাকে বলেছিলাম : পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব।
> এক সময় আমার বিশ্বাসের ভিতরে কোনো সংশয় ছিল না,
> আমি জানতুম রক্তক্ষরণের মধ্য দিয়ে আমাদের যাত্রা,
> একদিন কোথাও ফুটিয়ে তুলব
> সার্থকতার ফুল। (প্রতীক্ষা)

তবে তার জন্যে আমাদের ধৈর্য ধরে প্রতীক্ষা করতে হবে। কেননা 'এই যাত্রা বড়ো বেশী দীর্ঘ'।

Dhaka University Institutional Repository

'পোস্টার' কবিতাটি আমাদেরকে সত্তরের দশকের রুক্ষ সময়ের কথা মনে করিয়ে দেয় — যে সময় আমরা কয়েক বছর আগেই ফেলে এসেছি। কিন্তু কবি অনুভব করেন এখনো তার উত্তাপ। কেননা সেই সময়কার দাবি-দাওয়া সম্বলিত পোস্টারগুলো এখনো মুছে যায় নি। দেয়ালের অক্ষরগুলো অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে বটে তবু নিমেষেই সবটা পড়ে ফেলা যায়। আরো একটু বেশি মনোযোগী হলে,

ফাঁক করে দেখা যায়
বিশ দফা কর্মসূচীর রহস্য: (পোস্টার)

আর সঙ্গে সঙ্গে আশাবাদী কবির মনে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে নতুন আশা। সেই উত্তাল সময়ে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে যে দাবিগুলো কার্যকর করা যায় নি — এই সুস্থ-শান্ত পরিবেশে হয়তো সেই দাবিগুলো পূরণ হতে পারে। ফিরে আসতে পারে আমজনতার সুদিন। আর তাই কবি দেখেন,

সূর্য ঘুরে যেতে আলো পড়তেই
জ্বল জ্বল করতে থাকে অক্ষরগুলো। (ওই)

কবিসত্তা ও সমাজসত্তার সার্থক সমীকরণ লক্ষ করা যায় কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের 'শেষবারের মতো' কবিতায়। এ যুগের কবির উদ্বেগের হাত থেকে, অন্ধকারের মুঠি থেকে যেন উদ্ধার নেই। ছকে বাঁধা কিংবা আরোপিত আশাবাদে এখনকার কবি বোধহয় আর উদ্বুদ্ধ হন না। কেননা কবি ভাবতে পারেন না —

[...] দু'দুটো মহাযুদ্ধের পরেও
যুদ্ধের আগুন নিভবে না,
জ্বলতে থাকবে অ্যাঙ্গোলা-লেবানন
দক্ষিণ আফ্রিকা। (শেষবারের মতো)

কিংবা কবি ভাবতে পারেন নি,

[...] দেশ স্বাধীন হবার
কয়েক দশক পরেও
[...] স্বদেশে ক্ষুধার অন্ন উধাও, গরীব মানুষ ধুঁকছে! (ওই)

এ প্রসঙ্গে প্রায় একই সময়ে রচিত অশোক মিত্রের একটি প্রবন্ধের কিছু অংশ মনে পড়ে :

> দেশে দুর্ভিক্ষ, নিরন্নের হাহাকার, ফসলঠাসা গুদাম, কিন্তু গরিবরা না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে কাতারে-কাতারে, রাষ্ট্রশক্তি অবিচল, দুর্ভিক্ষ হেতু চিত্তস্থৈর্য এতটুকু নড়েনি যে ছোটোলোকগুলো খুব ভদ্রভাবে মারা যাচ্ছে, প্রতিবাদ না ক'রে, লুটপাটখুনজখম না ক'রে, আগুন না জ্বালিয়ে, এমনকি অভিশাপ পর্যন্ত না দিয়ে, মৃত্যুর এমন মহামহিমান্বিত সমারোহ দেখে হতচকিত তারা, অভিশাপের ভাষা পর্যন্ত তারা ভুলে গেছে। আন্দোলন মৃত, আপাতত বামপন্থা অবরুদ্ধগতি।[৫৭]

কিন্তু বামপন্থী কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের ব্যক্তিচৈতন্য এ সময় বৃহত্তর সমাজচেতনার সঙ্গে লীন হয়ে যায়। তিনি এই হতাশগ্রস্ত মানুষগুলোকে শোনান আশাবাদের বাণী। তাদেরকে বলেন এই দুঃসময়ের বিরুদ্ধে, ব্যর্থ শাসক ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্যে শেষবারের মতো প্রস্তুত হতে। কবির ভাষায় :

[...] হতাশার চাদরমুড়ি দিয়ে বসে থাকলে
বড়ো অসহায় দেখায়,

Dhaka University Institutional Repository

তুমি নৈরাশ্যের পোকাগুলোকে ঝাড়া দিয়ে ফেলে
শেষবারের মতো প্রস্তুত হও। (ওই)

'ভোরের এই মুহূর্তটি' কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের একটি উজ্জ্বল আশাবাদী কবিতা। সময়ের যে নিরন্তর যাত্রার ধ্বনি তিনি শুনতে পান বুকের মধ্যে, এখানেও সেই ধ্বনির প্রকাশ —

ভোরবেলা কেউ যাত্রা শুরু করলেই
আমি মাথা বাড়িয়ে জানলার
বাইরের আকাশটাকে
ভালো করে দেখে নিতে চেষ্টা করি। (ভোরের এই মুহূর্তটি)

কেননা কবির যাত্রাপথ সব সময়ই কণ্টকাকীর্ণ। ঘটনা-দুর্ঘটনার ঘনঘটনায় বাধাগ্রস্ত হয় তাঁর যাত্রা। কিন্তু আজ তিনি দেখেন —

এখন আকাশ বড়ো নির্মল,
এখন সমস্ত নীলিমার মেঘের স্তরে প্রশান্তি,
যেন ঘুমের মধ্যে চোখ বুজে থাকা
শিশুর সুন্দর মুখচ্ছবি। (ওই)

কবির মনে আশা জাগৃত হয় এই ভেবে যে, এবারের যাত্রা হয়তো নিষ্কণ্টক হবে। আর তাই ভোরের সূর্যের প্রথম পবিত্র আভা কবির আশার মতোই সিঁদূরের রঙে রঙিন হয়ে ওঠে।

'আগে উৎসকে জানো' কবিতাটিতে প্রকাশিত হয়েছে কুয়াশার মধ্য দিয়ে গভীর গভীরতর অনুভূতির দিকে যাত্রার ইঙ্গিত। তবে কবি বলেন, যে কোনো যাত্রার আগে তার উৎসকে ভালো করে জেনে নিতে হয়। কেননা উৎস থেকেই জানা যায় যাত্রাপথের রূপ, তার সাফল্য। কবির ভাষায় :

কিন্তু তার আগে
উৎসের সন্ধানে যেতে হয়, যেখানে জন্মের
রেখাগুলো দেখে
জানা যায়, শরীরের রূপ, তার ভাস্কর্য! (আগে উৎসকে জানো)

'আলোর দূত' কবিতাটিতে প্রকাশ পেয়েছে অন্ধকার সময়কে অতিক্রম করে আলোর উৎসবে মেতে ওঠার আকাঙ্ক্ষা। জীবনের দীর্ঘ সময় আলোহীন অন্ধকারে থাকতে থাকতে মানুষের সুস্থ চিন্তাগুলো আজ বিকারগ্রস্ত। তাদের কেবলি মনে হয় এক ভয়ংকর কালো অন্ধকার সমুদ্রের গভীরে জীবনের সমস্ত সজীব দৃশ্য মিলিয়ে যাচ্ছে। এর থেকে যেন মুক্তি নেই। তাদের বিস্বাদময় জীবনের চারপাশে ঘিরে আসে হতাশা। কিন্তু হঠাৎ করেই সবাই সচকিত হয়ে ওঠে — দেখে তাদের মুক্তির বার্তা নিয়ে হাজির হয়েছে আলোর দূত। আর তখন কী আশ্চর্য,

[...] এক নিমেষেই মুছে গেল
ক্ষোভ আর তিক্ততার চিহ্নগুলো:
যেন আজ সারা রাত চলতে থাকবে জোর
আলোর উৎসব। (আলোর দূত)

Dhaka University Institutional Repository

'স্বপ্নচ্যুত' কবিতায় ফুটে উঠেছে নৈরাশ্যের ছবি। প্রত্যেক আশাবাদী মানুষই স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন মানুষের আশাকে বাঁচিয়ে রাখে। অথচ ছিন্ন স্বপ্ন বড়ো ভয়াবহ। কেননা,

স্বপ্ন থেকে চ্যুত হ'লে
মানুষকে
বড়ো অসহায় মনে হয়। (স্বপ্নচ্যুত)

কারণ তার আর কোনো আশা থাকে না। চারপাশে ভীড় করে শুধুই নৈরাশ্যের ছায়া।

'ভোরবেলা' কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে কবির আশাবাদ। রাতের অন্ধকারকে দূরে সরিয়ে দিয়ে ভোরবেলা উদিত হয় সূর্য। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারকে হটিয়ে দিয়ে জেগে ওঠে পাখপাখালি, শস্যক্ষেত, প্রতিবেশী গাছ— সবাই সবার অবস্থান বুঝে নিতে চায়। ভোরবেলা হয়ে ওঠে কর্ম্মমুখর। একটার পর একটা বাধা অতিক্রম করে আশাবাদী মানুষ। তাই কবি বলেন, 'ভোরবেলা' শুরু করতে পারলেই ভালো হয়। কবিতার ভাষায় :

সবচেয়ে অবাক করে কর্মব্যস্ততায় ধাবিত মানুষ।
তাদের শুরু অনেক আগে থেকেই,
অতিক্রম করছে একটার পর একটা দুর্গ
ভোরবেলা শুরু করতে পারলেই ভালো হয়। (ভোরবেলা)

পাঁচ.

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মতো 'মানুষ জানে' কাব্যগ্রন্থেও কিছু সংখ্যক প্রেমভাবনাজাত কবিতা লক্ষযোগ্য। এ ধারার কবিতাগুলো হচ্ছে : 'আলো অন্ধকার', 'চতুর্দিকে ভালোবাসা', 'তুমি', 'এখন তুমি', 'রাজেশ্বরী' এবং 'যখনই'।

'আলো অন্ধকার' কবিতায় দেখা যায় কবি তাঁর প্রেমাস্পদাকে অনুভব করেন সর্বত্র— বাইরে এবং মনের ভেতরেও। কিন্তু সে শুধু অনুভবই। বাস্তবে তাকে কোথাও দেখা যায় না। অন্ধকারেই তার অস্তিত্ব— আলোতে শুধুই শূন্যতা। কবি তাঁর এই স্মৃতিবিভ্রমের বর্ণনা করেছেন এভাবে :

মনের ভেতরে অন্ধকারে তুমি কোথাও জেগে আছ,
এক এক দিন সন্ধ্যার আবছায়ায়
মনে হয় তুমি বাইরে এসে দাঁড়িয়েছ,
অথচ আলো জ্বাললেই
এক নিমেষে তোমার মূর্তিটা হারিয়ে যায়। (আলো অন্ধকার)

'চতুর্দিকে ভালোবাসা' কবিতাটিতে কবি তাঁর চারপাশের নিসর্গ প্রকৃতির মধ্যেই লক্ষ করেন ভালবাসা। যেখানে গভীর কাদায় ঘোলা জলের বুদ্বুদ কিংবা তার পাশে জেগে ওঠা নাম-না-জানা ফুলের কুড়ি অথবা ঝড়ো হাওয়ায় উড়ে যাওয়া মৌমাছির ঝাঁক বা গাছের শাখায় মৌয়ের চাক— সর্বত্রই কবি খুঁজে পান ভালবাসার স্পর্শ। তাইতো কবির ধারণা—

যেন কেউ বুক উজাড় করে ছড়িয়ে দিয়েছে
চতুর্দিকে ভালোবাসা। (চতুর্দিকে ভালোবাসা)

'তুমি' কবিতায় কবির প্রেয়সী তার সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে কবিকে ঘিরে রেখেছে। অত্যন্ত

Dhaka University Institutional Repository

সহজ-সরল-স্বাভাবিক সৌন্দর্যের অধিকারী কবির প্রেমিকা। তার জানা নেই বশীকরণের মন্ত্র, চোখে এমন তীব্রতা নেই — যা যাদুকরীর চোখে থাকে — যে সম্মোহন করবে। সে সামনেও সারাক্ষণ থাকে না: কিন্তু তার মধ্যে এমন কিছু আছে যার ভেতর কবি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধরা পড়েন। তাইতো কবি তাঁর প্রেমাস্পদাকে বলেন —

দূরদিগন্তে নীলিমা যে-রকম আকাশলীনা,
তুমি যেন সে-রকম ভাবেই
সমস্ত উদ্‌ভ্রান্তির মেঘ সরিয়ে কখন
আমার হৃদয়ে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছো। (তুমি)

সাদাসিদে কবির প্রেমিকার মতোই এ কবিতার সাদামাটা নিরাভরণ কাব্যভাষা আমাদের দারুণ মুগ্ধ করে।

'রাজেশ্বরী' কবির প্রেমিকা, যে হচ্ছে এ পৃথিবীর সৌন্দর্যের আধার। কবি তাকে খুব ভালবাসেন। তাকে তিনি গভীরভাবে অনুভব করেন — কখনো হারিয়ে যেতে দেন না। 'রাজেশ্বরী'র কথা বলতে গিয়ে কবি লেখেন —

আকাশের নীলিমায় ছড়ানো রয়েছে
রূপসী জ্যোৎস্নার অমল শরীর,
যেন ধবধবে শাদা : পালঙ্কে এলিয়ে রয়েছে
রাজেশ্বরী। (রাজেশ্বরী)

'যখনই' কবিতায় ফুটে উঠেছে প্রেমিকার প্রতি কবির গভীর অনুরাগের চিত্র। কখনো কখনো কবির হাজার আহ্বানেও সাড়া দেয় না তাঁর প্রিয়া — তখন হয়তো কবির অভিমান হয়। কিন্তু যখনই তার সাড়া মেলে তখন কবি আর মাটিতে থাকেন না — আনন্দে দিশেহারা হয়ে পড়েন তিনি। কবির এই মনোভাব অত্যন্ত আন্তরিকভাবেই প্রকাশ পেয়েছে কবিতার মাত্র কয়েক লাইনে —

এক এক সময়
হাজার বার মাথা কুটলেও সাড়া মেলে না;
কিন্তু যখনই সাড়া দাও
আমি চলে যাই অন্য ভুবনে
আমার সামনে জেগে ওঠে
নদনদী পর্বতমালা
দীর্ঘ গাছ, লতাপাতার ঝোপঝাড়;
সীমাহীন আকাশ ... (যখনই)

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের এই সাদাসিধে কাব্য ভাষার সৌরভে আমরাও আমোদিত হই — কবির সঙ্গে দিশেহারা হই।

ছয়.

'বৃষ্টি এলে'র মতো এ কাব্যগ্রন্থেও কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের মৃত্যুভাবনাজনিত কয়েকটি কবিতা রয়েছে। এর মধ্যে 'একদিন' শিরোনামের আছে দুটি কবিতা — যার একটির রচনাকাল ১৯৭২ এবং অপরটি রচিত হয়েছে ১৯৮০-তে। এছাড়াও 'যতো দিন যায়', 'দরজার কাছে', 'ছায়া' এধারার উল্লেখযোগ্য কবিতা।

Dhaka University Institutional Repository

'একদিন' (১৯৭২) কবিতার শুরুতেই কবি সবাইকে শুনিয়ে ঘোষণা দেন,

শোনা হে, এখন বয়স বাড়ছে (একদিন)

আর তাই সবকিছুই তাঁর কাছে এখন অসহ্য মনে হয়। শীতের দিনে শীত, গরমের দিনে গরম, আষাঢ়ের প্রথম বৃষ্টির ছাঁটেই শুরু হয় খুক খুক কাশি। তিনি উপলব্ধি করেন চির সত্য মৃত্যুকে। তিনি বুঝতে পারেন —

বয়স বাড়ছে, শরীরের তাপ কমছে,
[...] [...]
তাপ কমতে কমতে একদিন
সমস্ত শরীরটাই
বরফের মতো শীতল হয়ে যাবে। (ওই)

'যতো দিন যায়' কবিতাটিও পুরোপুরি কবির মৃত্যুচেতনা দ্বারা আচ্ছন্ন। কবির যতই বয়স বাড়ছে ততই তিনি অনুভব করছেন তাঁর সঙ্গে তাঁর আপনজনদের দূরত্ব। সবাই যেন তাঁর কাছ থেকে আস্তে আস্তে দূরে সরে যাচ্ছে-তিনি সবাইকে ঝাপসা দেখতে পাচ্ছেন। এমনকি কবির সবচেয়ে প্রিয় যে জন — তাঁর প্রেমাস্পদা, তার মুখের ছবিও আজ অস্পষ্ট; কবির বর্ণনায় :

যেন শীতের কুয়াশার পৃথিবীতে প্রকাণ্ড খোলা
মাঠের মধ্যে
আশ্চর্য শান্ত পায়ে তুমি হেঁটে চলেছ
ভালো ক'রে তাকাতে গেলেই
দু'চোখ ঝাপসা হয়ে যায়। (যতো দিন যায়)

মৃত্যু ভয়ে ভীত কবি খুব কাছেই মৃত্যুদূতের পায়ের আওয়াজ শুনতে পান —

বুট জুতো পরে কালান্তক কাল ঠিক যেন আমার
ঘরের বাইরে
অন্ধকারে পায়চারি করছে,
একবার বেরুলেই আমাকে নিয়ে যাবে। (ওই)

'দরজার কাছে' কবিতায় তাই দেখা যায়, দরজার কাছে কেউ হাঁক দিলেই কবি চমকে ওঠেন। কেননা,

এই সময় দরজার কাছে কেউ হাঁক দিলে
শব্দটা যেন বুকের ভিতর বেগে লাগে;
মনে হয় অসময়ে কেউ এসে
আমাকে বিপন্ন করতে চায়! (দরজার কাছে)

মৃত্যুভাবনায় আতঙ্কিত কবি তাই গভীরভাবে উপলব্ধি করেন একজন বন্ধুর বিশ্বস্ত সহানুভূতি — যার হাতের স্পর্শে তিনি ফিরে পাবেন জীবনের উত্তাপ। কবির ভাষায় :

অথচ অন্ধকারের গভীরতার ভিতরে
আমার একজন বন্ধুর দরকার;
একটি বিশ্বস্ত হাত,

যার কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে পারার সুখ
আমি মাঝেমধ্যেই স্বপ্নে দেখি। (ওই)

Dhaka University Institutional Repository

আমরা 'বৃষ্টি এলে'তেও দেখেছি মৃত্যুচিন্তায় কবি কখনো আচ্ছন্ন হয়ে যেতে চান না — তিনি ভালবাসেন জীবনকে — এ কবিতায়ও তার প্রতিফলন ঘটেছে।

'ছায়া' কবিতাটিতেও কবির ভাবনায় দেখি মৃত্যুরই ছায়া। কবি সেই ভাবনার প্রকাশ ঘটান এভাবে :

নিজের ছায়াকে দেখে ভয়ে ভয়ে থাকি
কখনো সামনের দিকে কখনো পেছনে
নিকট সঙ্গীর মতো হাঁটে, চলে, থামে;
এই ছায়া দীর্ঘ হবে নাকি! (ছায়া)

কবি এই ছায়ার অভিপ্রায় ভালো করেই বোঝেন। তবে ভয়ে একেবারেই গুটিয়ে যান না তিনি। জীবনের উষ্ণতাকেও তিনি অনুভব করেন কখনো কখনো —

বেশ তো ভালোই লাগে শেষ রৌদ্রে
গাছের ছায়ায় বসে থাকা; (ওই)

কিন্তু সেটা সাময়িক; শেষ পর্যন্ত মৃত্যুচিন্তার কাছেই যেন পরাস্ত হন কবি।

অথচ সন্ধ্যার শেষে যখন মিলিয়ে যায়
বাইরের ছায়া,
নিজের ছায়াই শুধু বেড়ে ওঠে সঙ্গোপনে
চরাচরে, মনের ভিতরে। (ওই)

'একদিন' (১৯৮০) কবিতার বিষয়বস্তুও কবির মৃত্যুভাবনা। বার্ধক্যে উপনীত কবি পাঁচতলার সিঁড়ি ভেঙে আর উপরে উঠতে পারেন না — ভীষণ কষ্ট হয়, সব সময় তাঁর মনে হয় তিনি পা পিছলে নিচে পড়ে যাবেন।

চারতলায় উঠতে গিয়ে দম নিতে হয়,
নামতে গেলেও আস্তে, আরও আস্তে, ধীরে আরও ধীরে। (একদিন)

কবি জানেন বেঁচে থাকতে গেলে এরকমভাবেই তাঁকে চলতে হবে। শরীর কাঁপবে, পা-পিছলে যাবার ভয় থাকবে এবং,

এরকমভাবে চলতে চলতে একদিন
চোখের সামনে সমস্ত আলো নিভে যায়। (ওই)

কেননা মৃত্যুকে কোনোভাবেই এড়ানো যায় না — মৃত্যু অমোঘ।

'দৃশ্যান্তর' কবিতায় কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের বার্ধক্যের অন্তিম ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। কবির বয়স বেড়েছে — তাই নিজের শ্রম ও ভালবাসায় গড়া এই সুখের গৃহস্থালির প্রতি মমত্বও বেড়ে উঠেছে। এসব ছেড়ে কোথাও যেতে চান না কবি। কিন্তু সময় বড় নিষ্ঠুর — এ পৃথিবীতে কাউকেই সে চিরস্থায়ী হতে দেবে না — তার করালগ্রাসে টেনে নেবে সবাইকে। কবিতায় কবির এই ভাবনার প্রকাশ দেখি এভাবে :

এই বাড়িঘর দালালকোঠা ফেলে রেখে
কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না;
মনে হয়

Dhaka University Institutional Repository

এইসব একান্ত আপন।
অথচ দমকা হাওয়ার মতো
সমস্ত দৃশ্যকে আলোড়িত ক'রে
সেই ভীষণ মুহূর্ত যখন আসে
যেতে হয়
যেতে দিতে হয়। (দৃশ্যান্তর)

'যেতে হয় / যেতে দিতে হয়' — লাইনগুলো উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সোনারতরী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'যেতে নাহি দিব' কবিতার বিখ্যাত সেই চরণগুলো — যার দ্বারা সম্ভবত কিরণশঙ্কর অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন — যেখানে কবি রবীন্দ্রনাথ উচ্চারণ করেছিলেন বিশ্বের সবচেয়ে নির্মম সত্যবাণী —

এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত ছেয়ে
সবচেয়ে পুরাতন কথা সবচেয়ে
গভীর ক্রন্দন, 'যেতে নাহি দিব'। হায়,
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।[৫৮]

সাত.

এ সমস্ত ধারার কবিতাগুলো ছাড়াও 'মানুষ জানে' কাব্যগ্রন্থে আরো কতকগুলো কবিতা আছে, সেগুলোর বিষয়বস্তু বিচিত্র। এগুলোর মধ্যে কোনোটি রচিত হয়েছে কোনো ব্যক্তির স্মরণে, কোনোটিতে প্রকাশ পেয়েছে জীবনের বারোমাসির বর্ণনা, জন্মভূমির প্রতি গভীর আকর্ষণ, স্মৃতিকাতরতা, সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী নেতাদের প্রতি ব্যঙ্গ; আবার কোনো কবিতায় দেখা যায় কবিকে জনসমুদ্রে মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতে। এধরনের কবিতাগুলো হচ্ছে : 'সমস্ত রাত', 'এই ফাল্গুনের হাওয়া', 'এরকম সময়', 'যাওয়া যায় না', 'এরকমভাবেই', 'ওদের জানতে দাও', 'কবিতা চাইলে', 'পরস্পরের জন্যে', 'দৃশ্যান্তর', 'বৃষ্টির শব্দে', 'এই মুহূর্তের অস্তিত্ব'।

ইঙ্গিতাত্মক একটি দুটি বাক্যে কিংবা চিত্রকল্পে একটি কবিতা পাঠকের মনে কীরকম ভাবানুভূতি অথবা ছবি জাগিয়ে তুলতে পারে তার উজ্জ্বল সাক্ষ্য 'সমস্ত রাত' কবিতা।

সমস্ত রাত সে হাহা করে আকাশের নিঃসঙ্গতায়।
যেন একটি দীর্ঘাঙ্গী এলোকেশী কালো মেয়ে
অন্ধকারে কোথাও হারিয়ে গেছে — তাকে
খুঁজে বেড়ায়। (সমস্ত রাত)

এই কবিতাটি যত সংক্ষিপ্ত, কবির অভিপ্রেত বক্তব্যটি ততই তীক্ষ্ণ। কবিতা লিখতে গেলেই যে খুব একটা গভীর তত্ত্বকথা বলতে হবে, অথবা কোনো কথাকে শ্রমসাধ্য চিত্রকল্প দিয়ে জটিল করে তুলতে হবে, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত তা বিশ্বাস করেন না। তাঁর কবিতায় শব্দের চাতুর্য কম — তাঁর নিজের কাব্যভাষা অত্যন্ত সহজ, সাদাসিধে। অথচ এই সাদাসিধে ভষার সৌরভে তিনি ফুটিয়ে তোলেন চমৎকার ইঙ্গিত।

Dhaka University Institutional Repository

প্রিয় বন্ধু শহিদ সোমেন চন্দের স্মৃতিতে কবি কিরণশঙ্কর রচনা করেন 'এই ফাল্গুনের হাওয়া' কবিতাটি। ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দের এমনই এক ফাল্গুনে সোমেন চন্দ রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের হাতে নির্মমভাবে খুন হন — সেই স্মৃতি এই বার্ধক্যে এসেও কবি ভুলতে পারেন না। হঠাৎ সব দৃশ্য কাঁপিয়ে ফাল্গুনের হাওয়া প্রাচীন বটের শুকনো পাতাগুলো উড়িয়ে নিয়ে যায় — তখন কবির পুরনো সব কথা মনে পড়ে যায়; অনেক পুরনো নাম — যেগুলো কবির কাছে প্রিয় স্পর্শের মতো সজীব। কবির ভাষায় :

ফাল্গুনের হাওয়া দিলেই আমার অনেক পুরনো,
নাম মনে পড়ে,
কয়েকটি নাম এতো প্রিয় যে স্পর্শের মতো
অনুভব করি; (এই ফাল্গুনের হাওয়া)

ফাল্গুনের হাওয়ায় কবির সব গোলমাল হয়ে যায়।

'এরকম সময়' কবিতায় জীবনের বারোমাসি বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে কবি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন সত্তরের দশকের রুদ্ধ সময়ের কথা; জীবনের পরিণতি মৃত্যুতে — সে কথাও বলতে ভোলেন না। কবিতার শুরুতেই কবি আমাদের সময় সম্পর্কে সচেতন করে দিয়ে বলেন,

এরকম সময়
যখন উথাল পাতাল সমুদ্র ঢেউয়ের মতো
সংসার কাঁপছে,
কূপমণ্ডুকও বদ্ধ ঘরে থাকতে চায় না,
বাইরে বেরোয়। (এরকম সময়)

বাইরে জ্যৈষ্ঠের দারুণ রৌদ্রে মাঠে কাজ করে ঘর্মাক্ত কৃষাণ, যে আষাঢ়ে শোনে নদীর ধারে জলের খলখল শব্দ, আর শরতে কাশফুলের গুচ্ছগুলোতে খুঁজে পায় জীবনের আশ্চর্য সজীবতা। হেমন্তে প্রবীণ ব্যক্তির পদশব্দ মিলিয়ে যেতেই — শীতের কুয়াশায় ছেয়ে যায় চারদিক — তখন মাঠের মানুষ বসন্তের অপেক্ষায় থাকে; এবং বসন্ত এলে ঘুম ভেঙে জেগে ওঠে ফের লাল-নীল হলদে ফুলের সমারোহে। এই ভাবে চলতে থাকে জীবনের পরিক্রমণ। কিন্তু জীবনতো অফুরাণ নয় — তারও শেষ আছে। কবিও সেই কথাই বলেন,

অন্ধকার প্রেতলোকে সারাজীবনটাই
খণ্ডিত হতে হতে এক সময়
ফুরিয়ে যায়; (ওই)

'যাওয়া যায় না' কবিতাটিতে দেখি বৃদ্ধ কবি জন্মভূমি বাংলাদেশের প্রতি অনুভব করেন গভীর নাড়ীর টান। এদেশের জলহাওয়ায় তিনি জন্মেছেন, বেড়ে উঠেছেন যৌবনঅব্দি; তাই এখনো তিনি সামনে তাকালেই দেখতে পান —

সেই পুরনো নীল আকাশ,
সবুজ মাঠ, মজা পুকুর,
কখনো মাঠের শেষে

Dhaka University Institutional Repository

এক চিলতে নদী।
[...]
ঝড় এলে গাছ দোলে
পূর্ণিমায় চাঁদের আলোর নীচে
হেসে ওঠে রজনীগন্ধা;
গুন টেনে যেতে-যেতে গান ধরে
নৌকোর বৃদ্ধ মাঝি। (যাওয়া যায় না)

খুব কাছেই কবির শৈশব-কৈশোর-যৌবনের স্মৃতি জাগানিয়া চেনা রাস্তা, সেই চেনা বাড়ি, প্রিয় জন্মভূমি। আজ রওনা দিলে কালই পৌঁছানো যায়।

অথচ যেতে গেলেই
দরজা বন্ধ;
ইচ্ছে হলেই যাওয়া যায় না। (ওই)

কারণ, এখন কবির জন্মভূমি স্বাধীন — স্বতন্ত্র একটি রাষ্ট্র। তিনি যেখানের এখন অধিবাসী — সেখানে থেকে যাওয়ার নানান বাধা। এ কবিতায় জন্মভূমিকে দেখতে চাওয়ার মধ্যে যেমন কবির প্রবল আকুলতা প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি দেখতে না পাওয়ার বেদনায় ঝরে পড়েছে দীর্ঘশ্বাস। একবিতার সহজ সরল ভাষায় আমরাও যেন কবির এই অনুভূতিকে উপলব্ধি করতে পারি।

'এরকম ভাবেই' কবিতায় সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী নেতাদের প্রতি কবির তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে। এ পৃথিবীতে বছরের ৩৬৫ দিনকে স্মরণীয় করে রাখতে বুদ্ধিজীবী-সমাজসেবীদের চিন্তার শেষ নেই। তাই আন্তর্জাতিক শিশু দিবস, নারী দিবস — এ দিবস-সে দিবস — দিবসের অন্ত পাওয়া দুষ্কর। কবি দেখেন এই সব ভণ্ড সমাজপ্রেমীদের মহোৎসবে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জমে ওঠা আবর্জনার স্তূপের কোনো রকম ফের হয় না। তাই যখন এরা গলা ফুলিয়ে বলে,

প্রতিবন্ধীদের জন্যে এ বছর কিছু করা দরকার।
গত বছর শিশুদের জন্যে,
তারও আগে মেয়েদের উদ্ধারের কাজকে মহীয়ান করতে
এসেছিল আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ। (এরকম ভাবেই)

তখন কবির কণ্ঠে ঝরে পড়ে ব্যঙ্গ —

এরকম ভাবেই প্রতি বছর একবার ক'রে আসে
তারপর পাখির মতো মিলিয়ে যায়
সময়ের কুয়াশার ভিতরে
হাজার হাজার সভাপতির প্রস্তাব —
ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনার স্তূপ
যেখানে ছিল সেখানেই পড়ে থাকে। (ওই)

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ স্মরণে রচিত কবির 'ওদের জানতে দাও' কবিতাটি। একবিতায় কবির বক্তব্য হচ্ছে, নিছক রূপকথার রাজ্যে আর শিশুকে পাঠানো উচিত নয়। কেননা এখন সময় হয়েছে ওদেরকে জানানোর কীরকম কঠিন সময়ের মধ্যে ওরা বড়ো হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

কতোটা রূঢ় বাস্তবতার মুখোমুখি ওদের হতে হবে। তাই কবির ভাষ্য :

ওদের জানতে দাও ওদের স্বদেশ
মোটেই রূপকথার রাজ্য নয়;
ওদের জন্যে খাবার
ওদের জন্যে পাঠশালা
ওদের জন্যে খেলার মাঠ —
ওদের নিজেদেরই তৈরী ক'রে
নিতে হবে। (ওদের জানতে দাও)

'কবিতা চাইলে' কবিতায় দেখতে পাই সময়ের নানান অভিঘাতে কবির মানসিকতা আজ বিপর্যস্ত। তাই এখন আর তিনি কবিতা লিখতে পারেন না। কেউ তাঁর কাছে কবিতা চাইলেই তিনি আঁতকে ওঠেন — আকাশ থেকে, পাহাড়চূড়া থেকে ছিটকে পড়েন মাটিতে। অথচ বুকের মধ্যে অনুভব করেন যৌবনের সেই তরঙ্গিত কাব্যভাষা। কবির ভাষায় :

আমার কাছে কবিতা চাইলেই
ঘরের পুরনো ছবিগুলো জীবন্ত হয়ে ওঠে,
ওরা কয়েক নিমেষের জন্যে
আমার স্মৃতিতে তোলে তরঙ্গ,
এক অবিশ্বাস্য আলো হাওয়ার জগতের দিকে
নিয়ে যেতে চায়। (কবিতা চাইলে)

সময়ের কাছে পরাস্ত কবিকে গ্রাস করে হতাশা। কবিতার শেষে শুনি সেই হতাশার ধ্বনি —

আমার কাছে কবিতা চাইলেই
আমি ড্রয়ার হাতড়ে ঘুমের ওষধ খুঁজতে থাকি। (ওই)

'পরস্পরের জন্যে' কবিতায় কবির ভাষ্য হচ্ছে, আর পিছনে তাকানো নয়; কেননা সে-সব অতীত — ধূসর স্মৃতি শুধু। যৌবনের প্রথম শিহরণ যেমন আর ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়, তেমনি ফিরিয়ে আনা যায় না নদীর ঢেউ অথবা জন্মদিনে উপহার পাওয়া গোলাপের আঘ্রাণ। এখন আমাদের সামনের দিকে তাকানোর সময়। বর্তমান সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে আমাদের। বুঝতে হবে পরস্পর পরস্পরকে। কারণ আমরা জানি না সামনে আমাদের জন্যে কী অপেক্ষা করছে। তাই কবি বলেন,

পরস্পরের হৃদয়ের দিকে
একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখতে।
যেন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে
বুঝতে পারি
আত্মত্যাগ, নিদেনপক্ষে স্বার্থত্যাগ
এই মুহূর্তে
আমাদের পরস্পরের জন্যে
কতোটা জরুরী। (পরস্পরের জন্যে)

'এই মুহূর্তের অস্তিত্ব' কবিতায় দেখা যায়, কবি যখন ঘরে থাকেন, পরিবার-বন্ধু-পরিজনের মধ্যে তখন তিনি স্বার্থপর; কিন্তু তিনি যখন ময়দানে লক্ষ জনতার সমুদ্রে এসে মেশেন তখন তিনি আর একক অস্তিত্ব অনুভব করেন না। তখন তাঁর ব্যক্তি

Dhaka University Institutional Repository

পরিচয়, সামাজিক পরিচিতি বিলীন হয়ে যায় — তিনি বিশাল জনতার সঙ্গে এক হয়ে যান। কবির ভাষায় :

[...] এই মুহূর্তে আমার
সামাজিক পরিচয় তুচ্ছ, তুচ্ছ আমার হাতঘড়ি,
মধ্যমায় সোনার আংটি, টেরিকটের জামাপ্যান্টে,
দীর্ঘকালের লেখক-পরিচিতি, চোখের চশমা,
মাথা গুঁজে থাকার মতো নিজস্ব পরিশ্রমে অনেক প্রয়াসে
তৈরী বাড়ি।
এখন আমার কোনো উপবীতের দরকার নেই,
ধমনিটা বুকের বাঁদিকে না ডানদিকে
ঠাহর ক'রে উঠতে না পারলে
এসে যায় না
আমি হাজার লক্ষ কোটি মানুষের একজন
এই সম্মিলিত মানুষের বিশাল শক্তিপুঞ্জের
ঐক্য ও প্রতীকের অংশ হয়েই
আমার এই মুহূর্তের অস্তিত্ব।
(এই মুহূর্তের অস্তিত্ব)

মানবীয় অস্তিত্বের অনুকূলে ব্যক্তির যে কালচেতনা, আকাঙ্ক্ষা, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা, তা এ কবিতায় অবিভ্যঞ্জিত হয়েছে কবি কিরণশঙ্করের জীবনবোধের ইতিবাচকতাকে চিহ্নিত করে।

কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত সময় ও সমাজসচেতন কবি। তাই যে-সমাজ ও সময়ে তাঁর বসবাস, সেই সমাজ ও সময়কে আত্মস্থ করেই জীবনের বিচিত্র রূপ ও রসকে আপন কবিশক্তিতে জারিত করেছেন তিনি। 'মানুষ জানে' কাব্যগ্রন্থেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। সত্তরের দশকের সংরক্ত সময় ও সমাজের অবশ্যম্ভাবী ক্রিয়া বিক্রিয়ার পটপরিসরে কবি এ কাব্যগ্রন্থের বক্তব্য ব্যঞ্জনায়, রূপ ও আঙ্গিকে ভিন্নতর প্রণোদনা সৃষ্টি করেছেন। কবিতার বাহন ভাষা, সে ভাষাও এখন তাঁর কবিতায় কালধর্ম তথা সমাজধর্মকে আত্মস্থ করেই পরিপুষ্ট ও বিকশিত হয়েছে। যেমন —

১. মনে পড়ে
রাত একটায় বাড়ির দরজায়
দুমদাম শব্দ
ওরা তোমার একুশ বছরের ভাইকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল,
সে আর ফিরে আসেনি। (এরকম জ্যোৎস্নায়)

২. মানুষ জানে
দুর্ভিক্ষ আর মন্বন্তরের কালো হাওয়ায়
কীভাবে গড়ে তুলতে হয় ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ।
মৃত্যুর ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে গভীরতর
অন্ধকারে
কীভাবে এগিয়ে যেতে হয়। (মানুষ জানে)

Dhaka University Institutional Repository

ভাষার এই নৈমিত্তিকতায় 'মানুষ জানে' কাব্যগ্রন্থের কবিতার প্রাণস্পন্দন অনেক বেশি সচল ও সংহত হয়েছে। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের ৬৭টি কবিতার মধ্যে একটিও অন্ত্যমিলের কবিতা নেই। ছন্দ বলতে অমিল প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত ও গদ্যছন্দই বর্তমান। উদাহরণ —

অমিল প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত :

শব্দ হচ্ছে অবিরাম। কোথাও জলের
পুরনো কলের মুখ ভেঙে অবিরল
জল পড়ে, রাত তিনটায়
বিশাল পৃথিবী স্তব্ধ, সমস্ত সংসার
নিশ্চিত নিদ্রায় মোড়া, চারদিক
থমথমে, অন্ধকার বিবর্ণ গলিতে
জল ঝরে কান্নার ধারায়। (শব্দ হচ্ছে অবিরাম)

মাঝে মধ্যে অমিল প্রবহমান অক্ষরবৃত্তের কবিতায় অন্ত্যমিল দেবার প্রচেষ্টা লক্ষণীয় :

আজ শুধু শক্ত রেখে রক্তঝরা পায়ের গোড়ালী
আর হাতের আঙুল
জেনে নিতে হয় যতো বিজ্ঞাপিত ভুল;
শুষ্ক পাতা উড়ে যায় ঝড়ের হাওয়ায়
মেঘের ভ্রূকুটি যেন স্বৈরাচার মুছে দিতে চায়,
সড়কে এখন রক্ত, তার পাশে পড়ে আছে ফুল। (সড়কে এখন রক্ত)

গদ্যছন্দ :

১. ওরা এখন মাথা নিচু ক'রে আছে, সেভাবেই
ওদের থাকতে দাও।
ওদের সামনে পেছনে সারিবদ্ধ বুটের শব্দ,
মাথা তুলতেই মৃত্যু। (একমাত্র তখনই)

২. গত রাতের এক পশলা বৃষ্টির পর
এখনো কয়েক ফোঁটা জল
ধরে আছে
সবুজ কচি পাতা।

মনেও হয় না প্রকৃতির শরীরে কোথাও কোনো
গোপন ক্ষত আছে। (বৃষ্টির পর)

'মানুষ জানে'র কবিতাসমূহে অলংকারের প্রয়োগও খুব বেশি লক্ষযোগ্য নয়। পারিপার্শ্ব এবং অবস্থান-প্রসঙ্গ প্রকাশের জন্যে কবি ব্যবহার করেছেন কতগুলো সরল উপমা ও উৎপ্রেক্ষা। সংখ্যায় তাও নিতান্তই অল্প। একটা দুটো অনুপ্রাস, সমাসোক্তি ও চিত্রকল্প কবির সহজাত অভ্যাসবশেই কবিতায় স্থান লাভ করেছে। উদাহরণস্বরূপ :

শব্দালংকার

সরল অনুপ্রাস :

১. সেইসব মহামহিম মানুষের কাছে (প্রতিরোধ)

২. নদীর ধারে জলের খলখল শব্দ। (এরকম সময়)

ছেকানুপ্রাস : এখন সমস্ত নীলিমায় মেঘের স্তরে প্রশান্তি (ভোরের এই মুহূর্তটি)

Dhaka University Institutional Repository

অর্থালংকার

উপমা :
১. তাপ কমতে কমতে একদিন / সমস্ত শরীরটাই
বরফের মতো শীতল হয়ে যাবে। (একদিন)

২. বোতাম টিপলেই ভূমিকম্পের মতো শব্দ। (মনে রেখো)

৩. আমি বন্যার মতো দুরন্ত নই কখনো
বজ্র আর বিদ্যুতের মতো প্রচণ্ডও নই। (উত্তরসূরীদের জন্যে)

৪. দ্রুত এগিয়ে চলে নদীর ঢলের মতো / ঘটনাস্রোত (ইতিহাস)

৫. বহুদিনের পুরনো একটি মুখের মতো / তার স্মৃতি; (এখন তুমি)

উৎপ্রেক্ষা :
১. প্রতিদিন ভোরের আকাশে আলোর কুমকুম,
মনে হয় সময়-সমূদ্রে
আলোর ঢেউয়ের মতো পৃথিবী কাঁপছে... (এরকম সময়)

২. সূর্য সবে উঠছে, ভোরের সূর্যের
প্রথম আভাকে সিঁদূরের মতো
পবিত্র মনে হয়। (ভোরের এই মুহূর্তটি)

৩. সারা আকাশ
যেন এক বিশাল আদিম পাখির মতো হয়ে যায়। (গভীর ঘুমের জন্য)

সমাসোক্তি :
১. টেবিল থেকে ওই উড়ে পালালো খবরের কাগজ;
পাশের বাড়ির ছাদ থেকে একটি পুরনো পোস্টকার্ড
উড়ে এসে দু'দণ্ড দাঁড়ালো জানলার পাশে,
তারপর পাখা মেলে আবার কোথাও উধাও। (এই হাওয়া)

২. যে শস্যক্ষেত সমস্ত রাত আকাশের নক্ষত্রের নীচে
হাওয়া আর অন্ধকারের ভেতর ঘুমিয়ে ছিল,
তার চোখ এখন উন্মিলীত,
প্রতিবেশী গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে
সে তার অবস্থান বুঝে নিতে চায়। (ভোরবেলা)

চিত্রকল্প :
সামনে তাকালেই
সেই পুরনো নীল আকাশ,
সবুজ মাঠ, মজা পুকুর,
কখনো মাঠের শেষে
এক চিলতে নদী। (যাওয়া যায় না)

আশাবাদী কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত এই রক্তাক্ত বিরুদ্ধ সময়ের মধ্যেও হৃদয়ে যে গভীরভাবে জীবনের সজীবতাকে লালন করেন তা এই চিত্রকল্পে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে অপরূপ মাধুর্যে।

Dhaka University Institutional Repository

৯. ছায়া হেঁটে যায়

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'ছায়া হেঁটে যায়'। কলকাতার *প্রমা* থেকে প্রকাশিত এ গ্রন্থে প্রকাশকাল উল্লেখ না থাকায় এটি ঠিক কখন প্রকাশ পেয়েছিল তা নির্ণয় করা বেশ জটিল। ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত কবির 'দৃশ্য বদলের দিন' কাব্যগ্রন্থে 'ছায়া হেঁটে যায়'-এর প্রকাশকাল উল্লেখ করা হয়েছে ১৯৯২ বলে; এবং ১৯৯৭-এ প্রকাশিত কবির 'আশি-নব্বুই-এর কবিতা' গ্রন্থে 'ছায়া হেঁটে যায়'-এর প্রকাশ হবার তারিখ লেখা রয়েছে ১৯৯১। 'সাহিত্যচিন্তা'র সর্বশেষ সংখ্যায় (রণেশ দাশগুপ্ত ও কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত স্মরণসংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৮) কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের বইয়ের তালিকাতে 'ছায়া হেঁটে যায়'-এর প্রকাশকাল ১৯৯২ লেখা হয়েছে। ১৯৯৪তে লেখা এক প্রবন্ধে সমালোচক নীলরতন সেন 'ছায়া হেঁটে যায়' কাব্যগ্রন্থটি ১৯৯১-এ প্রকাশিত বলে মত প্রকাশ করেছেন।[৫৯] সবগুলো তথ্য যাচাই করে বর্তমান গবেষকের কাছেও গ্রন্থটি ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত বলেই যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে। এ গ্রন্থে ১৯৫৫ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত রচিত এবং পূর্বপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলোতে অপ্রকাশিত কবি কিরণশঙ্করের মোট ৫৭টি কবিতা সংকলিত হয়েছে। এর মধ্যে ১৯৫৫-তে ১টি, '৫৬-তে ৪টি, '৫৮-তে ১টি '৬৩-তে ৩টি, '৬৪-তে ১টি, '৬৬-তে ২টি, '৬৭-তে ১টি, '৬৮-তে ৪টি, '৭০-এ ১টি, '৭১-এ ১টি, '৭৭-এ ১টি, '৭৮-এ ১টি, '৭৯-তে ১টি, '৮০-তে ১টি, '৮২-তে ১টি, '৮৪-তে ১টি, '৮৬-তে ৩টি, '৮৭-তে ৫টি, '৮৮-তে ৫টি, '৮৯-এ ৪টি, ১৯৯০-এ ২টি এবং তারিখ বিহীন ১৩টি কবিতা রচিত। নিচে এক নজরে বোঝার জন্যে ছকের মধ্যে কবিতার রচনাকাল, শিরোনাম ও সংখ্যা উল্লেখ করা হল :

রচনাকাল	কবিতার শিরোনাম	সংখ্যা
১৯৫৫	'নির্ঝর'	১টি
১৯৫৬	'কথা', 'উৎকণ্ঠা', 'সময়', 'বোবা রাতের কান্না'	৪টি
১৯৫৮	'আরো কিছু চায়'	১টি
১৯৬৩	'ভালোবাসা', 'রাত্রি তুমি যতো পারো', 'পাখিরা আসে না আর'	৩টি
১৯৬৪	'কে তুমি তৃষ্ণায়'	১টি
১৯৬৬	'জীবন আমার কাছে', 'বড়োই আশ্চর্য লাগে'	২টি
১৯৬৭	'অন্ধকারে একা'	১টি
১৯৬৮	'শীত', 'যদি দেখতাম', 'রক্ত ঝরে', 'রেঁস্তোরা'	৪টি
১৯৭০	'বড়ো দ্রুত সব মিলিয়ে যায়'	১টি
১৯৭১	'দরজায় টোকা পড়েছে'	১টি
১৯৭৭	'বাতাস যেদিক থেকে'	১টি

Dhaka University Institutional Repository

রচনাকাল	কবিতার শিরোনাম	সংখ্যা
১৯৭৮	'একটু দাঁড়িয়ে যাও'	১টি
১৯৭৯	'জটিল গভীরে'	১টি
১৯৮০	'স্বপ্নকে দুচোখে রেখে'	১টি
১৯৮২	'তোমার প্রতিমা'	১টি
১৯৮৪	'ছায়ার আড়াল দিয়ে'	১টি
১৯৮৬	'উড়ে যায় পাখির পালক', 'একবার স্থিরতাকে' 'অভিগমনের দিকে'	৩টি
১৯৮৭	'ভয়', 'চেনা-অচেনা', 'নিরাময় হবে ভেবে', 'নক্ষত্র জয়ের পর', 'কে কখন যাবে'	৫টি
১৯৮৮	'কথা', 'মাঠ, নদী, পথ', 'ছায়া হেঁটে যায়', '১২৫তম জন্মদিনে', স্মৃতি হয়ে যায়'	৫টি
১৯৮৯	'দেখলাম দীর্ঘকাল', 'বিস্তীর্ণ মরুর একপাশে', 'উত্তর মেলেনা', 'শুধু যাদুকর'	৪টি
১৯৯০	'যখন নিষেধ করি', 'কিছু পরাজিত লোক'	২টি
তারিখবিহীন	'পদশব্দ', 'রাতে তুই এসেছিলি', 'হারিয়ে যাবার পথ', 'মূল্যবান বোধগুলো সব', 'কে তুমি আড়ালে', 'এই রাতে', 'পরিত্রাণ', 'জ্যোৎস্নালোকে দৃশ্য', 'কিছুক্ষণ স্থিরতাকে পেলে', 'বৃক্ষের হৃদয়', 'আজ নয় অন্য দিন', 'এমন একাকী', 'শিকড়ের দিকে'	১৩টি

'ছায়া হেঁটে যায়' কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে 'শ্রীদীপক রুদ্র'কে।

'ছায়া হেঁটে যায়' সম্পর্কে সাধারণভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে, এ গ্রন্থে বিশেষ কোনো নতুন ধারা সংযোজিত হয় নি, পূর্বোক্ত ধারাবাহিকতাই বজায় রয়েছে। তবে কবিতার দীর্ঘ নামকরণ এ কাব্যগ্রন্থের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে। আলোচনার সুবিধার্থে এ গ্রন্থের কবিতাগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হল :

এক. সময় অনুভবজাত কবিতা
দুই. আশাবাদী কবিতা
তিন. প্রেম অনুভবজাত কবিতা
চার. মৃত্যুভাবনাজাত কবিতা
পাঁচ. বিবিধ বিষয়ক কবিতা

Dhaka University Institutional Repository

এক.

১৯৫৫ থেকে ১৯৯০ এই দীর্ঘ সময়ে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলায় তথা সমগ্র পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধ, বিদ্রোহ, রাজনৈতিক বিপ্লব, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্তিসহ ঘটে গেছে অনেক ঘটনা। সেই সব ঘটনা ও দুর্ঘটনার কোনোটির প্রত্যক্ষ, কোনোটির পরোক্ষ সাক্ষি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত নিজে। তাই এই সময়পরিসরে রচিত তাঁর অনেক কবিতায়ই তার ছাপ সুস্পষ্ট। 'ছায়া হেঁটে যায়' কাব্যগ্রন্থের কিছু সংখ্যক কবিতায়ও দেখা যায় কবি সময়কে যখন যেভাবে অনুভব করেছেন, প্রত্যক্ষ করেছেন, তার সহজ-সরল প্রকাশ। এ ধারার কবিতাগুলো হচ্ছে : 'দেখলাম দীর্ঘকাল', 'চেনা অচেনা', 'অন্ধকারে একা', 'পদশব্দ', 'বাতাস যেদিক থেকে', 'উড়ে যায় পাখির পালক', 'একবার স্থিরতাকে', 'কিছুক্ষণ স্থিরতাকে পেলে', 'ছায়ার আড়াল দিয়ে', 'বড়োই আশ্চর্য লাগে', 'সময়', 'রক্ত ঝরে', 'পাখিরা আসে না আর', 'দরজায় টোকা পড়েছে'।

'দেখলাম দীর্ঘকাল' কবিতায় কবি কিরণশঙ্কর সময়কে অনুভব করেছেন মহাকাল রূপে। একসময় যে মানুষ শুধু প্রত্যয়ের জোরে স্বপ্নের প্রাসাদ গড়ে তুলেছিল — সাজিয়েছিল সংসার; যেখানে ছিল না কোনো রাজা, রানি কিংবা ডিকটেটর। শুধু ছিল একদল বিশ্বস্ত মানুষ;

যারা আজ্ঞাবহ দাসমাত্র নয়
কাদায় বানানো নয় কিংবা যৌনতার ব্যূহে
নারীভুক অন্ধ নয়, যারা বরাবর
সজাগ সতর্ক আর দুর্গতের আসন্ন উদ্ধারে
একান্ত প্রয়াসী। (দেখলাম দীর্ঘকাল)

তাদেরকেও একদিন ঘিরে ধরে কিছু ক্লান্তি, কিছু বিষণ্ণতা। কেননা সময়ের রথের চাকা অবিরাম এগিয়ে চলে। আর সেই সময়-রথের চাকায় সংসার যাত্রায় ক্লান্ত অবসন্ন মানুষের সমস্ত শুভবোধ, সুন্দর স্বপ্ন, স্বপ্নের প্রাসাদ তছনছ হয়ে যায়। মহাকালের রথের চাকায় তারা পিষ্ট হয়, আর্তনাদ করে। মহাকাল সেই আর্তনাদে ভ্রুক্ষেপও করে না — সে থাকে অন্ধ-বধির-উদাসীন। কবির ভাষায় :

বর্শাবিদ্ধ দিনগুলি সময়ের মরচে-পড়া চাকার
ভিতরে
আর্তনাদ তুলে
নিমেষে হারিয়ে যায় মহাশূন্যতায়,
তুমি থাকো উদাসীন, লুপ্ত গন্ধ স্পর্শ বোধ ...
কালের পাথর। (ওই)

'চেনা অচেনা' কবিতাটিতে ফুটে উঠেছে আশির দশকের দুঃসময়ের চিত্র। সময় এখন এতটাই খারাপ যে কবির কাছে তাঁর চেনা মুখগুলোও বড্ড অচেনা মনে হয়। কবি তাই নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করেন —

Dhaka University Institutional Repository

মৃত্যু ও জন্মের
মধ্যবর্তী প্রান্তে এসে এখন তুমিও
কোনদিকে যাবে? (চেনা অচেনা)

কেননা এখন,

বালুতে চড়ায় দিকে দিকে
মৃত অস্থি নষ্ট ফুল,
পথরেখা নিশ্চিহ্নপ্রায়, (ওই)

প্রিয়ার কুন্দশুভ্র বাহু, শরীরী মনোরম সান্নিধ্যও সময়ের এই রূঢ়তায় কবির কাছে এখন শুধুই অস্পষ্ট স্মৃতি। তিনি শুধু দেখতে পান —

বাইরের মেঘ গর্জে ওঠে: ফানুস মুখোস
জ্বলে যায় গলে যায় বিদ্যুৎ-আগুনে। (ওই)

আর কেবলি নিজেকে প্রশ্ন করেন —

এ সময়ে কোনদিকে যাবে? (ওই)

'অন্ধকারে একা' কবিতাটিতে কবির কেবলি মনে হয় এখনই ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটবে; যার জন্যে তিনি সমস্ত শরীরে অনুভব করেন শীত শীত কাঁপুনি — কল্পনায় জ্বরে বেহুঁশ হয়ে চোখের সামনে দেখতে পান অন্ধকারে বিন্দুবিন্দু অসংখ্য বুদ্বুদ। কবি বুঝতে পারেন সময়ের ভয়ানক থাবা থেকে তিনি কিছুতেই নিষ্কৃতি পাবেন না। তাই অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করেন সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তটি দেখবার জন্যে।

আমি দূর থেকে দেখি
সমস্ত নীলিমা যেন তোমাকেই গোপনীয় স্থানে
নিয়ে যেতে চায়; তুমি নীলিমায় মেঘলীন
মুখের যৌতুক কোথাও গচ্ছিত রেখে
হয়তো ভীষণ কিছু ঘটবেই তার প্রতীক্ষায়
অন্ধকারে একা, সচকিত। (অন্ধকারে একা)

'পদশব্দ' কবিতায়ও দেখা যায় কবি একটা ভয়ংকর দুঃসময়ের আগমনের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন — যে সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে যাবে বলে অভিযানে বেরিয়েছে। তার,

পদশব্দে ভরে যায় পৃথিবী, সময়...
দারুণ ঝড়ের মুখোমুখী
দ্রুততম অভিযানে চকিত শহর
এখন উদ্বেল। (পদশব্দ)

এই দুঃসময়ের সঙ্গে মোকাবেলা করার জন্যে এখন কেবল সহিষ্ণুতা আর স্থিরতার গভীর প্রত্যয় প্রয়োজন। যেরকম —

মহৎ বৃক্ষের স্নায়ু ঝড়ের হাওয়ায়
ক্রুদ্ধ হতে জানে অথচ নিমেষে
ফল দেয় ছায়া দেয়
প্রয়োজন মতো। অথবা যেমন
কালো কালো মেঘগুলো ভ্রুকুটি কুটিল

Dhaka University Institutional Repository

অথচ সময় হলে
কাঠফাটা রৌদ্রে সারা মাঠে
ছায়া দিতে জল দিতে জানে,
আনে স্নিগ্ধ ধারা। (ওই)

সেরকম কৌশলী এবং ধৈর্যধারণ করে জয়ী হবার বাসনায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে পারলেই এই দুঃসময়ের কবল থেকে মুক্তি মিলতে পারে বলে কবি বিশ্বাস করেন। এবং সেই বিশ্বাসেই তিনি উচ্চারণ করেন —

পদশব্দে আদিগন্ত পৃথিবী, সময়
কাঁপছে কেবল। অদৃশ্য সংকেতগুলো
জেনে নিতে বুকে নিতে হলে
জ্বরের রুগীর হাতে কমলা লেবুর মতো
স্থিরতার বড়ো প্রয়োজন। (ওই)

'বাতাস যেদিক থেকে' কবিতাটিতে হাওয়া যেন সময়েরই প্রতিভূ। বাতাসের প্রতিকূলে যেমন চলা যায় না — কষ্টকর, তেমনি সময়ের বিরুদ্ধেও কেউ কোনোদিকে যেতে পারে না। এই বাতাস যেমন ওই চায়ের দোকানের বালক, ফুটপাথের ভিখিরী, মাঠের বক্তা কিংবা প্রেমিকের মন ছুঁয়ে যায় কিন্তু ধরা দেয় না — সময়কেও শুধু অনুভব করা যায়, তাকে ছোঁয়া যায় না। হাওয়া কিংবা সময় কোনোটাকেই ঠিকমতো বোঝা যায় না। সেজন্যেই কবি বলেন —

প্রবল হাওয়ার টানে মাঝে মাঝে
সব দৃশ্য কাঁপে।
কোথা থেকে আসে ওই হাওয়া,
এরকম তরঙ্গ উচ্ছল! (বাতাস যেদিক থেকে)

'উড়ে যায় পাখির পালক' কবিতায় দেখা যায় এই পৃথিবীর আপাত সরল জীবনযাত্রার পেছনেই লুকিয়ে আছে দুঃসময়ের গভীর কালো অন্ধকার। এই অরণ্য, নির্মেঘ নীলাকাশ, স্রোতস্বিনী নদী, মধ্যাহ্নের সূর্য, জনজীবন নিমেষেই অন্ধকারে তলিয়ে যাবে।

পশ্চিমে সন্ধ্যার সূর্য, দূর নীলে
রাঙাভাঙ্গা মেঘে
চুম্বনের শেষ বর্ণচ্ছটা;
পুরনো মন্দিরগাত্রে এসে পড়ে এককোণে
নিমিষের জন্য শেষ রোদ,
একটু বাদেই চতুর্দিকে
সব দৃশ্য অন্ধকার মসীলিপ্ত হবে। (উড়ে যায় পাখির পালক)

কবি এই ভয়ংকর সময়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চান, তাই হৃদয়মথিত করে উচ্চারিত হয় তাঁর আকুল জিজ্ঞাসা —

কোন দিকে গেলে স্থির প্রাজ্ঞ হওয়া যায়
সে নিশানা দেবে এই হাওয়া?
ভয়ংকর এই শূন্যতায়? (ওই)

Dhaka University Institutional Repository

'একবার স্থিরতাকে' কবিতাটি একটি সনেট। এ কবিতায় দেখা যায় আজকাল সময়ের দুর্বার চলার গতির সঙ্গে কবি তাল মেলাতে পারছেন না। এত দ্রুত বদলে যাচ্ছে সব যে তিনি হিমসিম খাচ্ছেন মানুষের মুখ আর মুখোশের ফারাক চিনে নিতে। এখন সময়ের সমুদ্রস্রোতে সবাই যেন প্রতিযোগী — প্রত্যেকের মনে হিংসার আগুন; একে অপরকে হত্যা করার জন্যে সবাই প্রস্তুত। কবি এই ধাবমান সময়ের ফাঁকে একটুখানি স্থিরতার খোঁজ করেন। কেননা একটু স্থিরতা পেলে তিনি ভাল করে স্বজনের মুখরেখা চিনে নিতে পারতেন। কবির ভাষায় :

একবার স্থিরতাকে পেলে খুব কাছাকাছি এসে
স্বজনে নির্জনে সব মুখরেখা নেয়া যেত চিনে:
স্বভাব চিহ্নিত হোত মুখ আর মুখোশের দেশে,
স্বেদ রক্ত ক্ষরণের লগ্ন স্থির হোত এ দুর্দিনে।
সময় সমুদ্রস্রোতে প্রতিযোগী হিংসার আগুনে
বিশ্ব কাঁপে, হাত রাখে তীরন্দাজ নিজ নিজ তূণে। (একবার স্থিরতাকে)

'ছায়ার আড়াল দিয়ে' কবিতাটিতে কবি উপলব্ধি করেন, ছায়ার আড়াল দিয়ে সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকারের আগমনের মতো এই সময়ে এই দেশে ছদ্মবেশী গুপ্ত ঘাতকেরও অনুপ্রবেশ ঘটছে। ছদ্মবেশী শত্রু প্রতিটি মানুষের মনে ছড়িয়ে দিচ্ছে বিষ — বিঘ্নিত হচ্ছে শান্তি — বাড়ছে ভ্রাতৃঘাতী দ্বন্দ্ব। কবির ভাষায় :

ঘটনার রক্ত থেকে প্রতিদিন ছায়ার বিস্তার,
ভ্রাতৃঘাতী দ্বন্দ্ব বাড়ে, বাড়ে দ্বেষ বিচিত্র স্বদেশে,
যে মহীরুহ ছিল শান্তি কিংবা কল্যাণ প্রতীক —
আজ তার প্রতি অঙ্গে ছড়িয়ে দিয়েছে কেউ বিষ,
ছায়ার আড়াল দিয়ে গুপ্ত শত্রু আসে ছদ্মবেশে। (ছায়ার আড়াল দিয়ে)

'বড়োই আশ্চর্য লাগে' কবিতায় মানুষের নিরন্তর উচ্চতার পানে ছুটে চলাটাই কবির কাছে বড়োই আশ্চর্য লেগেছে।

বড়োই আশ্চর্য লাগে এইসব ভ্রান্ত পরিক্রমা।
সবাই প্রত্যহ যেন ছুটে যাচ্ছি উচ্চতার দিকে,
কোনো তীক্ষ্ণ আকাঙ্ক্ষার পাহাড়ের শীর্ষে পৌছাবার
ভয়ঙ্কর প্রস্তুতিতে অপসৃয়মান দৃশ্য দোলে। (বড়োই আশ্চর্য লাগে)

ধাবমান সময়ের স্রোতে এখন কেউই স্থিত নয়, কারো উচ্চারণে নেই শান্ত সমাহিতি; সবাই ভীত সন্ত্রস্ত। মিথ্যার মোহময়ী চাকচিক্যে কেউ কেউ সংসার যাত্রায় চরমভাবে ব্যর্থ। তবু শীর্ষস্থানে পৌছে যাবার বাসনা মরে না। তাই কবি বলেন —

সমস্ত নগরীময় অন্ধ নিয়মের নাগপাশে
বড়োই বিভ্রান্ত লাগে এইসব হিংস্র পরিক্রমা;
পাহাড়ে উঠতে সাধ একবার পতনের আগে। (ওই)

'সময়' কবিতায় কবি সময়কেই বন্দনা করেছেন। কবিতার শুরুতেই কবি বলে নেন,

সময়, তোমাকে আমি কী বলে যে সম্বোধন করি
সে-কথাই ভাবি। কী রূপকে আছ বাঁধা জীবনের
গ্রন্থিতটে; (সময়)

Dhaka University Institutional Repository

কবি সময়কে দেখবেন বলে নিরন্তর পরিক্রমণ করছেন — এই পরিক্রমায় তিনি হারিয়েছেন প্রিয় শৈশব, কৈশোর, যৌবনের স্বপ্নময় দিনগুলো। এখন দন্তহীন বার্ধক্যে এসে উপলব্ধি করছেন সময়কে তিনি কখনো পরিপূর্ণ রূপে দেখতে পান নি — যেটুকু দেখেছেন প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা, চুম্বনের গাঢ় সান্ত্বনায় অথবা হিংসা দ্বেষে — সবই সময়ের খণ্ডিত রূপ। সেকারণেই কবির ভাষ্য :

সর্বত্রই আয়ুর সোপানে
জন্মহীন অন্তহীন অবজ্ঞাত লগ্নের সন্ধানে
নিরন্তর পরিক্রমা; তোমাকে যে দেখব কোথায়
স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে, জানি না তো। কেবল দেখেছি
তোমার খণ্ডিত রূপ জগেত জীবনে নানারূপে:
প্রেম প্রীতি ভালোবাসা, চুম্বনের গাঢ় সান্ত্বনায়
অথবা হিংসায় দ্বেষে, বেদনার বঞ্চনার স্তূপে
আমরা সবাই কিন্তু তোমাকেই শরীরে মেখেছি। (ওই)

'রক্ত ঝরে' কবিতায় ফুটে উঠেছে বিশ্বব্যাপী রক্তাক্ত সময়ের চিত্র। এখন এমন সময় যে মানুষের কাছে রক্তের কানাকড়িও মূল্য নেই। তাই সে অনায়াসে ভালবাসা, স্নেহ, মমতা বিসর্জন দিয়ে অতি আপনজনকেও রক্তাক্ত করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত তাই ব্যথাদীর্ণ কণ্ঠে উচ্চারণ করেন —

সারাক্ষণ রক্ত ঝরে। আফ্রিকায়,
ভিয়েটনামে, দক্ষিণ মার্কিনে,
রক্তকণিকার দাম কেউ আর
দেয় না একালে।
রক্ত ঝরে অরণ্যে পর্বতে লোকালয়ে
নীল দ্বীপে, সবুজে সুনীলে মর্মরিত
দৃশ্যপটে, অবিরাম...
রক্ত ঝরে কত অনায়াসে। (রক্ত ঝরে)

'পাখিরা আসে না আর' কবিতাটিতেও পাওয়া যায় দুঃসময়ের ছাপ। মানুষের সঙ্গে পাখির সম্পর্ক অতি প্রাচীন এবং নিবিড়। একে অপরের সান্নিধ্য ভালবেসে সৃষ্টির আদিম লগ্ন থেকে মানুষ ও পাখি ছিল আত্মার শরিক। কিন্তু যখন থেকে সময় রুদ্র মূর্তি ধারণ করেছে, তখন থেকেই সবার অগোচরে মানুষের এই অকৃত্রিম বন্ধু পাখিরা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। তাই দু-একটা কাক পাখি ছাড়া আজকাল আর কোনো পাখির দেখা মেলে না — এমন কি ঋতুরাজ বসন্তেও না। কবি তাই আক্ষেপ করে বলেন —

তারপর ফের তারা অরণ্যে সমুদ্রে গেল উড়ে
অদৃশ্য কখন হলো দূরতম নীলান্ত গভীরে
সেখবর কেউই রাখি না। এই রক্তঝরা রুদ্র দিনে
পাখিরা আসে না আর এমন কি বসন্তে ফাল্গুনে।
(পাখিরা আসে না আর)

'দরজায় টোকা পড়ছে' কবিতাটিতে দেখি কবি যেন একটা অস্থির সময় পার করছেন, তাই সন্ত্রস্ত। দরজায় টোকা পড়লেই যেন তাঁর মনে হয় কেউ আবার দুঃসংবাদ নিয়ে এল।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিদিন নানান দৈনিকে এত খবর পড়েন আর সেগুলোর মধ্যে এতগুলো দুঃসংবাদ থাকে যে দুশ্চিন্তায় রাতে কবির ঘুম পর্যন্ত হয় না। তিনি অসুস্থ বোধ করেন। কবির ভাষায় :

ভীষণ কৌতুককর মনে হচ্ছে এখন নিমেষ,
ঘর যেন দুলে উঠছে শরীরেও তাপ বড়ো বেশি;
দরজায় টোকা পড়ছে নতুন খবর কিছু নাকি,
ভিয়েৎনামে যুদ্ধ শেষ : এ খবরের আর কতো বাকি।
(দরজায় টোকা পড়ছে)

'কিছুক্ষণ স্থিরতাকে পেলে' কবিতায় দেখতে পাই, কবির চারপাশে এত বিশৃঙ্খল শব্দ, এত কোলাহল যে কবি তা কিছুতেই সহ্য করতে পারছেন না। এই জীবনের যা কিছু সুন্দর, মনোরম — ফুল, ভালবাসা, অতীতের সুখস্মৃতি সবকিছু শব্দের শরে শরবিদ্ধ হয়, কোথায় হারিয়ে যায় সমুত্থিত শব্দের আড়ালে। কবির কেবলি মনে হয় চারদিকে —

হাহাস্বরে অট্টরোলে কী নিষ্ঠুর করতালি বাজে।
যেন কোনো শান্ত মৃগশিশু
ধরা পড়ে গেছে হিংস্র নিষ্ঠুর ব্যাধের
সুবিস্তীর্ণ জালে। (কিছুক্ষণ স্থিরতাকে পেলে)

শুধু মৃগশিশু নয়, আমরাও আজ এই বৃহৎ শব্দময়তায় মিশে গেছি — এক মহা তীব্র আর্তনাদে সবাই একাকার। কিন্তু কবি এই হিংস্র-নিষ্ঠুর জনকোলাহল থেকে সরে নির্জন নিস্তব্ধ কোনো জায়গার খোঁজ করেন। একটু সুস্থির হতে চান —

কিছুক্ষণ স্থিরতাকে পেলে ভালো হ'তো।
অন্তত বন্ধুর মতো তার কাছে বসে
স্মরণের ঝাঁপি খুলে অতীতের অজস্র স্মৃতির
উপাদেয় ফুলগুলি হাতে তুলে নিয়ে
খুসী হওয়া যেত। (ওই)

এবং বিশৃঙ্খল শব্দের যন্ত্রণা ভুলে স্মরণীয় দৃশ্যের আড়ালে আকাঙ্ক্ষার প্রতিমার দিকে তাকানোর সময় পাওয়া যেত; ঐকান্তিক ভালবাসা দিয়ে সাজানো যেত একান্ত গোপন প্রহর। কবির ভাষায় :

কিছুক্ষণ স্থিরতায় আকাশ পৃথিবী ফুল
ঐকান্তিক ভালোবাসা দিয়ে
সাজাতাম একবার গোপন প্রহর। (ওই)

বিরূপ সময়েও কবির এই আশাবাদী ভাবনা পরবর্তী ধারার কবিতাগুলোতে আরো স্পষ্ট হয়েছে।

দুই.

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের কবি-মানস আশাবাদে সুস্থির। সময়ের দুর্বিপাকে কখনো কখনো কবি হতাশগ্রস্ত হলেও তাঁর কবিতায় আশাবাদের সুরই প্রধান। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থেও কিছু সংখ্যক কবিতায় কবির আশাবাদী মনোভাবের সুস্পষ্ট সাক্ষর বর্তমান। এ ধারার

Dhaka University Institutional Repository

কবিতাগুলো হচ্ছে : 'ভয়', 'মাঠ, নদী, পথ', 'মূল্যবান বোধগুলো সব', 'বোবা রাতের কান্না', 'স্বপ্নকে দুচোখে রেখে', 'পরিত্রাণ', 'অভিগমনের দিকে' ও 'শিকড়ের দিকে'।

'ছায়া হেঁটে যায়' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা 'ভয়'। কবিতার শুরুতেই দেখি—

ভয়ের অনেক উপাদান
আছে পৃথিবীতে। উদ্বেগে সন্ত্রাসে
সর্বত্র সংসার কাঁপে,
ভাঙে ঘর,
বিমর্ষ নগর। (ভয়)

অদৃশ্য কারো হিংস্র হাত পৃথিবীর যাবতীয় সুন্দরকে ধ্বংস করতে চায়। কিন্তু মানুষ কিছুতেই হার মানতে রাজি নয়; সে আশাবাদী। তাই সমস্ত বাধা অতিক্রম করে মানুষ তার সৃষ্টির ধারা অব্যাহত রাখে—

তবু কোথাও এখনো
মানব মানবী
আলো চায়, রক্ত মোছে,
ভাঙা ঘর বাঁধে, গান গায়
পশরা সাজায়। (ওই)

'মানুষ জানে' কাব্যগ্রন্থের 'রাস্তা, মাঠ, নদী' কবিতায় দেখেছিলাম হতাশা কাটিয়ে কবি আশাবাদের কথা শোনাচ্ছেন। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের 'মাঠ, নদী, পথ' কবিতাটিতেও সেই একই সুরের অনুরণন শোনা যায়। কবি জানেন, মাঠের সবুজ ভূমি শস্যের ভাঁড়ার, কিন্তু তিনি দেখতে পান না; নদীর শীতল জলে বিমর্ষ মনের জ্বালা জুড়াতে গিয়ে তিনি জলের বদলে দেখতে পান বালু; পথও তাঁকে নিয়ে যেতে চায় ক্রমশ জটিল আঁধারের দিকে। তবুও কবি নিরাশ হন না—প্রকৃতিই তাঁর বুকে জাগিয়ে রাখে আশার আলো; আর তাই আশাবাদী কবি উচ্চারণ করেন—

মনে হয় এই আলো নিয়ে
কোথাও মানুষ
একদিন অমরতা খুঁজে পাবে,
নিরাময় হবে তার
অসুস্থ শরীর। (মাঠ, নদী, পথ)

ঠিক এর উল্টো সুরের কবিতা হচ্ছে 'মূল্যবান বোধগুলো সব'। এখানেও বৃক্ষ আছে, নদী আছে, পথও আছে—কিন্তু কোনোটিই আশা জাগায় না কবির মনে। বরং কবির কাছ থেকে,

সমস্তই ধীরে ধীরে যেন
আবছা ছায়ার মতো
সরে যাচ্ছে দূর অন্তরালে। (মূল্যবান বোধগুলো সব)

কবি ভীষণভাবে হতাশ। কোথাও দেখতে পান না সামান্য আশার আলো। আর তাই তিনি চেয়ে চেয়ে শুধু দেখেন,

স্নায়ু থেকে মুল্যবান বোধগুলো সব
ঝরে ঝরে পড়ছে এখন:

Dhaka University Institutional Repository

একটি দুটি ফুলের মতোন
টুপটাপ শব্দাবলী হৃদয়সৈকতে
নিয়তই মিশে যাচ্ছে সন্তপ্ত বালুতে। (ওই)

'বোবা রাতের কান্না' কবিতায় ফুটে উঠেছে নিরুচ্চার রাতের দীর্ঘ যন্ত্রণার ইতিহাসের চিত্র। রাতের বুকে অনেক কালের দুর্বিষহ ভার, অনেক ব্যথায় তার মুখ পাংশু-কঠিন, রক্তক্ষত বুক। তার বুক রক্তাক্ত করেছে সংসার বিষে জর্জরিত মাতাল, উপবাসী রিকশাওয়ালা, রাতের চোর, টহলদার পুলিশ, ফুটপাথে শায়িত ভিখারী মেয়ে, সস্তা গণিকা, হাসপাতালের জীবনমরণ দোলায় দোদুল্যমান প্রসূতি মা। এই দুর্বহভার আর সে বইতে পারছে না, নিদারুণ কান্নায় তার বুক জ্বলে যায়। তাই রাত্রি ভাবে কবে কালের রাখাল তার কঠিন হাতে এই গুমোটভরা বুকে জ্বালাবে আশার প্রদীপ।—

উড়িয়ে ধুলো অশ্বক্ষুরে উধাও অনেক দূরে
কালের রাখাল হাজির নীরব গোপন অন্তঃপুরে;
সেই মতো কি সারাজীবন বিলিয়ে দিয়ে শেষে
দীর্ণ রাতের শেষ সীমানায়
আশার আনাগোনা,
নতুন গানের মেলায় বসে নতুন স্বপ্ন বোনা? (বোবা রাতের কান্না)

নতুন স্বপ্ন বোনা রাতের সার্থক হয়ে ওঠে। অন্ধকারের ভয়কে ঠেলে বিরল উষার দিকে জ্বলে ওঠে আশার আলো। তাই বোবা রাতের নিদারুণ কান্না আর কেউ শুনতে চায় না, একেবারেই না। কবির ভাষায় :

বোবা রাতের এই নিদারুণ যন্ত্রণা,
অন্ধকারের কান্নাফোলা মন্ত্রণা,
বুক জ্বলে যায়, আর না। (ওই)

'স্বপ্নকে দুচোখে রেখে' পুরোপুরি একটি আশাবাদী কবিতা। আমরা জানি স্বপ্নের আরেক নাম আশা। আশা আছে বলেই মানুষ বেঁচে আছে। স্বপ্ন যদি না থাকত তবে এ পৃথিবীতে কিছুই সৃষ্টি হত না। সেকারণেই কবি বলেন,

স্বপ্নের টানেই হাঁটে পৃথিবীতে প্রতি পদক্ষেপে
কবি শিল্পী প্রেমিক বিপ্লবী;
স্বপ্নকে পাঠালে নির্বাসনে
সব মন্ত্র অর্থহীন। (স্বপ্নকে দুচোখে রেখে)

'পরিত্রাণ' কবিতায় দেখা যায়, দিন দিন মানুষ স্বার্থপরের মতো একাকী হয়ে যাচ্ছে। এখন যে দিনবদলের পালা চলছে সেদিকে তার ভ্রুক্ষেপ নেই। তাই কবি বলেন,

এখন মানুষ যেন বড়ো বেশী বিচ্ছিন্ন একক,
যেন বা প্রেমের মন্ত্রে উজ্জীবিত নয়। (পরিত্রাণ)

কখনো কখনো অন্তরে আক্ষেপ হয়তো হয়। তখন মিছিলে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে দায়বদ্ধ শপথের কথা মনে করে কেউ কেউ পরিত্রাণ পায়। এবং সম্মিলিত আশা জেগে ওঠে। তাই,

Dhaka University Institutional Repository

কর্মী আর প্রেমিকের প্রতিশ্রুতি বুকে নিয়ে
শপথের ঘোড়া ছুটে যায়
ভাঙনের মুখ থেকে প্রত্যয়ের নতুন সীমায়। (ওই)

'অভিগমনের দিকে' কবিতার শুরু হয়েছে একটি আপ্ত বাক্য দিয়ে :

যে চলে গেছে, যাক। অন্য কেউ এইখানে এসে
দাঁড়াবে আবার। (অভিগমনের দিকে)

এ পৃথিবীতে কারো জায়গায়ই শূন্য থাকে না। একজন চলে গেলে তার জায়গায় অন্যজন এসে যায় — এটাই প্রকৃতির নিয়ম। তবে কখনো কখনো কিছু ভুল থেকে যায়, কিছু বিহ্বলতা, কিছু ক্রোধ কিংবা শোক — আর এইসব নিয়েই মানুষের জীবন-মহিম। মাঝে মাঝে হয়তো মনে হতে পারে, যে গেছে তার জায়গা পূরণ হবার নয়, সে অপূরণীয়। তাই প্রাণপণে মানুষ আঁকড়ে ধরে তার ফিকে হয়ে আসা ছবি। আর সংশয়ে ভাবিত হয় এই ভেবে যে,

এই বুঝি ক্ষয়ে যায়, এই বুঝি বুকের আধারে
গোপন শিখাকে লুপ্ত করে দেবে সাপের ছোবল! (ওই)

কিন্তু জীবনের ইতিহাস অন্য কথা বলে। মানুষ নৈরাশ্যবাদী নয়, তার মুখ সব সময় আগামীর পথ সন্ধানী, সে আশাবাদী। তাই কবিতার শেষে দেখা যায়,

সূর্যাস্তে কি সূর্যোদয়ে মানুষ প্রত্যহ আকাঙ্ক্ষিত
অভিগমনের দিকে যায় স্বপ্ন ও সংগ্রামে শুদ্ধ হয়
মানুষের মুখ, গতি নতুন পথের বাঁক নেয়। (ওই)

'শিকড়ের দিকে' কবিতায় কবি অত্যন্ত প্রত্যয়ের সঙ্গে অনুভব করেন ঐতিহ্যের গভীরেই আমাদের জীবনের শিকড় প্রোথিত। এ-যুগের মানুষের জীবনে যে অনিশ্চয়তার বোধ তাকে পদে পদে সংশয়-জর্জরতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে সে কথাও কবি ভোলেন না। তাই বলেন,

একেবারে শিকড়ের দিকে যেতে হবে
কেননা বাইরে বজ্রপাতে
বারবার ঝলসে গেছে বহু বনস্পতি,
বৃক্ষের শরীর।
স্পষ্ট নয় মুখের আদল, নিশ্বাসের
দ্রুত চলাচল
যেন স্তব্ধ হয়ে আছে,
চতুর্দিকে লতাপাতা গুল্মের ভিতরে
আবছায়া, যুগের বিকার। (শিকড়ের দিকে)

কবিতার শেষ স্তবকে কবি দ্বর্থহীন কণ্ঠে উচ্চারণ করেন জীবনের মূল উৎসের সঙ্গে, আদিতম মানবসত্তার সঙ্গে আমাদের চেতনার অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্রের কথা :

একেবারে শিকড়ের কাছে যেতে হবে
যেখানে মমতা,
গাঢ় রস ক্ষতহীন কিছু সহিষ্ণুতা
এখনো নিভৃতে জেগে রয়,
যেখানে বীজের উৎস
জয় করে ভ্রান্তি কিংবা ক্ষয়। (ওই)

Dhaka University Institutional Repository

তিন.

পূর্ববর্তী কাজগুলোর মতো 'ছায়া হেঁটে যায়' কাব্যগ্রন্থেও কবির প্রেমভাবনাজাত কবিতার ধারা বজায় রয়েছে। তবে এ পর্যায়ের কবিতাগুলোর মধ্যে কোনো কোনোটি যেমন প্রেমের সার্থকতায় উজ্জ্বল, তেমনি কোনো কোনোটিতে পড়েছে বিরূপ সময়ের ছাপ। এ ধারার উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলো হল : 'তোমার প্রতিমা', 'নির্ঝর', 'ভালোবাসা', 'রাত্রি তুমি যতো পারো', 'কথা', 'উৎকণ্ঠা', 'কে তুমি তৃষ্ণায়'।

'তোমার প্রতিমা' কবিতায় দেখা যায় প্রেমের পরিণতি বিষয়ে কবির মনে কাজ করছে একটা গভীর ভীতি। কবি দীর্ঘদিন নির্জনে নিঃসঙ্গতায় কাটিয়ে অনেক ক্লান্তির পথ পার হয়ে এসে যখন প্রেমাস্পদার কাছে সমর্পিত হতে চান — তখনি মনে পড়ে নির্মম সময় এখনো ঘিরে আছে চারপাশ। তিনি দেখতে পান,

> ক্ষণস্থায়ী জ্যোৎস্নালোকে বারবার কালো কালো ছায়া ফিরে আসে,
> সুন্দর সজীব দৃশ্য কেঁপে ওঠে অববাহী ছায়ার সন্ত্রাসে;
> (তোমার প্রতিমা)

তিনি বুঝতে পারেন, এখনো ফুল দিয়ে মালা গাঁথার সময় হয় নি, সময় হয় নি গায়ত্রী মন্ত্রোচ্চারণে প্রিয়তমাকে আপন করে নেবার। তাই বুকে দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে তাকে বলতে হয়,

> এমন কিছুই নেই যা তোমাকে দিতে পারি হাতে
> এই মগ্ন তমিস্রার রাতে। (ওই)

এই ভয়ংকর অপ্রেমের সময়ে কিছু দিতে গেলেও তার পরিণাম আরো ভয়ংকর হতে পারে বলে কবি প্রেমাস্পদার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে চান। কেননা তিনি তার প্রিয়তমাকে খুব ভালবাসেন, তাই তার চরম কোনো ক্ষতি তিনি চান না। সে কারণেই অত্যন্ত ব্যথাদীর্ণ হৃদয়ে কবিকে বলতে হয় —

> কাল পরিণয় হবে যদি এই লগ্নে বিয়ে হয়,
> অতএব দূরে দূরে রেখে দিই তোমার প্রতিমা। (ওই)

'নির্ঝর' একটি চতুর্দশপদী কবিতা। এ কবিতায় দেখি কবির শূন্য প্রাণ প্রেমের স্পন্দনে আজ দারুণ উৎফুল্ল, পরিপূর্ণ চরিতার্থতায়। কণ্ঠে তাই রবীন্দ্রনাথের গান। হৃদয়ের আশাদীপ প্রজ্বলিত জীবনের একান্ত গভীরে। সেই আলোতে দুচোখ ভরে দেখেন প্রিয়তমার উজ্জ্বল মুখ, আরক্তিম স্ফুরিত অধর; আর ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। কবির ভাষায় :

> কাঁপুক মেদুর রাত। আনো কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের
> তৃষাহরা মুক্ত গান, —
> [...] [...]
> যাদুকরী বাসনার মায়াঘেরা মণিময় দ্বীপে
> আসুক বন্যার বেগ, ক্ষণস্থায়ী অমরার আলো
> দাও জ্বেলে অন্তরালে সাতরঙা সুরের প্রদীপে
> অকৃপণ সততায়, লেগেছে দু'চোখে বড়ো ভালো

Dhaka University Institutional Repository

তোমার উজ্জ্বল মুখ, আরক্তিম স্ফুরিত অধর
ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত, অলৌকিক এই রূপান্তর। (নির্ঝর)

'ভালোবাসা' কবিতাটিও কবির প্রেমভাবনাজাত একটি সার্থক সনেট। এ কবিতার বিষয়বস্তুও প্রেম। কবি জেনেছেন, যন্ত্রণার অন্য নামই ভালবাসা। তাই যখন সমস্ত সংসার রক্তস্রাবী প্রাণের লীলায় দিশেহারা, তখনো তিনি আপন আকাঙ্ক্ষাকে সাজিয়ে তোলেন লাল নীল পান্নায় নীলায়। ভালবাসাকে বলেন,

ভালোবাসা, আহা, তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে। (ভালোবাসা)

কবি ভালবাসাকে অনুভব করেন সমগ্র সত্তায়। আর সেজন্যেই প্রাণ বিপন্ন জেনেও তিনি অত্যন্ত দার্ঢ্য স্বরে উচ্চারণ করতে পারেন —

যেদিকে তাকাই ক্রান্তিকালে
যদিও বিপন্ন প্রাণ তোমাকেই জেনেছি আড়ালে। (ওই)

'রাত্রি তুমি যতো পারো' কবিতায় কবি রাত্রিকে কল্পনা করেছেন তাঁর প্রেমিকা হিসেবে। তাই তিনি অন্ধকার উন্মোচনে অদম্য আলোর ক্ষীণতম রশ্মিটিকে লুপ্ত করে দিয়ে রাত্রিকে বলেন,

রাত্রি তুমি যতো পারো অবারিত হও। (রাত্রি তুমি যতো পারো)

মোহময়ী রাত্রির কাছে কবি দাবি করেন আত্মদানের সেই প্রগাঢ় চুম্বন — যাতে তাঁর প্রৌঢ়ের অশক্ত হাহাকার, সমস্ত যৌবনজ্বালা, দিনের সমস্ত শব্দ আর্তনাদ ক্রুদ্ধতার ঢেউ মুছে নেবে। কবি পরিতৃপ্ত হবেন, এবং তখনই —

শিল্পের মায়াবী উদ্বোধনে
অমরতা পাবে অন্ধকার। (ওই)

'কথা' (১৯৫৬) কবিতাটি কবি কিরণশঙ্করের প্রেমভাবনাজাত একটি অনবদ্য সনেট। এ কবিতায় দেখা যায়, কবি তাঁর প্রেমিকাকে যে কথাটি বলতে চান — অনেকবার চেষ্টা করেও সে কথাটি বলতে পারেন না। একটা ভয় — 'যেনবা মৃত্যুর ভয়ে' — তাঁকে রুদ্ধবাক করে রাখে।

অথচ সারারাত সারাদিন ধরে তিনি ভেবেছেন দেখা হলে অন্তরঙ্গ সখ্যতায় কী কথা বলবেন। কল্পনা করেছেন তাঁর কোন কথাটিতে প্রেয়সীর বুকে দীপ হলে জ্বলে উঠবে তীব্র বাসনাবেগ, হৃদপিণ্ড বাজবে সজোরে রক্তের আলোড়ন তুলে। আর তখন তাঁর প্রেমিকা,

[...] স্ফুরিত অধরে
দীর্ঘম্লান পক্ষ্ম তুলে উঠবে ঈষৎ যেন হেসে
কী জবাব দিতে হবে ভেবে। (কথা)

কিন্তু কবির কল্পনা কল্পনাই থেকে যায়। শেষ পর্যন্ত তিনি পারেন না মনের গোপন কথাটি তাঁর প্রেমাস্পদাকে জানাতে। এখনো সেই অব্যক্ত শব্দমালা নিয়ে তিনি প্রতীক্ষায় আছেন —

আজিও হয়নি বলা যে-কথায় মাতাবো তোমাকে,
কথা ছেড়ে কথা ধরি; শব্দগুলো প্রতীক্ষায় থাকে। (ওই)

Dhaka University Institutional Repository

'উৎকণ্ঠা' সনেটটিতে লক্ষণীয়, 'স্বপ্ন-কামনা' যুগের শরীরী প্রেমের সুস্পষ্ট ছাপ। বৃদ্ধ বয়সের প্রেমিক কবি তাঁর তরুণ প্রেমিকাকে লক্ষ করে যখন বলেন,

তোর এই স্মরণীয় দিনে
যাবি অল্প বয়সের প্রেমিকের কাছে পথ চিনে,
অপূর্ব সন্ধিতে হবে উপত্যকা প্রণয়সম্মত।
তরঙ্গসঙ্কুল তোর শরীরের শুভ্র স্তরে স্তরে
নদী, দ্বীপ, উপত্যকা, পাহাড়ের অমলিন চূড়া
সুবিন্যস্ত, ইন্দ্রিয়গোচর। তুই তাই ভারাতুরা,
নবীন যুবক তোকে নিয়ে যাবে শোভন বন্দরে। (উৎকণ্ঠা)

তখন 'স্বপ্ন-কামনা'র 'আমি নহি স্বর্গের দেবতা', 'স্বপ্না-কামনা', 'হে ললিতা, ফেরাও নয়ন' প্রভৃতি কবিতার ইন্দ্রিয় নির্ভর প্রেমের কথা মনে পড়ে। তবে তখন কবি ছিলেন যুবক, তাই নিজেই ছিলেন ভোক্তা; এখন তাঁর বয়স হয়েছে — অশক্ত শরীর। তিনি জানেন যুবতীকে দেবার মতো তাঁর কিছু নেই। তাই যুবতীর যৌবনকে তিনি ব্যর্থ হতে দিতে চান না। সে কারণেই তাকে সাবধান করে দিয়ে বলেন,

কিন্তু তুই আসবি না কখনো এদিকে
উত্তরযৌবন এই ছদ্মবেশী শুভার্থীর কাছে —
যার স্পর্শে মৃত্যু তোর: প্রেমহীন কামনাই আছে
যে-জন্তুর বিদ্যুৎ-নখরে। (ওই)

'কে তুমি তৃষ্ণায়' কবিতাটি গতানুগতিক প্রেমের কবিতা নয়। এ কবিতায় দেখি এক অসম সাহসী প্রেমিক পুরুষকে যে গতনিদ্র শতকের শিলাস্তূপে নিজের বুকের রক্ত ঢেলে ফোটাতে চায় সুবর্ণ মঞ্জুরী। অবারিত আত্মদানে জগতের সকল ব্যর্থ প্রেমিকের মনের ক্ষতচিহ্নকে সারিয়ে কিংবা যারা প্রেমের প্রতি বীতশ্রদ্ধ তাদের প্রাণের গভীরে আশ্বাসের আবহ ছড়িয়ে সবাইকে পৌঁছে দিতে চায় অপ্রেমের থেকে অন্য এক প্রেমের জগতে। এই প্রথাবিরুদ্ধ প্রেমিকের অদ্ভুত কর্মকাণ্ডে বিস্মিত কবি তাই প্রশ্ন করেন,

কে তুমি তৃষ্ণায় দীর্ণ জর্জরিত প্রেমিক পুরুষ
গড্ডালিকা প্রবাহের মধ্যে মিশে আজো দিশেহারা;
স্থবিরতা জঙ্গমতা এ দুয়ের স্রোতে নিষ্কলুষ
কেবল আবর্তে খোঁজো উদ্যোগের বিচিত্র চেহারা। (কে তুমি তৃষ্ণায়)

চার.

অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মতো 'ছায়া হেঁটে যায়' গ্রন্থেও কয়েকটি মৃত্যুভাবনাজাত কবিতা আছে। এ ধারার কবিতাগুলো হচ্ছে : 'ছায়া হেঁটে যায়', 'কে তুমি আড়ালে', 'এই রাতে' ও 'কে কখন যাবে'।

পৃথিবীর প্রায় সকল কবি-দার্শনিক বিভিন্নভাবে মানুষের দ্বিতীয় সত্তার অস্তিত্বের কথা বলেছেন। এই ভাবনা কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তকেও ভাবিত করেছে। তাঁর 'ছায়া হেঁটে যায়' কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতা 'ছায়া হেঁটে যায়' কবিতায় দেখি তার প্রকাশ।

Dhaka University Institutional Repository

আমি তুমি পাশাপাশি হেঁটে যাই যদি
আমাদের সঙ্গে সঙ্গে
আরো কেউ হাঁটে। কখনো আলোর নীচে
যতি এসে নিমেষে দাঁড়াই সন্ধ্যাকালে
দু'টি ছায়া পথের উপরে এসে পড়ে:
কিন্তু না দু'টি তো নয় তিনটে ছায়াই
একাকার হ'য়ে নড়ে চড়ে! (ছায়া হেঁটে যায়)

এই তৃতীয় ছায়াটি কবির মগ্নচৈতন্যলোকে আন্দোলিত করে। তিনি তাকে চিনে নিতে চান — সে হিতাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ, না মৃত্যুর পরোয়ানা-বাহক অদৃশ্য-দূত :

তৃতীয় ছায়াটি কা'র, কেন সারাক্ষণ
থাকে পাশাপাশি?
[...] [...]
একি কোনো গুপ্তচর যার শিরোস্ত্রাণ
ঢেকে আছে কালো আচ্ছাদনে,
যে কেবল কাছে কাছে হিতাকাঙ্ক্ষী সেজে
আমাদের নিয়ে যেতে চায়
বধ্যভূমির দেশে গোপন আড়ালে?
অথবা কি অন্তরঙ্গ প্রকৃত সুহৃদ
যে বাঁচায় নিয়ে যায়
যোগবিয়োগের ছায়াপথে নতুন সৃষ্টির
আশু প্রয়োজনে! (ওই)

কবি নিশ্চিত হতে পারেন না। আবার তার অস্তিত্বকে অস্বীকারও করতে পারছেন না। প্রকৃত পক্ষে এই অদ্ভুত ছায়াকে নিয়েই আমাদের প্রত্যেকের বেঁচে থাকা।

কবির বয়স হয়েছে। বয়সী মনে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই দেখা দিয়েছে পরকালের ভাবনা। 'কে তুমি আড়ালে' কবিতায় দেখা যায় তারই ইঙ্গিতময় প্রকাশ। মাঝে মাঝে রাঝরাতে কবির ঘুম ভেঙে যায়; দূরান্তরে শোনেন গোপন কান্নার শব্দ। বাইরে প্লাবিত জ্যোৎস্নায় শুনতে পান অদৃশ্য কার অন্তিম আহ্বান। অদৃশ্য এই আহ্বান তাঁকে নিদ্রা কিংবা জাগরণে বারবার মন্থিত করে। তাই কবি বলেন —

কে তুমি আড়ালে আছ
নিদ্রা আর জাগরণে ছুঁয়ে যাও,
আমাকে মন্থিত করো চরম নিমেষে। (কে তুমি আড়ালে)

আমরা বুঝতে পারি এই অদৃশ্য সত্তাই হচ্ছে মৃত্যু — যে সব সময় কবিকে ছুঁয়ে থাকে; তাঁকে মনে করিয়ে দেয় এ পৃথিবীতে থাকার সময় ফুরিয়ে এসেছে।

'এই রাতে' কবিতায় দেখি কবির শেষ জীবনে তাঁর যৌবনের কাঙ্ক্ষিত প্রেম ফিরে এসেছে। কিন্তু কবি তাকে প্রত্যাখ্যান করছেন। কেননা তার জন্যে প্রতীক্ষা করে কবি নিজের যৌবন-উত্তীর্ণ করেছেন, নিজেকে পবিত্র রেখেছিলেন শুধু তাকে ভালবেসে — কিন্তু তখন সে আসে নি। আজ বয়সের ভারে কবি ক্লান্ত, শরীর অশক্ত। আশেপাশে

Dhaka University Institutional Repository

অনুভব করেন অদৃশ্য সত্তার — মৃত্যুর। তাই অন্তরের আক্ষেপ প্রকাশ করে কবি উচ্চারণ করেন —

সমস্ত জীবন
যখন চেয়েছি তাকে আসেনি তখন
পায়ে পায়ে কুসুম ছড়িয়ে।
[...] [...]
এখন হলুদ
বিবর্ণ পাতার দিনে তুমি কেন এলে!
দু'পায়ে যুগের ক্লান্তি, দুই চোখে ঘুম,
দীর্ঘ প্রতীক্ষার শেষে স্নায়ুরা নিঝুম। (এই রাতে)

অভিমানী কবি তাই চলে যেতে চান চিরশান্তির দেশে — যেখানে নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে ঘুমানো যায়।

আমি আজ অনন্য ঘুমের দেশে যাবো,
আজন্ম ক্লান্তির শেষে নির্ভয়ে ঘুমোবো। (ওই)

'কে কখন যাবে' কবিতাটি কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের একটি অসাধারণ সনেট। এ কবিতায় কবির মৃত্যুভাবনা অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। কবিতার শুরুতেই কবি মৃত্যুর চিরন্তনতাকে প্রকাশ করে লেখেন —

কে কখন চলে যাবে অন্তরালে কেউ জানে না। (কে কখন যাবে)

মানুষ সময়ের সিঁড়ি বেয়ে ক্রমে ক্রমে অজ্ঞাত আড়ালে মিলিয়ে যায় জীবনের নানা সাক্ষ্য রেখে। কবির ভাষায় :

কেউ কেউ রেখে যায় নিজের কীর্তির কিছু রূপ, (ওই)

কেননা,

বিষণ্ন মানুষ জানে কীর্তিতেই মোছে মৃত্যুভয়। (ওই)

মৃত্যুভয় হয়তো কিছুকাল ঠেকিয়ে রাখা যায় — কিন্তু মৃত্যু তো অমোঘ। তাকে কোনো বন্ধনেই আটকে রাখা যায় না। তাই এ কবিতার শেষ দুই স্তবকে — যেখানে রবীন্দ্র-ভাবনা প্রতিফলিত — সেখানেই লক্ষ করি এ কবিতার চরম উৎকর্ষ :

মৃত্যু সে তো ব্যক্তিগত, জীবন সে অনন্ত প্রবাহ,
জীবন অনন্ত আর মৃত্যু সে তো ক্ষণিকের দাহ। (ওই)

নির্দ্বিধায় বলা যায়, কবি হিসেবে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের এখানেই অনশ্বরতা।

পাঁচ.

এগুলো ছাড়াও বিশেষ ধারার কিছু সংখ্যক কবিতা এ কাব্যগ্রন্থে সংকলিত আছে — সেগুলোর কোনোটি রাজনৈতিক কবিতা, কোনোটি প্রকৃতি বিষয়ক, কোনোটি আবার কবির ব্যক্তিগত অনুভব প্রকাশ করেছে। এ সমস্ত কবিতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলো হচ্ছে : 'কথা', 'বিস্তীর্ণ মরুর একপাশে', 'শীত', 'একটু দাঁড়িয়ে যাও',

Dhaka University Institutional Repository

'উত্তর মেলে না', 'নিরাময় হবে ভেবে', 'ছায়া হেঁটে যায়', 'জীবন আমার কাছে', 'হারিয়ে যাবার পথ', 'যদি দেখতাম', '১২৫তম জন্মদিনে', 'কিছু পরাজিত লোক', 'বৃক্ষের হৃদয়', 'জটিল গভীরে', 'আজ নয় অন্য দিন' ও 'এমন একাকী'।

'কথা' (১৯৮৮) কবিতাটি কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের গভীর প্রত্যয় বোধের কবিতা। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কবি একটি চরম সত্য উপলব্ধি করেছেন — তা হচ্ছে, জীবনের অনেক কথাই অন্তরে জমা হয়ে থাকে; সব কথা বলে কখনোই শেষ করা যায় না — এমনকি অন্তিম দিনটিতেও না। জীবনানন্দীয় ভাবনার প্রতিফল ঘটিয়ে তাই কবি অত্যন্ত দৃঢ় কণ্ঠে উচ্চারণ করেন —

সব কথা কখনো কি বলা হয়ে যায়?
সমস্ত দিনের শেষে সমস্ত কাজের শেষে
তবু কথা থেকে যায় বুকের গভীরে
জীবন বিকীর্ণ হোক দিকে দিকে
না বলা অনেক কথা থেকে যায় তবু
এমনকি শেষ দিনটিতে। (কথা)

কবির কাব্য সৃষ্টি, তার প্রয়োজন এবং স্থায়িত্ব নিয়ে কবি কিরণশঙ্করের সতর্ক ও সংশয়িত চিন্তা-ভাবনার প্রকাশ দেখতে পেয়েছি সত্তরের দশকে লেখা 'কথার পর কথা', 'কবিতা : সত্তর দশক' ইত্যাদি কবিতায়। আশির দশকের শেষে পৌঁছেও কবির মনে সে সন্দেহ কার্যকর। 'বিস্তীর্ণ মরুর একপাশে' কবিতায় দেখতে পাই তারই প্রতিফলন। এ পৃথিবীতে অনেক কবিতা লেখা হয়েছে, আরো অনেক লেখা হবে — কিন্তু তার সবই সময়ের কষ্টিপাথরে যাচাই হবে। যে কবিতা মানুষের মঙ্গল কামনায় নিবেদিত নয়, যে কবিতায় মানুষের সঞ্জীবন মন্ত্রের আভাসমাত্র নেই, সে কবিতাকে কালের দর্পণে বিস্তীর্ণ মরুর বালুকারাশির একপাশে স্থান করে নিতে হবে। কবির ভাষায় :

অনেক কবিতা লেখা হয়ে আছে পৃথিবীতে
আরও অনেক লেখা হবে এই বসন্তে ও শীতে
হাজার বছর ধরে লেখালেখি, তার কতটুকু
সহিষ্ণু আলোর দীপ জ্বেলে দেয় রোগীর শিখরে?
[...] [...]
অজস্র কবিতা লেখা হয়ে যাচ্ছে যান্ত্রিক নিয়মে,
বিংশ শতকের এই শেষ লগ্নে প্রায় অফুরাণ,
কিছু কিছু থেকে যাবে আর সবি কালের দর্পণে
একমুঠো বালুকাই বিস্তীর্ণ মরুর একপাশে। (বিস্তীর্ণ মরুর একপাশে)

একই ভাবনার বশবর্তী হয়ে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত রচনা করেন 'উত্তর মেলে না' কবিতাটি। তবে এখানে কবি নিজের কবিতার কাছেই প্রশ্ন রাখেন তাঁর কবিতার স্থায়িত্ব নিয়ে। তিনি দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর কবিতাকে ভালবেসে কবিতা লিখেছেন — কিন্তু কবিতার কাছে কখনো কিছুই চান নি। আজ তাঁর শরীরে বার্ধক্যের ছাপ, দীর্ঘ পর্যটনে তিনি ক্লান্ত; তাই আজকের গোধূলির বিধৃত নিমেষে কবিতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কবি জানতে চান :

তোমার বাগানে যদি কিছু ফুল
কখনো ফুটিয়ে থাকি তার জন্য কিছু কৃতজ্ঞতা

Dhaka University Institutional Repository

তুমি কি জানাবে, নাকি তারুণ্যের যৌবনের
কল্পনার সমস্ত উদ্যোগ তোমার শরীরে
কোনো চিহ্ন না রেখেই লুপ্ত হবে অগোচরে
কালের তিমিরে? (উত্তর মেলে না)

সন্দিহান কবির প্রশ্নের উত্তর কবিতা দেয় না। তার নিরুত্তর ঔদাসীন্যে কবি বুঝতে পারেন,

[...] পৃথিবীতে বেশ
কিছু প্রশ্ন থেকে যায়
কোনোকালে যার কোনো উত্তর মেলে না। (ওই)

'শীত' কবিতায় শীতকে কবি কল্পনা করেছেন মূর্তিমতী আতঙ্ক হিসেবে। কেননা শীতের হিংস্র থাবায় মানুষ ও প্রকৃতির সমস্ত শ্রী বিনষ্ট হয়ে যায়।

সব যেন ম্লানতায় মিশে যেতে চায়।
শীতের বিমর্ষ ছায়া তৃণহীন শাখার আভাস
আনে চরাচরে; শরীরের বেশবাস
ক্রমশ ওজন বাড়ে, রেস্তোঁরায় সন্ধ্যাগমে
উজ্জ্বল আলোর স্রোত, ঝড়ের হাওয়ায়
শীতের শ্বাপদ ঘোরে নির্জন প্রান্তরে। (শীত)

'একটু দাঁড়িয়ে যাও' একটি রাজনৈতিক সচেতনতামূলক কবিতা। এ কবিতায় দুটি পক্ষ। একটি সাধারণ জনতার পক্ষ — যারা রাজনীতি নিয়ে বড়ো বেশি বিতর্কের ঝড় তোলে, উত্তেজিত হয়ে ওঠে বিরুদ্ধ পক্ষের যে-কোনো বক্তব্যে — অথচ নিজেদের মধ্যেও কারো সঙ্গে কারো মতৈক্য নেই; যে কারণে বিপক্ষ শক্তি সুকৌশলে তাদের বিশ্বাসের ভিত্তিভূমিকেই উৎপাটন করার সুযোগ পায়। এই বিপক্ষ শক্তি হচ্ছে প্রশাসক। যাদের নিজেদের মধ্যে প্রচণ্ড ঐক্য। জনতার পক্ষ থেকে কোনো প্রকার স্ফুলিঙ্গও যাতে সৃষ্টি না হয় তার জন্যে তারা সর্বদা সতর্ক। অর্থের বিনিময়ে কিনে নেয় জনতার বুদ্ধি ও বিবেক। কবির ভাষায় :

একটু দাঁড়িয়ে যাও। নিজেকেই প্রশ্ন করো শুধু
ভিতরে-বাইরে তুমি ঠিক আছ কিনা।
কেননা এখন
[...]
নিজেদের শিবিরেই তীব্র মনান্তর।
অথচ অপর দিকে বিরুদ্ধ শিবিরে
কোনোও স্ফুলিঙ্গ থেকে অগ্নি যাতে না জ্বলতে পারে
তার জন্যে ব্যবস্থা বিস্তর,
কতো সহজেই না তারা ইতস্তত স্বর্ণমুদ্রা ছুঁড়ে
কিনে নেয় বুদ্ধি ও বিবেক —
এখনো ঠেকিয়ে রাখে অত্যন্ত কৌশলে
চৈত্র কিংবা বৈশাখের অগ্নিগর্ভ ঝড়। (একটু দাঁড়িয়ে যাও)

এ কবিতার মাধ্যমে কবি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ধূর্ত রাজনীতিবিদদের মুখোস উন্মোচন করে সাধারণ জনতার মধ্যে সচেতনতার উন্মেষ ঘটাতে চেয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

'জীবন আমার কাছে' কবিতায় দেখা যায়, কবি তাঁর চারপাশের প্রতিকূল সময়ের বিপর্যস্ত অবস্থা দেখে নিজের অন্তর-সত্তার কাছেই প্রশ্ন রাখেন :

জীবন, আমার কাছে কী-বা চাও আজ বলো দেখি।
(জীবন আমার কাছে)

যেখানে সময় থরোথরো করে কাঁপছে আহত জন্তুর মতো, অন্ধকারে খণ্ড খণ্ড ভয় হৃদয়ের স্বপ্ন কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে— মানুষ অভ্যস্ত হয়ে উঠছে নিজের তৈরি করা সর্বগ্রাসী ফাঁদে বিধ্বস্ত হবার জন্যে; সেখানে প্রান্তরের একাকী বৃক্ষের মতো কবির জীবন বুকের রক্ত অশ্রু স্বেদ ঢেলে কতকাল ফোটাবে কুসুম? কবির ভাষায় :

স্থূল, নেহাৎ পোষাকী
আচরণে অভ্যস্ত মানুষগুলো লুপ্ত, নিমজ্জিত
সর্বগ্রাসী স্বখাতসলিলে। রক্ত গোলাপের চারা
বুকে নিয়ে রক্ত অশ্রু স্বেদ ঢেলে সাধের বাগানে
তুমি আর কতোকাল ফোটাবে কুসুম। (ওই)

কবি স্নেহাকর ভট্টাচার্যকে মনে রেখে কবি তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে রচনা করেন 'হারিয়ে যাবার পথ' কবিতাটি। কবিতার শুরুতেই কবি বলেন,

হারিয়ে যাবার পথ খোলা আছে। যে যায় সে যায়।
(হারিয়ে যাবার পথ)

যেতেই হয় সবাইকে একদিন; মৃত্যুর লোমশ হাত টেনে নিয়ে যায়। পরিচিত মুখগুলো হারিয়ে যায় কালের অন্ধকারে, তবু তার মধ্যেও এই সংসার কারো কারো স্মৃতি বহন করে দীর্ঘকাল— মৃত্যুবার্ষিকীতে চলে তাঁর স্মৃতি অন্বেষণ। কবির ভাষায় :

প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে মৃত্যু তার মন্দিরা বাজায়,
মৃত্যু বার্ষিকীতে শুধু কিছুকাল স্মৃতি-অন্বেষণ। (ওই)

'যদি দেখতাম' কবিতায় কবি 'যদি' শব্দের ব্যবহারে এই সমাজের যাবতীয় শুভ বোধকে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন :

ভালোই লাগতো যদি দেখতাম
একলক্ষ্য পাশাপাশি স্বভাবে নিয়মে
রয়েছি সবাই।

ভালোই লাগতো যদি দেখতাম
সকলেই অদৃশ্য বন্ধনে প্রতিবেশী,
সুহৃদয় সামাজিকতায়
প্রত্যেকেই আন্তরিক, হৃদয়ে হৃদয়ে
সবাই শপথে স্থির স্বাভাবিকতায়।

ভালোই লাগতো যদি দুঃখে সুখে
সবাই হতাম একাকার। বিপদে অসুখে
কিংবা আর্তনাদে বন্ধু প্রতিবেশী। (যদি দেখতাম)

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা তা নই। আমরা অশুভ শক্তির প্রতি আসক্ত, তাই বেশিরভাগই নিম্নগামী। কেউ কেউ স্বজন নিধনে অভিলাসী। এই সমাজবাস্তবতা কবি মানতে চান

Dhaka University Institutional Repository

না। তিনি আশাবাদী — তিনি সুন্দরের সাধক। তাই বাস্তবতাকে অস্বীকার করেও বলেন —

ভালোই লাগতো যদি দেখতাম
আমরা তা নই। (ওই)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১২৫তম জন্মদিন স্মরণ করে কবি কিরণশঙ্কর রচনা করেন '১২৫তম জন্মদিনে' কবিতাটি। এ কবিতায় কবি রবীন্দ্রনাথকে বনস্পতির সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন —

বৃক্ষ হওয়া শক্ত নয়। অশ্বত্থ কি বট
হ'তে পারে কেউ কেউ কিন্তু বনস্পতি
এই দেশে একমাত্র তিনি
স্বদেশে স্বকালে। (১২৫তম জন্মদিনে)

কেননা তাঁর কোমল স্পর্শে সৃষ্টি রহস্যের কত যে নিভৃত দ্বার খুলে গেছে — কত অকথিত কথা আশ্চর্য সংকেতে প্রকাশ পেয়েছে — অফুরন্ত শিল্প উৎস থেকে জীবনের সুস্থ উন্মুখতা ফিরে এসেছে, তা বর্ণনাতীত। নিজের তুলনা শুধু তিনি নিজে। কবি কিরণশঙ্কর তাই রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ করে লেখেন :

যেন বা বৈশাখের মেঘ স্বচ্ছ জলধারা
এনে দেয় প্রচণ্ড ক্ষরায়
বিশুদ্ধ মাটির বুকে ক্রমে রূপ পায়
মানবিক গভীর ইশারা।

কখনো বসন্তকাল মনে হয় পাখি
ফিরে এলো বিশুষ্ক বাগানে
সৃষ্টির অদম্য বীজ ঠোঁটে নিয়ে ফের
অসামান্য জীবনের টানে। (ওই)

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির প্রতি কবি কিরণশঙ্করের মুগ্ধতা যেন কিছুতেই কাটে না। তিনি কৈশোর-যৌবনে যেমন নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে আশ্রয় পেয়েছেন রবীন্দ্র সৃষ্টির বিশাল সাম্রাজ্যে — এই বার্ধক্যেও তিনি সেই সম্রাটের দান থেকে বঞ্চিত হন না। তাই গর্বিত কণ্ঠে উচ্চারণ করেন :

এখনো যে নানা প্রয়োজনে আর নানা দুর্বিপাকে
তার সৃষ্টিকেই
মনে হয় কুয়াশায় আলোর সংকেত
এখনো ইঙ্গিত। (ওই)

'বৃক্ষের হৃদয়' শিরোনামে 'এই এক সময়' কাব্যগ্রন্থেও একটি কবিতা আছে। সে কবিতায় প্রকাশ পেয়েছিল বৃক্ষের প্রতি কবির গভীর মমতা — বৃক্ষকে মানুষের সবচেয়ে কাছের বন্ধু বলে তিনি স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। বর্তমান আলোচিত কবিতায়ও প্রায় একই সুরের অনুরণন শোনা যায়। কবি বৃক্ষ হতে চান — বৃক্ষের কাছে শিখতে চান কেমন করে দৃঢ়, স্থির ও প্রাজ্ঞ হওয়া যায়। কেননা চতুর্দিকে ভীষণ দুঃসময়ের সংকেত ধ্বনিত হচ্ছে এবং দুটি প্রতিপক্ষ মিলে ভয়াবহ দৃশ্য রচনায় মনোযোগী। তাই কবি বলেন :

Dhaka University Institutional Repository

কোথাও একক
বিচ্ছিন্ন হৃদয় নিয়ে বেঁচে থাকা দায়,
এ সময় কেবলই প্রয়োজন
বৃক্ষের প্রাজ্ঞতা, আপন স্বভাবে
শিকড়ে শিকড়ে
দৃঢ়বদ্ধ হওয়া। যেন যে-কোনো নিমেষে
ঝড় এলে ঝড়ের তাণ্ডব
বুকে নিতে পারি। ভূলুণ্ঠিত হ'তে হ'তে
শিকড়ে শিকড়ে
নিজেকে ছড়িয়ে দিতে পারি। (বৃক্ষের হৃদয়)

'কিছু পরাজিত লোক' কবিতাটি একটি সমাজসচেতনামূলক কবিতা। এই সমাজে যারা কর্তৃত্ব রেখে এতদিন সাধারণ জনতাকে শোষণ আর শাসনে জর্জরিত করেছে; যারা মনে করত এই রত্ন-সিংহাসনে বসেই পুরষানুক্রমে চালিয়ে যেতে পারবে এই নিপীড়ন-জুলুম, তাদের সে রঙিন স্বপ্নের জাল ছিন্ন হয়েছে। কবির ভাষায় :

তারা জানে এতোকাল তালুকের সমস্ত সম্পদ
তাদের পা'য়ের কাছে জড়ো করা ছিল,
যেন বা সাপের পাহারায়
আজন্ম সঞ্চিত যতো হিরা জহরৎ
এভাবেই থেকে যাবে, এভাবেই দিন
তাদের রঙীন স্বপ্নে থাকবে মসৃণ (কিছু পরাজিত লোক)

জনতা আজ মিলিত হয়েছে — তারা নব উত্থানের বজ্র মন্ত্রে জেগে উঠেছে। তাই,

[...] ভীষণ আবেগে
নড়ে ওঠে জনপদ এখানে ওখানে সবখানে,
স্থিতাবস্থা ক্রমশই ভেঙে ভেঙে পড়ে
সময়ের উন্মথিত টানে। (ওই)

জনতার জাগরণে সমাজপতিদের সাধের প্রাসাদ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। আমরাও দেখি,

সাপের খণ্ডিত দেহ হাওয়ায় উড়িয়ে নেয় ঝড়ে। (ওই)

'জটিল গভীরে' কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে জীবন সম্পর্কে কবির গভীর উপলব্ধিজাত ভাবনা। এ পৃথিবীর সবকিছুই পরিবর্তনশীল। সবকিছুরই বদল হয়। ঋতুচক্রে যেমন বদলে যায় নিসর্গ-প্রকৃতি, মানুষও তেমনি পাল্টে যায় সময়ের অভিঘাতে। তাই কবি বলেন —

বদলে যাচ্ছি তুমি আমি আরো অনেকেই
দিনে দিনে, যেন যা-আছি তা থেকে
ঝরে-পড়া এখন নিয়তি। দিনে দিনে
স্বভাবে কি আচরণে কেন্দ্র থেকে দূরে
অথবা ভাষণে
নিজের প্রতিজ্ঞা থেকে বিচ্ছিন্ন ভীষণ। (জটিল গভীরে)

প্রকৃতি বদলে যায় আবার ফিরেও আসে তার আপন স্বভাবে। কিন্তু ফেরে না। ফিরতে চাইলেও তার পক্ষে ফেরা সম্ভব হয় না — কেননা তার আদিম বিশ্বাসের সৌধ একবার

Dhaka University Institutional Repository

ভেঙে গেলে কেন্দ্র থেকে কেবলি সে দূরে সরে যায়। এক অভিঘাত থেকে অন্য অভিঘাতে জীবনের জটিল গভীরে পরিক্রমণই তখন তার একমাত্র নিয়তি। কবির ভাষায় :

আমরা বদলে যাচ্ছি অথচ কখনো
প্রাক্তন বিন্দুতে ফেরা অসম্ভব, ক্রমশই
আদি বিশ্বাসের সৌধ ভেঙে পড়ে,
অথবা কেবল ভেসে যাই দূরে দূরে
অস্থির তরঙ্গ থেকে ভিন্নতর তরঙ্গসঙ্কুল
অনিবার্য জটিল গভীরে। (ওই)

'আজ নয় অন্য দিন' কবিতায় দেখা যায়, কবি তাঁর এক বন্ধুকে কথা দিয়েছেন তার ওখানে যাবেন বলে। কিন্তু আদৌ তিনি যেতে পারবেন কিনা সে ব্যাপারে তিনি স্থির নিশ্চিত নন —

আজ নয় অন্য দিন যাব।
দেখি যদি যেতে পারি
অবশ্যই যাব। (আজ নয় অন্য দিন)

অবশ্যই যাবার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও 'যদি' শব্দটি উচ্চারণ করে তিনি সংশয়টাকে ঘণীভূত করে তোলেন। কেননা এই অসময়ে কোনো কিছুই আর স্থির নির্ধারিত থাকে না। তাই যাবার ইচ্ছে পোষণ করেও কবি বলেন —

যেতে হবে যাব এই ভাবনাই শুধু
গুনগুন করে ওঠে মনের ভিতরে,
তারপর যে সময়ে রৌদ্রতাপে দগ্ধ হয় পাখি
অথবা উত্তাল ঝড়ে দিগন্তের শেষ বাঁকে
নিমেষে মিলায়, সে-সময়ে
কিছু আর করার থাকে না। সব প্রতিশ্রুতি
মন্থিত হৃদয় থেকে শূন্যে উড়ে যায়। (ওই)

তাই বলে আশাবাদী কবি নিরাশ নন। তাঁর হৃদয়ে বন্ধুকে দেওয়া কথা সব সময়েই জাগরূক — বন্ধুর কাছে যাবার জন্যেও সর্বদা প্রস্তুত। সে কারণেই তিনি বন্ধুকে আশ্বস্ত করে বলেন —

যদি বললাম বলে মনে করবে না
আমি উদাসীন। (ওই)

'এমন একাকী' কবিতায় দেখা যায়, কবির মাঝে মাঝে খুব নিঃসঙ্গ মনে হয়। তিনি এই সমাজে, সমাজের মানুষের সঙ্গেই আছেন এবং থাকতেও চান তাদের হৃদয়ের কাছাকাছি, তাই বলেন —

আমি
এখন হৃদয় ছাড়া আর তো কিছুই
দেখতে চাই না। (এমন একাকী)

তবু তাঁর মনে হয় তিনি যেন মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলে পৌঁছতে পারছেন না।

যেন বাইরের থেকে
কেন্দ্র অভিমুখে বারবার

Dhaka University Institutional Repository

যেতে বাধা পড়ে। যেন কাঁটাতার
ভেতরের দিকে
যেন মাকড়সার সূক্ষ্ম জালে
কোথাও বিন্যস্ত কেন্দ্র নেই
অভিগমনের। যেন পরিখার
বাইরে থেকে নিশ্ছিদ্র প্রাচীর
আমাকে আড়াল করে রাখে,
দূরে দূরে রাখে। (ওই)

এ কবিতায় 'কেন', 'যেন', 'মনে হয়' শব্দের বারবার ব্যবহারে কবি যে সংশয়ের সৃষ্টি করেছেন তা পাঠক হিসেবে আমাদেরকেও প্রভাবিত করে। কবির মতো আমাদেরও এক সময় মনে জাগে — আমরাও ভীষণ নিঃসঙ্গ, একাকী। —

মানুষের সভ্যতার দারুণ বিস্তার প্রতিদিন
শব্দে প্রতিশব্দে আমন্ত্রণে
দোলায় পৃথিবী। তবু কেন এমন একাকী
মনে হয়, মনে হয়। (ওই)

এই নিঃসঙ্গতা কবি কিরণশঙ্করের মানসচৈতন্যের অনুকূল নয়। কবির এই বিভ্রান্তি সাময়িক। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের পূর্ববর্তী কাব্যগুলোর বিষয় ও চিন্তা 'ছায়া হেঁটে যায়' কাব্যের কবিতাগুলোকেও স্পর্শ করেছে অনায়াসে। এ কাব্যগ্রন্থের কবিতাসমূহে ভাব, ভাষা, অলংকার কিংবা ছন্দ নিয়ে কবির নতুন কোনো নিরীক্ষা আবিষ্কার করা যায় না। উপমা ব্যতীত অলংকারের আধিক্য নেই। সমিল ও অমিল প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত ও সনেটই এ কাব্যের প্রধান ছন্দ। উদ্ধৃতির সাহায্যে 'ছায়া হেঁটে যায়' কাব্যগ্রন্থের কবিতার শিল্পরীতি তুলে ধরা হল :

শব্দালংকার

সরল অনুপ্রাস :
১. উদ্বেগে সন্ত্রাসে / সর্বত্র সংসার কাঁপে, (ভয়)
২. কোনও দামাল দস্যু সব দৃশ্য তছনছ ক'রে (দেখলাম দীর্ঘকাল)
৩. শীতের শ্বাপদ ঘোরে নির্জন প্রান্তরে। (শীত)

অন্ত্যানুপ্রাস :
১. এমন কিছুই নেই যা তোমাকে দিতে পারি হাতে
এই মগ্ন তমিস্রার রাতে। (তোমার প্রতিমা)
২. বোবা রাতের এই নিদারুণ কান্না
বুক জ্বলে যায়, আর না। (বোবা রাতের কান্না)

শ্রুত্যানুপ্রাস :
ক খ : চরিতার্থ পূর্ণতায়, নীড়ের বন্ধন ভেঙে পাখি,
যাক উড়ে মেঘলোকে, যেইটুকু লগ্ন ছিল বাকী, (নির্ঝর)

র ড় : রাজপ্রাসাদে, পথে ও কুঁড়ে ঘরে,
হঠাৎ তীক্ষ্ণ প্যাচার ডাকে অশুভ মনে পড়ে, (বোবা রাতের কান্না)

ছেকানুপ্রাস : কঠিন ক্রান্তি জটিল ভ্রান্তি শেষে
আশার পাখি আশায় উড্ডীন? (বোবা রাতের কান্না)

Dhaka University Institutional Repository

অর্থালংকার

উপমা : ১. এই হাওয়া মাঝে মাঝে প্রেমিকের
সুগভীর স্পর্শের মতন; (বাতাস যেদিক থেকে)

২. থরে থরো কাঁপছে সময়
আহত জন্তুর মতো: (জীবন আমার কাছে)

৩. পরিহাসরসিকের মতো মৃত্যু পায়চারি করে; (হারিয়ে যাবার পথ)

উৎপ্রেক্ষা : সমস্তই ধীরে ধীরে যেন / আবছা ছায়ার মতো
সরে যাচ্ছে অন্তরালে। (মূল্যবান বোধগুলো সব)

চিত্রকল্প : দক্ষিণে নির্মেঘ নীল, নদীস্রোত ক্ষীণধারা
কখনো দুর্বার:
দু'চারটে নৌকো পালতোলা,
ফেরে হাট থেকে পণ্য নিয়ে
নানা লোকজন। (উড়ে যায় পাখির পালক)

'স্বপ্ন-কামনা'র মতো 'ছায়া হেঁটে যায়' কাব্যগ্রন্থেও দেখা যায় কখনো কখনো উপমাই চিত্রকল্প হয়ে গেছে। যেমন—

দ্যাখে সেই প্রতিবেশী নিজেই কেমন
অস্থিরতা জড়ো করে হৃদয়ে মননে
অন্য কোনো আশ্রয়ের খোঁজে
উন্মাদের মতো দ্রুত
ছুটে ছুটে যায়। (নিরাময় হবে ভেবে)

ছন্দ

পূর্বেই বলা হয়েছে এ কাব্যগ্রন্থে অক্ষরবৃত্ত ও সনেটই প্রধান ছন্দ। এছাড়া কিছু গদ্যছন্দের কবিতা এবং একটি স্বরবৃত্ত ছন্দের কবিতা এখানে আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ :

স্বরবৃত্ত : চাদর গলায় রসিক নাগর / জানায় সম্ভাষণ
বাগান মালী সারাদিনের কাজের ক্লান্তি শেষে
কোথাও কাছে ঘুমে অচেতন। (বোবা রাতের কান্না)

গদ্যছন্দ : বড়ো দ্রুত সব মিলিয়ে যায়, / বড়ো তাড়াতাড়ি।
স্পষ্ট হবার মূর্ত হবার আগে / চিত্রকল্প প্রতীক ক্ষয়ে যায়।
(বড়ো দ্রুত সব মিলিয়ে যায়)

অক্ষরবৃত্ত : ১. বড়োই আশ্চর্য লাগে এইসব ভ্রান্ত পরিক্রমা।
সবাই প্রত্যহ যেন ছুটে যাচ্ছি উচ্চতার দিকে,
কোনো তীক্ষ্ণ আকাঙ্ক্ষার পাহাড়ের শীর্ষে পৌঁছাবার
ভয়ঙ্কর প্রস্তুতিতে অপসৃয়মান দৃশ্য দোলে। (বড়োই আশ্চর্য লাগে)

২. কে তুমি আড়ালে আছো। অর্গলিত দ্বার
আজ খুলবো না। সমস্ত প্রহর
নিদ্রালস, নিদ্রাহীন। স্নায়ুর বিকার

Dhaka University Institutional Repository

দীর্ঘকাল সংরক্ত শরীরে। কণ্ঠস্বর
শুনলে, চিনতে কষ্ট হয়। আজ আর
খুলবো না দুয়ার এই রাতে। (এই রাতে)

সনেট

'ছায়া হেঁটে যায়' কাব্যগ্রন্থে সনেট আছে দশটি। এর মধ্যে বিশুদ্ধ শেক্সপিয়রিয় রীতির পাঁচটি এবং মিশ্রণ রীতির তিনটি সনেট রয়েছে। এছাড়া দুটি নতুন রীতির সনেট আছে, যা এর পূর্বে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের কোনো কাব্যগ্রন্থে পাওয়া যায় নি। উদাহরণস্বরূপ —

১. জীবন, আমার কাছে কী-বা চাও আজ বলো দেখি।
ওই দ্যাখো দৃশ্যান্তর থরো থরো কাঁপছে সময়
আহত জন্তুর মতো: অন্ধকারে খণ্ড খণ্ড ভয়
হৃদয়ের স্বপ্ন কাড়ে; তুমি থাকো বিষণ্ন একাকী

প্রান্তরে বৃক্ষের মতো; সংসারের যতো অন্ধ, মেকী
ক্ষুদ্রতা হীনতা লিপ্সা দীর্ণ করে নির্মল প্রণয়
ফুল্ল বসন্ত নিমেষে। ছড়ায় নির্বীর্য অবক্ষয়
কোপন স্বভাব ঘটনারী। স্থূল, নেহাৎ পোষাকী

আচরণে অভ্যস্ত মানুষগুলো, লুপ্ত, নিমজ্জিত
সর্বগ্রাসী স্বখাতসলিলে। রক্ত গোলাপের চারা
বুকে নিয়ে রক্ত অশ্রু স্বেদ ঢেলে সাধের বাগানে
তুমি আর কতোকাল ফোটাবে কুসুম। নাসাস্ফীত
বিকট কবন্ধ মূর্তি দিকে-দিকে: ত্রাসের ইসারা
প্রস্তরিত প্রণয়কে বিবরে পাতালে শুধু টানে। (জীবন আমার কাছে)

২. সময়, তোমাকে আমি কী ব'লে যে সম্বোধন করি
সে-কথাই ভাবি। কী রূপকে আছ বাঁধা জীবনের
গ্রন্থিতটে; তুমি তুল্য যৌবনের কোনো উপমায়
সে-প্রশ্ন জিজ্ঞাস্য আজো; বারংবার চাঁদ ও শর্বরী
তোমাকেই খুঁজে-খুঁজে ক্ষয়ে যায়, পরম স্নেহের
কৈশোর যৌবন হ'লো, দন্তহীন বার্দ্ধক্য ঝিমায়
প্রবীণ দীপ্তির শেষে, সর্বত্রই আয়ুর সোপানে
জন্মহীন অন্তহীন অবজ্ঞাত লগ্নের সন্ধানে

নিরন্তর পরিক্রমা; তোমাকে যে দেখব কোথায়
স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে, জানি না তো। কেবল দেখেছি
তোমার খণ্ডিত রূপ জগতে জীবনের নানারূপে;
প্রেম প্রীতি ভালোবাসা, চুম্বনের গাঢ় সান্ত্বনায়
অথবা হিংসায় দ্বেষে, বেদনার বঞ্চনার স্তূপে
আমরা সবাই কিন্তু তোমাকেই শরীরে মেখেছি। (সময়)

প্রথম সনেটটি কবি রচনা করেছেন বিশুদ্ধ পেত্রার্কীয় রীতিতে। এর মিলবিন্যাস হচ্ছে কখ খক ঃ কখ খক ঃঃ গঘঙ ঃ গঘঙ। দ্বিতীয় সনেটটির মিল বিন্যাস হল কখগ ঃ কখগ ঃঃ ঘঘ ঃ ঙচছ ঃ ঙচছ; এই রীতির সনেট কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তই সম্ভবত প্রথম রচনা করেছেন। কেননা বাংলা কাব্যসাহিত্যে সনেটের বিচিত্র ধারাবাহিকতায় এ ধরনের মিল বিন্যাস খুঁজে পাওয়া যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

১০. ভিতরে বাইরে

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের 'ভিতরে বাইরে' কাব্যগ্রন্থটি কলকাতা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৪-এর সেপ্টেম্বরে। বইটির প্রকাশক শ্যামল মহাপাত্র হলেও কোনো প্রকাশনা সংস্থার নামোল্লেখ নেই। তবে প্রাপ্তিস্থান হিসেবে 'পদ্মা-গঙ্গা পাবলিকেশন, স্টল নং ৩১, ভবানী দত্ত লেন, কলেজ স্ট্রীট, কলি-৭৩' লেখা আছে। 'ভিতরে বাইরে'র কবিতাসংখ্যা ২৫; এর মধ্যে 'আমি আসব' কবিতাটি 'এই এক সময়' কাব্যগ্রন্থ থেকে চয়িত। এ গ্রন্থে সংকলিত কোনো কবিতার শেষে সাল বা তারিখ উল্লেখ না থাকায় কবিতাগুলোর রচনাকাল সম্পর্কে জানার উপায় নেই। তবে কবিতাগুলো পাঠ করলে বোঝা যায় এগুলো অপেক্ষাকৃত শান্ত সময়ের কবিতা। এ গ্রন্থে সংকলিত বেশিরভাগ কবিতায়ই কবির আশাবাদী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। কিছু কবিতায় সমসাময়িক সময়ের ছাপ লক্ষ করা গেলেও সেগুলোতে পূর্বের মতো রুক্ষতা নেই। কয়েকটি কবিতায় পাওয়া যায় কবির বিচিত্র ভাবনার ছাপ। সব দিক বিবেচনা করে 'ভিতরে বাইরে' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলোকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা—

এক. আশাবাদী কবিতা
দুই. সময়ভাবনাজাত কবিতা
তিন. বিবিধ বিষয়ক কবিতা

এক.

কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের কবিতায় আশাবাদের সুরটিই প্রধান। তাই পূর্ববর্তী কাব্যগুলোর মতো বর্তমান গ্রন্থেও 'কবিতা এখন', 'যদি বা বিশ্বাস ভাঙে', 'মন্দিরের মুখোমুখি', 'পুরনো বইয়ের কাছে', 'এমন দিন কি আসবে', 'ভিতরে বাইরে' প্রভৃতি কবিতায় আশাবাদ ধ্বনিত হয়েছে।

কবিতাকে কেন্দ্র করে রচিত 'কবিতা এখন' কবিতাটি 'ভিতরে বাইরে' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা। কবিতাকে বিষয় করে এর আগেও কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত বেশ কয়েকটি কবিতা রচনা করেছেন। কবিতাকে তিনি বিভিন্ন রূপে উপস্থাপন করেছে তাঁর কাব্যে। 'মানুষ জানে' কাব্যগ্রন্থের 'কবিতা : সত্তর দশক' কবিতায় দেখেছি কবিতাকে প্রতিবাদী চরিত্রে, কেননা সে সময়টা ছিল পরিবর্তনের—তাই, তখন কবিতাকে দেখা গেছে পুরনো পোশাক খুলে ফেলে মাথায় কাঁটার মুকুট পরে স্বেদ আর শ্রমের ভেতর পরিব্যপ্ত হয়ে যেতে। 'ছায়া হেঁটে যায়' কাব্যগ্রন্থের 'বিস্তীর্ণ মরুর একপাশে' কবিতায় দেখা গেছে, 'কবিতাপ্রাণিত হয়ে চলে যায় মানুষের দিকে'। একই কাব্যগ্রন্থের 'উত্তর মেলে না' কবিতায় কবি বলেছেন, 'কবিতার কাছে আমি চাইনি কিছুই'। কবিতার কাছে যাঁর কিছুই চাওয়ার ছিল না, সেই কবিই দেখি আলোচ্য কবিতায় বলছেন,

> কবিতার কাছে আছে অনেক প্রত্যাশা। (কবিতা এখন)

Dhaka University Institutional Repository

তার কারণ নির্দেশও তিনি করেছেন এভাবে,

কেননা কবিতা
কখনো নির্মল হ্রদ কখনো বা অশনি সংকেত,
মুহূর্তে নাড়িয়ে দিতে জানে
মন্থর হৃদয়। (ওই)

বস্তুত কবি তাঁর জীবনের দীর্ঘ সময় পার করে এসেছেন নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে; এবং একটি বিষয় তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন যে,

যখন চোখের কোণে শুধু অন্ধকার,
চতুর্দিকে বিষাদের করুণ ব্যঞ্জনা —
অযথা অস্ত্রের দম্ভ, খল নায়কের
অশুভ চীৎকার — (ওই)

তখন একমাত্র —

কবিতাই তীক্ষ্ণ অসি, ছিন্ন করে দিতে পারে
ভীতিপ্রদ ছায়ার বিকার। (ওই)

আর সেই উপলব্ধি থেকেই তিনি কবিতার কাছে প্রত্যাশা করেন অনেক কিছু। আশাবাদী কবি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন —

ছলনার নানা বাঁক পার হয়ে কবিতা এখন
ক্রমশ এগিয়ে যেতে চায়
প্রতিশ্রুত পথ ধরে রৌদ্রে জলে ঝড়ে
পরিশুদ্ধ জীবনের দিকে। (ওই)

'যদি বা বিশ্বাস ভাঙে' কবিতার প্রথমেই দেখা যায় আশাবাদী কবি কিরণশঙ্করের আশ্বস্ত উচ্চারণ —

যদি বা বিশ্বাস ভাঙে তাকে ফের নতুন করেই
গড়ে নিতে হবে। (যদি বা বিশ্বাস ভাঙে)

কেননা মালা ছিন্ন হতে পারে, মূর্তি ভেঙে যেতে পারে, মালঞ্চের সব ফুল ঝরে যেতে পারে কঠিন ঝড়ের দামাল হাওয়ায়; ভাঙা এ পৃথিবীর শাশ্বত নিয়মেরই একটা অঙ্গ। ভাঙার জন্যে মহাকালের ক্রুদ্ধ তীক্ষ্ণ তীরগুলো অবিরাম পাক খাচ্ছে — ভাঙছে কীর্তিস্তম্ভ মায়াবী মিনার। কিন্তু আমরা জানি শুধু ভাঙাই একমাত্র সত্য নয় — ভাঙার পরেই সৃষ্টি হয় নতুনের; যেমন বৃক্ষ ছিন্ন হলে ফের তার সৃষ্টি হয় নতুন চারায়। আশাবাদী কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের মনে তাই স্থির বিশ্বাস ভাঙার কারণে অন্ধকারের যে ছায়া সাময়িক আচ্ছন্ন করে, নতুনের হিরক-উজ্জ্বল আবির্ভাবে সে অন্ধকার দূরীভূত হবেই। কবির ভাষায় :

হৃদয়ে বিশ্বাস যদি ধ্রুব নক্ষত্রের মতো
সুস্থির উজ্জ্বল,
বার বার অন্ধকার করবেই সে জয়। (ওই)

'মন্দিরের মুখোমুখি' কবিতাটিও কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের একটি আশাবাদী কবিতা। আমরা জানি মন্দির মানেই সংস্কারের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য। যার আশ্রয়ে মানুষ দিনের পর

Dhaka University Institutional Repository

দিন, বছরের পর বছর, যুগ যুগ ধরে নিজের আত্মবিশ্বাসকে হারিয়ে ফেলেছে। পরনির্ভরশীলতার হাজার বছরের ঐতিহ্যবহনকারী মন্দির চতুর্দিকে ভাঙা দেয়াল, লতাগুল্মের ঝোপে জরাজীর্ণ হয়ে পড়লেও এখনো সেখানে গভীর নিস্তব্ধতাই বিরাজ করে। কোনো ফাঁক-ফোঁকর দিয়েই প্রদীপ্ত আলোর শিখা সেখানে পৌঁছতে পারে নি। কবি ওই ভগ্ন মন্দিরের একেবারে ভিতরের দিকে চলে যেতে চান। সেখানে পৌঁছে তিনি হাজার বছর আগেকার পূর্ব পুরুষের কাছে ফিরে পেতে চান তাঁর আত্মবিশ্বাস। কবির ভাষায় :

আমি ওই উপাসনালয়ে একেবারে ভিতরের দিকে
চলে যেতে চাই।
যেন ভিতরের দিকে গেলেই হাজার বছর আগেকার
পূর্বপুরুষদের মুখোমুখী হব;

ভাঙা দেয়াল লতাগুল্ম গাছপালার ফাঁকে
আমি চেঁচিয়ে উঠব,
ফিরিয়ে দিতে বলব আমার আত্মবিশ্বাস।
(মন্দিরের মুখোমুখি)

'পুরনো বইয়ের কাছে' কবিতায় লক্ষ করি সন্ত্রাসে বিদীর্ণ বর্তমান সময়ের নানান ঘটনায় অস্থির কবি আত্মস্থ হতে চেয়েছেন পুরনো বইয়ের কাছে — যেমন আত্মস্থ ছিল অতীতকালের লোকগুলো। যাদের স্মৃতি ও প্রজ্ঞার আলো বিস্ময়করভাবে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। ঐশ্বর্যমণ্ডিত সেই মানুষের কাছে নিজের বিশ্বাস ফিরে পাবার আশা ব্যক্ত করেন কবি। আর তাই তিনি পুরনো বইয়ের কাছে হাত পেতে বলেন :

দাও সেই উজ্জ্বল আলোয় জ্বলা বিশ্বাসের দীপ
বুকের ভিতরে সুর, মগ্নতার বিবেকী আশ্বাস! (পুরনো বইয়ের কাছে)

'এমন দিন কি আসবে' কবিতায় ফুটে উঠেছে কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের আশাবাদী মনোভাবের উজ্জ্বল চিত্র। বর্তমান সময়ের বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যেও সমস্ত সংশয় কাটিয়ে কবি একটি সুন্দর আগামীর কথা ভাবেন — যেখানে মানুষ যখন যা চাইবে, তখনই তা পেয়ে যাবে। কবির ভাষায় :

এমন দিন কি আসবে কখনো
যখন
মেঘ চাইলে মেঘ, রৌদ্র চাইলেই রৌদ্র
হাত পাতলেই
মাঠে পাহাড়ে গাছের মাথায়
বৃষ্টির নির্ঝর।
এমন দিন কি কখনো হবে, যেদিন
চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে ক্ষমা আর
আশীর্বাদের
তাজা ফুলগুলো ... (এমন দিন কি আসবে)

'ভিতরে বাইরে' কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতা 'ভিতরে বাইরে'তে দেখা যায়, কবি হাজার বছরের পুরনো স্মৃতি সৌধের ভেতরে প্রবেশ করে তার সৌন্দর্য ও কারুকার্যে মোহিত

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে যান। কিন্তু সে মুগ্ধতা স্বল্পকালের। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি সেই রুদ্ধ বিশাল ঘরে অনুভব করেন অদ্ভুত এক নিশ্চলতা প্রাচীন সরীসৃপের মতো যেন কোথাও ওৎ পেতে আছে; ঘরগুলোর বিষণ্ন স্তব্ধতায় জড়িয়ে আছে যেন কয়েক শতাব্দীর গোপন স্মৃতির অকথিত যন্ত্রণা। কবি তাই পুরনো প্রাসাদের গম্বুজ আর খিলানের রহস্যময়তায় স্থির থাকতে পারেন না — তিনি বাইরে বেরিয়ে আসেন। বাইরের বট আর অশ্বত্থের পল্লবঘন ছায়ার ফাঁকে সূর্যরশ্মির উজ্জ্বল বর্ণচ্ছটায় অতীতের মোহজাল ছিন্ন হয় তাঁর। অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরেন তিনি। ফিরে পান আত্মবিশ্বাস। কবি দেখেন,

দূরে রাস্তায় যাত্রীবাহী বাস, নতুন নতুন
ঘর-বাড়ি আপিস,
চলন্ত রিকসায় শিশু আর কিশোরীর হাসিমুখ। (ভিতরে বাইরে)

আর তাই কবির কাছে,

বাইরের এই তাজা সজীব দৃশ্যকে তখন
ফুলের মতোই আকাঙ্ক্ষিত মনে হয়। (ওই)

দুই.

সময়সেচতন কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের পূর্ববর্তী কাব্যগুলোর ধারাবাহিকতায় 'ভিতরে বাইরে'র কিছু সংখ্যক কবিতায় কবির সময়ভাবনা লক্ষণীয়। এ ধারার কবিতাগুলো হচ্ছে : 'রূপান্তর', দিনরাত্রি', 'এই স্বপ্ন', 'শরতের দিন', 'অসমাপ্ত' ও 'আসল কথা'।

'রূপান্তর' কবিতায় দেখা যায় কবির মনে একটা ভয় সারাক্ষণ তাড়া করে ফেরে। আর তার জন্যে দায়ী বর্তমান বিপর্যস্ত সময়। কেননা এখন একদিনেই —

সাতটি বিমান দুর্ঘটনা, চারটি বিমান ছিনতাই,
এক ডজন হাত বোমার বিস্ফোরণ,
স্টোভের আগুনে যুবতীবধূর মৃত্যু —
এসব ঘটনাই ঘটে যাচ্ছে অহরহ, (রূপান্তর)

আর সে জন্যেই কবি খবরের কাগজের পাতা খুলতে ভয় পান, ভয় পান গভীরভাবে ঘুমোতে — যদি এই ঘুম আর কখনো না ভাঙে ভেবে। অথচ তিনি এক সময় নিজেকে দাবি করতেন বিপ্লবী বলে; বুলেট বোমার ভয় তুচ্ছ করে মিছিল নিয়ে পার্কে যেতেন বিশাল জনসভায়। তাই কবিতার শেষ পর্যায়ে দেখি নিজেই নিজেকে ধিক্কার জানিয়ে বলছেন,

একি রূপান্তর! তুমি না এক সময় ধ্বনি তুলে
মিছিল ক'রে পার্কের সভায় যেতে। (ওই)

পুরনো দিনের কথা স্মরণ করে কবি ফিরে পেতে চেয়েছেন হারানো বিশ্বাস; বর্তমান সময়কে মোকাবেলা করার সাহস।

'দিনরাত্রি' কবিতাটিতে প্রকাশ পেয়েছে গভীর দুঃসময়ের চিত্র। সময় এতটাই খারাপ যে এখন মানুষ বসবাস করছে এক স্তূপায়িত অনিশ্চয়তার মধ্যে। বাইরে হিংস্র শ্বাপদের ঘোরাফেরায় সমস্ত বাসভূমিই ভীত সন্ত্রস্ত; বাইরে বের হলেই ঘটতে পারে নিশ্চিত মৃত্যু। এই দুঃসময়ে মানুষ ভুলে যেতে বসেছে বৃক্ষ, নক্ষত্র কিংবা চাঁদের সৌন্দর্য। কেননা

Dhaka University Institutional Repository

বাইরের কোনো কিছুই ভালো করে না দেখতে দেখতে সব কেমন ঝাপসা, অস্পষ্ট। কবির ভাষায় :

এখন মানুষ চাঁদের দিকে তাকায় না,
নক্ষত্র বা বৃক্ষের দিকেও নয়,
এখন মনের ভিতরে জ্যোৎস্নাহীন ঝাপসা
দিন আর রাত্রি। (দিনরাত্রি)

'এই স্বপ্ন' কবিতায় ফুটে উঠেছে প্রতিকূল সময়ের বিরুদ্ধে স্বপ্নের বিজয়গাথা। কবি শৈশব-কৈশোরে যে স্বপ্ন দেখতেন সেই স্বপ্ন তাঁর যৌবনে বড়ো হতে হতে ছড়িয়ে পড়ে অরণ্যে নদীতে পাহাড়ে। কবিকে সেই স্বপ্ন কিছুতে স্থির হয়ে ঘরে বসে থাকতে দেয় না — মিশে যেতে চায় সমুদ্রের হাওয়ায়। কিন্তু তিনি স্বপ্নের আহ্বানে সাড়া দিতে পারেন না। কারণ,

[...] সময়ের হাওয়ায়
এখন ঝড়ের দাপটে দুলে উঠছে সমস্ত পৃথিবী,
চতুর্দিকে রক্তক্ষরণের দৃশ্য।
দিকে দিকে নতুন উত্থান, অন্যদিকে গভীর পতন
আশ্চর্য এক বোধ নিয়ে আসে অস্থির মজ্জায়, (এই স্বপ্ন)

সময়ের এই বিরূপতায় কবির মনের মধ্যে বেড়ে ওঠা স্বপ্ন কোথাও হারিয়ে যায় না। নদীর জলের বদ্বুদের মতো মিলিয়ে যায় না দুঃসময়ের স্রোতের আবর্তে। বরং বড়ো হতে হতে ক্রমশ বিশাল মূর্তি ধারণ করে আকাশকেও ছাড়িয়ে যেতে চায়। —

স্বপ্ন হারিয়ে যায় না, নদীর জলের বুদ্বুদের মতো
শুধুই মিলিয়ে যায় না স্রোতের আবর্তে,
বড়ো হতে হতে একদিন বিশাল মূর্তি, ক্রমশ
নীলিমাকে ছাড়িয়ে যায়। (ওই)

'শরতের দিন' কবিতাটিতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এক বিষাদময় শরতের ছবি। শরৎ বললেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক উজ্জ্বল আনন্দের কালের কথা। যে কালে আকাশে ফোটে স্বর্ণাভ রৌদ্র, মাটিতে দোলে শাদা কাশবন; অপূর্ব এই সৌন্দর্যে রবীন্দ্রনাথের মতো মন গেয়ে ওঠে 'অমল ধবল পালে লেগেছে হাওয়া'। কিন্তু এখন শরতের এই দিনে কেউ জানতে চায় না আনন্দের কথা; দেখা হলেই চোখে মুখে সবার অন্ধকারের ছোপ — সবাই বিষাদের কথা বলে। ভীষণ সময়ের আঘাতে বিপর্যস্ত মানুষগুলোর চারপাশে এখন ঘিরে ধরেছে এক ভয়াবহ হতাশা। শরতের এই উজ্জ্বল দিনেও নতুন করে জীবন শুরু করার কথা কেউ ভাবতে পারে না। কবিতার শেষ তিন পঙক্তিতে তাই কবি বলেন,

সর্বত্রই পোড় খাওয়া লোকগুলি একালে
নিজেদের চারপাশে
একটি ক'রে বিষাদের ঘর বানিয়ে রেখেছে। (শরতের দিন)

'অসমাপ্ত' কবিতায় কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের সময়ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর জীবনভাবনার সঙ্গে মিশে। কবি যৌবনে সময় পেয়েছিলেন সবকিছু গুছিয়ে নেবার, কিন্তু তিনি তা করেন নি। কবি বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

ওই কৃষ্ণচূড়া গাছটার কাছে
যেতে চেয়েছিলাম
ফুলের জন্যে;
নদীর স্বচ্ছ জলে স্নান করা ভেবে একদিন
যেতে চেয়েছিলাম উজানে;
অথচ হয়ে উঠলো না। (অসমাপ্ত)

কবির যৌবনকাল উত্তীর্ণ হয়েছে। সময় হয়ে এসেছে এখন যাবার। কিন্তু জীবনের আকাঙ্ক্ষিত সাধ অপূর্ণ থেকে গেল। আর তাই কবির,

দৃশ্যগুলোর দিকে তাকিয়ে এখন সব উদ্যোগই
কী ভীষণ অসমাপ্ত মনে হয়। (ওই)

'আসল কথা' কবিতাটিও এই একই ভাবধারার কবিতা। তবে এখানে কবির একটা স্থির লক্ষ আছে। কবি জানেন তিনি আর বাড়িতে ফিরতে পারবেন না। বাড়িতে না থাকলেই জমবে ধুলোবালি, জানালায় বাসা বাধবে মাকড়সা, মেঝেতে পিঁপড়ে। কিন্তু কবি বলেন,

তা হয় না।
যারা রইলো তাদের জন্য কিছু রেখে যাওয়াই আসল কথা।
(আসল কথা)

এই স্থির লক্ষে কবি অনুভব করেন তিনি এতকাল যতটা পথ হেঁটে এসেছেন, এখন তাঁকে আরো কিছুটা যেতে হবে; কুয়াশার তোরণ পার হয়ে আলো জ্বলজ্বলে উজ্জ্বল রাস্তার সন্ধানে।

তিন.

এ ধারার কবিতাগুলোর মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য করে নিবেদিত কবিতা ১টি, নৈরাশ্যমূলক কবিতা ১টি, প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা ১টি, মৃত্যুভাবনাজাত কবিতা ১টি এবং বাংলা ভাষার প্রতি মমত্ব প্রকাশ করে লেখা ১টি কবিতা উল্লেখযোগ্য। তবে এগুলো ছাড়াও পৃথক ধরনের কয়েকটি কবিতাও 'ভিতরে বাইরে' কাব্যগ্রন্থে আছে। সেগুলো হচ্ছে : 'অতি স্বাভাবিক', 'অনিন্দ্য একদিন জানবে' ও 'অক্ষর, শব্দ'।

'ভিতরে বাইরে' কাব্যগ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা 'রবীন্দ্রনাথের কাছে'। পূর্বের বেশ কয়েকটি কাব্যগ্রন্থেও কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে কিছু কবিতা লিখেছেন। আলোচ্য 'রবীন্দ্রনাথের কাছে' কবিতাটিতেও রবীন্দ্রনাথের প্রতি কবির গভীর শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়েছে।

বার বার ফিরে আসি রবীন্দ্রনাথের কাছে
নতজানু প্রার্থনায়, যেন কেউ এখনো আমাকে
নিভৃত সমুদ্রতীরে টেনে নিয়ে যায়
দেখায় অজস্র ঢেউ, জলোচ্ছ্বাস, জলের গভীরে
যে-রত্ন সঞ্চিত আছে তার এক বিরল আভাস। (রবীন্দ্রনাথের কাছে)

কবি কৃতজ্ঞচিত্তের স্বীকার করেছেন রবীন্দ্র সৃষ্টির ঐশ্বর্য ভাণ্ডার থেকে দুই হাত ভরে তিনি নিয়েছেন। এখনো ক্ষরায়, আর্দ্রতায়, তিনি লাভ করেন তাঁর সান্নিধ্য; হিংসার বিরুদ্ধে

Dhaka University Institutional Repository

কবি শুনতে পান রবীন্দ্রনাথের ভর্ৎসনার বাণী। এখনো চারদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে এলে কিরণশঙ্কর রবীন্দ্রনাথের কাছেই ফিরে আসেন এবং দেখতে পান,

ফুল ফোটাবার ঋতু এখনও আছে, এখনও নীলিমায়
সোনা রঙ অবলুপ্ত নয়,
প্রজাপতি মক্ষিকার ব্যস্ততাও অরণ্যের পথে
লক্ষ্য করা যায়, রবীন্দ্রনাথের কাছে এসে
ভুলতে হয় শোক তাপ ভয়। (ওই)

আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের একমাত্র নৈরাশ্যমূলক কবিতা হচ্ছে 'বৃক্ষ হতে ফল ঝরে কালো ছায়া ঘরে' কবিতাটি। কবিতার প্রথমেই যখন কবি ঘোষণা দেন :

প্রত্যাশা বলে কি কোনো সৌম্য শব্দ অভিধানে আছে?
(বৃক্ষ হতে ফল ঝরে কালো ছায়া ঘরে)

তখনই আমরা বুঝতে পারি আপাদমস্তক কবি এখন নিরাশায় আচ্ছন্ন। যার ফলে তিনি বলতে পারেন,

পতন স্খলন মৃত্যু এসব তো পরিচিত খুব,
দুরাশার মুখে পড়ে আঙ্গুলের চাপ ক্ষণে-ক্ষণে,
প্রস্তর গড়িয়ে যায় বেড়ে ওঠে হতাশার স্তূপ,
নতুন ফুলের কোনো আশা নেই প্রাচীন উদ্যানে। (ওই)

কবি শুধু একাই এই হতাশার প্লাবনে তলিয়ে যান না — তিনি তাঁর সঙ্গে টেনে নেন প্রিয় বন্ধু মহীতোষকেও। মহীতোষ, যাঁর প্রথম প্রেমিকা আজ আর তাঁকে চায় না। তাই হতাশাগ্রস্ত কবি আশাহত মহীতোষকে সম্বোধন করে বলেন,

তুমি জানো, মহীতোষ, প্রত্যেকেই বুকের পিঞ্জরে
নিবিড় ফুলের ঘ্রাণ পেতে চায় অথচ নিমেষে
দিকভ্রান্ত নাবিকেরা দ্বীপচ্যুত, দেশে কি বিদেশে
বৃক্ষ হতে ফল ঝরে ফুল ঝরে কালো ছায়া ঘরে। (ওই)

'অতি স্বাভাবিক' কবিতাটিতে ফুটে উঠেছে একজন দিনমজুরের অতি সাধারণ জীবনযাত্রার ছবি। জন্মের পর থেকেই একজন দিনমজুর এই রূঢ় পৃথিবীর কণ্টকময় পথে পরিক্রমণ শুরু করে। সে জানে না কতটা পথ তাকে অতিক্রম করতে হবে। তবে চতুর্দিকের নানা দৃশ্য দেখে সে তার জীবনটাকে গড়ে তোলে অত্যন্ত সাধারণভাবে। এবং চারপাশের যাবতীয় রুক্ষতাকেও সে গ্রহণ করে খুবই স্বাভাবিকভাবে। কবির ভাষায় :

রক্তপাত দেখে দেখে কেটে গেল দীর্ঘতম বেলা।
দিনমজুরের কাছে সৌখিনতা বলে কিছু নেই,
ভূমিষ্ট হবার পর থেকে প্রতিদিন
চর্তুদিকে নানা দৃশ্য দেখে দেখে
মালিক দালাল বেশ্যা গোপন মজুতদার
তার কাছে মনে হয় অতিস্বাভাবিক। (অতি স্বাভাবিক)

কবিতাকে কেন্দ্র করে রচিত 'অক্ষর, শব্দ' কবিতায় কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত মনে করেন বর্তমানে অক্ষর এবং শব্দের প্রকৃত মেলবন্ধন হচ্ছে না। প্রেমিক যেমন প্রেমাস্পদাকে

Dhaka University Institutional Repository

নিবিড় আলিঙ্গনে বেধে রাখে, তেমন করে শব্দ আর অক্ষর পরস্পর সংলগ্ন হতে পারছে না। তাই কবির কাছে মনে হচ্ছে শিরদাঁড়া ভাঙা রুগণ মানুষের মতো অক্ষরগুলো সোজা পায়ে ঠিক হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। শব্দগুলো বড়ো ঝাপসা হয়ে এসেছে, যেন সাত পুরনো ধূলিধূসর কাচ — স্পষ্ট করা দরকার। কবিতার প্রতি গভীর ভালবাসায় তাই কবি অনুভব করেন,

> এক-একটা অক্ষরকে ঘসে মেজে ঝকঝকে তকতকে
> করা দরকার;
> কয়েকটা অক্ষর মিলে যেন তৈরী হ'তে পারে
> গভীর অর্থবহ শব্দ;
> যে শব্দ একের পর এক উচ্চারিত হ'লে
> উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে কবিতার জগৎ।
> (অক্ষর, শব্দ)

তখন কবিতা মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে আর সবাই চিনতে পারবে কবিতার মুখের ছবি।

'মাথা উঁচু রেখে দাঁড়াবার জন্যে' কবিতাটিতে ফুটে উঠেছে প্রকৃতির প্রতি কবির গভীর অনুরাগের ছবি। কবি লক্ষ করেছেন এখনকার সময়ের নানান অভিঘাতে মানুষ তার প্রকৃত সত্তা টিকিয়ে রেখে মাথা উঁচু করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। কেবলি অনিশ্চয়তা আর বিপদের মুখোমুখি হতে হতে ক্রমশ মানুষ ভুলে যেতে বসেছে সুন্দর জীবনের কথা। তাই প্রকৃতিপ্রেমী কবি সমস্ত কোলাহল ছেড়ে মানুষকে আহ্বান জানান মুক্ত হাওয়ায় প্রকৃতির সান্নিধ্যে আসার জন্যে। কেননা কবি বিশ্বাস করেন একমাত্র খোলা হাওয়ায় বিশাল বটের ছায়ায় এসে দাঁড়ালেই মানুষ তার আপন সত্তার মহত্ত্বকে অনুভব করতে পারবে, সে আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম হবে। কবি বলেন,

> মাথা উঁচু রেখে দাঁড়াবার জন্যে
> একবার এসো এই খোলামেলা জায়গায়,
> বিশাল বটগাছটার ছায়ায়। (মাথা উঁচু রেখে দাঁড়াবার জন্যে)

কারণ,

> উন্মুক্ত জায়গায় এলেই
> গাছগুলোকে খুব আত্মীয় মনে হয়,
> হাওয়াকে সুহৃদ স্পর্শের মতো লাগে,
> নদীকে তৃষ্ণার অঞ্জলি। (ওই)

আর তাই,

> জীবনটা সুন্দর করবার জন্যে তখন শপথ নিতে আবার ইচ্ছা হয়। (ওই)

'ভিতরে বাইরে' কাব্যগ্রন্থে কবির মৃত্যুভাবনা প্রকাশ পেয়েছে একটি কবিতায়। কবিতার নাম 'সন্ধ্যার দিকে'। নামকরণেই এ কবিতার তাৎপর্য নিহিত। জীবন সায়াহ্নে উপনীত দুইজন মানুষের জীবনকাহিনি বর্ণিত হয়েছে এ কবিতায়। সাত-পুরনো চুন-বালিখসা একই বাড়ির দুই বৃদ্ধের প্রতিদিন দেখা হয় সিঁড়ি দিয়ে ওঠা কিংবা নামার সময়। মাঝে মধ্যে হয়তো দুজনেই ভাবেন,

Dhaka University Institutional Repository

একবার দাঁড়িয়ে আলাপ করলে কী রকম হয়?
নীচে নামলেই রাস্তার ওধারে পার্ক,
সন্ধ্যার দিকে অন্তরঙ্গ কথায় হৃদয়-বিনিময়...
একদিন কি বসা যায় না? (সন্ধ্যার দিকে)

কিছুই হয়ে ওঠে না; কেননা আগ-বাড়িয়ে কেউ কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে ভদ্রতায় বাধে। অতঃপর,

একদিন চাপা কান্না আর হরিধ্বনির মধ্য দিয়ে
বৃষ্টিভেজা ম্লান সন্ধ্যায়
ফুলের মালা গলায়
একজন চলে গেলেন। (ওই)

'অনিন্দ্য একদিন জানবে' কবিতার মাধ্যমে কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ফুটিয়ে তুলেছেন মানুষের পশুবৃত্তিক চরিত্রের চিত্র।

চার বছরের অনিন্দ্য পড়তে জানে না। সে ছবি দেখে ডোরা কাটা বাঘের, সেটাই তার মনের মধ্যে গেঁথে থাকে নিদ্রায়-জাগরণে। সে মা-ঠাকুমার কাছে টুনটুনির বইয়ের কথামালার গল্প শোনে। ঘুম ভাঙার পর সেগুলো তার মনে থাকে না। মনের মধ্যে জ্বলজ্বল করে ডোরাকাটা বাঘের মুখ। চার বছরের অনিন্দ্য খবরের কাগজ পড়ে না, জানতে পারে না—মানুষ কতো হিংস্র হতে পারে; প্রতিদিন আশেপাশে কতো রক্তক্ষরণের দৃশ্য দেখতে হয় মানুষকেই। তাই কবি বলেন,

বড়ো হলে অনিন্দ্য একদিন জানবে
মানুষের হিংস্রতার কাছে
বাঘ কিংবা চিতার হিংস্রতার নখর
কতোই না তুচ্ছ। (অনিন্দ্য একদিন জানবে)

তখন সুন্দরবনের ডোরাকাটা বাঘ, কুমায়ুনের মানুষখেকো চিতা কিংবা হায়েনার হাসি অনিন্দ্যর কাছে ম্লান হয়ে যাবে।

'বাংলা ভাষা' কবিতায় কবির কণ্ঠে প্রকাশ পেয়েছে দেশকে ভালবাসার কথা, জন্মভূমিকে ভালবাসার কথা, মাতৃভাষাকে ভালবাসার কথা। ১৯৪৭-এ ধর্মের দোহাই দিয়ে বাংলাদেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করলেও দুই বাংলার মিলন সেতু হিসেবে অক্ষত রইল বাংলা ভাষা; দুই বাংলার আপামর জনসাধারণের মনের ক্ষতকে সারিয়ে তুলবার একমাত্র বিশল্যকরণী। সে কথা স্মরণ করেই কবি লেখেন :

আমরা ভাষার ইমারৎ তৈরী করছি,
বুকে বুকে গুঞ্জন তুলেছি গানের
দুই বাংলা দেশে। আমরা যতোই
দূরে দূরে থাকি, একই ভাষায়
মিলনের সাঁকো তৈরী, এপার ওপার
একটাই যখন বাঙলা দেশ
অবাক হওয়ার সঞ্চারণে
স্পষ্ট উচ্চারণে

Dhaka University Institutional Repository

হৃদয়ের ক্ষত মুছে দিতে
ভাষাই আমাদের বিশল্যকরণী। (বাংলা ভাষা)

এই কবিতায় কবি কিরণশঙ্করের বাংলা ভাষার প্রতি, বাংলাদেশের প্রতি যে গভীর ভালবাসার উচ্চারণ ধ্বনিত হয়েছে তা ভূগোল-নিরপেক্ষ নয়; ঐতিহ্যগতভাবে প্রত্যেক বাঙালির প্রাণের নিভৃততম অভেদ্য উচ্চারণ।

'ভিতরে বাইরে'র কাব্যভাষা গদ্য। এ কাব্যগ্রন্থে একটিও অন্ত্যমিলের কবিতা নেই। কবিতার শরীর নির্মাণে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত অমিল প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত ও গদ্যছন্দকে অবলম্বন করেছেন। অলংকারের মধ্যে উপমার প্রাধান্য লক্ষণীয়। অল্পবিস্তর অনুপ্রাস, উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। 'ভিতরে বাইরে' কাব্যগ্রন্থ থেকে অলংকার ও ছন্দের উদাহরণ তুলে ধরা হল :

শব্দালংকার

সরল অনুপ্রাস :

১. কেউ জানতে চায় না নতুন ক'রে ফের
কোনদিক থেকে শুরু ক'রতে হবে; (শরতের দিন)

২. সমস্ত পৃথিবীর সুন্দর দৃশ্যগুলোকে / সে তার স্বপ্নের ভিতরে
নিয়ে আসতে চায়! (কবির জন্মদিন)

ছেকানুপ্রাস : আলো জ্বলজ্বলে উজ্জ্বল রাস্তায় চলার পর (আসল কথা)

অর্থালংকার

উপমা :

১. কখনো নদীর মতো মৃদু ধ্বনিময়, (কবিতা এখন)

২. ছায়ামূর্তির মতো ডালপালাগুলো
হঠাৎ হাওয়ায় নড়ে ওঠে। (মন্দিরের মুখোমুখি)

৩. অদ্ভুত এক নিশ্চলতা প্রাচীন সরীসৃপের মতো
কোথাও ওৎ পেতে আছে, (ভিতরে বাইরে)

উৎপ্রেক্ষা :

১. বাইরের এই তাজা সজীব দৃশ্যকে তখন
ফুলের মতোই আকাঙ্ক্ষিত মনে হয়। (ভিতরে বাইরে)

২. সাদা মেঘের টুকরোগুলো থরে থরে সাজানো
যেন নৈবেদ্যের সোনালী থালা! (শরতের হাওয়া)

ছন্দ

গদ্যছন্দ :

১. এমন দিন কি আসবে কখনো
যখন
মেঘ চাইলে মেঘ, রৌদ্র চাইলেই রৌদ্র
হাত পাতলেই
মাঠে পাহাড়ে গাছের মাথায়
বৃষ্টির নির্ঝর। (এমন দিন কি আসবে)

২. ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে সন্ধ্যায় ছাদে
আমি এখন মাঝে মাঝে আকাশ দেখি; (দিনরাত্রি)

Dhaka University Institutional Repository

অমিল প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত :

১. যদি বা বিশ্বাস ভাঙে তাকে ফের নতুন করেই
গড়ে নিতে হয়।
মালা ছিন্ন হতে পারে মূর্তি ভেঙে যেতে পারে
মালঞ্চের সব ফুল ঝরে যেতে পারে
কঠিন ঝড়ের দিনে দামাল হাওয়ায়। (যদি বা বিশ্বাস ভাঙে)

২. কবিতার কাছে আছে অনেক প্রত্যাশা।
কেননা কবিতা
কখনো নির্মল হ্রদ কখনো বা অশনি সংকেত,
মুহূর্তে নাড়িয়ে দিতে জানে
মন্থর হৃদয়। (কবিতা এখন)

প্রতীক

'ভিতরে বাইরে' কাব্যগ্রন্থের কিছু কবিতায় 'নদী', 'ফুল', 'বৃক্ষ' জীবনের চলমানতার সূত্রে কবির আশাবাদের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার হয়েছে। যেমন—

১. যা কিছু ভাঙার নয় তাকে বার বার
গড়ে নিতে হয়, যে-রকম বৃক্ষ ছিন্ন হলে
ফের গাছ নতুন চারায়: (যদি বা বিশ্বাস ভাঙে)

২. অন্ধকার দিকে দিকে ঘন হয়ে এলে
তাঁর কাছে ফিরে আসি, দেখি
ফুল ফোটাবার ঋতু এখনও আছে, (রবীন্দ্রনাথের কাছে)

এখানে 'বৃক্ষ' এবং 'ফুল'কে দুঃসময় বা নৈরাশ্য অতিক্রমী আশাবাদের উজ্জ্বল প্রতীক হিসেবে কল্পনা করে কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত কবিতার ক্ষুদ্রায়তনে বৃহৎভাবের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

১১. দৃশ্য বদলের দিন

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'দৃশ্য বদলের দিন'। গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় কলকাতার *প্রত্যয়* প্রকাশনী থেকে মাঘ ১৪০১, জানুয়ারি ১৯৯৫-এ। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে কবির স্কুল জীবনের সহপাঠী ও সুহৃদ শঙ্খ চৌধুরী এবং অশোক মিত্রকে। গ্রন্থে সংকলিত কবিতার সংখ্যা ৬৯। কবিতাগুলোর কোনোটিতে তারিখ বা সাল উল্লেখ নেই; সুতরাং কবিতাগুলোর রচনাকাল নির্ণয় করা যায় নি। তবে কবিতাগুলো পাঠ করলে বোঝা যায় কবি একটা রূঢ় সময়ের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করছিলেন। সে কারণেই আশাবাদী কবির আলোচ্য গ্রন্থভুক্ত প্রায় সবগুলো কবিতার মধ্যেই সময়ের কাঠিন্য অনুভব করা যায়, এমনকি প্রেম অনুভবজাত কবিতার মধ্যেও। এ কাব্যগ্রন্থের আলোচিত কবিতাগুলোকে নিম্নোক্ত চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা —

এক. আশাবাদব্যক্ত কবিতা
দুই. রাজনীতি সচেতন কবিতা
তিন. সময়চেতনাজাত কবিতা
চার. বিবিধ বিষয়ক কবিতা

এক.

পূর্ববর্তী কাব্যগুলোর মতো 'দৃশ্য বদলের দিন'-এর বেশ কিছু সংখ্যক কবিতায় কবির আশাবাদ ব্যক্ত হয়েছে; তবে সে আশাবাদ ধ্বনিত হয়েছে সমসাময়িক সময়কে ধারণ করে। এ ধারার কবিতাগুলো হচ্ছে : 'ঘরের বাইরে', 'দলিলের প্রতিশ্রুতি', 'চারাগাছ দুলে ওঠে', 'তেমন খারাপ নয়', 'যে যাই বলুক', 'তোমার স্বপ্ন', 'দুই রূপ', 'অনুভব'।

'ঘরের বাইরে' আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা। এ কবিতায় দেখা যায় রুদ্ধশ্বাস সময়ের চাপে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ কবির মনে হয় একবার ঘরের বাইরে বের হতে পারলেই তিনি ফিরে পাবেন প্রিয় মানুষের সান্নিধ্য, মুক্ত আকাশ এবং পৃথিবীর বিশালতাকে। তিনি বিশ্বাস করেন ঘরের বাইরে এলেই তাঁর চতুর্দিকে ঘিরে থাকা দুঃসময়ের কালো ছায়া সরে যাবে — পালিয়ে যাবে অরণ্যে, পাহাড়ে; মিলিয়ে যাবে মাটিতে কিংবা দিগন্তে। আর তখন মুহূর্তের মধ্যে ফিরে আসবে হৃদয়-কোণে লুকিয়ে থাকা স্পন্দমান স্বপ্ন। আশাবাদী কবি তাই স্বপ্ন দেখেন,

মাঠের নিস্পন্দ বৃক্ষ সমাজ
কয়েকটি ঝরা পাতার পতনে
নড়ে চড়ে ওঠে; (ঘরের বাইরে)

এবং অনুভব করেন সেই বৃক্ষের —

[...] নতুন পাতায় পাতায়
সুখের পাথর-চাপা সরিয়ে
এক ঝাঁক পাখির উন্মুখতা,
নতুন আকাঙ্ক্ষার কাকলি। (ওই)

Dhaka University Institutional Repository

'দলিলের প্রতিশ্রুতি' কবিতাটিতে কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত এই সমাজের লিখিত অনেক নিয়ম-কানুন, আইনের অসারতার চিত্র তুলে ধরেছেন।

দলিলের মধ্যে অনেক প্রতিশ্রুতি ছিল।
[...]
দলিলের ভেতরকার লেখালেখিগুলো
অনেককাল বাক্সবন্ধী, পুরনো তেলচিটে কাগজে
হিজিবিজি অক্ষরের মতো
কেমন যেন নিষ্প্রভ হয়ে মুখ লুকিয়ে ছিল;
স্যাতসেতে ঠাণ্ডায় ভিজে উঠেছিল চতুর্দিক। (দলিলের প্রতিশ্রুতি)

আমাদের সমাজে এখন এটাই প্রত্যক্ষ সত্য: যা কিছু সংবিধিবদ্ধ, যে নিয়মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সমাজ — সেসব এখন দুর্নীতিবাজ, অন্যায়কারী দুঃশাসকের হাতে শৃঙ্খলবন্দী। কবি চান আইনের সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে। তাই গুটিকতক ভণ্ড নেতা এবং অন্যায়পরায়ণ অমানুষের হাত থেকে প্রতিশ্রুত দলিলটাকে মুক্ত করতে আম-জনতাকে আহ্বান করে বলেন,

আজ আবার দলিলটাকে অন্ধকার কোণ থেকে
টেনে বার করতে হবে,
শুকিয়ে নিতে হবে রৌদ্রে, মাকড়শার জালগুলোকে
বাড়তে দেয়া চলবে না হে! (ওই)

প্রতিবাদমুখর আশাবাদী কবি বিশ্বাস করেন, এই সমাজের সাধারণ মানুষগুলোর মিলিত শক্তিতে মুক্তি পাবে সত্যিকারের প্রতিশ্রুত দলিল অর্থাৎ বাক্সবন্দী আইন। আর তাই তিনি মাঠের রৌদ্রে উড়ন্ত প্রজাপতিগুলোর দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করেন, কখন বেলাভূমির ওপর সমুদ্র ঢেউয়ের মতো নড়ে উঠবে আইনের ভেতরকার শক্তি।

'চারাগাছ দুলে ওঠে' কবিতাটিতেও দেখি সময়ের খরতাপে মাটির স্বাভাবিক আর্দ্রতা ক্রমশ কমে যাচ্ছে; মরে যেতে বসেছে কবির সজীব বিশ্বাসের সতেজ চারাগাছ। অথচ চারাগাছটাকে বড়ো করে তুলতে পারলে একদিন সে ফুলে ফুলে ভরিয়ে তুলত পৃথিবীকে। কিন্তু অপসৃয়মাণ সময়ের রথের চাকায় ঘটনার রক্তছোপ বড়ো বেশি স্পষ্ট এখন। তবে আশাবাদী কবি কিরণশঙ্কর সহজে হতাশ হন না। তাই যখন সব অন্ধকারে তলিয়ে যেতে বসেছে তখনো তিনি খোঁজ করেন বিশ্বাসের একটুখানি আলো। এবং স্থির বিশ্বাসী কবি দেখতে পান —

[...] বুকের ভিতর কোথাও একটা আলোর রেখা
এখনো একেবারে নিভে যায় নি; (চারাগাছ দুলে ওঠে)

এবং সেই আলোকের আমন্ত্রণ পেয়ে চারাগাছ আবার মাথা তুলে দুলে ওঠে। কবির ভাষায়:

এক এক সময় মনে হয় সব অন্ধকার
তালবেতালের রূপ নিয়েছে;
কিন্তু তার পরমুহূর্তেই
নতুন সজীব আলোকের আমন্ত্রণ,
গোপন জায়গায় চারাগাছ দুলে ওঠে। (ওই)

Dhaka University Institutional Repository

'তেমন খারাপ নয়' কবিতায় ফুটে উঠেছে আশাবাদী কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের বুকের গভীরে লালন করা বিশ্বাসের প্রতিচ্ছবি। কবির ঠাকুর্দা, বাবা, এমনকি কবি নিজেও একদিন বলেছিলেন,

'এখন সময়টা বড়ো খারাপ' (তেমন খারাপ নয়)

তবে তাঁরা প্রত্যেকেই ভেবেছিলেন এই খারাপ সময় বেশিদিন থাকবে না, ফিরে আসবে সুন্দর ঝলমলে দিন। কবির ভাষায় :

ঠাকুর্দা নিশ্চয় ভেবেছিলেন
আবার ভালো সময় আসবে;
বাবাও হয়তো স্বপ্ন দেখতেন অন্য দিনের
যখন পাখিরা ফিরে আসবে ঝাঁক বেঁধে,
ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে যাবে দিক দিগন্তে। (ওই)

সে সুদিনের দেখা এখনো মেলে নি। কেননা এখনো কবির নিজের দিনগুলো কাটে স্বপ্নহীন, নিদ্রাহীন — দুঃসহ। তবুও আশাবাদী কবি বিশ্বাস করেন এই অমানিশার অন্ধকার কেটে যাবে, দেখা দেবে মেঘলুপ্ত আলোক উজ্জ্বল দিন। সেই ভাবনা থেকেই তিনি লেখেন :

আর ভাবি আমাদের উত্তরাধিকার যাদের হাতে
তারা যেন একদিন বলতে পারে:
'এখন সময়টা ভালো, আকাশ নীল, মেঘ কেটে গেছে'। (ওই)

'যে যাই বলুক' কবিতাটিতেও ব্যক্ত হয়েছে কবি কিরণশঙ্করের প্রবল আশাবাদ। কবিতার শুরুতেই দেখা যায়, যে যাই বলুক কবি আর অন্ধকার দিনগুলোর কাছে ফিরে যেতে চান না। কেউই তা চায় না। যদিও কবি এখনো আলোকের সাক্ষাৎ পান নি; কিন্তু সে পথেই যখন যাত্রা করেছেন, তখন তিনি বিশ্বাস করেন এ পথেই আসবে অদূর ভবিষ্যতে মুক্তি। তাই কবি বলেন —

শিখরে ঝরণার খোঁজে যে চলেছে
তাকে কে ফেরাবে
তৃণশূন্য মরুভূর দিকে?
[...] [...]
এখন আলোর দিকে দৃষ্টি,
গ্রামে মাঠে গঞ্জে জলকাদা মাড়িয়ে
অনেক পথ: তবু
অন্ধকার দিনগুলোতে ফিরে যেতে
কেউ রাজী নয়। (যে যাই বলুক)

'তোমার স্বপ্ন' কবিতায় দুঃসময়কে জয় করে কবি আশাকে, ভালবাসাকে, স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছেন। একটি সেতুকে যেমন গড়ে তুলতে সময় লাগে কিন্তু ভাঙতে সময় লাগে এক মুহূর্তমাত্র; তেমনি —

পাখিরা কুড়িয়ে আনে এদিক ওদিক থেকে
খড়কুটো,

Dhaka University Institutional Repository

মূলত এই কবিতাটিতে কবি মানুষের ভেতরকার দুই সত্তার রূপকার্থে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার শুভ শক্তি ও অশুভ শক্তির মধ্যে শুভ, সত্য, সুন্দরকে বিজয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

'অনুভব ১৯৯৩' কবিতাটি আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতা। এ কবিতায় কবি কিরণশঙ্করের আশাবাদী মনোভাবের পাশাপাশি নিরাশাও প্রতিফলিত হয়েছে। 'দুই রূপ' কবিতায় নরপশুকে পরাজিত করে কবি মনুষ্যত্বকে বিজয়ী করে ভেবেছিলেন তিনি জিতেছেন; কিন্তু 'অনুভব ১৯৯৩' কবিতায় হার স্বীকার করে লিখেছেন :

> এক সময় মনে হয়েছিল শ্বাপদের থাবা থেকে
> অনেক দূর পর্যন্ত চলে এসেছি,
> নতুন যাত্রা শুরু হয়েছে। (অনুভব ১৯৯৩)

এখন তিনি লক্ষ করছেন—

> নৈরাজ্য আর নৈরাশ্যের জানোয়ার দুটি
> সব সময় যেন চিতাবাঘের মতো হিংস্র:
> যে-কোনো মুহূর্তে বেলা অবেলায়
> ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। (ওই)

তবে কবির মনে নৈরাজ্য কিংবা নৈরাশ্যের কোনো ছাপ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। তাঁর মানস আশাব্যঞ্জক। তাই ভয়ংকর শ্বাপদের উপস্থিতি টের পেয়েও তিনি উচ্চারণ করেন—

> নৈরাজ্য আর নৈরাশ্যের জানোয়ার দুটিকে
> বিদ্ধ করব কঠিন শায়কে,
> নতুন জীবনের যাত্রা শুরু হবে দিকে দিকে। (ওই)

এই আশাবাদী মনোভাবই কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের পূর্বাপর সকল কবিতাকে দান করেছে স্বাতন্ত্র্য মহিমা।

দুই.

সমাজসচেতন কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের কিছু সংখ্যক কবিতায় তাঁর রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার কথা, রাজনীতিকদের দায়বদ্ধতার কথা এবং সাধারণ মানুষের প্রত্যাশার কথা তুলে ধরেছেন। এ ধারার কবিতা এর পূর্বেও লক্ষ করা গেছে— তবে সেগুলোর বক্তব্যে এখনকার মতো এতটা জোরালো ভাব ছিল না। রাজনৈতিক ব্যর্থতা, স্বার্থান্বেষীর স্বার্থপরতা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতির কারণে এ সময়কার বিভিন্ন কবিতায় কখনো তীব্র ক্ষোভ, কখনো-বা অসহায়ত্ব কিংবা বিশ্বাসহীনতার প্রকাশ ঘটেছে। 'ছদ্মবেশী', 'মাথা নেড়ে সায় দেবার আগে', 'ঝড়ের মতো দিন', 'ভোট', 'চতুর্দশপদী', 'বসবাস', 'দিল্লী, মার্চ ১৯৯১', 'ফাঁকা আওয়াজ', 'একবার' এ পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য কবিতা।

'ছদ্মবেশী' কবিতাটি সমাজসচেতন কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের একটি প্রতিবাদী কবিতা। এ কবিতায় কবি এই সমাজের স্বার্থপর, ধূর্ত ও ভণ্ড নেতার মুখোস উন্মোচন করেছেন। কবি দেখেছেন আমাদের ভণ্ড নেতারা জনগণের বিশ্বাসকে পুঁজি করে কীভাবে

Dhaka University Institutional Repository

নিজেদের স্বার্থ হাসিল করেছেন এবং জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করে তাদেরকে কৌশলে পদদলিত করেছেন। এই করেই চলছিল বছরের পর বছর। কিন্তু কবি হঠাৎ একদিন লক্ষ করলেন এই অসহায় সরল জনগণের কানে কারা ঢুকিয়ে দিল শৃঙ্খল ভাঙার মন্ত্র — আর সঙ্গে সঙ্গে,

বারুদের মতো জ্বলে উঠলো সংঘবদ্ধ ইচ্ছাশক্তি,
ধ্বসে পড়লো সিংহাসন।
মানুষগুলো খাঁচা ভেঙে বাইরে পা বাড়ালো। (ছদ্মবেশী)

শৃগালের মতো ধূর্ত নেতারা জনগণের এই জাগরণ মেনে নিতে নারাজ। তারা এখন আড়াল থেকে নতুন করে কলকাঠি নাড়ছে — জনগণের ঐক্য ভেঙে আবার তাদের দাসত্বের শৃঙ্খল পরাতে চায়। তাই কবি এই শঠ, প্রবঞ্চক নেতাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। জনগণের প্রতি নিজের দায়বদ্ধতার কথা মনে করে উচ্চারণ করেন সতর্কবাণী —

আলোর ভিতরে বিষ,
শস্যের ভিতরে বিষ,
এখন ছদ্মবেশীর মুখোস খুলে দেবার সময়। (ওই)

'মাথা নেড়ে সায় দেবার আগে' কবিতায় উচ্চারিত হয়েছে জনগণের বিশ্বাসের প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক নেতার প্রতি কবির হুঁশিয়ারি —

মাথা নেড়ে সায় দেয়া ভালো...
কিন্তু সব সময় না। (মাথা নেড়ে সায় দেয়ার আগে)

কেননা এখন সময়ের তীক্ষ্ণ শরে কালের কণ্ঠ বিদ্ধ, হাওয়ার ঝাপটায় ক্রুদ্ধ জানোয়ারের আক্রোশ — চতুর্দিকে ঘোরে প্রতারকের দল, বিশ্বাসঘাতকের হাতে শাণিত তরবারি। তাই সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ রাজনৈতিক নেতাকে কবি মনে করিয়ে দেন —

মনে রেখো
লক্ষ লক্ষ লোক একটি মিছিল ক'রে এক সময়
তোমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে;
তোমার হাতের মুঠিতে সহজ বিশ্বাসে
তুলে দিয়েছে পতাকা
তাদের ভবিষ্যৎ। (ওই)

জনগণের এই বিশ্বাসের পতাকার সম্মান রক্ষার দায়িত্ব এখন নেতার। তাই অত্যন্ত সাবধানে তাঁকে পা ফেলতে হবে — সিদ্ধান্ত নিতে হবে: তোষামোদকারী কিংবা বিশ্বাসহন্তারকের মতো শুধু প্রভুর সব কাজে মাথা নেড়ে সায় দিলে চলবে না। সবার আগে তাঁকে জনগণের দাবির কথা ভাবতে হবে। তাদের সুন্দর ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে।

'ঝড়ের মতো দিন' কবিতাটিতে ফুটে উঠেছে জনগণের সঙ্গে প্রতারণাকারী নেতার মুখোস উন্মোচনের ছবি। জনগণ এখন আর বোকা নেই — তারা সচেতন নিজেদের অধিকার সম্পর্কে। তাই এক একটা দল যখন এসে পতাকা নাড়িয়ে জনগণকে স্বপ্ন দেখাতে চায় রঙিন ভবিষ্যতের, তখন জনগণ বলে —

Dhaka University Institutional Repository

তোমাদের সকলের কথা শুনে শুনে
সব কথাই এক রকম মনে হয়,
অথচ আমরা জেনেছি সেই মন্ত্র,
আসল নকল চিনতে শিখেছি। (ঝড়ের মতো দিন)

জনগণ এখন দাবি করে কর্মের; নেতারা এমন একটা কিছু করুক যাতে তারা দুমুঠো খেতে পায়, কেউ উপোসে না মারা যায়। কিন্তু ভণ্ড নেতারা শুধু প্রতিশ্রুতি দিতে জানে, স্বপ্নের বীজ বুনতে জানে — তাই এই ঝড়ের মতো দিনে তাদের এতদিনকার নকল দুর্গ ভেঙে যেতে বসেছে। সচেতন জনগণ তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে। জনগণই এখন দৃপ্ত স্বরে বলে,

আর কয়েকটা দিন সবুর করো
আমরাই তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবো। (ওই)

'ভোট' কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে কবি কিরণশঙ্করের একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্বাসের প্রতি অবিচল মনোভাবের কথা। ভোটের সময় এলেই প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোর প্রার্থী ও সমর্থকরা কবির কাছে করজোড়ে ভোট প্রার্থনা করেন। তাঁরা তাঁদের আদর্শের কথা বলেন, স্বপ্নের কথা বলেন। কিন্তু তাঁরা জানেন না কবি কৈশোর থেকেই একটা নির্দিষ্ট বিশ্বাসের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত, দায়বদ্ধ। শত প্রলোভনেও তিনি সেই দায়বদ্ধতা থেকে বিচ্যুত হন নি, হবেনও না। সে কারণেই কবি বলেন,

অথচ ওরা জানে না ছেলেবেলা থেকে আমি প্রতিশ্রুত
নতুন কোনো উন্মোচনের সংগ্রামে;
আমার ভেতরে রক্তে আমি লালন ক'রে এসেছি দীর্ঘকাল
একটি স্বপ্ন, একটি মন্ত্র; যার সঙ্গে না মিললে
ভোটের হাজার অনুরোধও আমি
রক্ষা করতে পারব না। (ভোট)

'চতুর্দশপদী' কবিতাটি একটি সনেট। এ কবিতায় ফুটে উঠেছে গভীর রাজনৈতিক সংকটের চিত্র। বর্তমানে জনগণ এবং রাজনৈতিক নেতার মধ্যে সুতীব্র বিরোধ। কারো প্রতিই কারো বিশ্বাস আর স্থির থাকছে না। তাই কবি লেখেন :

একে একে ঘটে যাচ্ছে কী রকম নৃশংস ঘটনা,
সত্য আর অর্ধসত্যে মিলেমিশে দারুণ সংবাদ;
অনেকেই জেনে শুনে লুফে নেয় নির্লজ্জ রচনা,
পথের মিছিলে নেই উচ্চারণে আগেকার স্বাদ। (চতুর্দশপদী)

নেতা ও জনগণের এই দুরত্বে সুবিধাবাদীর দল মুনাফা লুটে নেয়। ঢালে বিষ উভয়ের হৃদয়ের গোপন ভাঁড়ারে। এইসব দেখে শুনে জনগণের প্রতি, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ কবি কিরণশঙ্কর অস্থির হয়ে ওঠেন। কিন্তু তিনি কী করবেন; তিনি তো নেতা নেন। তাই ভবিষ্যতের সুদিনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করে কবি নিজেকেই প্রশ্ন করেন —

আগেকার মতো কেউ উজ্জীবন মন্ত্রের ছায়ায়
নামবে কি পথে পথে এক লক্ষ্যে হবে সততায়? (ওই)

Dhaka University Institutional Repository

'বসবাস' কবিতায় ফুটে উঠেছে হিন্দু মুসলমান সম্পর্ককে ঘিরে রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টিকারীর প্রতি কবির তীব্র বিদ্বেষ। আমাদের এই দেশের রয়েছে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ভ্রাতৃত্বের অটুট মেলবন্ধনের ঐতিহ্যিক ইতিহাস। এখানে একটা কিছু ঘটলেই সুসময় কিংবা দুঃসময়ে সবাই একত্রে সামিল হয় সভায়, মিছিলে। এখানে মন্দির মসজিদ নিয়ে ভাগাভাগি নেই, বরং—

জীবনে মরণে দুর্ভিক্ষে বিপ্লবে
হঠাৎ কোথাও কিছু যদি ঘটে যায়
অশুভ নিমেষে
প্রতিরোধে প্রতিশ্রুত দু'জনেই। (বসবাস)

কিন্তু এখন সময় খারাপ। কবি দেখেন একদল লোক ভিন্ন সুরে কথা বলে অন্ধকারে। হিন্দু মুসলমানের দীর্ঘকালীন এই প্রীতির বন্ধন ছিন্ন করে সারা দেশে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে সমগ্র দেশটাকে কব্জা করতে চায়। মিথ্যে রটনাকারী এইসব বিপথগামী রাজনৈতিক শত্রুদের বিরুদ্ধে কবি সকলকে সচেতন হবার আহ্বান জানান। জাতি ধর্ম বর্ণ ভেদাভেদ ভুলে সবাইকে একত্রে মিলিত হয়ে এই ঘৃণ্য নরপশুদের ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার কথা বলেন। কবির ভাষায় :

যথো মিথ্যা রটনার জালগুলি ছিঁড়ে
এবার নামতে হবে প্রকাশ্য রাস্তায়;
যেন বলতে পারি দু'জনেই;
বিভেদের শুয়োপোকাটাকে থেঁতলে দিয়ে
আগে যেরকম বসবাস এখনও তাই। (ওই)

রাজনৈতিক প্রতি কবি কিরণশঙ্করের তীব্র ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে 'দিল্লী, মার্চ ১৯৯১' কবিতায়। কেননা কথা ছিল রাজধানী দিল্লি থেকেই শুভযাত্রা শুরু হবে, দেশের মানুষ নির্ভয়ে এগিয়ে যাবে সকাল সন্ধ্যায় নতুন আলোর আমন্ত্রণে বিচিত্র নির্মাণে। কিন্তু কবি লক্ষ করেন,

আজ শুধু অনিশ্চিত নরকের ঋতু
ফিরে ফিরে আসে, প্রাসাদ দিল্লীর দ্বার
মহা ষড়যন্ত্রে ঠাসা, ওড়ে ধূলি অমলিন
নেতাদের যাতায়াতে
যন্ত্রের ঘর্ঘরে। (দিল্লী, মার্চ ১৯৯১)

মিথ্যাচারে স্বৈরাচারে লিপ্ত রাজনৈতিক নেতাদের মুখগুলোকে কবির কাছে শূকরের মতো মনে হয়। অবাক বিস্ময়ে কবি তাই লেখেন,

গণতন্ত্রী স্বদেশের এ এক অদ্ভুত
নব্য পরিচয়। (ওই)

'ফাঁকা আওয়াজ' কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে বর্তমান রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি জনগণের অনাস্থার কথা। দীর্ঘকাল জনগণ আস্থা রেখেছিল নেতাদের প্রতি। নেতাদের গাল ভরা বুলিতে মুগ্ধ হয়ে ভেবেছিল তারা সস্তায় বীজ ধান পাবে, সেচের জন্যে জল পাবে, ঋণ মকুব হবে কিন্তু নেতারা কোনো কথাই রাখেন নি। সমস্তটাই ছিল তাদের ফাঁকা আওয়াজ। জনগণ এখন সচেতন হয়েছে। তারা বলে—

Dhaka University Institutional Repository

এখন আর ফাঁকা আওয়াজ কেউ কানে তোলে না।
অনেকদিন ধরেই তো শুনছি ওইসব কথা,
চীৎকার ক'রে বললেই কি তা সত্যি হয়? (ফাঁকা আওয়াজ)

বরং,

ফাঁকা আওয়াজের পর আর কী আছে
সবাই জানতে চায়। (ওই)

রাজনৈতিক নেতাদের মূঢ়তাকে ব্যঙ্গ করে কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত রচনা করেছেন 'একবার' কবিতাটি। রাজনৈতিক নেতাদের বর্তমান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে,

একবার বড়ো আসনে বসতে পারলে
লঘু গুরু জ্ঞান থাকে না।
তখন মনে হয়
সমস্ত সংসারটাই যেন পায়ের কাছে
পোষা বেড়ালের মতো বসে আছে,
হুকুম পেলেই
লাফিয়ে লাফিয়ে চলবে। (একবার)

অথচ বাস্তব সত্য হচ্ছে আসনটা কারুর জন্যেই চিরকালীন নয়। কখনো না কখনো সবাইকে নেমে আসতে হয় ওই আসন থেকে — প্রাসাদের বাইরে, রাস্তায়। তখন তিনি যাদের এতদিন অবজ্ঞা করেছেন সেই সাধারণ জনগণও তাঁকে গ্রহণ করে না, পরিহাস করে।

তখন ওই দশ বছরের রাস্তার ছেলেটাও
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দ্যাখে,
সাহস পেয়ে কাছে এসে বলে :
আপনার সেই গাড়ীটা কোথায়? (ওই)

তিন.

'দৃশ্য বদলের দিন' কাব্যগ্রন্থের সময়চেতনাজাত কবিতাগুলো হচ্ছে, 'যাত্রা', 'ছবি', 'মাথা ঠিক রাখা দরকার', 'শেষ কৌতূহলে' ও 'কোনো নতুন খবর না'। এ সমস্ত কবিতার কোনোটিতে বিম্বিত হয়েছে রাজনৈতিক ধূর্ততা ও স্বার্থপরতার চিত্র, কোনোটিতে সাধারণ জনতার হতাশাক্রান্ত ছবি, কোনোটিতে আবার আইন-শৃঙ্খলার অবনতির করুণ কাহিনি।

'যাত্রা' কবিতাটিতে সময়চেতনার পাশাপাশি ফুটে উঠেছে কবি কিরণশঙ্করের স্বদেশপ্রেম ও আশাবাদী মনোভাবের ছবি। এ কবিতায় কবি যে সময়ের চিত্র অঙ্কন করেছেন সে সময়টা খুবই ভয়ংকর। চারদিকে অন্ধকার এবং কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। ভেতরে —

হলুদের ফোঁটা লাগানো কাঁটাগাছের ঝোপগুলিতে
রক্ত-জলকরা সরীসৃপের আনাগোনা!
একটু অসাবধানে পথ চললেই
ভয়ঙ্কর মৃত্যু। (যাত্রা)

Dhaka University Institutional Repository

অথচ কবি এ রকম পথে কখনো চলতে চান নি। তিনি চেয়েছিলেন এই দলাপাকানো অন্ধকার সময়কে কাঁধ থেকে ছুঁড়ে ফেলে স্বদেশের হৃদপিণ্ডের ভেতর স্পন্দিত হতে। সুসময়ের আগমন প্রত্যাশায় স্থির কবি চেয়েছিলেন —

পুরনো চিন্তার শবদেহটাকে শবাধারে রেখে
নতুন জন্মের উভয়ের দিকে এগিয়ে যেতে। (ওই)

'ছবি' কবিতার ছবিটিও ভীষণ বীভৎস সময়ে আঁকা। গোটা পৃথিবীটাই কবির কাছে মনে হয়েছে কয়েদখানা। ভেতরটা নিকষকালো অন্ধকারে ঢাকা, বাইরের জগতটাও চলছে অন্ধ ভিখিরীর মতো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে; আর প্রতিদিনের সংসারের দগদগে ঘা থেকে ঝরছে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত।

হাঁটতে আর কপালে ক্ষতচিহ্নের মতো ঝুলছে
ছেঁড়া কাপড়ের ব্যান্ডেজ;
একবার তাকালেই চোখ জ্বালা করে। (ছবি)

একদিকে,

গ্রাম উজাড় হতে চলেছে দিকে দিকে,
শহর উপবাসী;
জলে গ্লুকোজ ইনজেকশন চলছে রোগীর ওপর
হাসপাতালে। (ওই)

অন্যদিকে কয়েদখানার আড়ালে হাজার হাজার তরুণ হাত-পা গুটিয়ে বসে। তাদের বুকের মধ্যে তোলপাড় করে এই বীভৎস সময়ের শৃঙ্খল ভেঙে বেরিয়ে আসার উদ্যোগ — গরাদের লৌহকপাটে সে উদ্দীপনা আঘাত শুধু পায়; প্রতিকার হয় না।

'মাথা ঠিক রাখা দরকার' কবিতায় দেখি দুঃসময়ের দামাল দিনগুলোর হুটোপুটিতে কবির মাথা ঠিক থাকছে না। অথচ তিনি জানেন,

মাথা ঠিক না থাকলে
শহীদ মিনারের জনসভা,
শহরতলীর মৌন মিছিল,
বুকের মধ্যে ঢেউ তোলে না;
সিনেমায় শোনা রেকর্ডের গান,
খেলার মাঠের হুল্লোড়,
বাসের ঘর্ঘর, ট্রামের ঘন্টি...
কাল পর্যন্ত পৌঁছায় না। (মাথা ঠিক রাখা দরকার)

কিন্তু কবি কিছুতেই ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারছেন না। তাঁর কাছে এখন দিন আর রাত এক রকম মনে হয়। জলবিদ্যুতের যাতায়াত নিয়ে তিনি অনিশ্চয়তায় ভোগেন। তাঁর চতুর্দিকে কাগজে পড়া তর্ক-বিতর্কগুলো খইয়ের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। তিনি মাথা ঠিক রাখতে হিমসিম খান। অথচ কবি ভালো করেই জানেন,

মাথাটাকে ঠিক রাখাই
এই ঝড়ো দিনে
আসল কথা। (ওই)

Dhaka University Institutional Repository

'শেষ কৌতূহলে' একটি সনেট কবিতা। এ কবিতায় প্রবীণ কবির অন্তিম সময়ের ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। কৈশোর-যৌবন শেষ করে প্রবীণ কবি শূন্যলগ্নে কুয়াশার দিকে যাত্রা করেছেন। এখন আর তিনি অতীতের দুঃখের স্মৃতিচারণ করতে চান না। কেননা সেসব কথা মনে হলে তাঁর শরীর মন ছেয়ে যায় তীব্র যন্ত্রণায়। কবি এখন এই শেষ বেলায় তাই জীবনের সব দুঃখতাপ ভুলে যেতে সাহচর্য চান একজন প্রকৃত সুহৃদের। যার সুন্দর হাতের ছোঁয়ায় তিনি লাভ করবেন পরম শান্তি। কবির ভাষায় :

> হাজার বছর ধরে ইতিহাস নখরে বিক্ষত,
> সময় কখনো স্থির হতেও জানে না তীব্র ঢেউ
> ভাসায় প্রবল স্রোতে আকাঙ্ক্ষার ফুল ইতস্তত।
> শরীর তাপিত হলে সব দৃশ্য একাকার হলে
> একটি শান্তির হাত খোঁজে মন শেষ কৌতূহলে। (শেষ কৌতূহলে)

'কোনো নতুন খবর না' কবিতায় এমন একটি ভয়ঙ্কর সময়ের চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে যখন — মৃত্যুও কোনো মানুষের কাছে চমক সৃষ্টি করে না। কেননা এখন,

> রাত্রি ভোর হলেই কোথাও না কোথাও
> সেতুর পাশে, ফ্যাক্টরী গেটের সামনে
> বিশাল বট গাছের আড়ালে
> তাজা লাশের বাহার। (কোনো নতুন খবর না)

আর তাই যাঁরা এক সময় মানুষের শান্তির জন্যে, স্বাধীনতার জন্যে বিপ্লব করেছেন তাঁরা আজকের এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় যে পুলিশ এক সময় দাপটের সঙ্গে চোর ডাকাত ধরেছেন তারাও এই নিষ্ঠুরতায় বিভ্রান্ত। এমনকি —

> যারা এক সময় প্রচণ্ড মাস্তানী করতেন সর্বত্র
> এখন বয়সের ভারে ক্লান্ত,
> তারা চিন্তিত। (ওই)

কেননা এই মরণ খেলায় তারা কখনো অভ্যস্ত ছিল না। মানুষের মনের ভেতরে এতটা হিংস্রতা থাকতে পারে সেটা তাঁরা কল্পনাও করেন নি। তাই মানুষরূপী শ্বাপদ সৃষ্ট এই রক্তাক্ত সময়ে কবি বলেন —

> বোমাবাজি বন্দুক পিস্তলের আবহাওয়ায়
> মৃত্যু এখন আর কোনো নতুন খবর না। (ওই)

চার.

আলোচিত কবিতাগুলো ছাড়াও 'দৃশ্য বদলের দিন' কাব্যগ্রন্থে বেশ কিছু সংখ্যক কবিতা আছে যেগুলোর বিষয়বস্তু বিচিত্র। এ ধারার কবিতাগুলোর মধ্যে 'লণ্ঠন', 'স্বপ্ন', 'ফেরা', 'দেশে যখন', 'নভেম্বরের যাত্রা ১৯৯২', 'ছবির কাচ ভেঙে গেলে', 'এ কার ধর্ম', 'মিডিয়া' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

'লণ্ঠন' কবিতায় ফুটে উঠেছে কবির মৃত্যুচিন্তা।

লোডশেডিং-এর দস্যু
যখন দলা দলা অন্ধকার
বারান্দা আর ঘরের ভিতরে
ছুঁড়ে দেয়... (লণ্ঠন)

তখন কবি নিজের হাতে লণ্ঠন জ্বালিয়ে নেন। কিন্তু বয়সের ভারে ক্লান্ত কবি ম্লান আলোয় সব কিছুকে দেখেন ঝাপসা। আর দমকা হাওয়ায় লণ্ঠনটা নিভে গেলে রাতের গভীর অন্ধকার তাঁকে আচ্ছন্ন করে পরলোক ভাবনায়। কবির ভাষায় :

হঠাৎ দমকা হাওয়ায়
লণ্ঠনটা নিভে যায়,
রাতের গভীরতা যেন আমাকে
এক অদৃশ্য রহস্যময় জগতের দিকে
টেনে নিয়ে যায়;
যেখানে লণ্ঠনের প্রয়োজন নেই। (ওই)

'স্বপ্ন' কবিতাটি কবি সুহৃদ রণেশ দাশগুপ্তকে নিয়ে লেখা। বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টির গোড়াপত্তন থেকে শুরু করে পার্টি ভেঙে বহুধা বিভক্ত হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তিনি ছিলেন অবিসংবাদী ব্যক্তিত্ব। তাঁর কাছে দীক্ষিত অনেক কর্মী পরবর্তী কালে পশ্চিম বাংলার মন্ত্রী হয়েছেন — পরিবর্তন হয়েছে আরো অনেক সহকর্মীর — তিনি কিন্তু অটল থেকেছেন নিজের স্থির বিশ্বাসে। তিনি বিচলিত হন নি কোনো কিছুতেই। কবি লিখেছেন —

অনেকেই নিয়েছিল একদিন আপনার কাছেই
রাজনীতির প্রথম পাঠ,
আপনার জন্যে যে আসনটি নির্দিষ্ট হয়েছিল
এখন তা অপরের দখলে।
এখন আর পুরনো বন্ধুরা খোঁজ রাখেন না,
আপনি কিন্তু তাতে বিচলিত নন;
ভাঙা ঘরে ভাঙা চৌকিতে শুয়ে শুয়ে
আপনি কি এখনো সেই শোষণহীন সমাজ গড়ার
স্বপ্ন দেখেন (স্বপ্ন)

সেই তিরিশের দশক থেকে রণেশ দাশগুপ্ত বুকে ধারণ করে চলেছেন একটি স্বপ্ন — মানুষের সার্বিক মুক্তির। তিনি মানুষকে ভালবাসতেন। তাই স্বপ্ন দেখতেন —

আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু
সময় আসবে সেদিন দিকে দিকে মানুষ
এগিয়ে যাবে অন্ধকার কোণগুলো থেকে; (ওই)

রণেশ দাশগুপ্তের এই স্বপ্নকে কেউ কখনো ভাঙতে পারে নি। তাঁর দৃঢ় মনোবলের কাছে হার মেনেছে পার্টির আদর্শচ্যুত সুবিধাভোগী নেতা, কুচক্রী প্রশাসক। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত সেকথা স্মরণ করে লেখেন —

এই ভালো, আপনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত
একটি সুস্থ স্বপ্নকে চোখের সামনে রেখে

Dhaka University Institutional Repository

চলে যেতে পারবেন:
স্বপ্নচ্যুত মানুষের দল অবাক হয়ে চেয়ে
দেখবে। (ওই)

'ফেরা' কবিতাটিতে কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের মৃত্যুভাবনা প্রবল। কবি এই সংসারের মায়াজাল ছিন্ন করে চলে যাচ্ছেন কিন্তু আবার তিনি এই পৃথিবীতে ফিরে আসবেন সে আশাও ব্যক্ত করে যাচ্ছেন।

ভাঙা সংসার পেছনে রেখে চলে যাচ্ছি।
[...] [...]
আমি যাচ্ছি কিন্তু সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্ন এখনো
চোখ থেকে মুছে যায়নি,
নতুন দিনে আমি আবার আসব। (ফেরা)

আমরা এর আগেও পুনর্জন্ম সম্পর্কিত ভাবনায় কবি কিরণশঙ্করের আগ্রহ লক্ষ করেছি। এখানেও জন্মান্তরবাদের প্রতি কবির পূর্বের সেই বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়েছে।

'দেশে যখন' কবিতাটিতে সুবিধাবাদী কবিদের প্রতি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের চাপা ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে। কেননা দেশে যখন একটার পর একটা ঘটনা দিগন্ত কালো করে হঠাৎ অসময়ে বজ্রের মতো ফেটে পড়ছে,

তখন
আমাদের আরামপ্রিয় কবিদের অনেকেই
হাত গুটিয়ে রয়েছে
ঘরের অর্গলরুদ্ধ পরিবেশে। (দেশে যখন)

কারণ এইসব সুবিধাবাদী কবিদের ধারণা এখন সময় খারাপ, তাই খারাপ সময়ে ভালো লেখা যায় না।

আর এখন যদি লিখতেই হয়
বর্তমানকে সযত্নে এড়িয়ে
সেই পুরনো খিস্তিই আউড়ে যাওয়া ভালো। (ওই)

'নভেম্বরের যাত্রা ১৯৯২' কবিতায় কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত তুলে ধরেছেন কমিউনিস্ট আন্দোলনের অগ্রযাত্রার বর্ণনা। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বরে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তার ছিল একটাই লক্ষ — এটাই মন্ত্র,

যা-কিছু কদর্য ভ্রষ্ট যা-কিছু পঙ্কিল বঙ্কিম
বাঁচার লড়াই হবে তার বিপরীতে সারাক্ষণ
গ্রীষ্ম বর্ষা শীতে। (নভেম্বরের যাত্রা ১৯৯২)

সেদিনের সেই যাত্রা অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছে। এখন,

চতুর্দিকে পোড়া মাটি বিদীর্ণ বোমায়
অজস্র মানুষ ছিন্ন দেশে ও বিদেশে
শুধুই মৃত্যুর দৃশ্য যত্রতত্র নানা অবস্থানে, (ওই)

এখন নভেম্বরের বিপ্লবের যা কিছু প্রত্যয়সিদ্ধ তার সব কিছু ভেঙে ফেলতে চায় একদল ছদ্মবেশী গণতন্ত্রীর দৈত্য। তাদের ভীষণ হিংস্র থাবায় —

Dhaka University Institutional Repository

সময়ের ছবি ভাঙে, ইতিহাস দ্রুত বদলায়,
পৃথিবীতে অস্থিরতা মানুষের দৃপ্ত অভিযানে। (ওই)

আশাবাদী কবি মানুষের শুভ বুদ্ধির প্রতি অবস্থা রেখে তাই নভেম্বরের সেই উজ্জীবন মন্ত্রকে জাগিয়ে রাখতে চান মনের কোণে। তিনি বিশ্বাস করেন অশুভ শক্তির সাময়িক বিজয়ের কাছে যা চির কল্যাণকর মানুষের জন্যে মঙ্গলজনক তা নিঃশেষ হয়ে যায় না।

মনের ভেতরে থেকে যায়
ভিন্ন নামে ভিন্ন পরিবেশে হয়তো বা
শোষণ নিগড় ভাঙা অদম্য সংকেত। (ওই)

'নভেম্বরের যাত্রা ১৯৯২' কবিতার আশাবাদ ধ্বনিত হয় 'ছবির কাচ ভেঙে গেলে' কবিতার পঙক্তিমালায়। কবির পূর্বের বিশ্বাসের শাব্দিক উচ্চারণ শুনতে পাওয়া যায় এভাবেই —

ছবির কাচ ভেঙে গেলেই কি ছবিটা নষ্ট হয়ে যায়?
[...] [...]
যে মানুষ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিলেন
চতুর্দিকে ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর দেয়া মন্ত্র;
ঢেউয়ের মতো বুকের মধ্যে তার কল্লোল,
তিনি রয়ে গেলেন
শপথের উচ্চারণে আহত মানুষের বদ্ধমুঠিতে,
কোটি মানুষের নিভৃত চেতনায়। (ছবির কাচ ভেঙে গেলে)

'এ কার ধর্ম' কবিতায় কবির জিজ্ঞাসা যে ধর্ম মানুষের কল্যাণ কামনা করে না, বাঁচার মন্ত্র শেখায় না, বরং মানুষে মানুষে সৃষ্টি করে বিভেদ, মানুষের রক্তে খেলে হোলি — সেটি কার ধর্ম? কোন ধর্ম? কবির ভাষায় :

কেউ তো জানে না এ কার ধর্ম,
লোভ চাতুর্যের কঠিন বর্ম...
দেখে মনে হয় এ কোন জল্লাদ
রক্ত ঝরায়, নোনা মৃত্যুর স্বাদ। (এ কার ধর্ম)

ঢাল-তলোয়ার সামনে রেখে যে ধর্ম কেবল হিংসা ছড়ায় আকাশে বাতাসে, কবির ভাষায় সেটি আসল ধর্ম নয়। তাঁর মতে —

এ ধর্ম আসলে নয় মানবিক,
প্রেম প্রীতি তার নয় কো শরিক,
স্বধর্মে স্থির মানুষেরা দ্যাখে
ছড়ায় জল্লাদ ষড়যন্ত্রের বিষ। (ওই)

প্রচার মাধ্যমকে ব্যঙ্গ করে রচিত হয়েছে 'মিডিয়া' কবিতাটি। এ কবিতায় আমরা লক্ষ করি বর্তমানে মিডিয়া এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছেছে যেন সে অসীম ক্ষমতাধর। মিডিয়া ইচ্ছে করলেই একজন অখ্যাত মানুষকে রাতারাতি বিখ্যাত করে তুলতে পারে।

তুমি কে, কী তোমার যোগ্যতা, কীরকম চরিত্র বল
এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই,
মিডিয়ার লোমশ হাতে তুমি এখন ক্ষীরের পুতুল।

Dhaka University Institutional Repository

মিডিয়া তোমাকে খ্যাতির চূড়ায় নিয়ে এসেছে
তুমি যেই হও না কেন এই মুহূর্তে
মিডিয়ার দরকার তোমার হালচালকে উস্কে দেবার,
পেয়ে গিয়েছে তোমার জীবন থেকে
কভার স্টোরি তৈরির পর্যাপ্ত রসদ। (মিডিয়া)

ঠিক তেমনি একদিন এই মিডিয়াই আবার সেই খ্যাতিমান মানুষটিকে আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে কুণ্ঠা করে না।

কেননা মিডিয়া মানুষকে চায় সংবাদের জন্যে
কভার স্টোরি রচনার জন্যে নিজের প্রয়োজনে,
রস নিঙড়ে ত্যাজ্য ফলের বাকীটুকু দূরে
ছুঁড়ে ফেলে দেয়। (ওই)

মিডিয়ার প্রচারণায় অন্য কেউ উঠে আসে শীর্ষ খবরে — যে মানুষটি একদিন সংবাদের শিরোনামে জ্বলে উঠেছিল কেউ তার খোঁজও রাখে না। মিডিয়াকে ব্যঙ্গ করে কবি তাই লেখেন —

একবার মিডিয়া তার ধারালো দাঁত আর মুখ দিয়ে
শূন্যে তুলে ধরতে পারলে
তুমি তখন দারুণ সংবাদ হয়ে ওঠো। (ওই)

'দৃশ্য বদলের দিন' কাব্যগ্রন্থের কবিতায় কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত অলংকার ও ছন্দ প্রয়োগে নতুনত্ব না দেখাতে পারলেও তাঁর কবিতার স্বাভাবিক ধর্ম অক্ষুণ্ণ থেকেছে। দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে অলংকার ও ছন্দের যৎসামান্য বৈচিত্র্য দেখানো হল :

শব্দালংকার

সরল অনুপ্রাস : ১. সিঁড়ির নীচে কোণে কোণে অন্ধকার বাসা বাঁধে। (দুশ্চিন্তা)
২. বাঘা বাঘা বক্তা জড়ো হয়েছেন এই সভায়। (বক্তা)

ছেকানুপ্রাস : খাদ্য স্বাস্থ্য বাসস্থানের এক নতুন জগৎ। (ছেলেটি জানে না)

অন্ত্যানুপ্রাস : ১. শরীর তাপিত হলে সব দৃশ্য একাকার হলে
একটি শান্তির হাত খোঁজে মন শেষ কৌতূহলে। (শেষ কৌতূহলে)

অর্থালংকার

উপমা :

'উপমাই কাবিত্ব' — জীবনানন্দ দাশের স্মরণীয় এই উক্তিটির শিল্পরূপ কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত 'দৃশ্য বদলের দিন' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলোতে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এ কাব্যগ্রন্থের 'ছবি', 'তোমাদের সঙ্গে' প্রভৃতি কবিতায় কবির সামগ্রিক ভাবনা উপস্থাপনে উপমার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষণীয়। উদাহরণ —

১. সমস্ত পৃথিবীটা কয়েদখানার মধ্যে পড়ে আছে।
দিনের উজ্জ্বল রৌদ্রের স্বচ্ছতা,
রাতের আকাশে সাদা তুলোর মতো জ্যোৎস্না

Dhaka University Institutional Repository

এখন কয়েদখানার গরাদের পেছনে
কয়েক হাজার বুকের মধ্যে স্মৃতির মতো
বন্দী।
বাইরের জগতে অন্ধ ভিখিরীর মতো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে
চলছে প্রতিদিনের সংসার,
মাঝে মাঝে দগদগে ঘা থেকে ঝরছে
ফোঁটা ফোঁটা রক্ত,
হাঁটুতে আর কপালে ক্ষতচিহ্নের মতো ঝুলছে
ছেঁড়া কাপড়ের ব্যান্ডেজ। (ছবি)

২. ধনুকের শরের মতো তীক্ষ্ণ সব যুক্তি, (বক্তা)

৩. বারুদের মতো জ্বলে উঠলো সংঘবদ্ধ ইচ্ছাশক্তি, (ছদ্মবেশী)

৪. ঝড়ের মতো দিন হো হো শব্দ ক'রে মিলিয়ে যাচ্ছে। (ঝড়ের মতো দিন)

৫. মরচে-পড়া পেরেকের মতো হয়ে গেছে তার ধার। (নতুন অধ্যায়)

৬. তোমাদের দায়বদ্ধতা এখন ঝলসে-ওঠা
তরবারীর মতো। (তোমাদের সঙ্গে)

উৎপ্রেক্ষা :

১. দলিলের ভেতরকার লেখালেখিগুলো
অনেককাল বাক্সবন্দী, পুরনো তেলচিটে কাগজে
হিজিবিজি অক্ষরের মতো
কেমন যেন নিষ্প্রভ হয়ে মুখ লুকিয়ে ছিল; (দলিলের প্রতিশ্রুতি)

২. কেমন যেন একটা ইতস্তত ভাব
সংশয়ের লতার মতো চোখের সামনে
দুলতে থাকে। (নতুন অধ্যায়)

৩. তলিয়ে যাওয়া যৌবনের দিনগুলি
যেন বাঘের মতো লাফিয়ে ওঠে। (তোমাদের সঙ্গে)

চিত্রকল্প :

আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে কখনো কখনো উপমাই চিত্রকল্প হয়ে যায়। যেমন—

লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে বাইরের দিকে
তাকিয়ে দেখি :
ম্লান আলোয় সব দৃশ্য ঝাপসা
বাগানের কয়েকটা গাছকে
ঝাকড়া চুলওয়ালা
দৈত্যের মতো দেখায়। (লণ্ঠন)

Dhaka University Institutional Repository

ছন্দ

'দিন বদলের দৃশ্য' কাব্যগ্রন্থে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের ছন্দের নতুন নিরীক্ষা নেই। পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থের মতোই প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, সনেট ও গদ্যছন্দের কবিতা এখানে লক্ষণীয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ :

অক্ষরবৃত্ত :

হিংসা, তোমার দারুণ হননের রূপ
ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দিকে;
তোমার পদশব্দের দাপটে কেঁপে উঠছে
স্বদেশ, পৃথিবী। (দুই রূপ)

মাত্রাবৃত্ত :

কেউ জানে না এ কার ধর্ম,
লোভ চাতুর্যের কঠিন বর্ম...
দেখে মনে হয় এ কোন জল্লাদ
রক্ত ঝরায়, নোনা মৃত্যুর স্বাদ! (এ কার ধর্ম)

গদ্যছন্দ :

সীতা, তুমি এক বছরের কচি ছেলেটাকে নিয়ে
আবছা আলোয় এই সন্ধ্যায়
বাইরে যেয়ো না। অনিমেষ বাড়ী ফিরতে
দেরী করছে, তোমার অস্বস্তি, অথচ
বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকলে কী হবে,
ছেলেটার কথা ভেবো। (ঝরা পাতা)

সনেট

'দিন বদলের দৃশ্য' কাব্যে মাত্র দুটি সনেট আছে। সনেট দুটি হচ্ছে 'চতুর্দশপদী' ও 'শেষ কৌতূহলে'। দুটি সনেটই শেক্সপিয়রিয় রীতির আদলে কখ কখ ঃ গঘ গঘ ঃঃ ঙচ ঙচ ঃ ছছ মিল বিন্যাসে ১৮ মাত্রায় (৮+১০) রচিত।

Dhaka University Institutional Repository

১২. আশি-নব্বুই-এর কবিতা

'আশি-নব্বুই-এর কবিতা' কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ। জীবনের শেষ পর্যায়ের এ গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় আষাঢ় ১৪০৪, জুলাই ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার *গ্রন্থমিত্র* প্রকাশনী থেকে। গ্রন্থটি তিনি উৎসর্গ করেন তাঁর প্রয়াত স্ত্রী বীণা সেনগুপ্তকে। 'আশি-নব্বুই-এর কবিতা' গ্রন্থে সংকলিত কবিতা রয়েছে ৪১টি; এগুলোর কোনোটিতে সাল-তারিখ সংযোজিত না থাকায় কবিতাগুলোর সঠিক রচনাকাল নির্ণয় করা যায় নি। তবে বর্তমান গ্রন্থের প্রকাশক সুবিমল সরকার 'প্রকাশকের কথা'য় গ্রন্থভুক্ত কবিতাগুলো কবির আশি ও নব্বই দশকের রচনা বলে উল্লেখ করে লিখেছেন :

> জীবনের সায়াহ্ন-বেলায়, রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কারপ্রাপ্ত, কবি কিরণশঙ্কর গভীরতাসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন এই পৃথিবীকে, জীবনকে ও মানুষকে — আর তারই কিছু পরিচয় রয়ে গেল আশি ও নব্বুই-দশকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতা থেকে সংকলিত এই 'আশি-নব্বুই-এর কবিতা' বইটিতে।

জীবনের সায়াহ্ন-বেলায় বলেই হয়তো এ কাব্যগ্রন্থে কবির মৃত্যুভাবনা বিষয়ক কবিতার সংখ্যাধিক্য লক্ষণীয়। এ গ্রন্থে সংকলিত কবিতাগুলোর মধ্যে কিছু সংখ্যক কবিতায় কবি স্মরণ করেছেন প্রয়াত পত্নী বীণা সেনগুপ্তকে, কিছু কবিতায় রয়েছে সমসাময়িক সময়ের ছাপ; আর কয়েকটি কবিতা আছে যেগুলোর বিষয়বস্তুই হচ্ছে কবিতা। এছাড়াও রয়েছে অন্যান্য সুরের বেশ কিছু কবিতা। এইসব বিবেচনা করে 'আশি-নব্বুই-এর কবিতা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত কবিতাগুলোকে মোটামুটি পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়।

এক. সময়চেতনাজাত কবিতা
দুই. মৃত্যুভাবনাজাত কবিতা
তিন. স্ত্রীর স্মরণে রচিত কবিতা
চার. কবিতা বিষয়ক কবিতা
পাঁচ. বিবিধ বিষয়ক কবিতা

এক.

'আশি-নব্বুই-এর কবিতা' গ্রন্থের সময় অনুভবজাত কবিতাগুলোর মধ্যে 'তোমার ভালোবাসা', 'সুখ পুড়ে যায়', 'ফিরে যেতে পারছ না', 'এদিনেও মনে হয়' উল্লেখযোগ্য। এ কবিতাগুলোতে ফুটে উঠেছে সমসাময়িক সময়ের রুক্ষ-কঠিন ছাপ। এমনকি ভালবাসার কোমল অনুভূতিও এই সময়ের রুদ্র তাপে বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে যায়, বদলে যায় ভালবাসার বর্ণাঢ্য গোলাপ; তার প্রকাশ দেখতে পাই 'তোমার ভালোবাসা' কবিতায়। বিধ্বস্ত, ধূলিধূসর সময়ের বর্ণনা দিয়ে যখন কবি তাঁর প্রেমাস্পদাকে বলেন :

> তোমার ভালোবাসা একান্ত ব্যক্তিগত,
> খুবই স্বাভাবিক
> কিন্তু তুমি তো জানো এই মুহূর্তে

Dhaka University Institutional Repository

কী এক সময়, সব দৃশ্য বদলে যাচ্ছে,
বদলে যাচ্ছে তোমার ভালোবাসার বর্ণাঢ্য গোলাপও।
(তোমার ভালোবাসা)

তখন আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে, সময়টা সত্যিকার অর্থেই কী ভীষণ প্রচণ্ড।

'সুখ পুড়ে যায়' কবিতাটিতেও দেখা যায় বর্তমান সময়ের ভয়াবহ চিত্র। এ সময়ে বোমা ফাটে, আগুন জ্বলে, নগর পোড়ে। কবি কৈশোরে স্বপ্ন দেখেছিলেন একটি শান্ত সুন্দর সুখী-সমৃদ্ধ দেশের, বৃষ্টিতে ভিজে আগুনে পুড়ে বিষণ্ন দশকগুলো একে একে পার হয়ে এসে এখন তিনি দেখেন,

ছুরি থেকে অন্য এক ছুরির ফলায়
ঝুলে বেঁচে আছে দেশ এই সন্ধিক্ষণে; (সুখ পুড়ে যায়)

কোথায় এসে পৌঁছেছেন কবি বুঝে উঠতে পারেন না। কেননা এখন তিনি দেখতে পান,

[...] এই স্বদেশে বিদেশে রাত্রি দিন
অগ্নিজ্বলে বোমা ফাটে, ছুরির ফলায়,
সুখ পুড়ে যায়। (ওই)

মানুষ যেখান থেকে শুরু করে সেখানে আর ফিরে যেতে পারে না — এটাই হচ্ছে সময় বাস্তবতা; এই বাস্তবতার নিরিখে কবি কিরণশঙ্কর রচনা করেন 'ফিরে যেতে পারছ না' কবিতাটি। কবিতায় দেখতে পাই কবি যৌবনে একটি রাজনৈতিক মতাদর্শে দীক্ষিত হয়ে সমাজের প্রতি মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ হয়েছিলেন। শপথ করেছিলেন পৃথিবীকে বদলে দেবেন।

প্রতিটি মানুষ স্বেচ্ছায় দেবে তার শ্রমের ফল,
প্রতিটি মানুষ পেয়ে যাবে তার যা প্রয়োজন,
পৃথিবীকে নতুন সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্যে
(ফিরে যেতে পারছ না)

কবি বুকের মধ্যে লালন করেছিলেন দারুণ আশা-আকাঙ্ক্ষার বীজ। চোখের স্বপ্ন তখন বড়ো সুন্দর ছিল।

আকাশের নীলিমাকে ছিনিয়ে আনবার আকাঙ্ক্ষা,
তখন উত্তাল নদীর স্রোতে শরীরটাকে ধুইয়ে দেবার সময়,
লতাপাতার আড়ালে শিশুর মুখের মতো লালাভ
বেশ কিছু তাজা ফুল,
ঘাসের ওপর ভয় না-পাওয়া কয়েকটি প্রজাপতি,
হরিণ শিশুর মতো স্পন্দমান
তাজা যৌবনের স্বপ্ন। (ওই)

কিন্তু যৌবনের সেই তাজা স্বপ্ন এখন ধূলিধূসরিত। এখন প্রতিদিন চোখে পড়ছে শিশুদের মুখে খাবার নেই, অবমাননার ভয়ে নারী সর্বদা সন্ত্রস্ত। যুবকের শরীরে নেমে এসেছে এখন বার্ধক্যের দুশ্চিন্তার ছাপ। আর তাই কবি বলেন,

এই অস্থির সময়ে অল্প বয়সের স্মৃতি বড়ো মনোহর;
অথচ সেখানে ফিরে যেতে পারছ না। (ওই)

Dhaka University Institutional Repository

কেননা যেখান থেকে শুরু করা হয় সেখানে আর ফিরে যাওয়া যায় না।

'এদিনেও মনে হয়' কবিতায় ধ্বনিত হয়েছে স্বপ্নভঙ্গের হাহাকার।

যে স্বপ্ন দুচোখে ছিল একদিন তার
স্বদেশ প্রেমের কোনো ছবি বুকে এঁকে,
যে স্বপ্ন উজ্জ্বল হ'তো প্রেমিকার স্পর্শের ছোঁয়ায়,
পাখিরা আসতো ফিরে নিরাময় নীড়ে
আকাশ অরণ্য আর পাহাড়ের দেশে
আজ সেই স্বপ্নরা কোথায়! (এদিনেও মনে হয়)

এই প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে আজকের প্রতিকূল সময়ের অতল অন্ধকারে। কবির ভাষায় :

আজ যেন সব দৃশ্য ডুবে আছে ভীতির জগতে,
অরণ্যের ডালপালা সব
ম্রিয়মান, মানুষের হাতে গড়া পৃথিবী সংসার
নিমেষেই মিশে যেতে চায়
ক্ষয়ের আবহে। (ওই)

কবি বলেন, এইভাবে নির্বিবাদে বসে বসে সময়ের কাছে পরাজয় মেনে নেওয়া যায় না। স্বপ্ন ছাড়া মানুষের বাঁচবার আর কোনো পথ নেই। তাই যৌবনের স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। যে অপার সম্ভাবনা নিয়ে মানুষ এই পৃথিবীকে সুন্দর করে গড়ে তুলেছিল তাকে ধরে রাখতে হবে। নতুবা মানুষের ভবিষ্যত হবে আরো ভয়াবহ।

যৌবনের স্বপ্নকে ধরে রাখতে হবে দিকে দিকে
যে যে স্বপ্নে প্রতিশ্রুতি সম্ভাবনা ছিল একদিন,
চোখ থেকে সেদিনের ছবি মুছে গেলে
দিন হবে আরো ভয়াবহ। (ওই)

দুই.

'স্বপ্ন-কামনা - বৃষ্টি এলে - মানুষ জানে - রুক্ষদিনের কবিতা - দৃশ্য বদলের দিন - ভিতরে বাইরে'-এর মধ্য দিয়ে জীবন-মৃত্যুর স্বরূপ সম্বন্ধে কবির যে অনুভূতির ধারা চলে এসেছে, 'আশি-নব্বুই-এর কবিতা'য় এসে তা পরিণত রূপ লাভ করেছে। 'মানুষ মরণশীল' এই চরম সত্যিটা যেমন কবি জানেন, তেমনি তিনি বিশ্বাস করেন,

মানুষ প্রয়াত হলে ছাই হয়ে যায়।
অথচ ওই ছাইয়ের গাদায়
স্তূপ হয়ে থাকে না মানুষ,
কোথাও নতুন কোনো জন্মের ভেতরে
নড়েচড়ে ওঠে;
কোথাও সে পৃথিবীর পথে
আকাশের নীচে
মাটিতে পা রেখে
নবজনমের নানা সৌরক্ষণগুলি
চিনে নিতে চায়। (মানুষ প্রয়াত হলে)

Dhaka University Institutional Repository

কবির এই বিশ্বাস এ কাব্যগ্রন্থের 'জানা অজানা', 'যাওয়া আসা', 'বয়স', 'কেউ থাকবে না একদিন', 'এ বড়ো আশ্চর্য খেলা', 'এ-এক আশ্চর্য খেলা', 'স্মৃতির ভিতর' কবিতাগুলোতে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, নিরাভরণ, সরল, নিঃসংশয়দৃঢ় ও শক্তিশালী রূপ লাভ করেছে। কবি কখনোই মৃত্যুর কাছে পরাজয় স্বীকার করেন নি; বরং তিনি বরাবরই মৃত্যুকে পরাভূত করে নিজের আত্ম-স্বরূপ দেখতে পেয়েছেন। তাই 'যাওয়া আসা' কবিতায় শোনা যায় তাঁর নিঃসংশয়দৃঢ় উচ্চারণ :

আমি যাব না, আমি থেকে যাব।
যদি শরীরটাকে কেউ তুলে নিয়ে যায়
শরীর চলে যাবে অন্য কোথাও আড়ালে,
আমি থাকব। (যাওয়া আসা)

মর্ত্যলোকের সুদীর্ঘ কালের ইতিহাস থেকে কবি লাভ করেছেন দিব্যজ্ঞান। তাই মৃত্যুকে অবহেলা করে তিনি বলেন :

আমার কৈশোরের যৌবনের বার্ধক্যের স্মৃতি
গাছপালা নদীর স্রোত পাহাড়ের ছায়াকে
জড়িয়ে ধরে রয়েছে,
দিনের সূর্য আকাশের চাঁদ নীলিমা
প্রতিদিন রচনা করছে নানা দৃশ্য:
ওই দৃশ্যগুলির মধ্যেই আমি থেকে যাব।
আমার আগে যাঁরা ছিলেন তাঁরাও আছেন
ওই দৃশ্যগুলোর মধ্যে;

একটার পর একটা শরীর সেই কবে থেকে
চলে যাচ্ছে কুয়াশার দিকে,
সবাই কিন্তু রয়ে গেছেন
এখানেই কোথাও অনুভবের ভেতরে,
আমিও থেকে যাব। (ওই)

'কেউ থাকবে না একদিন' কবিতায় দেখা যায়, মৃত্যুর অমোঘতা বরণ করে নিয়েও কবি বলছেন :

কেউ থাকবে না একদিন
মানুষ মরণশীল তবু যতোদিন
পৃথিবীতে বেঁচে থাকা যায় অসময়ে,
ভালোভাবে বাঁচবার সাধ। (কেউ থাকবে না একদিন)

'স্মৃতির ভিতরে' কবিতাটিতেও মৃত্যুর চিরন্তনতা স্বীকার করে মানুষের জীবনের অনশ্বরতাকে বড়ো করে তুলেছেন কবি। তিনি উপলব্ধি করেছেন মানুষের নিত্যসত্তা কখনো মরে না — সে চিরঞ্জীব। —

মানুষের মৃত্যু নেই একটি মানুষ চলে গেলে
অন্য কেউ ফিরে আসে নবজন্মে নব রূপান্তরে,
জন্মায় নতুন করে যেন বা নতুন কচি পাতা,
স্মৃতির ভিতরে শুধু মায়াবী ভুবনে শূন্য ঘরে
মানুষ আশ্বস্ত হয়, দূরে থাকে আর্ত বিষণ্ণতা। (স্মৃতির ভিতরে)

Dhaka University Institutional Repository

মানবের এই অন্তর্নিহিত স্বরূপ কবিকে ক্রমশ জীবনমুখি করে তোলে। এই প্রৌঢ় বয়সে পৌঁছেও তিনি মৃত্যুকে উপেক্ষা করতে চান। কেননা,

জীবন স্বপ্নকে নিয়ে বেঁচে থাকতে চায় নিরন্তর, (এ-এক আশ্চর্য খেলা)

তাই আয়ুর অন্তিম সীমায় এসেও কবি আবার সব কিছু প্রথম থেকে শুরু করার কথা ভাবেন।

আয়ুর, অন্তিমে এসে শরীর এখন
বড়ো বেশী কম্পমান, তবুও হৃদয়
সবকিছু জেনে নিতে শিশুর মতোই কৌতূহলী,
আবার নতুন করে আবার প্রথম থেকে যেন
শুরু করতে চায় দিনশেষে। (এ বড়ো আশ্চর্য খেলা)

তবে কবি কখনোই অবাস্তব কল্পনায় জীবনের কঠিন বাস্তবতাকে ভোলেন নি। সেজন্যে শাশ্বত মৃত্যুকে একদিন যে তাঁকেও আলিঙ্গন করতে হবে এ চরম সত্যটিকে তিনি হৃষ্ট চিত্তেই গ্রহণ করেছেন। আর সেই কালের যাত্রায় যেতে যেতে এই পৃথিবীতে তিনি রেখে যেতে চেয়েছেন আপনার কীর্তিময় জীবনের বর্ণময় ছবি। 'বয়স' কবিতায় তাই কবিকে বলতে শুনি :

[...] তুমি
এখনো শরিক আছ কালের যাত্রায়
অবশিষ্ট পথে। কিছু বর্ণময় ছবি
যদি ফোটে যেতে যেতে গোধূলি আকাশে
যেন বা ঝড়ের শেষে স্থিরতায় মিশে যায় মেঘ,
ফুলের সৌরভটুকু যদি পাও শেষের নিঃশ্বাসে
সে কি কম কথা!
তুমি রেখে যাবে দৃশ্যপটে
একটি অদৃশ্য রঙ চিরন্তন সজীব নির্মাণে। (বয়স)

গভীর শান্তি ও স্নিগ্ধতার মধ্যে কবির এই শেষ যাত্রায় যাবার ইচ্ছা — মৃত্যু সম্পর্কে এই চরম আত্মোপলব্ধি, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তকে দান করেছে অপার মহিমা।

তিন.

'আশি-নব্বুই-এর কবিতা' গ্রন্থের তৃতীয় ধারাটি নতুন; পূর্বের কাব্যগ্রন্থগুলোতে এ ধারাটি নেই। কেননা এ ধারার কবিতাগুলো কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের প্রয়াত পত্নী বীণা সেনগুপ্তকে স্মরণ করে রচিত। ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারি কবির দীর্ঘ জীবনের সুখের-দুঃখের সঙ্গী প্রিয়তমা স্ত্রীর পরলোক গমনে প্রৌঢ় কবি গভীর শোকাভিভূত হয়ে পড়েন। ১৯৪৯-এ তাঁরা জীবনে মরণে একসঙ্গে থাকার শপথ করে সাত পাঁকে বাঁধা পড়েছিলেন। অবশ্য তারও আগে সেই চল্লিশের দশকের গোড়ার দিক থেকেই তাঁদের পরিচয়। বীণা বিশ্বাস ছিলেন শহিদ সোমেন চন্দের মাসিমা ও

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক সহকর্মী। তাই প্রথমে রাজনৈতিক মতাদর্শের মিল এবং পরে তাঁদের মনের মিলন — ১৯৯৫-এর ১৭ই জানুয়ারি পর্যন্ত যা অটুট ছিল। বীণা সেনগুপ্ত ছিলেন কবির কর্মের ও মর্মের ছায়াসঙ্গী। তাই আকস্মিক না হলেও পত্নীর মৃত্যু কবিকে ভীষণ নিঃসঙ্গ এবং শূন্য করে দেয়। আর এই একাকিত্বের বেদনাবোধ থেকেই উৎসারিত হয়েছে 'আশি-নব্বুই-এর কবিতা' গ্রন্থের 'যেতে যেতে', 'নেই', 'শোক', 'একা' ও 'শূন্যতা' কবিতাগুলো।

'যেতে যেতে' কবিতায় ফুটে উঠেছে একটা গভীর শোকের আবহ। কবি-পত্নী কিছুক্ষণ আগে পরলোক-গমন করেছেন। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অন্তিম সংস্কারের জন্যে। কবি হাসপাতালের সিঁড়ির এককোণে দাঁড়িয়ে আছেন বুকে একরাশ শূন্যতা ও হাহাকার নিয়ে। কবির ভাষায় :

> তুমি যাচ্ছ আলো থেকে সন্ধ্যার বলয়ে
> বিকেলের শেষ রৌদ্রের ছায়ায়,
> মস্ত তোরণ তারই ভেতর দিয়ে।
> আমি দাঁড়িয়ে আছি হাসপাতালের সিঁড়ির কোণে,
> আমার হাত শূন্য বুক শূন্য,
> ভেতর থেকে ঠেলে উঠছে শোক। (যেতে যেতে)

কবির কেবলই মনে হয় এই বিশাল শূন্যতা তাঁকেও যেন অতল অন্ধকারে টেনে নিয়ে যেতে চায়। আর তিনি পাথরের মতো নিশ্চল-নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।

'নেই' কবিতায়ও শোনা যায় একটা প্রবল শোকের হাহাকার ধ্বনি। আজ কবি-পত্নী নেই বলেই — কবির ঘরে হাওয়া এসে ফিরে চলে যায়, ফিরে যায় সন্ধ্যার অন্ধকারে পাখির ঝাঁক; এমনকি যে বেড়ালগুলো থাকত তাঁর কাছাকাছি পাশেপাশে, সেগুলোও তাদের প্রিয় মানুষের শোকে চলে গেছে কোথাও। কবি-পত্নীর চলে যাওয়ায় আকাশ-বাতাস-ফুল-পাখি-জোনাকি সবাই-ই শোকাভিভূত — সমস্ত সংসারটাই যেন মহাস্তব্ধ শোক বুকে ধারণ করে আছে। আর তাই কবি অনুভব করেন —

> নেই নেই বলে যেন সারাক্ষণ চাপা আর্তনাদ,
> স্মৃতিচিহ্ন থরে থরে হৃদয়ের একান্ত নিভৃতে,
> নেই নেই বলে যেন ভেঙে পড়ে সব স্বপ্নসাধ,
> কেবল শোকের দাহ থেকে যায় ছয়টি ঋতুতে। (নেই)

'শোক' কবিতাটিতে দেখা যায় মেঘমেদুর এক শীতের জানুয়ারিতে প্রিয়তমা পত্নী পরলোকে চলে গেলেও তাঁর শোক এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেন নি কবি। তাঁর দিন কাটে একটা ঘোরের মধ্যে। তাঁর মনের ভেতর বিষাদ এত ভারি হয়ে উঠেছে যে, তিনি কোনো বই হাতে তুলে নিলে তাতেই শোনেন বুকচাপা হাহাকার — আজকাল জীবনানন্দের কবিতায়ও তিনি আবিষ্কার করেন বিষাদের মহাসিন্ধু। তাই কবি বলেন —

> ভাবতে পারতুম না দুর্বহ শোক প্রকৃতির দৃশ্যে দৃশ্যে
> এতো নিভৃত হয়ে উঠতে পারে:

Dhaka University Institutional Repository

স্মৃতি তাড়িয়ে নিয়ে যায় বারবার ভিতরের দিকে,
যে-কোনো কবিতা পড়লেই মনে হয় শোকের কবিতা,
স্মৃতি থেকে বেরিয়ে আসে শোক। (শোক)

'একা' কবিতায় দেখি মাঝে মাঝেই কবি অতীত স্মৃতি তাড়িত হয়ে প্রয়াত স্ত্রীর সঙ্গে কথোপকথন করছেন।

আজ কেমন আছ, একটু ভালো?
বড়ো দেরি হয়ে গেল ফিরতে
সন্ধ্যায় যে ট্যাবলেটটি খাবার কথা ছিল
খেয়েছ তো?
এইসব কথা শুনতে শুনতে
তুমি পাশ ফিরে শুয়ে থাকো অমলিন অন্ধকারে,
উত্তর মেলে না। (একা)

কবিকে নানান কাজে অনেক রাত পর্যন্ত বাইরে থাকতে হয় এখনো কোনো কোনো সময়। বাড়িতে ফিরে তাঁর মনে থাকে না প্রিয়তমা পত্নী নেই। যখন মনে পড়ে তাঁর বুকের মধ্যে ধক্ করে ওঠে। আর তখন তিনি দেখেন,

শূন্য বিছানায় চাঁদের আলোর শুভ্রতা,
বাইরে হাওয়ায় দুলছে গাছের ডাল,
দুলছে জানলার পর্দা। (ওই)

বাইরের দমকা হাওয়ায় কবি বুকের মধ্যে আরো বেশি করে অনুভব করেন শূন্যতা। তাই তাঁর বুক চিরে বের হয়ে আসে সেই শাশ্বত বাণী—

যে চলে যায় সে একাই যায়,
যে পেছনে পড়ে থাকে সে-ও একা। (ওই)

এই যে শূন্যতা কবি বুকের মধ্যে লালন করেন পরম মমতায়, 'শূন্যতা' কবিতায় দেখি সেই শূন্যতার কাছেই কবি বন্দী। কেননা যে ছিল কবির জীবন মরণের সঙ্গিনী সে তো চলে গেছে মাঘ মাসের শীতে—বুকের গভীরে রেখে গেছে কিছু স্বপ্ন কিছু স্মৃতি, আর এক রাশ হাহাকার। তাই শূন্য নিঃসঙ্গ কবির বুকে ধীরে ধীরে গোপনে জায়গা করে নিয়েছে শূন্যতা—কবির সঙ্গে শূন্যতারই এখন একসঙ্গে বসবাস। জীবনের অন্তিম লগ্নে এটাই কবির নিয়তি। কবির ভাষায় :

যে ছিল সঙ্গিনী সে তো চলে গেছে মাঘ মাসে শীতে,
রেখে গেছে কিছু স্বপ্ন কিছু স্মৃতি বুকের গভীরে;
অথচ কখন তুমি এলে
চোরাপথ দিয়ে
জানিনি, বুঝিনি।
তোমার সঙ্গেই বসবাস
ঘর বাঁধা ফুল তোলা শেষ লগ্নে এই কি
নিয়তি! (শূন্যতা)

শুধু কবির নয়— প্রিয়জন হারা প্রত্যেক মানুষেরই একাকী শেষ জীবন শূন্যতার হাতেই সঁপে দিতে হয়—এটাই নিয়তি। এই-ই চিরন্তন সত্য।

Dhaka University Institutional Repository

চার.

কবিতাকে বিষয় করে এর আগেও কয়েকটি কবিতা কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত রচনা করেছেন। সেগুলো বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থেও কবিতাকে নিয়ে কিছু সংখ্যক কবিতা আছে — সেগুলোর মধ্যে 'কবিতার বইগুলি', 'কবিতা বলয়', 'শেষ রাতে' উল্লেখযোগ্য।

'কবিতার বইগুলি'তে কবিতাকে দেখতে পাই কবির বন্ধু ও সঙ্গী হিসেবে — যে কবিতা এক সময়ে কবিকে নিয়ে যেত অনেক দূরের শান্তির বলয়ে। সেই স্মৃতিচারণ করে কবি এখন বলেন —

ফের মনে পড়ে পৃথিবীতে
কবিতার কোনো শেষ নেই,
পৃষ্ঠা ওল্টাতে গিয়ে স্তব্ধ হতে হয়,
এতো সব মণিমুক্তা শুয়ে আছে পাশাপাশি ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে
শুধুমাত্র মানুষের স্পর্শের অভাবে। (কবিতার বইগুলি)

শেষ চরণটি উচ্চারণ করে কবি এই আহ্বানই জানিয়েছেন — যেন আমরা সবাই কবিতার বইগুলো থেকে জ্ঞানের এইসব মণিমুক্তো বাইরে বের করে আনি এবং ছড়িয়ে দেই বিশ্বময়। মানুষের স্পর্শে কবিতা হয়ে উঠুক আরো শাণিত, উজ্জ্বল।

'কবিতা বলয়' কবিতায় দেখি কবিতাকে ভালবেসে যৌবন-বেলায় কবি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন,

যত দূর চোখ যায়
পিঙ্গল পাহাড় অমল ধবল নদী
ওই বিশাল অরণ্য খরস্রোতা নদীর তীর
সব দৃশ্য ছবি হয়ে ধরা দেবে (কবিতা বলয়)

তাঁর কবিতায়। সেই তাজা যৌবন থেকে এই প্রৌঢ় বয়স পর্যন্ত নানান বাঁধা বিপত্তি পেরিয়ে তিনি এখনো অবিচল কবিতা লিখে চলেছেন। কবিতাকে তিনি বুক দিয়ে আগলে রেখেছেন। কবিতাও তাঁকে ছেড়ে যায় নি। কেননা তাঁরা সাত পাঁকে বাঁধা। কবির ভাষায় :

জানতে পারিনি কি ভাবে এতো বছর কেটে গেল
আমাকে সাত পাঁকে বেঁধে রেখেছিল কবিতা
প্রৌঢ়ত্বের প্রাচীরের কাছে পৌঁছে এখন
আমি নতুন করে জেগে উঠলাম
অনুভব করলাম অনেক কিছু খুইয়ে তবেই
এতো দূর এসে পড়েছি
কিন্তু কবিতা আমাকে পরিত্যাগ করেনি। (ওই)

'শেষ রাতে' কবিতায় কবি আমাদের জানান,

চার দশকের বেশী কবিতার অমেয় জগতে
ভ্রমণ করেছি নানা পথে:
দেখেছি আকাশময় নীলের বাহার,

Dhaka University Institutional Repository

সাতটি রঙের ছটা পাহাড় চূড়ায়,
দূরে নীচে বনস্পতি শাখার বিস্তার
সবুজের রহস্যের ঐশ্বর্য বিলায়।   (শেষ রাতে)

এই সময়ের কবিতা কবিকে দান করেছে অনন্ত ঐশ্বর্য, তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে আলোর সভায়। কিন্তু বর্তমান সময় প্রতিকূল —

একালে পৃথিবী রাজ্য যায়
সমুদ্র ভাসিয়ে নেয় দ্বীপ উপদ্বীপ
মানুষের হাতে গড়া বিচিত্র সন্ত্রাসে
পৃথিবীর হৃদপিণ্ড কাঁপে:   (ওই)

এখনো কবিতা লেখেন তিনি। এখনো পাহাড় বন সমুদ্র আকাশ আগের মতোই চিরন্তন। তাই ভবিষ্যত সময়ের কাছে জানতে চান কবি তাঁর নতুন লেখা কবিতাগুলো কোন দিকে যাবে?

পাঁচ.

বিশেষ ধারার কবিতাগুলো ছাড়াও 'আশি-নব্বুই-এর কবিতা' গ্রন্থে বেশ কিছু সংখ্যক কবিতা আছে, যেগুলোর বিষয়বস্তু বিচিত্র। এ ধারার কবিতাগুলোর মধ্যে 'জন্মদিনের কবিতা', 'জন্মদিন', 'অনুভব : ইদানীন্তন কাল', 'সরীসৃপ নেই', 'ভালোবাসা' উল্লেখযোগ্য।

কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের জন্মদিন নিয়ে দুটি কবিতা আছে আলোচ্য গ্রন্থে। প্রথমটি 'জন্মদিনের কবিতা'। এ কবিতায় রুক্ষ সময়ের কথা জানিয়ে কবি আমাদের অনুনয় করেন —

আমার জন্যে একগুচ্ছ ফুল এনো,
আর কিছু নয়।   (জন্মদিনের কবিতা)

কবি তাঁর জন্মদিনে ফুল ছাড়া কিছু চান না। কেননা তিনি শেষ কবে হাত দিয়ে ফুল ছুঁয়ে ছিলেন তা এই রক্তাক্ত সময়ে মনে করতে পারেন না। তাই বলেন :

বিশ্বাস করো আমি বহুকাল বাগানে যাইনি,
হাত দিয়ে ছুঁয়েও দেখিনি
কৃষ্ণচূড়া টগর বকুল।   (ওই)

দ্বিতীয় কবিতার নাম 'জন্মদিন'। এ কবিতায় দেখি কবি তাঁর জন্মদিনে পুরনো তিক্ততা ভুলে বিনীতভাবে বলছেন —

আজ থাক ডালে ডালে ফুল,
কৃষ্ণচূড়া টগর বকুল,
আজ হিংস্র দস্যুকেও ক্ষমা:
আজ আমি বৃক্ষের উপমা।
পাতা ঝরে শীর্ণ গাছপালা,
বুকে এক গুঞ্জন নিরালা।
আজ আর তিক্ত কথা নয়,
আজ শুধু পাখির বিনয়।   (জন্মদিন)

Dhaka University Institutional Repository

এই ছোট্ট কবিতাটির ভাব ও ভাষার সারল্য কবির জন্মদিন সার্থক করে তোলে, আর আমাদের মুগ্ধ করে।

'অনুভব : ইদানীন্তন কাল' কবিতাটিতে ভালবাসার কাল-আকালের কথা বলা হয়েছে। ভালবাসার সঙ্গে চুম্বনের সংযোগ খুবই নিবিড়। কিন্তু এই নিবিড়তা তখনই সার্থক হয় যখন প্রেমিক ও প্রেমাস্পদা পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস করে — মনপ্রাণ দিয়ে অনুভব করে। কবির মতে এরকম ভালবাসা পূর্বে ছিল, এখন নেই। এখন যা আছে তা শরীর সর্বস্ব আলিঙ্গন ছাড়া আর কিছু নয়। কেননা এখন ভালবাসায় স্বার্থের মিশ্রণ পড়েছে। অনুভবের গভীরতা কমে গেছে। কবির ভাষায় :

ভালোবাসা ছিল বলে একদিন নিবিড় চুম্বনে
অভিভূত হয়েছিলে তুমি।
এখনো চুম্বন আছে দেখেছ তুমিও
দূরদর্শনের পটে, সিনেমার রূপালী পর্দায়,
মনে হয়েছিল অস্থিরতা
শরীরসর্বস্ব এক আলিঙ্গন বড়ো মধুময়

চুম্বন সর্বত্র আছে ভয়াল উত্তাল
এমন কি এই ঝড়ো দিনে;
অথচ অতৃপ্তি ঢেউ আছে দিকে দিকে
যেহেতু এ শব্দ দৃশ্য স্পর্শের ভিতরে
কোনোখানে ভালোবাসা নেই। (অনুভব : ইদানীন্তন কাল)

'সরীসৃপ নেই' কবিতায় কবি মানুষকেই পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ংকর প্রাণী বলে চিহ্নিত করেছেন। কেননা মানুষ সাপের চেয়েও হিংস্র ও বিপদজনক। কবির মতে ফুলের বাগানে এখন আর সরীসৃপ ঘোরে না। এই সুন্দর দৃশ্যে এখন মানুষেরই আনাগোনা। অবশ্য কবি এসব মানুষকে মানুষ বলতে নারাজ। তাঁর ভাষায় :

অথচ মানুষ নেই একটিও এইখানে আর।
কারা যেন অপেক্ষায় পাতার আড়ালে,
হাতে অগ্নিস্ফুরণের অস্ত্র, কেউ এলে
বাগানেই অনিবার্য রক্তের ক্ষরণ।

সরীসৃপ নেই, আছে লুকানো মানুষ,
হিংস্র আততায়ী,
বিষাক্ত সাপের চেয়ে বড়ো ভয়ঙ্কর। (সরীসৃপ নেই)

'ভালোবাসা' কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের একটি অনাবিল প্রেমের কবিতা। এ কবিতায় কবি ভালবাসাকে আহ্বান করে যেমন নিজের কাছে পেতে চেয়েছেন, তেমনি তিনি সকল মানুষের বুকেও ভালবাসাকে থাকার অনুরোধ করেছেন। কেননা কবি বিশ্বাস করেন একমাত্র ভালবাসাই পারে এ পৃথিবী থেকে, মানুষের মন থেকে হানাহানি, হিংসা-বিদ্বেষকে দূরে সরিয়ে একটা আনন্দময় স্বর্গ রচনা করতে। কবির ভাষায় :

ভালোবাসা, তুমি আমার কাছেই থাকো,
আমার বুকের অস্থিরতার ফাঁদে

Dhaka University Institutional Repository

উৎস পূর্ণ হোক বিচিত্র স্বাদে,
তুমিই আমাকে নিবিড় বন্ধে রাখো।

তুমি ভালোবাসা মানুষের বুকে থাকো,
ছড়াও তোমার সুগভীর উদারতা;
আপন যাদুতে হিংসাকে ঠেলে রাখো,
আনো বুকে বুকে অনন্ত স্বচ্ছতা। (ভালোবাসা)

পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থের মতো 'আশি-নব্বুই-এর কবিতা' গ্রন্থেও কবিতার আঙ্গিক ও শিল্পবৈচিত্র্যে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত পূর্বের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন। এ কাব্যগ্রন্থের কাব্যভাষা আটপৌরে — সহজ-সরল। কবিতার বিষয়ের প্রয়োজনে কখনো কখনো গুরুগম্ভীর শব্দের প্রয়োগ লক্ষ করা গেলেও তা অপ্রচল বা দুর্বোধ্য নয়। কবি এগুলোকে বলেছেন 'হৃদয়ের ভাষা'। যেমন —

সমস্ত সংসার কাঁপে শোক তাপ স্বেদ ও প্রস্তরে
একাকার অভিভূত; অন্তরালে শুধু ভালোবাসা
অবিরাম কাজ করে, ঢালে ধারা উদ্বায়ু অধরে,
কাব্যলোকে চিরকাল বাসা বাঁধে হৃদয়ের ভাষা। (ফিরে আসতেই হবে)

আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে অলংকারের ব্যবহার অত্যন্ত অল্প। তার মধ্যেও শব্দালংকার ও অর্থালংকারের কিছু শিল্পসফল প্রয়োগে কবির দক্ষতা নজরে পড়ে। যেমন —

শব্দালংকার

সরল অনুপ্রাস : ১. স্মরণীয় বহু বাক্য বরণীয় হলেও এখন
হৃদয় বালুর স্তূপ। (মূর্ছিত মানুষ)

অন্ত্যানুপ্রাস : বোমায় বিদীর্ণ যতো জনপদগুলি,
আতঙ্কবাদীরা তোলে সদম্ভ অঙ্গুলি:
দিনে দিনে স্তূপায়িত কঙ্কালের খুলি। (দৃশ্য)

ছেকানুপ্রাস : শুনেছে ঝিল্লির স্বর নদীর কল্লোল (ঢেউয়ের কবলে)

অর্থালংকার

উপমা : ১. কাকতাড়ুয়ার মতো একালের কৃষিক্ষেত জুড়ে
পাশ ফিরে শোয় দেশে দেশে / মূর্ছিত মানুষ। (মূর্ছিত মানুষ)

২. অকুল সমুদ্রে হাঙরের মতো
সমস্ত সময়টা দুলছে। (জানা অজানা)

কখনো কখনো উপমা উপস্থাপিত হয়েছে চিত্রকল্পের মতো :

লতাপাতার আড়ালে শিশুর মুখের মতো লালাভ
বেশ কিছু তাজা ফুল,
ঘাসের ওপর ভয় না-পাওয়া কয়েকটি প্রজাপতি
হরিণ শিশুর মতো স্পন্দমান
তাজা যৌবনের স্বপ্ন। (ফিরে যেতে পারছ না)

উৎপ্রেক্ষা : পাখীর ঝাকের মতো, শোকাবহ যেন বা প্রকৃতি। (স্মৃতি)

Dhaka University Institutional Repository

ছন্দ

এ কাব্যগ্রন্থে দুটি কবিতা আছে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের; একটি কবিতা আছে শেক্সপিয়রিয় রীতির আদলে অসমমাত্রিক (১৪, ১৮, ২২) ছন্দে রচিত সনেট; এছাড়া বাকি কবিতাগুলো প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত ও গদ্যছন্দের। উদাহরণ —

মাত্রাবৃত্ত :

ভালোবাসা, তুমি আমার কাছেই থাকো,
আমার বুকের অস্থিরতার ফাঁদে
উৎস পূর্ণ হোক বিচিত্র স্বাদে,
তুমিই আমাকে নিবিড় বন্ধে রাখো। (ভালোবাসা)

সমিল প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত :

নেই নেই বলে যেন সারাক্ষণ চাপা আর্তনাদ,
স্মৃতিচিহ্ন থরে থরে হৃদয়ের একান্ত নিভৃতে,
নেই নেই বলে যেন ভেঙে পড়ে সব স্বপ্নসাধ,
কেবল শোকের দাহ থেকে যায় ছয়টি ঋতুতে। (নেই)

অমিল প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত :

ক্লান্তিতে মানুষ আজ পাশ ফিরে শোয়!
দেখেও দ্যাখে না
সারা পৃথিবীতে
এখানে ওখানে বধ্যভূমি;
অন্ধকারে ষড়যন্ত্র স্তূপ হয়ে ওঠে প্রতিদিন
জল্লাদের নাটকীয়তায়। (মূর্ছিত মানুষ)

গদ্যছন্দ :

কয়েকটা কাক উড়ে যাচ্ছে ঝাঁক বেঁধে
এখনই মিলিয়ে যাবে নীলিমার দিকে;
বুকের মধ্যে রেলগাড়ির চাকার শব্দ
আমাকে যেন বিশাল শূন্যতায় ঠেলে দিতে চায়,
আমি অভিভূত দাঁড়িয়ে আছি। (যেতে যেতে)

সনেট :

এ এক আশ্চর্য খেলা, সব দৃশ্য স্মৃতি হয়ে যায়।
এই তো সেদিন যাকে দেখেছি সমীপে
একান্ত বুকের কাছে স্পর্শধন্যতায়
আজ সে কোথায় গেল? অন্ধকার এল নিষ্প্রদীপে!
এ-বড়ো আশ্চর্য খেলা, স্মৃতিময় ছবি
টেনে নেয় জড়ো করে নিজের মহলে,
ভোরের প্রথম সূর্য কিংবা সন্ধ্যাকালে অস্তরবি
ক্রমশ বিলীন হলে সব দৃশ্য স্মৃতি হয়ে জ্বলে।

জীবন স্বপ্নকে নিয়ে বেঁচে থাকতে চায় নিরন্তর,
চায় কি স্পর্ধিত প্রেম শেষহীন দীর্ঘ পরমায়ু?
গোলাপ কেন যে কালো — এরকম প্রশ্ন অবান্তর,
একজন চলে গেলে অন্যজন থেকে যায় বিপর্যস্ত স্নায়ু।
সব খেলা ভেঙে গেলে শুধু মাত্র স্মৃতির মহলে
যা ছিল এখন নেই, শুভ্রতার তারা হয়ে জ্বলে। (এ এক আশ্চর্য খেলা)

Dhaka University Institutional Repository

প্রতীক

প্রতীক-রূপক ব্যবহারে কাব্যশরীর যেমন সংহতরূপ লাভ করে, তেমনি তা কবির অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষেত্রে পালন করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। বস্তুত কবিতার কালোত্তীর্ণ অভিব্যঞ্জনার মাত্রা প্রকাশে প্রতীকের ব্যবহার শিল্পকৃতিরই উচ্চাঙ্গ প্রয়াস। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের 'আশি-নব্বুই-এর কবিতা'য় কবির প্রতীক ব্যবহারের প্রবণতা বা প্রতীক নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাঁর সচেতনতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এ কাব্যগ্রন্থের 'সুখ পুড়ে যায়', 'জন্মদিন', 'সরীসৃপ নেই', 'নটু মামা' কবিতাগুলোতে 'ছুরি', 'সাপ', 'নটু মামা' প্রভৃতি প্রতীকের সাহায্যে কবি সমসাময়িক প্রতিকূল সময় ও সমাজের সুবিধাবাদী, ধূর্ত, পশু-প্রবৃত্তির মানুষের চিত্র অঙ্কন করেছেন। যেমন —

> ছুরি থেকে অন্য এক ছুরির ফলায়
> ঝুলে বেঁচে আছে দেশ একই সন্ধিক্ষণে: (সুখ পুড়ে যায়)

এখানে দেখা যায়, কবির স্বদেশ ভূমি এক দারুণ সংরক্ত সময় অতিক্রান্ত করছে। রক্তাক্ত সেই সময়কে কবি 'ছুরি'র প্রতীকে প্রতীকায়িত করে কবিতায় নতুন ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন।

> সরীসৃপ নেই, আছে লুকানো মানুষ,
> হিংস্র আততায়ী,
> বিষাক্ত সাপের চেয়ে বড়ো ভয়ঙ্কর। (সরীসৃপ নেই)

এখানে মানুষকেই কবি হিংস্র আততায়ী হিসেবে চিহ্নিত করে তাকে বিষাক্ত সাপের প্রতীকে প্রকাশ করেছেন। সময় এখন এতটাই অস্থির ও বিপর্যস্ত যে মানুষের মানবীয় গুণাবলি হারিয়ে যেতে বসেছে। মানুষ পরিণত হয়েছে ভয়ংকর বিষাক্ত সাপে।

> নটু মামা রাখে হাত, আকাশে বাতাসে,
> যতো জল ঘোলা হয় ততো স্বস্তি তার:
> সমস্ত পৃথিবী তার ইচ্ছার পাহাড়।
> সমস্ত দুর্বল দেশ খেলার পুতুল। (নটু মামা)

সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসিস্ট শক্তির প্রতীক 'নটু মামা'। পররাষ্ট্র লোভী, সুচতুর নটু মামারা ভালো মানুষের মুখোস মুখে এঁটে দুর্বল প্রতিবেশীদের অসহায়তার সুযোগে সবকিছু গ্রাস করে নিতে চায়। এই খেলাতেই নটু মামাদের আনন্দ।

সার্বিকভাবে জাতীয় জীবনে হতাশা আর বঞ্চনার কষাঘাতে যে দুষ্ট ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল সেই সময়ে, কবির সংবেদনশীল মনে তা গভীর রেখাপাত করেছিল। তাই বিভিন্ন প্রতীক-রূপকের মাধ্যমে সেই গোপন দুষ্ট ক্ষতকে প্রকাশ করে তাঁর সময় ও সমাজকে নৈরাশ্য আর তামসিক পরিস্থিতি থেকে আশাবাদে উত্তরণে নিষ্ঠাবান শিল্পীর দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। এখানেই কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত পূর্বসূরিদের কাব্য ঐতিহ্য ধারণ করেও যথার্থরূপে স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. অমিত চক্রবর্তী, 'কবির মুখোমুখী', সাহিত্যচিন্তা (কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত সম্পাদিত) মে ১৯৯৭; পৃ. ৩৯।
২. জীবনানন্দ দাশ, 'স্বপ্ন-কামনা' (কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত), ১৯৩৮, ঢাকা: পৃ. ভূমিকাংশ দ্রষ্টব্য।
৩. প্রাগুক্ত।
৪. অমিত চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত; পৃ. ৩৪।
৫. জীবনানন্দ দাশ; প্রাগুক্ত।
৬. ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দে ফরাসি বিজ্ঞানী ল্যাভয়সিয়ে পদার্থের অবিনাশীতাবাদ সূত্রের মাধ্যমে প্রথম উল্লেখ করেন যে, পদার্থকে সৃষ্টি করা যায় না বা ধ্বংসও করা যায় না, তাকে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তর করা যায় মাত্র। [দ্রষ্টব্য : ড. সরোজ কান্তি সিংহ হাজারী, মাধ্যমিক রসায়ন, ২০০২, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা; পৃ. ১৭।]
৭. অতুলচন্দ্র সেন ও অন্যান্য (সম্পাদক; অনুবাদক), উপনিষৎ, অখণ্ড সংস্করণ, ১৯৮০, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা; পৃ. ৯৬।
ইসলাম ধর্মে মানুষের পুনর্জন্ম স্বীকার না করলেও পুনরুত্থানের কথা বলে। পবিত্র কোরআনুল করিম-এর ত্রিশতম পারায় তিরাশি সংখ্যক সূরা 'তাৎফিক'-এর চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ আয়াতে বলা হয়েছে :

'আলাইয়া জুন্নু উলাইকা আন্নাহুম মাবউছুন,
লিইয়াওমিন আজিম —
ইয়াওমা ইয়া কুমুন্নাছু লিরব্বিল আলামিন' —

অর্থাৎ 'তারা (মানবকুল) কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে, সেই মহাদিবসে, যেদিন মানুষ দাঁড়াবে বিশ্বপালন কর্তার সামনে'।
[দ্রষ্টব্য : মাআরেফুল ক্বোরআন (অনুবাদ ও সম্পাদক : মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), ১৪১৩ হিজরি, খাদেমুল — হারামাইনিশ্ শরীফাইন বাদশা ফাহদ ইবনে আবদুল আজীজ কর্তৃক প্রকাশিত, মদীনা মোনাওয়ারা; পৃ. ১৪৪১।]
৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'মরণ', সঞ্চয়িতা, ২০০০, রহমান বুকস, ঢাকা; পৃ. ১৯।
৯. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'কৃষ্ণকান্তের উইল : ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ', উপন্যাস সমগ্র (কাঞ্চন বসু সম্পাদিত), ১৯৯৩, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা; পৃ. ৪৩৪।
১০. সুমিতা চক্রবর্তী, আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়, ১৯৯২, প্রজ্ঞা প্রকাশন, কলকাতা; পৃ. ১০৮।
১১. জীবনানন্দ দাশ; প্রাগুক্ত।
১২. প্রাগুক্ত।
১৩. ভবতোষ দত্ত এ কবিতায় অজিত দত্তের কবিতার সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়েছেন। দ্রষ্টব্য : সাহিত্যচিন্তা (কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত সম্পাদিত), সেপ্টেম্বর ১৯৯৭; পৃ. ৪৩।
১৪. জীবনানন্দ দাশ; প্রাগুক্ত।
১৫. চণ্ডীদাস; বৈষ্ণব পদাবলী।
১৬. জীবনানন্দ দাশ; প্রাগুক্ত।
১৭. অমিত চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত; পৃ. ৩৮।
১৮. সুমিতা চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত; পৃ. ১১৮
১৯. অমিত চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।
২০. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, 'জনযুদ্ধের গান', কবিতা সংগ্রহ-১, ১৯৯৩, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা; পৃ. ৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

২১. 'আকাল' গ্রন্থে সংকলিত অন্যান্য কবিতাগুলো হচ্ছে :
জঠর — অরুণ মিত্র; চালের কাতারে — বিষ্ণু দে; রবীন্দ্রনাথের প্রতি — সুকান্ত ভট্টাচার্য; শ্রাবণ — বুদ্ধদেব বসু; ১৩৫০ — বিমলচন্দ্র ঘোষ; ফ্যান — প্রেমেন্দ্র মিত্র; নরক — নবেন্দু রায়; অনুভব — মণীন্দ্র রায়; লাল — ফারুখ আহ্‌মদ [ফররুখ আহমদ]; আমাদের গান — জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র; মন্বন্তর — দিনেশ দাস; স্বাগত — সুভাষ মুখোপাধ্যায়; অন্নদাতা — অমিয় চক্রবর্তী; অভিশাপ — কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়; গৃহস্থ বিলাপ — সমর সেন; কাহিনী — অবন্তী সান্যাল এবং দ্বৈরথ — গোলাম কুদ্দুস। [দ্রষ্টব্য : ড. সরোজমোহন মিত্র, 'পরিশিষ্ট', সুকান্তের জীবন ও কাব্য, ১৯৯৭, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা; পৃ. ১৭৫।]
২২. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের প্রকাশিত কাব্যগুলোতে খুঁজে 'মেঘমুক্ত' কবিতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নি বলেই উল্লিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। — বর্তমান গবেষক।
২৩. প্রেমেন্দ্র মিত্র, 'ফ্যান', সমগ্র কবিতা, ১৯৮৯, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা; পৃ. ৯৮।
২৪. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, চল্লিশের দশকের ঢাকা (সরদার ফজলুল করিম সহযোগে), ২০০১, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা; পৃ. ৫৯।
২৫. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, 'সোমেন চন্দ ও সমকাল', আগুনের অক্ষর (কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ও পবিত্র সরকার সম্পাদিত), ১৯৯২, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা; পৃ. ৮০।
২৬. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, 'চীন : ১৯৪১', প্রাগুক্ত; পৃ. ৪২।
২৭. শ্রীপ্রভাতাংশু মাইতি, ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা, ২০০৩, শ্রীধর প্রকাশনী, কলকাতা; পৃ. ২৬৪-২৬৫।
২৮. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, 'কমরেড স্তালিন', প্রাগুক্ত; পৃ. ১৪৩।
২৯. অমিত চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত; পৃ. ৪০।
৩০. জীবনানন্দ দাশ, 'তিমিরহননের গান', কবিতা সমগ্র, ২০০২, তিশা বুকস্ ট্রেড, ঢাকা; পৃ. ১৬১।
৩১. সুকান্ত ভট্টাচার্য, 'দুর্মর', সুকান্ত সমগ্র (বদরুদ্দীন উমর-এর ভূমিকা ও রণেশ দাশগুপ্তের স্মৃতিকথা সম্বলিত), ১৩৮০, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা; পৃ. ১৬৭।
৩২. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, চল্লিশের দশকের ঢাকা, প্রাগুক্ত; পৃ. ৬২।
৩৩. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, কবিতার রূপ-রূপান্তর, ১৯৮১, উচ্চারণ, কলকাতা; পৃ. ৬৫।
৩৪. প্রাগুক্ত।
৩৫. ভবতোষ দত্ত, 'কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের কবিতা', সাহিত্যচিন্তা (কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত সম্পাদিত), সেপ্টেম্বর ১৯৯৭; পৃ. ৪৭-৪৮।
৩৬. বিদ্যাপতি, 'নব-অনুরাগী কৃষ্ণ', বৈষ্ণব-পদাবলী (শ্রীসুকুমার সেন সম্পাদিত), ১৯৫৭, সাহিত্য অকাদেমি, দিল্লি; পৃ. ৭।
৩৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'উর্বশী', প্রাগুক্ত; পৃ. ১৬১।
৩৮. 'স্বর ও অন্যান্য কবিতা' গ্রন্থে এই কবিতার শিরোনাম রয়েছে ১৯৩৭-'৪৭।
৩৯. অমিত চক্রবর্তী, 'কবির মুখোমুখী', প্রাগুক্ত; পৃ. ৪১।
৪০. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, 'সময় অসময়', সাহিত্যচিন্তা (কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত সম্পাদিত), আশ্বিন ১৪০২; পৃ. ৬১।
৪১. অশোক মিত্র 'চারটি উৎক্ষিপ্ত মন্তব্য', কবিতা থেকে মিছিলে, ১৯৯৫, প্যাপিরাস, কলকাতা; পৃ. ৪০-৪১।
৪২. মাসুদুজ্জামান, বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার কবিতা : তুলনামূলক ধারা, ১৯৯৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা; পৃ. ৫২-৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

৪৩. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক (ও অন্যান্য সম্পাদিত), বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, ২০০২, বাংলা একাডেমী, ঢাকা; পৃ. ৬০৪।
৪৪. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় শব্দকোষ, ২০০১, সাহিত্য অকাদেমি, দিল্লি; পৃ. ১১০৪ ও ১৮৬০।
৪৫. সুমিতা চক্রবর্তী, আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়, প্রাগুক্ত; পৃ. ১২২।
৪৬. জীবনানন্দ দাশ, 'বনলতা সেন', প্রেমের কবিতা সমগ্র (আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত), ১৯৯৬, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা; পৃ. ৫৯।
৪৭. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, 'সময় অসময়', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।
৪৮. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, 'সময় অসময়', সাহিত্যচিন্তা (কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত সম্পাদিত), বৈশাখ ১৪০৩; পৃ. ৪৭।
৪৯. প্রাগুক্ত; পৃ. ৪৬।
৫০. সৈয়দ আকরম হোসেন, বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, ১৯৮৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা; পৃ. ২১।
৫১. বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'গোপাল মুখার্জি', সাহিত্যচিন্তা (কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত সম্পাদিত) আশ্বিন ১৩৯২; পৃ. ১২।
৫২. প্রাগুক্ত; পৃ. ২৩-২৪।
৫৩. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, 'সময় অসময়', প্রাগুক্ত; পৃ. ৪৮।
৫৪. সুকান্ত ভট্টাচার্য, 'প্রিয়তমাসু', রচনাসমগ্র, ২০০৪, তৃণ, ঢাকা, পৃ. ৭৩।
৫৫. মিহির চক্রবর্তী, 'বাংলা কবিতার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সত্তরের কবিতা', নান্দীমুখ, বর্ষ-১৮, সংখ্যা-২, ১৯৭৮ [দ্র. সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়, 'সত্তর-দশকের কবিতা', আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাস (অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত), ২০০৩, ভারত বুক এজেন্সি, কলকাতা; পৃ. ২১৩]
৫৬. অশোক মিত্র, 'কবিতা থেকে মিছিলে', প্রাগুক্ত; পৃ. ১৮।
৫৭. অশোক মিত্র, 'শরতে আজ কোন্ অতিথি', প্রাগুক্ত; পৃ. ১০৪।
৫৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'যেতে নাহি দিব', সঞ্চয়িতা, প্রাগুক্ত; পৃ. ৮৬।
৫৯. নীলরতন সেন, 'প্রবীণ কবির মুক্তচিন্তা', সাহিত্যচিন্তা (কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত সম্পাদিত), সেপ্টেম্বর ১৯৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ব্রিটিশ-ভারতের উত্তপ্ত ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জীবনী শুধুই তাঁর ব্যক্তিগত নয়, একটি সময়ের প্রতিবিম্ব। বর্তমান গবেষণায় তাঁর জীবনী রচনাকালে দেখা গেছে একদিকে বহির্বিশ্বের বিরাজমান পরাশক্তির প্রতিক্রিয়ায় উত্তপ্ত বঙ্গদেশ, অন্যদিকে স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামশীল ভারতের অভ্যন্তরীণ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় কম্পমান এ অঞ্চল। এর মধ্যে প্রগতিশীল ধারার বিকাশশীলতা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত সংযুক্ত হয়েছিলেন এই ধারার সঙ্গে। সংখ্যায় নগণ্য কিন্তু আদর্শগুণে বলীয়ান এই ক্ষুদ্র ধারাটি পরবর্তীকালে বাংলাদেশের প্রগতিশীল চিন্তাচেতনার বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী চেতনার উগ্রতাকে উপেক্ষা করে অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল চিন্তাচেতনা লালন ও প্রকাশ করা যে সম্ভব কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত তাঁর জীবন দিয়ে তা প্রমাণ করেছেন। তাঁর মানস-গঠনে দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি সর্বোচ্চ আনুগত্য, পাশ্চাত্য সাম্যবাদী চিন্তার সংরাগ — এই দুইদিক কার্যকর ছিল। ঢাকার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল বিকাশে যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন অবদান রেখেছিলেন কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের অবদানকে তার থেকে বিচ্ছিন্ন করলে এই ধারা ক্ষীণতর হবে নিশ্চয়।

সংগঠন ও সাংস্কৃতিক কর্মের পাশাপাশি নিজের সাহিত্য, বিশেষ করে কবিতায় যে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের পরিচয় পাওয়া যায়, তিনি কর্মীর পক্ষপাত, আদর্শবাদীর এককেন্দ্রিক আদর্শনিষ্ঠা, রাজনৈতিক নেতার একপক্ষীয় দৃষ্টি থেকে মুক্ত। এক্ষেত্রে তিনি আবেগপ্রবণ, কিন্তু আবেগপ্লাবনে অনিকেত নন। সংবেদনশীলতা তাঁর কবিতার মুখ্য স্বর। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলোতে একাধিক বিষয়ের কবিতা লক্ষ করা গেছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা, স্বাজাত্যবোধ এবং আশাবাদ হল মূল চেতনা। সময়ের অভিঘাতকে তিনি অস্বীকার করেন নি, তাই তাঁর কবিতায় উঠে এসেছে সমকালীন রাজনৈতিক পরিবেশ, রাজনৈতিক উত্তাপ; দাঙ্গার প্রতিক্রিয়া তো বটেই। তিনি এই প্রসঙ্গসমূহ কবিতায় ধারণ করতে গিয়ে তৎকালীন অন্তঃসারশূন্য রাজনীতি ও রাজনীতিকদের প্রকৃতরূপ তুলে ধরেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর পক্ষপাত গণমানুষের ধারাবাহিক ইতিহাসের প্রতি।

কিন্তু কবি সমাজ-রাজনীতির এই বিষয়গুলোকে তাঁর কবিতায় মুখ্য করেন নি। তিনি শুরু করেছিলেন ব্যক্তিগত অনুভূতি দিয়েই। অনেকটা রবীন্দ্রনাথের মতো —

Dhaka University Institutional Repository

মরণবন্দনায় যার সূচনা। ব্যক্তি অনুভূতিকে মুখ্য করতে গিয়ে কবি সুখ-দুঃখ, হৃদয়াবেগ, ভাল লাগা, ভালবাসা এই জাতীয় বিমূর্ত ধারণাগুলোকে তাঁর কবিতায় শব্দরূপ দিয়েছেন। যে কারণে এই বিমূর্ততাও পাঠকের কাছে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে।

কবির ব্যক্তিজীবনে যেমন ঢাকা থেকে কলকাতায় পর্বান্তর ঘটেছিল, তেমনি তাঁর কাব্যজীবনেও পর্বান্তর লক্ষ করা যায়। ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতির কোমল শব্দগুলো সময়ের রক্তাক্ত বজ্ররূপে দেখা দেয় তাঁর পরবর্তী কবিতায়। এ সময় কবি কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা। পশ্চিমবঙ্গের সমকালীন রাজনীতি তাঁর কবিতাকে প্রভাবিত করেছিল এবং তিনি ওই টানাপোড়েনের রাজনীতি থেকে নিজস্ব পথ সন্ধান করেছেন।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের কবিতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক মৃত্যুকে অস্বীকার করে জীবনের জয়পতাকা তুলে ধরা। তাঁর প্রায় প্রতিটি কাব্যগ্রন্থে মৃত্যুবিষয়ক কবিতা আছে। কিন্তু এই কবিতাগুলোতে তিনি মরণনামা রচনা করেন নি। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মহত্তর জীবনের ইঙ্গিত দিয়েছেন।

একথা স্বীকার্য যে, তাঁর কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আছে, বিশেষ করে প্রভাব আছে জীবনানন্দ দাশের। কিন্তু এই প্রভাবকে আত্মীকরণের মধ্য দিয়ে কবি হিসেবে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের যে অগ্রসরতা তা অনেক বেশি স্পষ্ট এবং এটাই কবি হিসেবে তাঁর স্বীকৃতি-স্তম্ভ। কবিতার বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রকরণের ক্ষেত্রেও কবি কিরণশঙ্কর নতুনত্বের প্রয়াসী ছিলেন। প্রচলিত ছন্দ ও অলংকার ব্যবহারের পাশাপাশি নিরীক্ষাধর্মী প্রকরণ পরিচর্যায় তিনি সিদ্ধহস্ত। সনেটে নিজস্বতা প্রয়োগ, অক্ষরবৃত্ত ছন্দে নিজের চিন্তা অনুযায়ী বিন্যাস, মাত্রাবৃত্তের মধ্যলয়কে নিরীক্ষাতলে স্থাপন কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের কবিতার প্রকরণচর্চার গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা।

কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তকে বিবেচনা করতে হবে চল্লিশের দশকের প্রগতি সাহিত্যের মুষ্টিমেয় স্রষ্টাদের নিরিখে। কেননা আজকের বাংলাদেশে এই ধারাটির ক্ষীণ সূচনালগ্নে তিনিও ছিলেন এর অন্যতম অগ্রদূত। বাংলাদেশের বাংলা কাব্যধারায় তাঁর অবদানটুকু তাই অস্বীকারযোগ্য যেমন নয়, তেমনি পশ্চিমবঙ্গে তাঁর পরবর্তী কাব্যরচনাও স্বাতন্ত্র্যগুণেই স্মরণযোগ্য।

.....

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

আকরগ্রন্থসমূহের নাম, প্রকাশকাল, প্রকাশনা সংস্থা ও প্রকাশ স্থান

১. স্বপ্ন-কামনা : অগ্রহায়ণ ১৩৪৫, কবি নিজে, ঢাকা
২. নতুন আঁচড় : ১৩৫০, প্রতিরোধ পাবলিশার্স, ঢাকা
৩. স্বর ও অন্যান্য কবিতা : ভাদ্র ১৩৬০, মডার্ন পাবলিশার্স, ৬ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা-১২
৪. দিনযাপন : শ্রাবণ ১৩৬৯, কবিতা পরিষদ, ৮০/২/৮ লেক রোড, কলকাতা-১৯
৫. এই এক সময় : শ্রাবণ ১৩৮০, সারস্বত লাইব্রেরী, ২০৬ বিধান সরণী, কলকাতা-৬
৬. বৃষ্টি এলে (দ্বিতীয় মুদ্রণ) : ফাল্গুন ১৩৮৮, উচ্চারণ, ২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩
৭. রুক্ষদিনের কবিতা : ১৯৮৩, সাহিত্যচিন্তা, কলকাতা
৮. মানুষ জানে : মাঘ ১৩৯১, উচ্চারণ, ২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩
৯. নির্বাচিত কবিতা : আষাঢ় ১৩৯৬, উচ্চারণ, ২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩
১০. ছায়া হেঁটে যায় : ১৯৯১, প্রমা, ৫ ওয়েষ্ট রেঞ্জ, কলকাতা-১৭
১১. ভিতরে বাইরে : সেপ্টেম্বর ১৯৯৪, পদ্মা-গঙ্গা পাবলিকেশন, ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা
১২. দৃশ্য বদলের দিন : মাঘ ১৪০১, প্রত্যয়, ২৪/১ বি ক্রিক রোড, কলকাতা-১৪
১৩. আশি-নব্বুই-এর কবিতা : আষাঢ় ১৪০৪, গ্রন্থমিত্র, ১ বি, রাজা লেন, কলকাতা-৯

গ্রন্থপঞ্জি ও অন্যান্য সহায়ক উপাদান

ক. বাংলা গ্রন্থ

১. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : কল্লোল যুগ, ১৪০৫, এম.সি সরকার অ্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা
২. অতুলচন্দ্র সেন ও অন্যান্য (অনুবাদক, সম্পাদক) : উপনিষৎ (অখণ্ড সংস্করণ), ১৯৮০, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা
৩. অনীক মাহমুদ : আধুনিক বাংলা কাব্যে সাম্যবাদী চেতনা, ১৯৯৫, বাংলা একাডেমী
৪. অমরেন্দ্র চক্রবর্তী (সম্পাদক) : কবিতা পরিচয়, ১৯৮১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
৫. অমলেন্দু সেনগুপ্ত : উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব, ১৯৮৯, পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা
৬. অরুণকুমার সরকার : তিরিশের কবিতা এবং পরবর্তী, ১৯৮১, প্যাপিরাস, কলকাতা

Dhaka University Institutional Repository

৭. অরুণ সেন (সম্পাদক) : বিভূতিভূষণ : আধুনিক জিজ্ঞাসা, ১৯৯৭, সাহিত্য অকাদেমি, দিল্লি

৮. অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদক) : আধুনিক কবিতার ইতিহাস, ২০০৩, ভারত বুক এজেন্সি, কলকাতা

৯. অশোক মিত্র : কবিতা থেকে মিছিলে, ১৯৯৫, প্যাপিরাস, কলকাতা

১০. অশোককুমার মিশ্র, ড. : আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা (১৯০১-২০০০), ২০০২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

১১. অশ্রুকুমার সিকদার : আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয়, ১৩৯২, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা

১২. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. : বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, ১৩৯২, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

১৩. আবুল কাসেম ফজলুল হক : আধুনিকতাবাদ ও জীবনানন্দের জবিনোৎকণ্ঠা, ২০০৩, জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা

১৪. আবদুল গণি : সোজা-সহজ কথায় : বাংলা ছন্দের রূপ ও স্বরূপ, ১৯৬৭, বাশার ব্রাদার্স, কলকাতা

১৫. আবদুল গণি হাজারী (অনুবাদক) : মনঃসমীক্ষা (মূলঃ সিগমুন্ড ফ্রয়েড), ১৯৭৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

১৬. আবদুল কাদির : ছন্দ সমীক্ষণ, ১৯৭৯, মুক্তধারা, ঢাকা

১৭. আবদুল মান্নান সৈয়দ : দশ দিগন্তের দ্রষ্টা, ১৯৮০, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
: নির্বাচিত প্রবন্ধ, ১৯৮৭, মুক্তধারা, ঢাকা
(সম্পাদক) : প্রেমের কবিতা সমগ্র (জীবনানন্দ দাশ), ১৯৯৬, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা

১৮. আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক) : আধুনিক বাংলা কবিতা, ১৯৯৯, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

১৯. আবু হেনা মোস্তফা কামাল : কথা ও কবিতা, ১৯৮১, মুক্তধারা, ঢাকা

২০. ই. এইচ. কার : দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক (১৯১৯-১৯৩৯), ১৯৮৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

২১. কিরণচন্দ্র চৌধুরী, ড. : আধুনিক ইওরোপ, ২০০২, ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী প্রাঃ লিমিটেড, কলকাতা

২২. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত : কবিতায় মানবিক উচ্চারণ ও অন্যান্য ভাবনা, ১৯৯১, প্রমা, কলকাতা
: কবিতার রূপ-রূপান্তর, ১৯৯২, উচ্চারণ, কলকাতা
: মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরকাল, ১৯৬৪, রূপা অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা
(পবিত্র সরকার সহযোগে) : আগুনের অক্ষর, ১৯৯২, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা
(সরদার ফজলুল করিম সহযোগে) : চল্লিশের দশকের ঢাকা, ১৯৯৪, নয়া প্রকাশ, ঢাকা

২৩. কোকা আন্তোনভা, গ্রিগোরি বোন্‌গার্দ-লেভিন, গিগোরি কতোভ্‌স্কি (অনুবাদ : মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজেন শর্মা) : ভারতবর্ষের ইতিহাস, ১৯৮৬, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো

Dhaka University Institutional Repository

২৪. খালেদ হোসাইন : আধুনিক বাংলা সাহিত্য প্রসঙ্গ, (২০০২), আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা।

২৫. খালেদ হোসাইন ও সাজ্জাদ আরেফিন (সম্পাদক) : সমর সেন, ২০০২, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা

২৬. খোকা রায় : সংগ্রামের তিন দশক, ১৯৮৫, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা

২৭. গোপাল হালদার (সংকলক) : বাংলার ফ্যাসিস্ট বিরোধী ঐতিহ্য, ১৯৭৫, মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

২৮. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, ড. : দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য, ২০০২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

২৯. গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত, শ্রী : আধুনিক ভারত, ১৯৮৯, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, কলকাতা

৩০. জগদীশ ভট্টাচার্য : আমার কালের কয়েকজন কবি, ২০০৪, ভারবি, কলকাতা

৩১. জীবনানন্দ দাশ : কবিতার কথা, ১৩৭০, সিগনেট প্রেস, কলকাতা
: কবিতা সমগ্র, ২০০২, তিশা বুক্স ট্রেড, ঢাকা

৩২. জীবেন্দ্র সিংহরায় : আধুনিক কবিতার মানচিত্র, ২০০১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
: কল্লোলের কাল, ১৯৮৭, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৩৩. জ্ঞান চক্রবর্তী : ঢাকা জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত যুগ, ১৯৮৭, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা

৩৪. দিনেশ দাস : শ্রেষ্ঠ কবিতা, ১৯৭২, ভারবি, কলকাতা

৩৫. দিলীপকুমার মিত্র, ড. : আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, ২০০২, বামা পুস্তকালয়, কলকাতা

৩৬. দিলীপ কুমার নন্দী ও অন্যান্য (সম্পাদক) : একদিন শতাব্দীর শেষে (জীবনানন্দ স্মারক সংকলন) ২০০০, পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, কলকাতা

৩৭. দীপ্তি ত্রিপাঠী : আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়, ২০০৩, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৩৮. দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দীপক রায় (সম্পাদক) : বাংলা আধুনিক কবিতা (১ম খণ্ড), ১৯৯২, সাহিত্যম, কলকাতা

৩৯. ধনঞ্জয় দাশ (সম্পাদক) : মার্কসবাদী সাহিত্যবিতর্ক, ২০০৩, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা

৪০. ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় : একালের বাংলা কবিতা : নিবিড় পাঠ, ১৯৯২, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

৪১. নারায়ণ চৌধুরী : সুকান্ত চর্চা, ১৯৯৪, মুক্তধারা, ঢাকা

৪২. নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী : কবিতার ক্লাস, ১৯৮৯, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা

৪৩. প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় : আধুনিক ভারত (দ্বিতীয় খণ্ড), ১৯৮৮, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা

৪৪. প্রভাতাংশু মাইতি, শ্রী : ইওরোপের ইতিহাসের রূপরেখা (বিশ্বের ইতিহাস), ২০০৩, শ্রীধর প্রকাশনী, কলকাতা

৪৫. প্রেমেন্দ্র মিত্র : কবিতা সমগ্র, ১৯৮৯, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

Dhaka University Institutional Repository

৪৬. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : উপন্যাস সমগ্র, ১৯৯৩, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা
৪৭. বদরুদ্দীন উমর (সম্পাদক) : সুকান্ত সমগ্র, ১৩৮০, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা
৪৮. বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়, ড. : আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা, ২০০৩, প্রকাশ ভবন, কলকাতা
৪৯. বিশ্বনাথ দে (সম্পাদক) : সুকান্ত বিচিত্রা, ১৯৯৫, সাহিত্যম, কলকাতা
৫০. বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : নির্বাচিত কবিতা, ২০০০, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
৫১. বুদ্ধদেব বসু : কালের পুতুল, ১৯৮৪, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা
৫২. ভূদেব চৌধুরী, শ্রী : বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, ১৯৯২, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা
৫৩. ভূঁইয়া ইকবাল (সম্পাদক) : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৫, বর্ণমিছিল, ঢাকা
৫৪. মণি সিংহ : জীবন সংগ্রাম, ২০০২ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা
৫৫. মাসুদুজ্জামান : বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার কবিতা : তুলনামূলক আলোচনা, ১৯৯৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
৫৬. মাহবুবা সিদ্দিকী : আধুনিক বাংলা কবিতায় সমাজ সচেতনতা, ১৯৯৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
: সিকান্দার আবু জাফর : কবি ও নাট্যকার, ১৯৯৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
৫৭. মুহিউদ্দীন খান, মাওলানা (অনুবাদক, সম্পাদক) : মাআরেফুল ক্বোরআন [মূলঃ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী (রহঃ)], ১৪১৩ হিজরি, খাদেমুল — হারামাইনিশ্ শরীফাইন বাদশা ফাহদ ইবনে আবদুল আজীজ কর্তৃক প্রকাশিত, মদীনা মোনাওয়ারা
৫৮. মুস্তাফা নূরুল ইসলাম : নজরুল ইসলাম : নানা প্রসঙ্গ, ১৯৯১, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা
৫৯. শঙ্খ ঘোষ : ছন্দের বারান্দা, ১৩৯৫, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা
৬০. মোতাহার হোসেন সুফী : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১৯৮৮, মুক্তধারা, ঢাকা
৬১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সঞ্চয়িতা, ২০০০, রহমান বুকস, ঢাকা
৬২. সমর সেন : বাবু বৃত্তান্ত, ১৯৯১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
৬৩. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা কবিতার কালান্তর, ২০০০, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
৬৪. সরোজমোহন মিত্র, ড. : সুকান্তের জীবন ও কাব্য, ১৯৯৭, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
৬৫. সুকান্ত ভট্টাচার্য : রচনাসমগ্র, ২০০৪, তৃণ, ঢাকা
৬৬. সুকুমার সেন, শ্রী : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (চতুর্থ খণ্ড), ১৯৭৬, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, কলকাতা
(সম্পাদক) : বৈষ্ণব-পদাবলী, ১৯৫৭, সাহিত্য অকাদেমি, দিল্লি
৬৭. সুবোধ চৌধুরী, ড. : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক পর্যায়), ১৯৯০, ভারত বুক এজেন্সি, কলকাতা
৬৮. সুভাষ মুখোপাধ্যায় : কবিতা সংগ্রহ-১, ১৯৯৩, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
: পদাতিক (ড. সৌমিত্র শেখর সম্পাদিত), ২০০৫, মনন প্রকাশ, ঢাকা
৬৯. সুমিতা চক্রবর্তী : আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়, ১৯৯২, প্রজ্ঞা প্রকাশন, কলকাতা
: আধুনিক বাংলা কবিতার চালচিত্র, ১৯৯৬, সাহিত্যলোক, কলকাতা

Dhaka University Institutional Repository

৭০. সৈকত আসগর, ড. : বাংলা কবিতার শিল্পরূপ : চল্লিশের দশক, ১৯৯৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

৭১. সৈয়দ আকরম হোসেন : বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, ১৯৮৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

৭২. সৈয়দ আলী আহসান : আধুনিক বাংলা কবিতা : শব্দের অনুষঙ্গে, ২০০১, গতিধারা

৭৩. সৌমিত্র শেখর, ড. : সত্যেন সেনের উপন্যাসে জীবন ও শিল্পের মিথস্ক্রিয়া, ২০০৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-জিজ্ঞাসা, ২০০৭, অগ্নি পাবলিকেশনস্, ঢাকা

৭৪. হায়াৎ মামুদ : সোমেন চন্দ, ১৯৮৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

৭৫. হাসান আল আবদুল্লাহ : কবিতার ছন্দ, ১৯৯৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

৭৬. হাসান হাফিজুর রহমান : আধুনিক কবি ও কবিতা, ১৯৯৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

৭৭. হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক : ভারতবর্ষের ইতিহাস (মুঘল ও ব্রিটিশ ভারত), ১৯৯০, পশ্চিবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা

৭৮. হুমায়ুন আজাদ : ভাষা-আন্দোলন : সাহিত্যিক পটভূমি, ১৯৯০, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা

খ. প্রবন্ধাবলি

১. অমিত চক্রবর্তী : কবির মুখোমুখী : কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত'র সঙ্গে সাক্ষাৎকার (সাহিত্যচিন্তা বর্ষ-২৬, বিশেষ সাহিত্যসংখ্যা, বৈশাখ ১৪০৪, কলকাতা)

২. অরুণ সেন : চল্লিশের কবিতা : দায় ও মুক্তি (পরিচয়, ৫৪ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, চৈত্র ১৩৯১, কলকাতা)

৩. অরুণাভ সরকার : কবিতা বা নিহিত দিনপঞ্জি (সাহিত্যচিন্তা, বর্ষ-২৭, বিশেষ স্মরণ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৪০৫, কলকাতা)

৪. অশোক মিত্র : শ্রী দেহের স্বাদ (সাহিত্যচিন্তা, ঐ)

: মানুষের অস্তিত্বেরই প্রতিকৃতি : গেরিলা কবি (সমর সেন, ২০০২, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা)

৫. আবদুল গফুর, অধ্যাপক : ফররুখ-কাব্যে বাংলার নিসর্গ (পূর্বাচল, ষষ্ঠ বর্ষ, একাদশ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৮৫, ঢাকা)

৬. আবু শাহ্‌রিয়ার : আহসান হাবীবের কবিতা-ভিন্ন বিচার (বই, ত্রয়োদশ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৮৪, ঢাকা)

৭. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত : কবিতায় শিল্পদৃষ্টি : জীবনানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথ (উত্তরণ, ৭ম বর্ষ, ১০ম সংকলন, আশ্বিন ১৩৭৫, কলকাতা)

: সময় অসময় : চল্লিশের দশকের একজন বাঙালি কবির স্মৃতি-আলেখ্য (সাহিত্যচিন্তা, শারদীয়া সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৮৭, কলকাতা)

: ঐ (সাহিত্যচিন্তা, বর্ষ-২৫, শারদীয়া সংখ্যা, আশ্বিন ১৪০২, কলকাতা)

: ঐ (সাহিত্যচিন্তা, বর্ষ-২৫, বিশেষ সাহিত্য সংখ্যা, বৈশাখ ১৪০৩, কলকাতা)

Dhaka University Institutional Repository

: ঐ (সাহিত্যচিন্তা, বর্ষ-২৬, শারদীয়া সংখ্যা, আশ্বিন ১৪০৩, কলকাতা)
: সোমেন চন্দ ও সমকাল (আগুনের অক্ষর, ১৯৯২, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা)

৮. গৌরিশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় : অনুভবে জাগিয়ে রাখে (সাহিত্যচিন্তা, বর্ষ-২৭, বিশেষ স্মরণ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৪০৫, কলকাতা)

৯. জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় : ইনিই রণেশ দাশগুপ্ত (সাহিত্যচিন্তা, বর্ষ-২৭, বিশেষ স্মরণ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৪০৫, কলকাতা)

১০. দিল আফরোজা বেগম : ফররুখ আহমদের কাব্য-প্রতিভা (পূর্বাচল, ষষ্ঠ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৮৫, ঢাকা)

১১. দিলারা হাফিজ : বাংলাদেশের কবিতার বিষয় ও আঙ্গিক (১৯৪৭-১৯৭১) (সাহিত্য পত্রিকা, একচল্লিশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, আষাঢ় ১৪০৫, ঢাকা)

১২. দিলীপ মজুমদার : প্রগতি লেখক আন্দোলনের চার বৎসর : বাংলাদেশ (সাহিত্যচিন্তা, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৮১, কলকাতা)

১৩. নীলরতন সেন : প্রবীণ কবির মুক্ত চিন্তা (সাহিত্যচিন্তা, বর্ষ-২৪, শারদীয়া সংখ্যা, আশ্বিন ১৪০১, কলকাতা)

১৪. প্রভাতকুমার দাস : সাহিত্যচিন্তা সম্পাদক কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত (সাহিত্যচিন্তা, বর্ষ-২৭, বিশেষ স্মরণ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৪০৫, কলকাতা)

১৫. প্রবোধচন্দ্র সেন : বাংলা ছন্দের নূতন সম্ভাবনা (সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা সংগ্রহ-১, ১৯৯৩, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা)

১৬. বাসুদেব দেব : কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের কবিতা (সাহিত্যচিন্তা, বর্ষ-২৭, বিশেষ স্মরণ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৪০৫, কলকাতা)

১৭. বিশ্বজিৎ ঘোষ : প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ, ঢাকা (সাহিত্যচিন্তা, বর্ষ-২০, সংখ্যা-৯, আশ্বিন ১৩৯৭)

১৮. বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : গোপাল মুখার্জি (সাহিত্যচিন্তা, বর্ষ-১৫, শারদীয়া সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৯২, কলকাতা)

১৯. বেগম আকতার কামাল : সুকান্তের কবিতার শব্দরূপ (সাহিত্য পত্রিকা, যুক্ত সংখ্যা : ৪৭, ৪৮, ৪৯, অক্টোবর ১৯৯৩-জুন ১৯৯৪, ঢাকা)

২০. ভবতোষ দত্ত : কবিতার শব্দ ও তত্ত্ব (সাহিত্যচিন্তা, বর্ষ-১৬, শারদীয়া সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৯৩, কলকাতা)
: কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক বাংলা কবিতার চর্চা (সাহিত্যচিন্তা, বর্ষ-২৭, বিশেষ স্মরণ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৪০৫, কলকাতা)
: কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের কবিতা (সাহিত্যচিন্তা, বর্ষ-২৭, শারদীয়া সংখ্যা, আশ্বিন ১৪০৪, কলকাতা)

২১. মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় : কাব্যদৃষ্টি ও সমর সেনের 'তিন পুরুষ' (মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক, ২০০৩, করুণা প্রকাশনী)

২২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : কবিও পেয়ে গেছে নতুন যুগ (সুকান্ত বিচিত্রা, ১৯৯৫, সাহিত্যম, কলকাতা)

২৩. মাসুদুজ্জামান : বাংলাদেশের কবিতায় আত্মস্বরূপ (সাহিত্য পত্রিকা, ছত্রিশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, আষাঢ় ১৪০০, ঢাকা)

Dhaka University Institutional Repository

২৪. মিজানুর রহমান খান : আহসান হাবীবের কবিতার শিল্পরূপ (সাহিত্য পত্রিকা, ৩৪ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৯৮, ঢাকা)

২৫. মিহির চক্রবর্তী : বাংলা কবিতার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সত্তরের কবিতা, (নান্দীমুখ, বর্ষ-১৮, সংখ্যা-২, ১৯৭৮, কলকাতা)

২৬. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : চল্লিশের বাংলা কবিতা (সাহিত্য পত্রিকা, পঁয়ত্রিশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৯৮, ঢাকা)

২৭. শাহ্ ফজলে রাব্বী : বাংলাদেশের কবিতা (বই, চতুর্দশ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৮৫)

২৮. সরোজমোহন মিত্র, ড. : জীবন ও সাহিত্য কৃতি (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৫, বর্ণমিছিল, ঢাকা)

২৯. সাধন চট্টোপাধ্যায় : ঢাকা প্রগতি আন্দোলনের প্রজন্ম : কবি কিরণশঙ্কর (সাহিত্যচিন্তা, বর্ষ-২৭, বিশেষ স্মরণ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৪০৫, কলকাতা)

৩০. সুভাষ মুখোপাধ্যায় : সুকান্ত (সুকান্ত বিচিত্র, ১৯৯৫, সাহিত্যম, কলকাতা)

৩১. সুমিতা চক্রবর্তী : অচ্যুত গোস্বামী : ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্ব (সাহিত্যচিন্তা, আশ্বিন ১৪০৩, কলকাতা)
: চল্লিশের কবিতা (আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাস, ২০০৩, ভারত বুক এজেন্সি, কলকাতা)
: বাঙালি কবির কাব্যচিন্তা : চল্লিশের দশক (সাহিত্যচিন্তা, বর্ষ-২৩, শারদীয়া সংখ্যা, আশ্বিন ১৪০০, কলকাতা)

৩২. সুশান্ত চট্টোপাধ্যায় : সত্তর-দশকের কবিতা (আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাস ২০০৩, ভারত বুক এজেন্সি, কলকাতা)

৩৩. সৈকত আসগর, ড. : বিষ্ণু দে-র কবিতায় শব্দের ব্যবহার (সাহিত্য পত্রিকা, ৩৪ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৯৮, ঢাকা)

গ. পত্র-পত্রিকা

১. কল্যাণ চন্দ (সম্পাদক) : সাহিত্যচিন্তা, বর্ষ-২৭, বিশেষ স্মরণ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৪০৫, কলকাতা

২. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত (সম্পাদক) : উত্তরণ, ৭ম বর্ষ, ১০ম সংকলন, আশ্বিন ১৩৭৫, কলকাতা
: সাহিত্যচিন্তা, ১০ম বর্ষ, শারদীয়া সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৮৭, কলকাতা
: সাহিত্যচিন্তা, বর্ষ-২৫, বিশেষ সাহিত্য সংখ্যা, বৈশাখ ১৪০৩, কলকাতা

অমৃত কুমার দত্ত (সহযোগে) : ক্রান্তি, শারদীয়া সঙ্কলন, ১৩৫৩, ঢাকা।

৩. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (সম্পাদক) : সাহিত্য পত্রিকা, ৩৩ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৯৭, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঘ. অভিধান

১. অঞ্জলি বসু (সম্পাদক) : সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান (দ্বিতীয় খণ্ড) ২০০১, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা

২. মুহম্মদ এনামুল হক, ড. ও অন্যান্য (সম্পাদক) : বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, ২০০২, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

৩. সুধীরচন্দ্র সরকার (সংকলক) : পৌরাণিক অভিধান, ১৪০৪, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

৪. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গীয় শব্দকোষ (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), ২০০১, সাহিত্য অকাদেমি, দিল্লি

ঙ. অন্যান্য

সাক্ষাৎকার

: ইভা দাশগুপ্ত, অধ্যাপিকা (গ্রহণ : বর্তমান গবেষক, ১৭.১১.০৩, গড়িয়া স্টেশন রোড, কলকাতা)

: কল্যাণ চন্দ (গ্রহণ : বর্তমান গবেষক, ১৬.১১.০৩, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা)

: দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (গ্রহণ : বর্তমান গবেষক, ১৮.১১.০৩, সুশীল সেন রোড, কলকাতা)

: প্রফুল্লকুমার দত্ত, কবি (গ্রহণ : বর্তমান গবেষক, ২১.১১.০৩, 'হ্যাপিলুক', কলকাতা)

: রাণা চট্টোপাধ্যায়, কবি (গ্রহণ : বর্তমান গবেষক, ২০.১১.০৩, নিউ পার্ক, গড়িয়া স্টেশন রোড, কলকাতা)

: সঞ্জয়শঙ্কর সেনগুপ্ত (গ্রহণ : বর্তমান গবেষক, ১৯.১১.০৩, নিউ বালিগঞ্জ, কলকাতা)

: সুমিতা চক্রবর্তী, অধ্যাপক ও গবেষক (গ্রহণ : বর্তমান গবেষক, ২০-১১-০৩ কৃষ্ণচূড়া এ্যাপার্টমেন্ট, যাদবপুর, কলকাতা)

: সুমিত্রশঙ্কর সেনগুপ্ত, কবিপুত্র (গ্রহণ : বর্তমান গবেষক, ১৭.১১.০৩, বাণীবভবন, গাঙ্গুলী বাগান, কলকাতা)